



ର ବି - ର ଶି

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ

করেকথানি সমালোচনা গ্রন্থ

শরৎচন্দ্র ৪১

ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ৩১০

ডাঃ শচীন সেন

সীতা ও সরমা ২১

মধুসূদন-কাব্য-পরিচয় ২১

দীননাথ সান্যাল

কাব্যসাহিত্য মাইকেল

মধুসূদন ৩১

বাল্মীকি কাব্যসাহিত্যের কথা (বঙ্গব্রত)

ঐকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

এ. সুখার্জি এ্যান্ড কোং

২, কলেক্টর কোয়ার্টার : কলিকাতা

রবি - রশ্মি

পশ্চিম ভাগে

[কলিকাতা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত]

কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপাধ্যায়,
বিবিধ-গ্রন্থ-প্রণেতা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ
কর্তৃক বিশ্লেষিত



প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মৃধোপাধ্যায়
১, কলেজ রোড : কলিকাতা

প্রচ্ছদ পট
ও. সি. গাঙ্গুলী

৮১. ৮৪১
ট. ২. ৫২ ৫-

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ

মূল্য সাত টাকা

১২.৯.৩২

মুদ্রাকর—ইন্ডোপ্রেস লিমিটেড
বেঙ্গল প্রেস
১০, কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতা

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

রবি-রশ্মির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার ইহা দেখিয়া বাইতে পারেন নাই। বিগত ১লা পৌষ তিনি সাহিত্য-সেবার মধ্যেই নব্বয় জগৎ হইতে বিদায় লইরাছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, “সকলের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে মাত্র অর্ধেক বই ছাপা হইল। বাকী অর্ধেক আমার জীবদ্দশায় ছাপা হইবে কি না বিধাতাই জানেন।” কে জানিত যে তাঁহার সেই কথা এমন নির্মম ভাবে সত্য হইবে ?

চারুচন্দ্রের ও আমার সাহিত্য-জীবন প্রায় সমকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। আজ তাঁহার পুত্রের অহুরোধে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি অত্যন্ত দুঃখের সহিত। আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। বন্ধুবরের অক্লান্ত সাধনার ফল তাঁহার অবর্তমানে প্রকাশ্য সহিত সাহিত্যামোদীর করে তুলিয়া দিবার উপলক্ষ্যে ছই-একটি কথা মাত্র বলিব।

রবি-রশ্মি Browning Encyclopaedia শ্রেণীর গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৬০ খানি কাব্য ও গীতিনাট্য এবং ৩৬০টি কবিতার ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। কবির প্রায় সকল বিখ্যাত কাব্য ও কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবি-রশ্মিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বঙ্গসাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। এক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবি তাঁহার প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ভালরূপে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য ও ভাবধারার উৎস অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। তাঁহার কাব্য ও কবিতার পারম্পর্য—তাঁহার চিন্তা-বিকাশের স্তরগুলি বুঝিবার পক্ষে রবি-রশ্মি অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। চারুচন্দ্র যে ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-কাব্যের আত্মদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্তসাধারণ কাব্যাত্মবোধের ফল। তিনি একাধারে কবি, রসজ্ঞ ও সমালোচক ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা বুঝিবার এবং বুঝাইবার যোগ্যতা তাঁহার যেমন ছিল তেমন আরও অধিক লোকের নাই। তিনি যে প্রশালীভূত এই ছত্রই কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অল্প অনেকের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত

যদিও পরিচর্য থাকার তাঁহার আরও সুযোগ হইয়াছিল কবির নিকট হইতে অনেক বিষয় বাচাই করিয়া লইবার। কাজেই রবি-রশ্মিকে নানা দিক হইতে প্রামাণিক মনে করা যোয্য, হয় অজ্ঞান হইবে না ; কারণ আমরা জানি যে গ্রন্থকার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব নহে। চারুচন্দ্র বিশ্বাস বঙ্ক, সহযোগী সাহিত্য-সেবী এবং অমুরাগী তত্ত্ব-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ব্যতীতও তিনি বহু সাহিত্যিকের রচনা হইতে তাঁহার গ্রন্থের মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন :—

“রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাখ্যা বহু লোকে বহু বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকলের উক্তির সার-সংগ্রহ করিয়াছি এবং অনেক স্থলে কবির নিজের অভিমতের দ্বারা বাচাই করিয়া বিশেষ ত্রুটি ও বিনয়ের সহিত আমার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।”

কোনও কোনও কবিতার ব্যাখ্যার তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। এমন কি কবির সহিতও তাঁহার কবিতার ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ইহা অসংকোচে বলিতে পারি যে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার অল্পশীলনে চারুচন্দ্র যে নিরলস সাধনার পরিচর্য দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে অতিরিক্তে মুছিয়া বাইবে না।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার রবি-রশ্মির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়া নিয়াছিলেন। পরিশিষ্টের আলোচনাগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ. কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইয়াছে।

স্বকি-রশ্মি : ১ বর্ণচ্ছত্র

স্বকি-রশ্মি	১	পাখল	৪২
উদ্বোধন	২	স্বপ্ন	৪৩
মাতাল	৬	প্রবাসী	৪৫
যথাস্থান	৭	কুঁড়ি	৪৬
ভীকৃত	৭	বিশ্বদেব	৪৮
সেকাল	৮	আবর্তন	৪৮
যাত্রী	১২	অতীত	৫০
অতিথি	১২	কত কি যে আসে, কত	
‘আষাঢ়’ ও ‘নববর্ষা’	১৪	কি যে যায়	৫১
নববর্ষা	১৪	মরণ-দোলা	৫২
আবির্ভাব	১৬	মরণ	৫৫
কল্যাণী	১৮	হিমালয়	৫৭
নৈবেদ্য	২১	প্রচ্ছন্ন	৫৯
মুক্তি	২২	ছল	৫৯
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে		চেনা	৬০
জীবন সমর্পণ	২৬	প্রসাদ	৬০
দীক্ষা	২৬	নব বেশ	৬০
ভ্রায়দণ্ড	২৭	জন্ম ও মরণ	৬১
শৃঙ্খল বিধে	২৭	১৩ নম্বর—আজ মনে হয়	
শিক্ষা	২৭	সকলেরি হাতে তোমারই	
‘সুগন্ধর’ ও ‘স্বার্থের		ভালোবেসেছি	৬১
সমাপ্তি’	২৮	৪০ নম্বর—আলোকে আশিরা	
প্রার্থনা	২৮	এরা লীলা করে যায়	৬২
স্মরণ	২৯	৪৬ নম্বর—সাক হয়েছ রত্ন	৬৩
মৃত্যুমাধুরী	২৯	১৫ নম্বর—আকাশ-সিঁদু-মাঝে	
চিঠি	৩১	এক ঠাই	৬৩
শিশু	৩২	২৫ নম্বর—চুম্বারে ভোম্বারে তীক্ষ্ণ	
শিশু-লীলা	৩৩	ক’রে যাত্রা আছে	৬৪
জগৎকথা	৩৫	১৮ নম্বর—ভোম্বারি বীণায়	
কেন মধুর	৩৫	কত তার আছে	৬৪
সুখোচুরি ও বিদার	৩৯	৪৪ নম্বর—পথের পথিক	
‘স্বপ্ন’	৪১	করেছ আশিরা	৬৫
অনুভব	৪২	২ নম্বর—কেবল তব মনের	
		পায়ে চাষিরা	৬৫

উৎসর্গ—ক্রমাগত

আখার আলিতে রজনীর দীপ

জ্বলিছে যতগুলি—

৬ নম্বর—ভোমার চিনি ব'লে

আমি করেছি গরব

১২ নম্বর—হে রাজন্ তুমি

আমারে বাঁশী বাজাবার

দিয়েছ যে ভার

চিঠি

খেত্ৰা

শেব খেয়া

শুভক্ষণ ও তাগ

আগমন

দান

বাণিকা বধু

কুপণ

কুয়ার ধারে

অনাবস্তক

ফুল কোটানো

দিন শেষ

দীঘি

প্রতীক্ষা

প্রজ্বর

সব-পেয়েছির দেশ

শান্তিদোহসব

প্রাক্কলিত

সীতাঞ্জলি

আমার মাথা নত ক'রে

দাও হে

কত অজানারে জানাইলে

তুমি

বিপদে ঘোঁরে রক্ষা করো,

এ নব্বো ঘোর প্রার্থনা

প্রোমে প্রোমে গানে গকে

আলোকে পুণকে

তুমি বক নব রূপে এস প্রাণে

আমার নরন-ভুলান এলে

জগৎ জুড়ে উদার হুরে

আনন্দগান বাজে

আজি বড়ের রাতে তোমার

অভিসার

তুমি কেমন ক'রে গান করো

হে গুণী

২৪, ২৫, ২৬ নম্বর গান

প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি

জাগে

ধনে জনে আছি জড়ারে হার

দাও হে আমার ভয় ভেঙে

দাও

আবার এরা ঘিরেছে

মোর মন

আমার মিলন লাগি' তুমি

আলুছ কবে থেকে

এস হে এস সজল ঘন, বাদল

বরিষণে

জগতে আনন্দযন্ত্রে আমার

নিমগ্ন

তুমি এবার আমার লহ তে

নাথ লহ

এবার নীরব ক'রে দাও হে

তোমার মুখের কবিরে

বিশ্ব যখন নিভ্রাগমন, গগন

অন্ধকার

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

জালিয়ে তুমি ধরায় আস

কবে আমি বাহির হলেম

তোমারি গান গেয়ে

তোমার প্রেম যে বইতে পারি

এমন সাধ্য নাই

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী

কথা ছিল এক তরীতে কেবল

তুমি আমি

১০৩

১০৪

১০৫

১০৬

১০৭

১০৮

১০৯

১১০

১১১

১১২

১১৩

১১৪

১১৫

১১৬

১১৭

১১৮

১১৯

১২০

১২১

চাই গো আমি তোমারে		গীতিমালা	১৩০
চাই	১১১	আত্মবিক্রম	১৩০
দেবতা জেনে দূরে রই		গীতাভি	১৩২
দাঁড়ারে	১১১	যাত্রাশেষ	১৩৫
হে মোর দেবতা, ভরিয়া		ফাঙ্কলী	১৩৭
এ দেহ প্রাণ	১১২	বলাকা	১৩৯
এই মোর সাধ যেন এ		✓ নবীন	১৪৩
জীবন-মাঝে	১১২	✓ এবার যে ঐ এলো	
একলা আমি বাহির হলেম		সর্বনেশে গো	১৪৭
তোমার অভিসারে	১১৩	✓ আমরা চলি সমুখ পানে	১৪৭
ভারততীর্থ	১১৩	✓ শঙ্খ	১৪৭
অপমান	১১৪	পাড়ি	১৪৮
ভজন-পূজন সাধন আরাধনা		✓ ছবি	১৪২
সমস্ত থাক পড়ে	১১৫	✓ শাকাহান	১৪৬
সীমার মাঝে অসীম তুমি		✓ চকলা	১৬০
বাক্সাও আপন স্বর	১১৬	১০ নম্বর—হে প্রিয় আজি	
তাই তোমার আনন্দ		এ প্রাতে	১৬৫
আমার 'পর	১১৬	বিচার	১৬৬
আমার এ গান ছেড়েছে তার		প্রতীক্ষা	১৬৮
সকল অলঙ্কার	১১৭	১৩ নম্বর—পউষের পাতা-ঝরা	
আমার মাঝে তোমার লীলা		তপোবনে	১৬৯
হবে	১১৭	২১ নম্বর—ওরে তোদের স্বর	
গান দিয়ে যে তোমার খুঁজি	১১৭	সচে না আর	১৬৯
তোমার খোঁজা শেষ হবে		৩৪ নম্বর—আমার মনের	
না মোর	১১৮	জানলাটি আজ	১৭০
যেন শেষ গানে মোর সব		৩৫ নম্বর—আজ প্রভাতের	
রাগিণী পূরে	১১৮	আকাশটি এই	১৭২
আমার চিত্ত তোমার নিত্য		৩৬ নম্বর	১৭৩
হবে, সত্য হবে	১১৮	৩৭ নম্বর—দূর হ'তে কি	
মনকে আমার কাঁধকে	১১৯	শুনিস্ যত্নের গর্জন	১৭৭
নাঘটা যেদিন ঘুচে নাথ	১১৯	৩৮ নম্বর—সর্বদেহের ব্যাকুলতা	
জীবনে যত পূজা হলো		কি বলতে চার বাণী	১৭৯
না সারা	১১৯	৩৯ নম্বর—যে দিন উদিলে	
শেষের মধ্যে অশেষ আছে	১১৯	তুমি বিশ্বকবি দূর সিদ্ধপারে	১৮০
কালিকা	১২১	৪০ নম্বর—এইক্ষণে মোর	
অচলাহতন	১২৫	হৃদয়ের প্রান্তে	১৮৬
ভাকবান	১২৮	৪১ নম্বর	১৮৭

৪৩ নম্বর—তোমারে কি		প্রবাহিনী	২২২
বারবার করেছিল অগম্য	১৮০	চিবস্তন	২২২
৪৫ নম্বর—ভাবনা নিয়ে মরিল		পুন্ডরী	২৩০
কেন ক্ষেপে	১৮১	, তপোভঙ্গ	১৩৬
৪৬ নম্বর—নববর্ষ	১৮২	ভাঙা মন্দির	২৩৮
১৪ নম্বর—কত লক্ষ ববয়ের		আগমনী	২৩৮
তপস্তার ফলে	১৮২	, লীলাসজিনী	২৩২
১৬ নম্বর—বিশ্বের বিপুল		বেঠিক পথের পথিক	২৪০
বস্তুরাশি	১৮৪	, বকুল-বনের পাখী	২৪১
১৭ নম্বর—হে ত্বন আমি		, সাবিত্রী	২৪২
বতরণ	১৮৬	, আহ্বান	২৪৭
১৮ নম্বর—যতক্ষণ স্থির		লিপি	২৫৩
হয়ে থাকি	১৮৭	বাতাস	২৫৬
১৯ নম্বর—আমি যে বেসেছি		পদধ্বনি	২৫৬
ভালো এই অগতেবে	১৮৯	দোসব	২৫৭
ভই নারী	১৯৬	কৃতজ্ঞ	২৫৭
৩০ নম্বর—এই দেহটির ভেলা		মৃত্যুর আহ্বান	২৫৮
নিয়ে	২০৩	দান	২৫৯
২৮ নম্বর—পাখীবে দিয়েছ		প্রভাত	২৫৯
গান, গায় সেই গান	২০৫	অমৃতিভা	২৬০
২৯ নম্বর—যে দিন তুমি		প্রভাতী	২৬০
আপনি ছিলে একা	২০৮	তৃতীয়া ও বিবাহিনী	২৬১
৩১ নম্বর—নিভা তোমার		কঙ্কাল	২৬১
পারের কাছে	২১১	অন্ধকার	২৬২
৩২ নম্বর—আজ এই দিনের		বসন্তের দান	২৬৫
শেষে	২১২	শিবাজী-উৎসব	২৬৬
৩৩ নম্বর—জানি আমার		নমস্কার	২৬৬
পারের শব্দ	২১৩	নতীর পূজা	২৬৭
৪৫ নম্বর—বোবন	২১৫	শ্রীকৃষ্ণ-উৎসব ও	
পলাতক	২১৭	শ্রীকৃষ্ণ	২৭১
মুক্তি	২১৮	কল্করস্বী	২৭২
কাঁকি	২১৯	লেখন	২৭৬
মিষ্টি	২২০	অঙ্কুরা	২৭৮
হারিয়ে যাওয়া	২২০	উজ্জীবন	২৮০
শিশু ভোলাস্বামী	২২২	পথের বাধন ও বিদায়	১৮১
মুণ্ডশ্রাব্য	২২৬	বায়ী	২৮১
		সাগরিকা	২৮২

বনবাণী	২৮৪	পল্লিশিষ্ট (টীকা-টীপনী ও সমালোচনা-সংগ্রহ)	
পল্লিশেষ	২৯৩	উৎসর্গ—হিমাঙ্গি	৩১০
পুনশ্চ	২৯৬	খেয়া—শেষ খেয়া	৩১০
কালের যাত্রা	২৯৮	বলাকা কাব্যের নামকরণ	৩১১
বিচিত্রিতা	৩০১	ববীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমণ	৩১৩
চণ্ডালিকা	৩০২	রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সূত্র	৩৩৮
তাসের দেশ	৩০৪	রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম	৩৫৪
উপসংহার	৩০৭	মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা	৪৭২
		ববীন্দ্র-পরিচয়	৩৯৪
		নিদর্শনী	৪৩৩



অবি-ব্রহ্মি

ক্লগিকা

রবীন্দ্রনাথের 'ক্লগিকা' কাব্যের কবিতাগুলি শিলাইদহে রচিত। কাব্য-
খানি বাংলা ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সম্ভ্রাসজীতে কবি নিজের প্রতিভার স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।
ক্লগিকায় কবি তাঁহার নিজস্ব ভাষার সন্ধান পাইলেন, ইহার পূর্বে তিনি যেন
অপরের নিকটে ধার-কবা কৃত্রিম ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন।
মানসী কাব্যে কবি প্রথম যুক্তাক্ষরকে হইয়া গণনা করিতে আরম্ভ করেন।
ক্লগিকাতে তিনি প্রথম হসন্তবহুল চলিত কথার সৌন্দর্য ও ধ্বনিমায়ুর্ধ্ব ধরিতে
পারিলেন। গিরিকের যাহা বাহ্য উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলঙ্কার—
তাহা এই কাব্যের কবিতাগুলির মতো বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।
ইহা ছন্দে ভাবে প্রকাশভঙ্গিতে কবির স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অবলীলাক্রমে বলমূল
কবিতা, সর্বত্র আনন্দের লঘু নৃত্য টলমল করিতেছে। নিছক গীতি-
কবিতা হিসাবে 'ক্লগিকা' কবির এক অনবদ্য অপূর্ব সৃষ্টি, কবির অন্ততম
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত নূতন নূতন বরণে, নূতন নূতন প্রকাশভঙ্গিতে কাব্য
রচনা করিয়া আসিয়াছেন, এক একখানি কাব্য যেন তাঁহার কাব্যপ্রতিভার
প্রকাশভঙ্গিমার এক একটি নূতন পর্যায়। তাঁহার কাব্যধারায় বিবর্তন অধিক।
একথা কবি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—

“আজকাল যেমন কবিতা লিখছি তা ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে আমি
ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে কি না ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেছে। আমি
বেশ অনুভব করিতে পারছি, আমি যেন আর একটা অপরিবর্তনের সন্ধিক্ষেত্রে আসার অবস্থায়
দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চলবে তাই ভাবি।” অবিভ্রাম পরিবর্তন দেখলে
জর হয়।

—সম্ভ্রাস ১৩২৪, ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা। ‘পুরবী কাব্যের ‘আলোক’ কবিতার ব্যাখ্যায় এই
পদ্য উইথ।

এই ক্লগিকা কবির কাব্যরচনার তত্ত্বের একটি শ্রেষ্ঠ ও মনোজ পরিবর্তন।

কণিকার কবি জীবনের প্রিয় বস্তু হারাইয়া যাওয়ার ও অভিলষিত বস্তু না পাওয়ার কতি ও ব্যর্থতাকে হাসি-তামাশা দ্বারা ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। হৃদয়ের দারুণ বেদনাকেও তিনি হাসির আলোক দিয়া বরণ করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন এই কণিকার কবিতাগুলির মধ্যে। কবি নিজেরই তাঁহার মানসী জীবনদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সব

নিজের কথাটাই।

হাকা তুমি করো পাছে

হাকা করি তাই

আপন ব্যথাটাই।

চটুল ভঙ্গীতে বলা সরল কথাগুলিও একটি গভীর বেদনাময় অনুভূতি ও অসুস্থাব হইতে উৎসারিত। এখানে ওমর খৈয়ামের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যাইতে পারে। সত্যকে সব বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজরূপে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতার আভাস কবি কণিকার দিয়াছিলেন, সেই ক্ষমতারই কবিত্বময় সৃষ্টি এই কণিকা। কবি জীবনকে সহজভাবে সত্যরূপে গ্রহণ করিতে উৎসুক—

মনেরে আজ কহ যে

ভালো বল বাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে।— বোঝাপড়া।

তাঁহার “চিত্ত-দুয়ার মুক্ত দেখে সাধু-বুদ্ধি বহির্গতা”। এই কবিই পরে কান্তনীতে বলিয়াছেন—“ভালোমানুষ নইরে মোরা ভালোমানুষ নই।” কবির বয়স তারুণ্য-বৈশা হইলেও, “পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো, সবার আমি এক-বয়সী ছেনো।”

উদ্বোধন

(১৩০৬)

যে দিন হইতে মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে একটি কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না। সেই সমস্যাটি হইতেছে—এই বিশাল জগতে তাঁহার স্থান কোথায়, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহা কেই বা বলিয়া দিবে?

আর প্রতি মুহূর্তে যে বেদনার ভার চারিদিক হইতে আসিরা তাহাকে বিরিয়া ধরিতেছে, তাহার তরুই বা সে কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? এই পৃথিবীকে মাহুকের মনে হয় বড় দুঃখময়, এখানে প্রতিকূলে বহুদিনের সব্ব-পোষিত আশার সূত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা, প্রতিপদে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের হাহাকার। ইহার মাঝখানে পড়িয়া মাহুয় পথ খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু জীবনের এই বিমর্ষ মূর্তি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে না। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবনের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আনন্দেরেই হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তন আনন্দ-ময়ের উপাসক। দুঃখ-বেদনাকে, নিরাশার আঘাতকে জগতের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া মানিতে তাঁহার মন চায় না। তাঁহার মনে হয়, এ দুঃখ যেন সংসারের উপরের কর্তন গুচ্ছ খোলা মাত্র; উঠাব দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগের অপব্যয় না করিয়া, তাহার অন্তস্তলে যে গোপন আনন্দের উৎস আছে তাহারই রসাস্বাদন কবিরাজ জন্ত তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন তাঁহার প্রিয়াকে a traveller between life and death দেখিয়াছিলেন, এবং সংসারের কোনো কিছু আবিলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, ও করিতে পাবে না বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথও তেমনই এমন একটি মুক্ত স্বন্দর জীবন পাইতে চাহিতেছেন, যাহা পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য নিরাশা নিফলতার দ্বারা একটুকুও অভিভূত না হইয়া পৃথিবীর সমস্ত আনন্দরস নিঃশেষে পান করিয়া যাইবে; অমল কমল যেমন জলের কোলে সহজ আনন্দে ফুটিয়া উঠে, পঙ্কজ হইয়াও সে যেমন পঙ্কিলতাকে পরিহার করিয়া শোভায় সুধমায় ঢলঢল করে, তেমনি করিয়া এই অপরূপ মানব-জীবন-সংসারের মধ্যে কবির জীবনও অনাসক্তভাবে কাটিয়া যাইবে। জীবনের কোথাও এতটুকু বাধন পড়িবে না যে, শেষের দিনে ডাক আসিলে সাড়া দিতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট ও বিধা হইতে পারে। সেই জন্ত নবীন-জীবনের উদ্বোধন সঙ্গীত কবির কণ্ঠে উদ্বেষিত হইতেছে। যাহা বাইবার তাহাকে কেহ কোনোদিন ধরিত্তা রাখিতে পারে না। যাহা পাইবার নহে, তাহার জন্ত সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া ফিরিলেও কোনো লাভ নাই। কিন্তু মাহুয় চিরদিন এই সহজ সরল সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বস্তির সঙ্কেত ও নিরাশ হৃদয়ের বীর্ধবাসে তাহার চারিদিকে যে দুঃখের পৃঙ্খল জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহা সে নিজেই স্রষ্টা করিতেছে। সেই 'পৃঙ্খল' ফির

কবিতা না পারিলে তাহার ভাগ্যে আনন্দ লাভ কবা অসম্ভব। অর্থহীন মান প্রভৃতি সব ভুলিয়া মানুষ যদি সৌন্দর্য-পিপাসু হইয়া মুখ-রূপে ভ্রমরের মতো বিশাল জগতের মর্যকোষে বাস করিতে পারে এবং কল্যাণময় সৌন্দর্য-শতদলের শোভা দেখিতে ও রস আনন্দন কবিতা শিখে, তবে তাহার জীবন আনন্দে বলমূল অমূল সুন্দর হইবে, সামান্য দুঃখ-কালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তাই কবি বলিতেছেন যে, অতীতের প্রতি কোনো মমতা না করিয়া ও ভবিষ্যতের কোনো আশা না রাখিয়া কেবল বর্তমানকেই আমাদের কর্মে প্রয়োগ করিতে হইবে। মানুষের জীবন তো কতকগুলি বর্তমান মুহূর্তেব সমষ্টি। অতএব বর্তমানকে সার্থক করিয়া তোলাই হইতেছে জীবনের সাধনা। বর্তমানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অতীত তো গত, তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমাদের ক্ষণস্থায়ী বর্তমানকে বিনষ্ট করা উচিত নয়। আবার ভবিষ্যৎ তো অনাগত, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাও ঘটিতে পারে। অতএব বর্তমানই আমাদের একমাত্র উপায়। অতীত তো অতীত, মাথা কুটিলেও তাহাকে তো আর পাওয়া যাইবে না, গতত্ব শোচনা নাস্তি। আবার পবকালের ভরসায় সকল সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিয়া এ জীবনকে বিফল করিয়াও কোনো লাভ নাই। আনন্দের কোনো কারণ না থাকিলেও সর্বদা কেবল আনন্দেই মগ্ন থাকিতে হইবে। সামান্য কয়েক দিনের জন্ত আমরা ইহজগতে আসিয়াছি। সুতরাং বিরস মুখে বসিয়া থাকিয়া জীবনকে পণ্ড না করিয়া এই জীবনের সকল প্রকার সুখ আনন্দ করা বাঞ্ছনীয়।

কবি বলিতেছেন যে, অনন্ত মহাকাল যেমন চিরদিন অতীতকে বহন করিয়া বেড়ায় না, অতীতকে ক্রমাগত পিছনে ফেলিয়া কেবল বর্তমানকে বৃকে করিয়া অনবরত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ আমাদেরও অতীতের অহুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া, ভবিষ্যতের প্রত্যাশা না রাখিয়া, কেবল চৈকনিক-বর্তমান আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহারই প্রত্যেক ক্ষণটিকে আমাদের কর্মের স্বাক্ষর সকল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। অতীতকে টানিয়া আনিয়া বর্তমানের জায়াগা ছুড়িয়া কোনো লাভ নাই। যে কনিক-বর্তমান আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহাকে বরণ করিয়া লও, তাহাকে লইয়াই আত্মিকার কনিক-জীবনের আনন্দস্বপ্ন গাও, কনিক-দিনের উৎসবে মগ্ন হও। গৃহকোণে

বসিয়া ক্ষণিক বর্তমানকে অতীতের চিন্তায় ভাবনার ভারাক্রান্ত করিয়া জীবনকে মৃত্যুপুরী করিয়া তুলিয়া না। জীবনের বর্তমানকে যদি আনন্দ-উৎসবে সার্থক করিয়া তুলিতে পারো, তাহা হইলে তোমার অতীত আনন্দময় হইবে এবং ভবিষ্যৎও আনন্দিত হইবে। তাহা হইলে এই বর্তমান ক্ষণগুলি সারা-জীবনের কণ্ঠে আনন্দের মালা হইয়া হুলিবে।

কবি উদ্দেশ্যমূলক কর্ম হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে যোগে আনন্দের আবেগে পাগল হইয়া উঠিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—
বলিমুখ পতঙ্গের মতো জগতে সকল আনন্দে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে।

“সকল সংসার ও প্রথার বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিবার ব্যগ্রতা স্বর্গী কবিদের ও বইটম্যানের কবিতায় পাওয়া যায়। ইহারা বলেন- প্রকৃতি ও মানবকে লইয়াই এত জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার দেশে কালে যখন ও শাস্ত। শাস্ত সত্যের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, আপনাকে অথও মানব-পরিবারের অন্তর্গত নলিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যিনি নিজেকে শাস্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনি সকলের পরমাত্মীয় হন।

‘বাধা বিবেচনা সমস্তা সন্ধান- সব সরাইয়া ফেলিয়া ক্ষণ-প্রকাশের যুগে মুহূর্তে মুহূর্তে যে অমৃত রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি তাহারই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন এবং প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন। জীবনের সব জটিলতা ছুড়াবনা সরাইয়া দিয়া জন্মবাবুদের সহজ পথে চলার দুনিবার আকাঙ্ক্ষায় কবি বলিতে চাহেন জন্মের আবেগ তুচ্ছ নয়, সৌন্দর্যের উপলব্ধি কোনো মহৎ তত্ত্বের চেয়ে অসত্য নয়।”

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

“সরল চটুল ভাঁজে কবি কথা গলিষাছেন; অথচ তাহারই হাঁকে হাঁকে কবি-জন্মের অগস্তুরে চাহিয়া দেখিবার সংযোগ আমাদের বশনই ধটিতেছে, তখনই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে কী গভীরতা হইতে তাহার কথা উৎসারিত হইতেছে, আর অনেক সময়ে কেমন বেদনা-ভরা সেই গভীরতা।”

কাশী আবহুল গুহুদ।

তুলনীয়

কণ-সম্পদ ইয়ং হুর্লুভা প্রতিহতকা পুরুষার্থসাধনী।

যদি নাহি বিচিন্তাতে হিতং পুনর্ অপোষ সমাধায়ঃ কুতঃ ॥

কণ-স্বপ্নের শুভাশীর্ষক না করা হুর্লুভ, প্রতিহত হইলে তাহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য দান করে। যদি এই বর্তমানে হিত-চিন্তা না করা যায়, তবে এই বর্তমানের পুনরাগমন তো আর কখনোই হইবে না।

—শান্তিদেব, বোধিচর্যভূষণ।

তিসূসে যুজ্জসু ধম্মেহি থনো তম্ মা উপচ্ছপা।

ধনাতীতা হি সোচন্তি দিয়সং হি সমম্বিতা ॥

রবি-রশ্মি

হে তিস্রা, তুমি ধর্ম বনোনিবেশ করে, তুমি জনকে পরিতাপ করিলে না। যাহারা জনাতীত, অর্থাৎ জনকে অতীত হইতে দেয়, তাহারা শোকগ্রস্ত হয় এবং নরকের হুঃখ ভোগ করে।

—বুদ্ধদেবের উপদেশ।

গৃহীত ইব কেশেবু যুক্তানা ধর্ম আচরেন্।

— চাপকা ॥

পাত্ত ভরো, পাত্ত ভরো,

পুনঃ পুনঃ কী কাজ বলায় ?

কতই দ্রুত যাচ্ছে সময়

গড়িয়ে যোদের পায়ের তলায়।

অনুৎপন্ন আগামী কাল,

লব্ধ মরণ বিগত দিন,

কাজ কি তাদের ভাবনা ভাবায়

অন্ত যদি স্বর্ণ কলায়।

ওমব প্ৰথম কাশ্বচল্ল ঘোষেব অনুবাদ।

এক লক্ষমার খুশীর তুফান,

এই তো জীবন। — ভাবনা কিসের ?

— হাকিজ কাজী নজরুল ইসলামেব অনুবাদ।

Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof

—St Matthew, 6. 34.

Trust no Future, however pleasant,

Let the dead Past bury its dead,

Act—act in the living Present,

Heart within, and God o'erhead.

—Longfellow, *Psalm of Life*.

One hour of glorious life

Is worth an age without a name

মাতাল

কবি বিবেচনা অপেক্ষা অববিবেচনাকে প্রশংসা করিয়াছেন অনেক স্থানে। কেবল বিচার-বিতর্কে কাজের অবসর পাওয়া যায় না, শুভকণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা কেবল পাজি দেখিয়া মিন-কণ খুজিয়া কর্ম করিতে চায়, তাহাদের আর কর্ম করাই হয় না। তাই কবি বলিতেছেন উদ্যম আগ্রহে যাহারা

বিপদের ভয় না করিয়া সকল কুসংস্কার পরিহার করিতে পারে এবং কোনো কর্মে প্ররক্ত হইয়া তাহার শেষ দেখিয়া তবে ছাড়ে, কবি তাহাদের দলেই ভিড়িতে চাহিতেছেন। কর্মে মত্ততা এবং সেই কর্মের তলা পর্বন্ত ডুবিয়া দেখার মধ্যে যে যৌবনের বেগ আছে, কবি তাহাই কামনা করিতেছেন। বিবেচকদের দলে ভিড়িয়া পঙ্কু হইয়া থাকিতে তিনি চাহেন না। বাঁধা দস্তরের রাস্তা ছাড়িয়া যে দিকে পথ নাই সে দিকে নূতন পথ খুলিবার ব্রত লইয়া বিপথে ধাবমান হইবার আনন্দে জীবন উৎসর্গ করিতে কবি বাগ্র। যে মাহুঘের বা যে জাতির হুংখ স্বীকারে ভয়, নূতনের সন্ধানে রত হইতে জড়তা, যেখানে পদে পদে নিষেধ মানা, যেখানে কেবল সাবধানতা, সেখানে লক্ষী দয়া করেন না। লক্ষীছাড়া হইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে পাবিলেই লক্ষীকে জয় করিয়া আনিতে পারা যায়।

দ্রষ্টব্য—তাসের দেশ। বলাকায় নবীন, যৌবন নামক কবিতা।

যথাস্থান

(১৩০৬)

এই কবিতাটি কবির বিরুদ্ধ-সমালোচকদের সমালোচনার জবাব এবং কবির যথার্থ ও উপযুক্ত সম্বন্ধার নির্ণয়।

ভীকৃত

(১৩০৬)

ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার বাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সম্ভ্রান্তকে নহে অসম্ভ্রান্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহ আদর করিয়া মৃন্ময় মুখকে পোড়ায়-মুখা বলে মা আদর করিয়া ছেলেকে ছুট্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভৎসনা করে। হৃদয়কে মৃন্ময় বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না। সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেঘনায় অশ্রুকে হস্তাক্ষটায়, গভীর কণ্ঠকে কোঁড়ুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।” —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় উক্ত।

সেকাল

(১৩০৬)

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের হৃদয় অতীত কালে করনায় প্রবেশ করিয়া কালিদাসের কাব্যে বণিত সেকালের আচার-ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনার সমাবেশ করিয়া এই কবিতাটিতে কালিদাসের কালের একটি পরিবেশ ও আবহাওয়া আনিয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কালের সৌন্দর্যমালা এই কবিতার মধ্যে গাঁথিয়া কবি তাঁহার কালের পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান সে-দেশের ও সে-কালের কোনো সৌন্দর্যকে এ কালের কবি-চিত্ত হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। কালিদাসের বণিত তাঁহার সময়ের চিত্রপরম্পরা আমাদের অতি নিপুণতাব সহিত নিজের কবিতার মধ্যে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছেন। পদে পদে তাঁহার বর্ণনা কালিদাসের কাব্যের বিবিধ বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কবিতার সহিত মেঘদূত, স্বপ্ন প্রভৃতি কবিতা তুলনীয়।

১

কালিদাসের আশ্রয়দাতা রাজা বিক্রমাদিত্যেব সভায় নবজ্ঞান বিদ্বান কবি ছিলেন, তাঁহার নবরত্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মতন কবি জন্মগ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চয় সেই নবরত্নের সঙ্গে দশম-রত্নরূপে যুক্ত হইতেন। বাস্তবিক তিনি কবি-কালিদাসের কবিত্ব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। এই কবিতায় কবির সেই আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী রেবা বা শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে-কালের উত্তানে কৃত্রিম শৈল নির্মিত হইত, তাহাকে ক্রীডাশৈল বলিত।

—ক্রীডাশৈলঃ কনক-কদলী-বেষ্টনঃ প্রাক্কলীযঃ।—মেঘদূত, উত্তর ১৬।

ক্রীডাশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাক্ষ্যারোহণৌ।—মেঘদূত, পূর্ব ৬১

মেঘদূত কাব্য মল্যাক্রান্তা ছন্দে রচিত।

২

ঋতুসংহার কাব্য ছয় সর্গে ছয় খণ্ডের প্রকৃতি-বর্ণনা। মেঘদূত কাব্য আবারুজ প্রথম দিবসের ঘটনা লইয়া লেখা।

৩

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে সুন্দরীর পদাঘাত না পাইলে অশোক প্রস্তুত হয় না, আর সুন্দরীর মুখমদের কুলকুচা না পাইলে বকুলফুল ফুটে না। এই কবিপ্রসিদ্ধি কালিদাসের বহু কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়—

সেধাব কুববকে	খিরিছে মাধবীর
কুঞ্জ, তারি পাশে	ছুইটি পাছ
অশোক তরু রয়	কাপায়ে কিশলয়,
বকুল মনোবন	কবে বিরাজ।
আমাব সাথে মোর	প্রিয়াব নাম পদ—
তান্ন পোতে সেউ	আশাক চাষ,
বকুল কুড়ালে	মোহন ছলে চাহে
প্রিয়াব বদনেব	মত ধারায় ॥ মেঘদূত উত্তর ১৭।

মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটকম ৩য় অঙ্ক কুমারসম্ভবম ৩২৬ কর্ণবমঞ্জরী নাটক প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

৪

মেঘদূত উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে সেকালের রমণীদের বেশ-বিজ্ঞাসের সুন্দর বর্ণনা আছে—

ওন্তে লীলাকমলম বলকে বালকুন্দানুবিন্দা*
নীতা লোভপ্রসব বজসা পাণ্ডুতাম আননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবক* চাককর্ণে শিরীষ*
সীমন্তে চ তদ উপগমঙ্গ* যত্র নীপ* বব্ণাম ॥

কুমারসম্ভব কাব্যের ৩৫৫ শ্লোকে কেশরদামকাঞ্চীর উল্লেখ আছে—

প্রস্তা* নিতম্বাদ অবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম।

যজ্ঞাধাবা বা ধারায়ন্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় বহু কাব্যে—

তত্রাবশ্যং বলয় কুলিশোন্মদ্বিনোদলীর্ণ-তায়ঃ

নেত্রস্তি তা* স্তব্ধবতযো যজ্ঞধারাগহঙ্ঘম। —মেঘদূত, পৃষ্ঠ ৬২।

মেঘদূত পৃষ্ঠ ৪২, রঘুবংশম্ ১৬৪২, কুমারসম্ভবম্ ৬৪১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সেকালের রমণীরা কেশ ধুপেব ঘোঁরা দিয়া কেশ সংস্কার করিত—

অঙ্কক স্তব্ধি ধুপ্যমোদিতং কেশপাশম।

—ঋতুসংহার, শিশির, ১২।

দ্রষ্টব্য—রঘুবংশম্ ১৬৪০, ঋতুসংহার বর্ণা ২১, কুমারসম্ভবম্ ৭১৪।

সে-কালের রমণীরা এ-কালের রমণীদের মতনই মুখে পাউডার মাখিত, কিন্তু সে পাউডার এ-কালের মতন কৃত্রিম স্নগন্ধীকৃত খড়ির গুঁড়া বা চালের গুঁড়া নহে, তাহা হইত সহজ-স্বরুতি লোণ-সুলের রেণু বা কেরাসুলের রেণু।

—মেঘদূত, উত্তর ২, কুমারসম্ভব ৭।৯ ;

এবং কালাঙ্কুর গন্ধে বসন সুরভিত করিত—

প্রকাম-কালাঙ্ক-ধূপ-বাসিতঃ বিশস্তি শযাগৃহম্ উৎস্রকাঃ স্রিয়ঃ ।

—ঋতুসংহার, শিশির ৫ ।

দ্রষ্টব্য—ঋতুসংহার, হেমন্ত ৫, কুমারসম্ভব ৭।১৫ ।

৫

সে-কালের রমণীরা কপোলে বক্ষে চন্দন কুঙ্কম কস্তুরী দিয়া চিত্র-রচনা করিত—

প্রিয়ঙ্ কালীয়ক কুঙ্কমাক্তং স্তনেষু গে রেণু বিলাসিনীভিঃ ।

আলিপাতে চন্দনম্ অঙ্গনাভঃ মদালমাভিব সৃগনাভ যুক্তম্ ॥

ঋতুসংহার, বসন্ত ১২ ।

দ্রষ্টব্য—ঋতুসংহার, শিশির ৯, কুমারসম্ভব ৯।২০ ইত্যাদি ।

বিবাহের সময়ে বধু যে বস্ত্র পরিধান করিত, তাহার আঁচলের কোণে একটি হংস-মিথুনের ছবি আঁকা থাকিত—

আমুক্তান্তরণঃ প্রখী হংস চিত্র হুকলবান ।

আসীদ অতিশয়-প্রেক্ষাঃ স রাজ্যলী বধু বরঃ । —রঘুবংশম ১৭।২৫ ।

দ্রষ্টব্য—কুমারসম্ভবম ৭।৩২ ।

বিরহিলীর চিত্র মেঘদূতের পূর্ব ১০ ও উত্তরের ২৫, ২৬ শ্লোক হইতে এখানে অঙ্কিত হইয়াছে ।

সে-কালের রমণীদের পায়ে নূপুর থাকিত—রঘুবংশম ১৬।১২, ঋতুসংহার—ঐয় ৫, শরৎ ২০ দ্রষ্টব্য ।

৬

সে-কালের রমণীরা শুক, সারিকা, কপোত, ময়ূর প্রভৃতি পাখী পুষিত।—মেঘদূত উত্তর ১৮, ২৪, পর্ব ৩৮ ; বিরামোর্বলী নাটক, ৩য় অঙ্ক ।

তপোবন-ভঙ্গণীরা সহকার-ভঙ্গুর আলবালে জলসেচন করিত—

আলবাল-পরিপূরণে নিযুক্তা শকুন্তলা । আভজান-শকুন্তলম্, ১ম অঙ্ক ।

৭

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটক বসন্তোৎসবের সময়ে অভিনীত হয়—
মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ১ম অঙ্ক।—শ্রীকালিদাস-প্রণীত-বসন্ত মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাম
নাটকম্ অশ্বিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোজ্যম্ ইতি।

রাজা অগ্নিমিত্র চিত্রশালায় রানীর চিত্রপটের মধ্যে পরিচারিকারূপিণী
মালবিকার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং সেই চিত্রশালায় তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করেন।—মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ১ম অঙ্ক।

মৃগা তরুণীরা ছল করিয়া আঁচল বা মালা গাছের ডালে আটকাইয়া
প্রণয়ীদের দেখিয়া লইত।—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ১ম অঙ্ক; বিক্রমোর্বশী
১ম অঙ্ক।

তখনকার কালের তরুণ-তরুণীরা যৌবনের নবীন নেশায় প্রমত্ত হইত।—
মেঘদূত, পূর্ব ২৫।

বুঝিবে, নাগরের সেথায় যৌবন
হয়েছে উদ্দাম ছনিবার।—প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ।

৮

কালিদাসের আবির্ভাবকাল লইয়া পণ্ডিতদিগের মতভেদ ও বিবাদ এখনও
মিটে নাই। তবে অনেকে এখন মনে করেন যে কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় জ্যেষ্ঠ রত্ন ছিলেন।

নিপুণিকা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মহারানী উল্লীনরীর দাসীর নাম।

৯

আধুনিক রমণীরা ইংরাজী শিখিয়া বিদেশীভাবাপন্ন ও বিদেশীভাষিণী
হইয়াছে, তাহারই প্রতি কবির ক্ষেপণ শ্লেষ। তথাপি তাহারা যে চিরন্তন নারী
তাহার সাক্ষ্য তাহাদের হাবভাবে প্রকাশিত হয়।

১০

কালিদাসের কাব্য, নাটক পাঠ করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ভো কালিদাসের
সে-কালের আভাস পাইতেছেন, কিন্তু কবি কালিদাস তো কবি রবীন্দ্রনাথের
এ-কালের কোনই আভাস পাইতে পারেন নাই। তাই কবি বলিতেছেন যে,
কালিদাস আগে জন্মিয়া ঠকিয়া গিয়াছেন।

যাত্রী

(১৩০৬)

জীবনযাত্রার পথে অনেক সঙ্গীর সঙ্গে মিলন ঘটে ; তাহাদের কেহ বা বহুদূর পথের সহযাত্রী, কেহ বা কেবল খেয়া-পারা পারের সময়টুকুর সাথী । যে খেয়ার সাথী, সেও তাহার সম্পদ লইয়া চলিয়াছে স্নান ও চিরস্তনের উদ্দেশে—যাহার গোলাতে সে তাহার জীবনের ফসল জমা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে । সে যদিও আমার পথেই বরাবর যাইবে না, তবু তাহাবও আমাব সহিত একই খেয়ানোকায় চড়িতে ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই ; তাহার ও তাহার সম্পদেব স্থান এই নৌকাতে হইবে, আমি তাহাদের কাহাকেও আত্মসাৎ করিব না, আমি কেবল তাহাব খেয়ানোকার সাথী হইয়া তাহাদেব গন্তব্যের দিকেই উত্তীর্ণ করিয়া দিব । তাহার মনের কথা তাহারই থাকুক, সে তাহা গোপন রাখুক, আমি কেবল তাহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিব—এই ক্ষণিক স্বপ্ন সময়টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে । এই রকম তো আগেও অনেক বাব হইয়াছে—কত যাত্রী আমাব জীবন-তবীতে কেবল খেয়া পাব হইয়া গিয়াছে, তাহার ধানের আঁট অল্পক্ষণের জন্ত আমাব তরীতে বাধিয়া তাহার স্থায়ী কাম্য-স্থানের দিকে উত্তীর্ণ কবিয়া লইয়া গিয়াছে ।

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ করিয়াই হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, সৌন্দর্য্যকে কেহ কখনো নিঃশেষে আপন করিয়া লইতে পারে না, তাহা ছরাপনা অ-ধরা চিরাপস্রিয়মানা ত্রী, তাহা স্বর্গেও চিরস্থায়ী নয় । তাই কবি যাত্রীকে কেবল খেয়া পার করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট । তাহাকে তিনি একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইতে তো চাহেনই না, তাহাব গন্তব্য স্থানের ঠিকানা জানিবার জন্তও তাহার কোনো ঠেংসুকা নাই ।

অতিথি

(১৩০৬)

হৃদয়কে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার বাসনা মানব-মনে বিরহিণী-রূপে নিরন্তর বিরাজ করিতেছে ; তাই মানুষ কিছুতেই তৃপ্তি পায় না, অথচ যাহাকে সে চায় সে অনির্বচনীয় অবাস্তব অনায়ত্ত অগম্য ও ধারণাতীত ।

‘আমি কহিলাম— কারে ভূমি চাও,

ভগ্নো বিরহিণী নারী।

সে কহিল—আমি যারে চাই তার

নাম না কহিও পারি।’ —উৎসর্গ।

সেই অজানা অতিথি কিন্তু প্রাণের কপাটে শিকল নাড়ে।

মানব জীবন ‘পাইনি’ ও ‘পেয়েছি’ দিয়ে গঠিত। ঘর বলে—‘পেয়েছি’, পথ বলে ‘পাইনি’। মানুষের কাছে পেয়েছিরও একটা ডাক আছে আর পাইনিরও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে, পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে, ঘর নেই সেও তেমন মানুষের শাস্তি। শুধু ‘পেয়েছি’ বন্ধ ওহা শুধু ‘পাইনি’ অসীম মরুভূমি।

—রবীন্দ্রনাথ।

বধু একেবারে অন্তরের, এবং অতিথি একেবারে বাহিরের। বাহিরের অতিথি আসিয়া অন্তরের বধুর কাজ ভোলায়। আজ অতিথির সহিত গোপন অভিসাবে মিলিত হইয়া ঘরের কাজ ভুলিবার পরম স্নগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণিমা রায়ে প্রকাশ্যে যদি হে বধু, তোমার অভিসারে বাহির হইতে ভয় বা সঙ্কোচ হয়, তবে না হয় ঘরের মধ্যে গোপন থাকার মতন ঘোমটার আবরণ টানিয়া মুখ ঢাকিয়া চলো, আব ঘরেরই প্রদীপ হাতে লও। প্রকাশ্যে যদি তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে না পাবো, তবে না হয় লুকাইয়াই গোপনে অসম্পূর্ণভাবেই তাহাকে লইও, কিন্তু তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিয়ো না। তুমি অন্তঃ এইটুকু জানো যে সে আসিয়াছে। তাহাকে পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কি এখনো তোমার সাধা হয় নাই? তাহাকে কি এখনো অপেক্ষা করাইয়া রাখিবে, না তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবে?

মানব-মনে ও মানব-জীবনে অত্যন্ত মনঃ ভাবে ও মনঃ কর্মের প্রেরণাব্যাবির্ভাব হয়। সেই অতিথির আগমনের প্রতীক্ষায় বাসকসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যেন সেই অতিথি গৃহদ্বারে আসিলেই তাহাকে বরণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই আত্মবিশ্বাস যেন রাখার কাছে শ্রামের বাঁশীর আহ্বান, ইহাকে বার্থ হইতে দিলে সারা-জীবন ইতালি হইয়া হায় হায় করিয়া ধ’দিয়া কাটাইতে হইবে।

যে-কোনো দেশে যখনই কোনো মনঃ আদর্শের নব অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই কতক লোকে তাহাকে সমাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কতক লোকে লুকাইয়া সেই আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে বরণ করিতে সাহস পায় নাই, এবং কেহ কেহ তাহাকে একেবারে

অস্বীকার করিয়া জীবনকে ব্যর্থ নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন ক্রাইস্টের বা মহাম্মদের বা বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার, অথবা আমাদের দেশে বা অন্তর্গত অনেক দেশে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ত আত্মত্যাগের ও স্বদেশীভূত পালনের আহ্বান কতক লোকে স্বীকার করিয়াছে, কতক লোকে পারে নাই, আর কতক লোকে করে নাই।

তুলনীয়—খেয়া পুস্তকের ‘আগমন’ কবিতা, ও ‘দুই পাখী’।

‘আষাঢ়’ ও ‘নববর্ষা’

“বর্তমান সভ্যতার যুগে মানব জীবনে প্রকৃতির স্থান বড় অল্প। তাই ইহাকে জীবনে পাইবার আকাঙ্ক্ষা বড় বেশি। চিরকল্প যেমন স্বাস্থ্য কামনা করে, মুমূর্ষু যেমন জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকায, তেমনি তৃপ্তিত ব্যাকুলতায় আজ মানবের অন্তরাত্ম প্রকৃতিতে চাহিতেছে। এত ভাবাহীন প্রার্থনায় মানব স্রষ্টার ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই আজ প্রকৃতির কবিতা এমন করিয়া হৃদয়কে ধোলা দেয়। মানব জীবনের দুর্লভ ও অগোচর আকাঙ্ক্ষাগুলি যখন কবির হস্তে রূপ গ্রহণ করিয়া, ছন্দে নাচিয়া, সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এমনই করিয়া ইহাবা হৃদয়কে মুগ্ধ করে।”

— বিশ্বপ্রকৃতি ও ববীন্দ্রনাথ উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল।

আষাঢ় নববর্ষা প্রভৃতি বর্ষার যে-কোনো কবিতা কবির অসামান্য অল্পভবের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। ইহাদেব শব্দ-সঙ্গীত, ভাবব্যঞ্জক শব্দবিশ্বাস ও অল্পপ্রাস এবং মধুর তান-লয়-মান ও চিত্র-পরম্পরা কবিতাগুলিকে পরম মনোরম করিয়াছে। এই দুইটি কবিতার সহিত কবির ‘বর্ষামঙ্গল’ কবিতা এবং ‘আবার এসেছে আষাঢ় গগন ছেয়ে’ প্রভৃতি গান তুলনীয়।

নববর্ষা

১

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—তুলনীয়

“My heart aches, ...being too happy in thine happiness.

—Keats, Ode to a Nightingale

মম্বরের মতো নাচে রে—কবি সামান্য কবির স্বাধ বসিলেন না বর্ষার
বেষদর্পনে মম্বর কদাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে—তিনি নিজের হৃদয়কেই

ময়ূরহানীর করিরা উপস্থিত করিরা বাহ্যপ্রকৃতিকে ও অন্তঃপ্রকৃতিকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

গুরু গুরু মেঘ ইত্যাদি—মেঘগর্জনধ্বনি ভাষায় ও অনুপ্রাণে প্রকাশ করিতেছে।

২

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা—তুলনীয়—উৎসা—অজগর। উত।—
অথর্ববেদ, ৪।১৪। জলধারা না অজগর সর্প।

দাহুরি—উপ প্রবদ মণ্ডুকি বর্ষম্ আবদ তাহুরি। অথর্ববেদ, ৪।১৫।

হে ভেক, বর্ষাকে তোমরা আবাহন করো। ঋগ্বেদ, ৭।১০।

বিজাপতির কাব্যেও বর্ষাকালে ভেকের রবের বর্ণনা আছে।

৩

কবি নিজের মনের আনন্দ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া সমস্ত কিছু সুন্দর দেখিতেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন প্রিমরোজ ফুলকে কেবল ফুলরূপে দেখেন নাই, তাহাতে আরও অতিরিক্ত কিছু দেখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাহ্য সৌন্দর্যকে নিজের মনের আনন্দে অভিব্যক্ত দেখিতেছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দের নিত্যলীলা চলিতেছে, তাহার সঙ্গে মানব-মনের আনন্দের যোগের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। নবতৃণদল শ্রামলতায় সরসতায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা যেন কবিরই হৃদয়ের হর্ষবিস্তার; কদমকুল ফুটিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কবিরই আনন্দ-জাগ্রত প্রাণের বিকাশ! ২—

৪

উদ্বর্গ আকাশে বর্ষার নব মেঘভাব দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন কোনো নীলবসনা রূপসী তাহার দীর্ঘ কেশকলাপ আলুলারিত করিয়া দিয়া উচ্চ প্রাসাদচূড়ার দাঁড়াইয়া আছে। তড়িৎশিখার চকিত আলোক যেন সেই রূপসীর রূপপ্রভা, সেই রূপসীর নীলাঘরীর রূপালী জরির কুটিল কুঞ্চিত পাড়। এখানেও শব্দে ও অনুপ্রাণে তড়িৎস্পন্দন চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

৫

বর্ষার সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ধৌত হইয়া নির্মল হইয়াছে, সেই জন্ত কবি তাহার বসন অমল বলিয়াছেন; আবার বর্ষার আগমনে সমস্ত উদ্ভিদ

শ্রামল হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্ত তাহার অমল বসন শ্রামল বলিয়াছেন ।
সুন্দরী বর্ষা যেন সজোখোত শ্রামল বসন পরিধান করিয়া সজ্জিতা হইয়াছে ।

সে উন্নতা বিরহ-বিধুরা বধূর জায় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে ।

ঘট-রূপ পানা তৃণ প্রভৃতি ঘাট ছাড়াইয়া ভাসিয়া বাইতেছে বলিয়া কবি
জলশ্রোতের গতির ইঙ্গিত করিয়াছেন । কবি এই কবিতাতেই শেষ কলিতে
বলিয়াছেন—

তীর ছাপি' নদী কলকল্লালে এলো পন্নীর কাছে রে ।

নবমাগতী ফুল বর্ষার আগমনে ফুটিতেছে, ও বরিতেছে, যেন কোনো
সুন্দরী তবলী আনমনে ফুলগুলি তুলিয়া তুলিয়া দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া
দিতেছে ।

৬

বর্ষাকালে বকুলফুল ফোটে । তাই কবি বলিতেছেন, সেই বকুলগাছে
বর্ষাসুন্দরী যেন দোলা বাঁধিয়া দোল খাইতেছে—বাদল-বায়ে বকুলশাখা
হলিতেছে ও বকুলফুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে । এখানেও শব্দ ও অমুশ্রাস
শাখার ঘন আন্দোলন ও বকুলফুলের ঝরিয়া-পড়া চমৎকারভাবে প্রকাশ
করিয়াছে । বর্ষামঙ্গল কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

নীপশাথে সখি ফুলডোরে বাঁধে ঝুলনা ।

৭

বর্ষা যেন সৌন্দর্যের ভরা লইয়া তরলী সাজাইয়া আসিয়া কেতকীবনে
তাহার তরুণ তরলী ভিড়াইয়াছে । কেয়ার বাড় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কেয়া-
ফুলের পাপড়িগুলি নৌকার ডোঙার মতন খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছে ।
চারিদিকে শৈবালদল পুঞ্জিত হইয়াছে, যেন বর্ষাসুন্দরী অঞ্চলে ভরিয়া সঞ্চয়
করিতেছে ।

আবির্ভাব

এই কবিতাটির তাৎপর্য সঙ্ক্ষেদে স্বয়ং কবি যে পত্র লিখিয়াছিলেন
তাহা এই—

“কাষের একটা বিভাগ আছে যা পানের সহজাতীয় । সেখানে কাষ কোনো নির্দিষ্ট অর্থ
অঙ্গপদ করে না, একটা বায়া রচনা করে, যে-মাত্র কান্তন পানের দক্ষিণ হাওয়ার, যে-মাত্র শব্দ-

গভুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জ। মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না থাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

“কণিকার ‘আবির্ভাব’ কবিতার একটা কোনো অন্তর্গত বানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা গোপন; সমগ্র ভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হ’লে থাকে তা হ’লে আর কিছু বলবার নেই।

‘তবু ‘আবির্ভাব’ কবিতার কেবল মূর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এই যে—এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল কান্ডন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে, সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা-আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হ’য়ে এল; তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিরে এল বর্ষার সজল স্তম্ভ সমারোহ—জীবনে বাণীর বঞ্চন হলো, বাণীয়া আর-এক মূর বাঁধতে হবে; সেদিন থাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখছি আর-এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারি অন্তর্ধানের নূতন আয়োজন। জীবনের গভুতে গভুতে যার নূতন প্রকাশ সে এক হ’লেও তার জগতে একই আসন মানায় না।”

—৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩।

“সাহিত্যের উদ্দেশ্য ‘কি’ (ভারতী, ১৯২৪ বৈশাখ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা) নামক এক প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে লিখিয়াছিলেন—

“লিখতে হইলে যে বিষয় চাইই এমন কোনো কথা নাই। . বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিবা যাচা হাতে ঠেকে তাহা আনুমানিক এবং তাহা কণস্বরী।”

বাস্তবিক এই কবিতাটিতে বিষয়বস্তু হইয়াছে গোপন; উহার ভাষা ছন্দ মূর লালিত্য অমুপ্রাস মিলিয়া কবির মনের একটি বিশেষ মুহূর্তের যে উল্লাস ও অমৃত্যব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতেই ইহা একটি উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শব্দের ইন্দ্রজাল বুনিয়া পাঠকেব বা শ্রোতার মনে যে মায়া রচনা করে, সেইটিতেই এই কবিতার বাহাছরি এবং ইহার মহামূল্যতা।

এই কবিতার সপ্তম কলিতে আছে—বনবেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নরনের পরসাদ।” বেতস মানে বেত, তাহা নিরেট, তাহাতে বাঁশি হইতে পারে না। ‘বনের বেগুর বাঁশিতে পড়ুক তব নরনের পরসাদ’ বলিলে অমুপ্রাস ও অর্থ দুইই রক্ষিত হইতে পারিত। এই কথা কবির গোচর করিলে তিনি আমাকে এক পক্ষে লিখিয়াছিলেন—

“কোনো ভালো অভিধান দেখো তো, বেতস বলতে বাঁশও হয় এমন শাস্ত্র পেড়েছি। কবিতা ধবং লিখেছিলেন তখন থাপড়ায় কথা ডেকেছি—শব্দেতে যে জহরকম বাঁশি হয় তা নয়,

কিন্তু ওর সর্বহামের কাকটুকুতে নিঃশ্বাস সকার করে হর বের করা যায় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু বহন দেখা গেল বেতস বলতে শর বোঝার না এবং অর্থবাহার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাপখের দশ মিটল দেখে নিশ্চিত হয়েছি। তুমি কোন্ কুপন অভিধানের মোহাই দিয়ে আবার ঝগড়া তুলতে চাও।”

ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে—অভিধানে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ নাই। না থাকুক। ইহার পরে যত অভিধান রচিত হইবে তাহাতে বেতস মানে বেণু বা বাঁশ লিখিতে হইবে। দাণ্ড রায় কোদণ্ড শব্দ কোদাল অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে আজ হইতে কোদণ্ড মানে কোদালও হইবে। সেক্সপীয়ার প্রভৃতি কবিরা কত কত শব্দ নিজেদের মনগড়া অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। অভিধানকারগণ তাহা পরে অভিধানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এমনি করিয়াই তো এক শব্দের বিভিন্ন নানা অর্থ হইয়া থাকে।

কল্যাণী

(কবির বীণার কত সুর কত রাগিণী সৌন্দর্যকে ঘিরিয়া-~~রাখে~~ বাতা-
কিছু স্তম্ভর তাহাকে সুরের জালে বন্দী করিয়া কবি আনন্দ লাভ করেন।
কবি সৌন্দর্যের ও গুণাবের, জীৱ ও কল্যাণের উপাসক।)

নারীর রূপ কাব্যজগতে বড় আদরের সামগ্রী। সহস্র কবির বীণার সহস্র রূপে রমণীর রূপের ও সৌন্দর্যের স্তুতি বাজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল-মাত্র রমণীর রূপের পূজারী নহেন; তাঁহার ঋষিভুলভ অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে ভোগ হইতে ভ্যাগের পথে, বিলাস হইতে সংযমের পথে আকর্ষণ করিয়াছে। তরুণ কবি প্রথমে ‘বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী’ যে রমণী, যাহার অঞ্চলচ্যুত বসন্তরাগ-রক্ত কিংকট গোলাপ পৃথিবীকে পাগল করিয়া দেয়, সেই দীপ্তশিখা-স্বরূপিণী রমণীমূর্তিকে নানা ভাবে নানা রূপে বন্দনা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সাধনা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কামনা সংযমের কাছে পরাজিত হইল, এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। অবশেষে তিনি দেখিলেন এ বিশ্বের সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত কল্যাণ যিনি আপনার পদতলে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া এ-জগৎকে প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি শিখ-শাক্ত-মূর্তি দেবী অন্নপূর্ণা; শিব শব্দর তাঁহারই কাছে তিস্রাক্ষর পাতিয়া আছেন। তিনি

ত্যাগের প্রতিমূর্তি, তাঁহার মধ্যে ভোগের চিহ্ন মাত্র নাই। অল্পপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করিবার জন্তই শিব নিজেকে ভিখারী বলিয়া স্বীকার করেন, এবং ইহাতে তাঁহার একটুও লজ্জা নাই।

কবি দেখিতেছেন রমণী সংসারের সমস্ত ভোগস্পৃহা বর্জন করিয়া গুচি-সুন্দর স্থিত মূর্তিতে গৃহকার্যে রত আছেন, চারিদিকের ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতের মধ্যেও তিনি তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত গৃহখানি অটুট রাখেন। সেই নিবিড় শান্তির অন্তরে বিরাজমান তাঁহার গৃহখানি যৌবন চাক্ষু্যাহীন। গৃহখানির চারিদিকে পুষ্পিতা লতা বেঠেন করিয়া উহাকে সৌন্দর্যের মন্দিরে পরিণত করিয়াছে, তাহাকে বিরিয়া শিশুদেব আনন্দধননি উখিত হইতেছে। তপোবন-সুলভ পবিত্রতার মধ্যে কল্যাণী রমণীব এই ভবনখানি কবি কীটসের বর্ণিত সাইকীর Bower এর কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু কল্যাণী রমণীর মন্দিরে যে মাদকতাসৃষ্ট গুহ্রশ্রী প্রতিষ্ঠিত তাহাব সন্ধান কীটস পান নাই। এই অচঞ্চল শান্তি ও ভোগবিরতির মধ্যে কল্যাণী আপনার কল্যাণত্বতে নিবত। উষা ও সন্ধ্যা তাঁহার কাছ আসিয়া পূজাবিলীকুপে তাঁহাকে পূজা করে। কর্মকান্ত ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় হতভাগ্য মনুষ্যের জন্ত তিনি নির্জনে অপক্লপ শাস্তিমণ্ডিত মন্দিরে হৃদয়ের সুধাপাত্র উজ্জাদ করিয়া ঢালিয়া দিবার জন্ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। তাঁহাব স্নিগ্ধ স্পর্শে আশাহীন উত্তমহীন জীবন 'হেমস্তেব হেমকান্তি সফল শান্তির পূর্ণতায়' ভরিয়া উঠে।

অপূর্ব-স্নিগ্ধজ্যোতিঃশালিনী এই মহীয়সী নারীমূর্তি দেখিয়া কবি উচ্ছ্বসিত-হৃদয় হইয়া গাহিয়াছেন—ওগো লক্ষ্মী, ওগো কল্যাণী, তোমার এই মাতৃমূর্তিই নারীত্বের চরম পবিত্রতা। তুমি স্বর্গের অপ্সরী নও, তুমি স্বর্গের ঐশ্বরী। তুমি কেবল ভোগবাসনা-পবিত্রত্বের উপকরণ মাত্র নও, তুমি অনন্তের পূজার মন্দিরে জদয়কে লইয়া গিয়া একটি অনাবিল শান্তির মাঝে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দাও। তোমাব কল্যাণী-মূর্তির নিকটে রমণীর রূপ, রমণীর জ্ঞান, সকলই তুচ্ছ। অক্ষুন্ন শান্তির মধ্যে তুমি যখন আপন গৃহকর্মে ব্যাপ্তা থাকো, তখন সমস্ত আকাশ জুড়িয়া শব্দহীন মাপ্তল্য-শব্দ বাজিয়া বাজিয়া তোমার কার্যকে অভিনন্দিত করে ও গুহ্রশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে সকল কিছুই পরিবর্তনশীল কালের অধীন, কিন্তু তোমার সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি চিরকাল একই প্রকার থাকিয়া যাবে। শীত যায়, বসন্ত আসে, আবার বসন্তের বিদায় লয়, কিন্তু তুমি যে কল্যাণী সেই কল্যাণীই থাকো। জরা-যৌবনের

পরিবর্তন সেই কল্যাণীমূর্তির কোনো পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। তরুণী ও যুগ্মর কৃষ্ণে তুমি যে কল্যাণী একই ভাবে আগুরুক হইয়া থাকো। নদীর মতো। তুমি তোমার পাশ্চস্থিত সকল-কিছুকে কল্যাণ বিতরণ করিয়া জীবনের শেষ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ। তুমি আছ বলিয়া সংসার আছে, নহিলে সংসার কবে ছিদ-ভিন্ন হইয়া যাইত। আমি কবি, আমি সহস্র বস্তুর বন্দনা গাহিয়া ফিরি। কিন্তু সকল-কিছুর বন্দনাগান শেষ করিয়া আমার কবিত্বের চরম পরিণতির যে গান, আমার প্রতিভার যাহা শ্রেষ্ঠ অর্থা, আমার শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি আমি তোমারই জন্য রাখিয়াছি।

এই কবিতাটি সৌন্দর্যের কল্যাণীমূর্তির বন্দনা, ভোগবিরতির শাস্তির আরতি।

তুলনীয়—‘রাজে ও প্রভাতে’ এবং ‘ছই নাবী’ প্রভৃতি কবিতা।

নৈবেদ্য

(আষাঢ়, ১৩০৮)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে নৈবেদ্য একটি অপকল্প অনবদ্য অভিনব সৃষ্টি। এতদিন কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেছিলেন। তাহার পরে মধ্যে ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ রচনা করিয়া সার্বজনীন উপাসনার পথনির্দেশ করিতেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পরিবাবে মধ্যে ও দেশের সমুখে যে ধর্মপ্রাণতা আধ্যাত্মিকতা ও সত্য-তপস্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে বাণ্যাবধি পড়িতেছিল। সেট সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মের উপলব্ধির প্রকাশ এই নৈবেদ্য পুস্তকে কবিতাগুলি। কিন্তু এই উপলব্ধি তাঁহার বুদ্ধির উপলব্ধি, জ্ঞানের উপলব্ধি। ভগবানের সন্নিধি লাভ কবিবাব বাসনা ও সত্যপথে চলিবাব প্রার্থনা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ঐ বাসনা ও প্রার্থনাব মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠ তেজস্বিতা ও কঠোর সংঘম আছে, যাহা মহর্ষির পুত্রকে ঋষিধেব উত্তরাধিকারী করিয়াছে। স্বদেশের ধর্মসাধনাব মধ্যে বাহা শ্রেষ্ঠ তাহার সক্তি সর্বদেশের সর্বকালের যে সত্যধর্ম তাহাবই বোধ এই কবিতাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সাধক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা ও আবাসনাব নৈবেদ্য সাজাইয়া বব চাহিতেছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব—নিজের জন্ত ও স্বদেশবাসীর জন্ত। সত্যের পথে, ত্রায়ের পথে, ধর্মের পথে চলা কঠিন দুঃখজনক বলিয়া কবি জ্ঞানেন, অথচ তাহাবই প্রতি তাঁহার লোভ। তিনি দুঃখ বরণ করিবাব জন্ত ব্যাকুল হইয়া দুঃখ বহন করিবাব শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কবি এখানে যোগী—পরম যন্ত্রণাময়ের প্রতি তাঁহার চিত্ত সতত উন্মুক্ত, সত্যস্বকপের সমুখীন এবং ত্রক্ষে যোগযুক্ত। এই পরমসমাহিত অবস্থার এমন অনেক কথা তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে বাহা ঋষিদৃষ্ট সজ্জেরই মতন পূর্ণ ও অগ্নিগর্ভ। তারত-দশকে যে-সমস্ত কবিতা নৈবেদ্যে আছে, সে সমস্তও পূর্ণ, আর বীর্ঘবান্ মুক্ত দর্শনের আলোকে ভাস্বব। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে, কবির বীর্ঘবান্ আত্মা সেই সৃষ্টিমহিমা লাভ করিয়াছে এই কাব্যে। এই কাব্যে কবি প্রকৃতিকে ও মানবকে সোপান করিয়া প্রকৃতির ও মানবের অধীশ্বরের সমুখে উপনীত হইয়াছেন।—(কাজী আবদুল ওহুদ বিরচিত রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সত্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমিতে চিত্তকে স্থাপিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত মানবকে তালবাসিনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মবিহার লাভ করিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে ও তাঁহার জীবনে উপনিষদের শিক্ষার যে প্রভাব ছিল, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়। কবির আধ্যাত্মিক জীবন উন্মেষ লাভ করিবার আকৃতি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মের সন্মুখে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছে। সন্ধে সন্ধে স্বদেশের জন্তও কবি সত্যবোধ সত্যধর্ম সত্যনিষ্ঠা বল ও বীর্য প্রার্থনা করিতেছেন। কবি স্বদেশকে তাহার প্রাচীন আদর্শের উপরই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছেন।

মুক্তি

(১৩০৭)

সকল দেশের মধ্যব্গের কবি দার্শনিক ও ধর্ম প্রবর্তকদের এই ধারণা ছিল যে, এই মর্ত্যে কেবল দুঃখ, এবং বৈবাগ্যের দ্বারা সংসারে অনাসক্ত হইতে পারিলেই আত্মস্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়া যাইবে, এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা আমাদের দেশে প্রথমে মুক্তির বিজ্ঞানে প্রতিবাদ-বোদ্ধা করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

অজ্ঞান তনয় নাম কহিবে / ক ৩৮ ।

ধর্ম অর্থ কাম বাহু আদ এত সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাহু / কতব প্রধান ।

যাহা হেতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তধান ।

বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় যুগা দ্রাস ।

ভুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধারণার অগ্রদূত হইয়া সংসারকেই ধর্মসাধনার পন্থা জীর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রস সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্যের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পবিত্র ও উন্নত হইয়া উঠে। কবির দৃষ্টিতে এই জগৎ মায়ী মাত্র নহে, ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশক্ষেত্র ও লীলাক্ষেত্র—

সীমার যাকে অসীম ছুঁসি বাজাও আপন হয়।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

যে বিশ্ব আমাদের চেতনার ভিতরে, বাসনার ভিতরে, বেদনার ভিতরে, কর্মের ভিতরে, সর্ব অসুভবের ভিতরে স্পন্দিত হয়, তাহা তো আমাদের মোহময় মিথ্যা অথবা ক্ষতিকারক হইতে পারে না।

এইজ্ঞাত কবি বলিয়াছেন—

“হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে বাহাকে emotion বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ পতি, তাহার সহিত বিশ্ব সম্প্রদায়ের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের ক্ষণিক সহিত, তাপের সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা স্রবের মিল আছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মাত্রই—একটা অনির্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদ্বাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপকল্প ভাবে অনন্তের জন্ত আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। সঙ্গীত ও সঙ্গীতাকাশের সৃষ্টিস্রষ্টা কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-জগতের সঙ্গীতসঙ্গীত সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, যে একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখ দুঃখের কোনো যোগ নাই, তাহা বিশ্বের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে কবিতাে নিখিল চরাচরের সামগ্ৰ্য্য। কেবল সঙ্গীত ও সৃষ্টি কেন, যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে তখন তাহাও আমাদের সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশ কালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসবের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদের প্রাণকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্ত যেমন পরম্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্নতি আকষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে তেমনি বিশ্বের সম্প্রদায় সৌন্দর্য্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক সম্প্রদায় পরমাণুর মত এক-জনে মিশিয়া অনিবার্য্য আবেশে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।”

—পঞ্চভূত, গন্ধ ও পদ।

কবি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকেও এই কথাই বলিয়াছেন—ব্রহ্মবিশি, পূর্বভাগ দ্রষ্টব্য।

মালিনী নাটকের মধ্যেও কবি বলিয়াছেন যে—দূর হইতে নিকটের মধ্যে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টের মধ্যে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে ভালো করিয়া উপলব্ধি করা যায়।

কবি অজ্ঞাত লিখিয়াছেন—

“প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন, তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে যুক্ত করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অধিবাশ করি না, সেই মোহকে আমি দিল্লা করি

না। তাহা আমাকে বন্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার জ্ঞান নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়, যে জিনিসটাকে সম্বন্ধ করিতেছি, নীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত দরকে আলোকিত করে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাষ্ঠারও টানিবাব ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যে সেই অপকৃপাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুক্ত, সেই মোটেই আমার মুক্তি রসের আধারন।”

—বঙ্গভাবাব লেখক, ২৮০ ৮২ পৃষ্ঠা।

অতএব দেখা বাইতেছে যে, এই কবিতার ভাবার্থ এই—এই সংসার ও এই মানবজীবন মিথ্যা মরীচিকা মাত্র অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির অস্বপ্নের নহে। প্রকৃত-পক্ষে ভগবান সংসারের এই বিচিত্রতা ও জীবনের এই নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। স্মৃতরাং মুক্তি-লাভের জন্ত ইহ-সংসারকে বর্জন করিয়া-পবলোকোপেক্ষী সাধনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়াই, আপনার কর্তব্য করিয়াই ভগবানকে লাভ করা যায়।

আমাদের দেশের বৈরাগ্যবাদী উদাসীনতা ও সাংসারিক বিষয়ে অলস নিশ্চেষ্টতা এক দিকে, এবং পাশ্চাত্যদেশের বৈষয়িক সম্ভোগ-লোলুপ উদামতা অত্র দিকে,—এই উভয়েরই প্রতিবাদ করিয়া কবি বাবংবার বলিয়াছেন—
মুক্তি ও বন্ধনের সমন্বয় কবিতাে হইবে, স্ব-অধীন হইয়া স্বাধীনতার সাধনা করিতে হইবে, আত্ম-উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে।
ইন্দ্রিয়ানুভূতিই উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সোপান।

এইরূপ কথা তিনি নৈবেদ্যের নানা কবিতার মধ্যে বলিয়াছেন—

সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,

আমি একা ব'সে রব, মুক্তি আরাধিতে ?

অথোহি যে মর্ত্যলোকে যুগা 'করি' তারে

ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।

এই কবিতার কবি বলিয়াছেন যে আমি জগৎ-ছাড়া নই, আর জগৎ আমি-ছাড়া নয়। অতএব আমি ও জগতের মধ্যে কোনো বন্ধনই নাই।

যদি বা থাকে, তবে তাহা ছেদন করিবার কোনো উপায়ও নাই। মাহুষ সমস্তকে লইয়াই সম্পূর্ণ। প্রেমেরই মুক্তি, প্রেমে সকল স্বার্থপরতার গাঙী মুছিয়া যায়, প্রেমে সব আসক্তির যুড়্য ঘটে। তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নাই তবু আমাদের জন্ত নিরন্তর সমস্তই ত্যাগ করিতেছেন। যিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি তো কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। এইজন্য কবি বলিয়াছেন—

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে খাই রে,
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে। —গীতবিতান।

* * *

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

* * *

বাবে বারে তুমি আপনার হাতে বাদে গল্পে ও গানে
বাঁচিব হইতে পরশ কবেছ অন্তর-মাঝখানে।

প্রদীপের মতো ইত্যাদি—জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ এক-একটি দীপ-বতিকার মতো বিশ্বের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার ইত্যাদি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বসৌন্দর্যের অমূল্যত্বই উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

মোহ—বিশ্বজগৎকে সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া তাহাকে ভালোবাসার নাম মোহ বা মায়।

প্রেম মোর ভক্তিরূপে বহিবে ফলিয়া—তুলনীর—

যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা। —চৈতালি, পুণ্যের হিসাব।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের। —চৈতালি, অস্তব।

কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতি বিশ্বব্রাহ্মের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্র। প্রকৃতির আবেশ-বিহীনতা, জীবনের মোহ ও বন্ধন, অন্তরের আনন্দ ও মুক্তির তৃষ্ণা—সমস্তই বিশ্ববিমোহনের চরণতলে একত্র হইয়া আছে।

বৈষ্ণবদের যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৈকুণ্ঠের জন্ত সঞ্চিত থাকে, হেগেল তাহা সংসারেই মিটাইতে চাহেন। কবির মত অনেকটা হেগেলের মতের অনুগামী—ইহা Ideal Realism of Hegelian Philosophy।

ভুলনীর—

He prayeth best who loveth best.

—Coleridge, *Ancient Mariner*.

For Love is Heaven, and Heaven is Love.

—Scott, *Lays of the Last Minstrel*.

Leigh Hunt-এর *Abu Ben Adhem*; Browning-এর *Saul, Rabbi Ben Ezra*.

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ

এই কবিতাটি কবি তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপাসনায় ভগবানের প্রেমে তন্ময় হইয়া যাইতে দেখিয়া মুগ্ধ অন্তরের আনন্দের সহিত লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। মহর্ষি বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মজ্ঞানে কিরূপ নিমগ্ন হইয়া তপস্তা করিতেন তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ইহার পরে দিয়াছেন—

“এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিমেষক নিবেদন, তাঁর গভীর গাভীয়া।” আশ্রমবিশ্বালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন, ৭৪২ পৃষ্ঠা।

দীক্ষা

বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়া মানুষ একটি ঐক্যকে খোঁজে—সেটি শিবম্। মঙ্গলের মধ্যেই স্বন্দ—অঙ্কুর এইখানে হুইভাগ হইয়া বাড়িতে চলিয়াছে; মঙ্গলের মধ্যেই স্থখ-হুঃখ ভালো-মন্দ। মাটির মধ্যে যে বীজটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্ত, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না; লড়াই বাধিল শিবকে জানিতে গিয়া—শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র, এইখানে মহদভয়ং বজ্রম্ উদ্ভূতম্। কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের স্বার্থ জন্ম ও পরীক্ষা। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শক্তির মধ্যে তাহার গর্ভবাস। কবি ভগবানের নির্দেশ অনুধাবী সত্যের, জ্ঞানের, ধর্মের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছেন। বাঙালীর ভাববিজ্ঞানতা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কবি বহু কবিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রায়দণ্ড

কবি মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে অন্তরে অন্তরে অহুভব করিয়াই কান্ত হইতেছেন না ; তাঁহাকেই নিজের চিত্ত-মন্দিরে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সৈনিকরূপে এই সংসার-বক্ষে দৃঢ়-পদক্ষেপে বিচরণ করিতে চাহিতেছেন ।

শৃঙ্খল বিশেষ

কবি ভারতের অতীত গৌরবের সহিত বর্তমানের অধঃপতন তুলনা করিয়া পুনরায় সেই অতীতের মহিমায় স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিতেছেন । স্বৈতান্বতর-উপনিষদের ২।৫ ও ৩।৮ বাণী দুইটিকে কবি এই কবিতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রাচীন-ভারতের আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন ।

শিক্ষা

কবি প্রাচীন ভারতের যে-সব পরিচয় কাব্যে ও শাস্ত্রে পাইয়াছেন, সেই আদর্শ অনুধাবন করিয়া এই সনেটটি লিখিয়াছেন ।

নৃপতির শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি ইত্যাদি—
ইহাব পরিচয় আমরা পাই কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে—বান্দকো মূনি-
বৃত্তীনাং ।—রঘুবংশ, ১ম সর্গ ।

ক্ষমিতে অরিরে—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধও ধর্মযুদ্ধ ছিল, যুদ্ধের সময়েও
শ্রায়-পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া বীবেব পক্ষে মানি ও লজ্জার কারণ হইত ।
প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের আদর্শ ছিল—

বিরথং বিগতং ব্যং বিবর্ণং বিমুগ্ধস্তিতম

যুদ্ধোৎসাহ ততঃ তদা ব্রহ্মহা ভাষতে নরঃ ।

—বল্লিপুবাণ । মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ব্রহ্মব্যা ।

সবফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার—

কর্মণ্যোব্যাহিকারসূত্রে, যা ফলেশু কদাচন ।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৭ ।

সর্বং কর্মকলং ব্রহ্মার্পণম্ অন্ত । —ঋগ্বেদ ।

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার—প্রত্যেক গৃহস্থের মিত্য পঞ্চযজ্ঞ
অনুষ্ঠান করিতে হইত—তাহার মধ্যে নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ দুইটি ; অর্থাৎ

প্রত্যহ অন্ততঃ একটি অতিথির ও কোনো না কোনো প্রাণীর সেবা করিতে হইবে, তাহাদিগকে অন্নপানীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, তাহারও গৃহস্থের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই বোধ মনে রাখিতে হইবে।

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্ত করেছে উজ্জল—দৈন্ত মালুকের অক্ষমতার পবিচায়ক, এ জন্ত দৈন্ত লজ্জাজনক ; কিন্তু সক্ষমের স্বৈচ্ছাকৃত যে দৈন্ত ত্যাগের মহত্ব যুক্তিত হয়, তাহাতে সেই দৈন্ত মাহাত্ম্যের প্রভাৱ উজ্জল হইয়া উঠে।

সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সন্মুখে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্তাদ্ ব্রহ্ম জ্ঞান-পরায়ণঃ।

যদ যৎ কর্ম প্রকুবীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৮ম উল্লাস।

ঈশা বাস্তব ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তদ তাজেন ভূতীথা মা গৃধঃ কস্তাশ্চিদ ধনম্॥

—ঈশোপনিষৎ ১ম শ্লোক।

যুগান্তর ও স্বার্থের সমাপ্তি

এ দুইটি সনেট বোয়ার-যুদ্ধের সময়ে লেখা। ১৯০০ সালে বোয়ার-যুদ্ধ হয়। সেই জন্ত শতাব্দীর শ্রমাস্তরের কথা বলা হইয়াছে। ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রতি ওলন্দাজ উপনিবেশী বোয়ারেরা অত্যাচার কবিত্তেছে এই অজুহাতে ইংলও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরে পররাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাকে কবি নিন্দা করিতেছেন।

কবিদল চীৎকারিছে—এই সময়ে কিপ্লিং প্রভৃতি কবিরা বোয়ার-বিষে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা

কবি মানব-জীবনকে ভালবাসেন। তাই তিনি তাহার বিকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। আচার সংস্কার প্রথা রীতি যেখানে জীবনে স্বচ্ছন্দ মহিমাকে ধ্বংস করে সেখানে কবি তাহাকে নির্মম আঘাত করেন। এই কবিতায় কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সর্বসংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ আত্মার প্রার্থনা, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ত সত্যসন্ধ বিগতভীঃ সমদর্শী ভারতবর্ষের বাণীবর্ডির প্রার্থনা।

স্মরণ

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ কবিরের পত্নীবিয়োগ হয়। সেই শোকে কবি যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি স্মরণ নামে মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে।

এই কবিতাগুলি কবির ব্যক্তিগত ক্ষতির ক্ষতমুখ হইতে নির্গলিত হৃদয়-শোণিতে অভিষিক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি সার্বজনীন বিরহব্যথা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি কবিজীবনে, অথবা কি ধর্মজীবনে, কোথাও ভাবাবেগে বিহ্বল হওয়াকে প্রশ্রয় দেন নাই, উদ্বেলিত উজ্জ্বাসকে তিনি সর্বক্ষেত্রে নিম্না করিয়াছেন। এই অস্ত্র এই বিষম ক্ষতির কবিতাগুলির মধ্যেও একটি অসামান্য সংযম ও আত্মদমন আছে। এখানে কবির শোক হইয়াছে মিতবাক।

মৃত্যুমাধুরী

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শনে ৫৬৭ পৃষ্ঠায় “সার্থকতা” নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্মরণ সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে নবপর্ষদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনও ভয়ঙ্কর বা শোকাবহ মনে করেন নাই। মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি তাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

“জগৎ রচনাকে যদি কাব্যত্বসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহাব সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে বার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেথানকার বাহা,—তাহা চিরকাল সেইখানেই অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভাব বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুঃস্বপ্ন হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যে দিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব, সমস্ত ভূগিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।—একে বাহা প্রত্যক্ষ, বাহা বর্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—

আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেবারে মোরোমোর আর শেষ থাকিত না— তবে তাহার উপরে আর আগিল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিবা দ্বিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিা না রাখিত?

মরিতে না হইলে বাচিা থাকিবার কোন মৰ্ণাধাই থাকিত না। এখন জগৎস্তম্ভ লোকে যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গোরবে গৌরবান্বিত।

জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেই জন্ত আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিা থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, স্থবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতেব আর সকল দিকেই কঠিন স্থল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা-অসীমতাকে অপ্রমাণ করে—জগতের যে-সীমার মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রথমতম প্রবলতম বাসনাব, আমাদের প্রতিমতম হৃদয়তম কল্পনার কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব আশানবাসী—আমাদের সবোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

জগতের নখরতাই জগৎকে হুল্লর করিয়াছে। এই জন্ত মানুষের দেহলোকেও মৃত্যুর কল্পনা।—পঞ্চভূত, অপূর্ব বামাষণ।

কবি এই কবিতার বলিতেছেন যে বিচ্ছেদে মানুষের গুণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। প্রিয়া-বিরহে প্রিয়ার মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া কবি মনে করিতেছেন—মৃত্যু তাঁহার নিকটে অমৃতরস বহন করিয়া আনিয়াছে। কবির গৃহলক্ষী এখন বিশ্ব-লক্ষ্মীতে পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিতেছেন যে তাঁহার প্রিয়া মরণের সিংহদার দিয়া বিজয়িনী-রূপে তাঁহার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন। এই মৃত্যু-ঘটনাকে সেই জন্ত কবি দুঃখজনক বোধ করিতেছেন না। কবির প্রেমসী জন্ম-মরণের মাঝে পাড়াইয়া বহিয়াছেন, যেমন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার প্রিয়াকে দেখিয়াছিলেন—A traveller between life and death।

কবি মরণের মধ্যে প্রেমকে যেমন জীবনের অতিথি-রূপে দেখিয়াছেন, তেমনি মরণকেও অন্য অতিথি-রূপে দেখিয়াছিলেন। কবি তাঁহার প্রিয়াকে তাঁহার জীবনের মধ্যে জীবিত দেখিতেছেন। এই ভাবটি বলাকার 'হবি' কবিতার স্পষ্ট হইয়াছে।

এই কবিতাগুলির সঙ্গে কবি শেলীর Adonais তুলনীয় ; এবং কবিরই নিজের লেখা অন্ত্যস্ত মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কবিতা তুলনীয়—দ্রষ্টব্য উৎসর্গ।

চিঠি

১৩০৯ সালের মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে ৫৬৮ পৃষ্ঠায় “সঞ্চয়” নামে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

কবি বলিতেছেন যে একটি চিঠি দেখিয়া অতীত কালের কত কথাই মনে পড়ে ; ঐ চিঠিটুকু অতীতকালের স্মৃতির ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। ঐ চিঠির নিজস্ব কোনো মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীত কাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর।

কবিরের পরীবরণ হইলে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শমীজকে ও পীড়িতা মধ্যমা কস্তা রাণীকে লইয়া আলমোড়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে মাতৃহীন পুত্রকন্তাকে ও নিজেকেও প্রচুর রাখিবার জন্ত, নিজেকে শৈশবের অশোক আনন্দের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্ত, শিশুতোষণ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই শিশুতোষণ কবিতাগুলি কবির নূতন সৃষ্টি নয়, তিনি কড়ি ও কোমল এবং সোনার তরী পুস্তকের মধ্যে যে-সব শিশু সঞ্চায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, এগুলি যেন তাহাদেরই অঙ্কুরভি ও প্রসুতি। কবি যখনই কোনো দ্রুত অঙ্কুর করেন, তখনই তিনি সেই দ্রুত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত শৈশবের সর্বভোলা আনন্দের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। ইহার অল্পদিন পরে কবির এই কস্তার ও পুত্রের মৃত্যু হয়।

শিশুর কবিতাগুলি কবি যেমন যেমন লিখিতেছিলেন অমনি সেগুলিকে মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া দিতেছিলেন, মোহিতবাবু তখন কবির কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই কবিতাগুলি সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যেই ১৩১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শিশুর কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুর মনের উপভোগ্য, নানা রঙ্গভরা কল্পনাপ্রবণ শিশু-রঙ্গের সুখদুঃখের স্মৃতিতে পূর্ণ। এগুলি শিশু-জীবনের আনন্দ-লোককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আর কতকগুলি কবির দার্শনিকতায় ভরা; সেগুলি শিশু কেন, শিশুর অনেক ঠাকুরদাদার মনের পক্ষেও গুরুপাক। কিন্তু সব কবিতাই যে সুস্বাদু ও সুরস তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। সেই-সব কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণ রূপরসময় করিতে না পারিলেও পাঠক ও শ্রোতা কবিতার ভাষা ও ছন্দের স্বাক্ষরে মুগ্ধ হইয়া যান। যেখানে কবি কথা দিয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া বা রঙ্গভঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন সেখানে শিশুর অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু যেখানে কবি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন সেখানে শিশুর মন কোনো সাড়া দেয় না, শিশুর পিতামাতার মর্মেও যে সব সময়ে সাড়া দিতে পারে তাহা যেন হয় না। কবি যেমন এক দিকে শিশুচিত্তের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি শিশুর পিতামাতার মনস্তত্ত্বও ধরিয়া দেখাইয়াছেন। এই ক্ষমতার তিনি

বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশবিদেশের কোনো কবি এমন নিপুণতার সহিত শিশুর মনস্তত্ত্ব চিত্রিত করিতে পারেন নাই। অন্ত কবিরা বরঞ্চ লোকে শিশুকে কেমন চোখে দেখে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন শিশুর চোখে বিশ্ব-সংসার কেমন লাগে। যোগী কবির কাছে শিশু বিরাট অনন্ত রহস্যময় বিধাতারই যেন এক একটি রহস্য-কণা। বৈষ্ণব সাধকদের মতো আমাদের কবিও বাৎসল্য রসের ভিতর জগৎপিতার সহিত মানবের সম্বন্ধের মধুরত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। এইসব কারণে শিশু-কাব্য রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

অষ্টব্য—শিশু সাহিত্য—শাব্দা দেবী, উদ্বখন, ভাদ্র ১৩৪০। শিশু রবীন্দ্রনাথ—স্বধামরী দেবী, শান্তিনিকেতন-পত্রিকা। আর্নেস্ট বীস প্রণীত রবীন্দ্রনাথ।

শিশুসীমা

মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে ‘শিশু’ বিভাগের প্রবেশক কবিতা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া-সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলেন সে কথার দ্বারাই তাঁহার নিজের শিশু-সম্পর্কীয় কবিতাগুলিকে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, মনে করিয়া এখানে কিছু উদ্ধার করিতেছি।

“বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আঘাত উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুদৃশ্য কাথ-কারণ-স্বত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহিঃগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিঁদু তীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাব-বশতই বাল্য-স্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। যন্ত্রের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোহীন না হইলে আনন্দের তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং প্রাপ্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সম্বলন করিয়া সিন্ধু জীলামর স্মরণকর্তা লবুজুয়ে বাড়ী কিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে পাঁখি পাঁখি কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্তাকণ্ডে অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতি মাত্র নিয়মহীন ইচ্ছাময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আনন্দের মতো স্থলীকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে

সমুদ্রতীরে বাত্মির ধর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি কেছোমতো রচনা করিয়া মর্ত্যলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে।

“জালা করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা এখা অনুসারে বয়স মানবের কত নুতন পরিবর্তন হইয়াছে ; কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন কারবার মানবের ঘরে শিশুত্বটি ধরিয়া জয়গ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন সুচরিত্র যেমন সমুদ্র ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে ; এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির স্বজন ; কিন্তু বয়স মাদ্রু বহল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।”—হেলেনডালানো ছড়া।

শিশু চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন। এই জন্ত সে পরিবর্তনকে অর্থাৎ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে।

তুলনীর—

John Earle তাঁহার Microcosmographie পুস্তকে ‘The Eternal Child’ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“ We laugh at his foolish sports, but his game is our earnest :
and his drums, rattles, and hobby horses are but the emblems and mock-
ings of men’s business ”

“Hence in a season of calm weather,

Though inland far we be,

Our souls have sight of that immortal sea

which brought us hither,

Can in a moment travel thither,

And see the children sport upon the shore,

And hear the mighty waters rolling ever more.”

—Wordsworth, *Ode on Immortality*

ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ভাবটি কবি ভ্যানার (Vaughan) প্রসিদ্ধ কবিতা “The Retreat” হইতে পাইয়াছিলেন এমন অন্বমান অনেকে করেন।

মেক্সিকোর রু বার্ড্ নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে অনন্তের মধ্যে শিশুরা পৃথিবীতে জয়গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।

ড্যান্সিল টমসন্স তাঁহার Daisy and Poppy, Hound of Heaven কবিতাতে শিশুর মধ্যে দেবতাব স্বীকার করিয়াছেন।

জন্মকথা।

কবি বলিতেছেন যে যে-শিশুটি জন্মে সে আকস্মিক নয়। বিশ্বের সমস্ত বহুস্তর মধ্য হইতে শিশুর আবির্ভাব হয়। শিশু যে বংশে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশের সকলের আজীবনের তপস্তার ধন সে! ভগবানই প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতৃপিতামহের ও মাতৃমাতামহের সঙ্গে এক সূত্রে বঁধিয়া সংসারে প্রেরণ করেন, তিনিই সন্তানের মধ্যে তাহার পিতৃপুরুষের সমস্ত সাধনাকে মুক্তি ও সিদ্ধি দানের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। মানব কেহই বিচ্ছিন্ন নয়, স্বতন্ত্র নয়, সকলেই তাহার পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সহিত সংযুক্ত। মানবের কোনো সম্পর্কই আকস্মিক বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র নহে, তাহার সহিত সমস্ত বিশ্বের সম্পর্ক আছে। তাহার কোনো সম্পর্কই কেবল মাত্র প্রয়োজনের সঙ্কট বা সীমাবদ্ধ সঙ্কট নয়, সেই সঙ্কট অনাদি কালের ও জন্ম-জন্মান্তরের। তাই সমস্ত সঙ্কটই পবনদেবতার বহুস্তরসঙ্কটকেই প্রকাশ করে।

এই কবিতার মধ্যে কবি তিনটি সূত্র একত্র বুনিয়াছেন—কবিত্ব, বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রমবাদ বা হেরেডিটি, এবং আত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ। কবি বলিতেছেন যে শিশু অনন্ত অসীম হইতে আবির্ভূত হয় এবং দেশ কাল এবং বংশের সমস্ত বাহ্য ও মানসিক প্রভাব তাহার স্বভাবকে গঠন করে।

এই কবিতাটির সহিত কবি টেনিসনের ‘ডি প্রোফান্ডিস’ কবিতাটি বিশেষ ভাবে তুলনীয়।

বাক্য তাঁহার নিকঙ্কর মধ্যে পুত্র-সঙ্কটে খুঁটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই বলিয়া গিয়াছিলেন—

অজ্ঞাং অজ্ঞাং সম্ভবসি, হৃদয়াদ্ অধিজায়সে।

আজ্ঞা ব পুত্র নামাসি, স জীব শরণঃ শতন॥

ঐ কথাটিকেই কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে অসামান্য কবিত্ব মিলাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত মনোহর রচনা।

কেন মধুর

বিশ্বের আনন্দ-উৎস বাৎসল্য-রসের ভিতর দিয়া মাতার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করে। শিশুর হাতে রজনী খেলনা দিলে শিশুর হৃদয়ে গুঞ্জেবে

আনন্দ-হাস্ত ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া মনে হয় এই আনন্দের সুরের সঙ্গে বিধেব আনন্দধারার অংশ সংযোগ আছে ; ছেলের মুখে হাসি তখন মেঘের রং জলের রং, ফুলের রং প্রভৃতির সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসিয়া যায়—ছেলের হাসি দেখিয়াই বুঝিতে পারি বিশ্বসৌন্দর্য কোথায় কোথায় কি কি রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। শিশু-হৃদয়ের আনন্দধারার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির মিল আছে বলিয়াই শিশুর আনন্দের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দের রূপরীতাৎম্যাতাব নয়নে মূর্ত হইয়া উঠে। শিশুর নৃত্য বিশ্বছন্দেরই অঙ্গ ; তাহার নৃত্যের সঙ্গে বিশ্ব-সঙ্গীত সুর দেয় ও বিশ্বছন্দ তাল মিলায়। বিশ্বসঙ্গীত যেন শিশুর আনন্দের প্রতিধ্বনি, অথবা বিশ্বসঙ্গীতেবই প্রতিধ্বনি শিশুর আনন্দ-কাকলী।

শিশু যে ভোজনানন্দ উপভোগ কবে তাহা দেখিয়াই উপলব্ধি হয় বিশ্বের উপভোগ্য পদার্থ কত মধুর। পূত্র-স্পর্শ-সুখ বিশ্বের আলোক-বাতাসের স্পর্শের আনন্দ হৃদয়ে স্পষ্ট করিয়া দেয়। মাতা সন্তান-বাৎসল্যের ভিতর দিয়া অগত-শোভার অর্থ উপলব্ধি করেন, আপনাব অন্তরের আনন্দ-ভাতিতে জগতের শোভার আনন্দময়ের ও স্নহের সত্তা সুন্দর করণ মাতৃবেব মনে প্রেম ও আনন্দ উদয় হইলে সে সমস্ত-কিছুকে স্নন্দব দেখে।

শিশুই জ্বীলোককে মাতৃদেব আনন্দ অমৃতব করায়। জ্বীলোক মা হইলেই বিশ্বপ্রকৃতি তাহার কাছে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়। শিশুব আনন্দে মাতৃহৃদয়ও আনন্দিত হয়। কাহারো অন্তরে আনন্দ না থাকিলে প্রাকৃতিক আনন্দ উপলব্ধি কবিত্তে পারে না, এবং অন্তরে আনন্দ থাকিলে সেই আনন্দের দ্বারা ই স্নন্দর স্নন্দরতর রূপে উপলব্ধ হয়।

মাতা অপত্যস্নেহ দ্বারা আনন্দময়ী বিশ্বমাতার স্নেহ উপলব্ধি করেন। এই অল্প কবি অন্তর বলিয়াছেন—

“মাতাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অন্যের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অল্প নার ভালবাসা। . . . বৈকবধর পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনাব সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবশি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে ধুনিয়া এ কৃত্রিম বাসবাসুরটিকে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব করিয়া শেব করিতে পারে না, তখন আপনাব সন্তানের মধ্যে আপনাব ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।” —পঞ্চকূত, বহু

এই কথা গোরা উপভাসের মধ্যে হরিদোহিনীর মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন—

“ও আমার গোপীবরত, আমার জীবনলাগ, আমার পোশাক, আমার নীলমণি। বাবা তোমার কাছে বলতে আমার ইচ্ছা নেই, এ দুটিকে—রাখারগী আর সতীশকে পাণ্ডুরার পর থেকে ঠাকুরের পূজা আসি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখন কষ্টের পাখর হয়ে যাবে।”

কবি বলিতেছেন যে ভালবাসাই স্বর্গ—স্বর্গ ভালবাসায় পূর্ণ। শিশুদের মুখে স্বর্গের ছবি, তাহাদের সকল আনন্দে ভগবানের আনন্দমুখি প্রতিক্রিয়া হয়—শিশুর হাসিতে ভগবানের প্রশান্ত সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে। মাতা সন্তানের স্নেহে তাহার সৌন্দর্য ও সারলতা দেখিতে পান এবং মুগ্ধ হইয়া সেই ভাবে বিষকেও উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। যখন শিশু হাসে তখন মা মনে করেন প্রকৃতিও হাসিতেছে—এবং শিশুর হাসির ছুটোতেই হৃদয় ফিরণশালী। শিশুর হাতেব রঙীন খেলনাই বিশেষ বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ এবং শিশুর ভোজনানন্দই বিশ্বসামগ্রীকে জননীর কাছে স্বাদুতা দান করে। মায়ের ইচ্ছিন্নক উপলব্ধি সমস্তই তাঁহার সন্তানের স্নেহমূলক।

যিনি দান করেন তিনি যেমন সুখ পাইয়া থাকেন, তেমনি সুখ পাইয়া থাকেন যিনি দান গ্রহণ করেন। মাতা যখন সন্তানকে রঙীন খেলনা দেন, তখন শিশু আনন্দিত হয়, আবার মাতা সন্তানের আনন্দে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তখনই মাতা বুঝিতে পারেন যে আমরাও যখন প্রকৃতি-মাতার প্রতিপাল্য তখন প্রকৃতিও আমাদের সুখের জন্যই এবং নিজেরও সুখের জন্যই এত বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আবার মাতা যখন আপন সন্তানকে মিষ্ট কিছু খাইতে দেন, তখন তিনিও আনন্দিত হন—এখানেও দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সুখী। প্রিয়কে কিছু দান করিয়া যেমন সুখ, প্রিয়কে স্পর্শ করিয়াও সেইরূপ সুখানুভব করা যায়—এই ব্যাপারেও স্পষ্ট ও স্পর্শক উভয়েই সুখী। সুতরাং ঈশ্বর বা প্রকৃতি আমাদের ভালবাসেন বলিয়াই আমাদের কাছে প্রকৃতি এত সুন্দর ও মধুর রূপে প্রতিভা হন।

“নিজের শিশু কন্যাকে যখন ভাল লাগে তখন সে বিশ্বের মূল বহন মূল সৌন্দর্যের সম্ভবতী হ’য়ে পড়ে—এবং যের উজ্জ্বল উপাসকের মতো হ’য়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের ঐতিহাসিক ব্রহ্মদেবের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা দাতাই আমাদের জিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি স্রষ্টার সজাগ আবির্ভাব,—যে ‘নিষ্ঠা’ আনন্দ দিখিল জনতের মূলে সেই আমাদের ক্রমিক উপলব্ধি।”

অনন্ত যুহুর্তে যুহুর্তে আপনার অপরূপ প্রকাশ সমস্ত সৌন্দর্যকে ও মানব-সম্বন্ধকে রক্ষা করিয়া মানবের মানস-গোচর করেন। প্রেমের আবেগে হাহুধ যে পরিমাণে নিজেকে ভুলিতে পারে সেই পরিমাণে তাহার কাছে অনন্ত প্রকাশিত হন। এই প্রেম-সাধনার কথাই বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতায় বালক কৃষ্ণের নবনীত ভঙ্গন করা ও রঙীন খেলনা লইয়া খেলা করা দেখিয়া মাতা বশোদ্ধার আনন্দ-প্রকাশের কথা আছে—

অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতি প্রেমযেতে পুরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারী ঘাই —অজ্ঞাত
রাণী দিল পুরি' কর বাইতে রজিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল বায়।
খাউতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি' হরষিত ভেল মাথ —ঘনরাম দাস।
কুকলে কল হাতে বাইতে খাইতে পথে
আসি' নিজ গৃহে উপনীত।
কল দেখি যশোমতি আনন্দে না জানে কতি
বাগুয়াইয়া প্রস হুখে ভাসে —ঘনরাম দাস।
রাঙা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীধামের মাথে
যরে গেলে দিব স্বীকর নবী। —নরসিংহ দাস।

এই কবিতাটির মধ্যে চারিটি কলিতে মাতা দর্শনেন্দ্রিয় প্রবণেন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা নিজের আনন্দাচ্ছত্তব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়—

Womanliness means only motherhood .
All love begins and ends there, roams through
But, having run the circle, rests at home
—Robert Browning, *The Inn Album*.

He (Rabindranath) knows that the figurative delight of the child points the mode of representing the wonder of the earth that philosophy finds it so hard to reduce to order . . .

Herbert Spencer saw in the appetures of the child only the insatiable hunger of the beast-innate at a lower stage. Rabindranath has learnt to divine in them the first putting forth of the desires, which, being repeated

in the other plane of intelligence, seek out the path to heaven itself
He has, in truth, known how to see the child with the mother's eyes
and the mother with the child's ;.

—Ernest Rhys.

The poet, a grown up man, looks at the child with the same wonder
and sense of new discovery as a child experiences in its daily life. The
child's ways are so innocent and mysterious, so foolish and wise, so pre-
posterous and lovable. The poet shows in these poems a regard, at once
joyous and tender, for the changing mood and wayward desires of a child.
Every poem gives us a picture touched in with the fond life-like detail of
a sympathetic child-lover.

—Ernest Rhys.

লুকোচুরি ও বিদায়

প্রপঞ্চ রূপী খোক। পঞ্চভূতে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার একেবারে বিনাশ
ঘটে না, সে ভাব-রূপে পরিণত হয়। অতএব খোকার মৃত্যু একেবারে তাহার
নির্বাণ নহে, তাহা তাহার রূপান্তর-প্রাপ্তি ও সর্বত্র-ব্যাপ্তি। খোক। হওয়া জল
আলোক কুল হইয়া মাঝে স্পর্শ করিতে আসিবে, এবং ভাবরূপে স্বপ্ন হইয়া সে
মাতার মনের মধ্যেও আসা-যাওয়া করিবে।

তুলনীয়—সাজাহান কবিতা। এবং—

He is made one with Nature There is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder to the song of night's sweet bird.
He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone ;
Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own
Which wields the world with never-wearied love,
Sustains it from beneath, and kindles it above
He is a portion of the loveliness
Which once he made lovely.

—Shelley, *Adonais*,

Where art thou, my gentle child ?
Let me think thy spirit feeds,
With its life'intense and mild,
The love of living leaves and weeds

Among these tombs and ruins wild ,
 Let me think that through low seeds
 Of the sweet flowers and sunny grass
 Into their hues and scents pass
 A portion

—Shelley, *To William Shelley*.

Three years she grew in sun and shower
 Then Nature said, "A lovely flower
 On Earth was never sown ;
 This child I to myself will take ;
 She shall be mine, and I will make
 A lady of my own

* * *

She shall be sportive as the fawn,
 That wild with glee across the lawn
 On up the mountain springs
 And hers shall be the breathing balm,
 And hers the silence and the calm
 Of mute insensate things.

—Wordsworth, *A Memory*

You will bury me my mother
 Just beneath the hawthorn shade,
 And you'll come sometimes
 And see me where I am lowly laid
 I shall not forget you mother,
 I shall hear you when you pass,
 With your feet above my head
 In the long and pleasant grass.
 If I can I'll come again, mother
 From out my resting place .
 Tho' you'll not see me mother,
 I shall look upon your face ;
 Tho' I cannot speak a word,
 I shall harken what you say,
 And be often, with you,
 When you think I'm far away.

—Tennyson, *New Year's Eve*.

উৎসর্গ

মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় কবিরের কবিতাগুলিকে বিধ্ব-অম্লসারে বিভাগ করিয়া একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩১০ সালে। সেই বিভাগগুলির নাম ছিল—যাত্রা, ক্রমস্বায়ং, নিষ্কমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, শোকালয়, নারী, কল্পনা, লীলা, কোঁতুক, বৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হস্তজাগা, সংকল্প, স্বদেশ, রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা, মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ, শিশু, গান, নাট্য। এই প্রত্যেক বিভাগের কবিতাগুলির মোট তাৎপর্ষ বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রথমে এক-একটি প্রবেশক কবিতা কবি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যখন এই কাব্য-সংস্করণের আর পুনর্মুদ্রণ হইল না, তখন কবির কবিতাগুলি প্রথমে যে যে পুস্তকে যে ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন এই প্রবেশক কবিতাগুলি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, এবং এইগুলিকে একখানি নূতন পুস্তকের মধ্যে স্থান দেওয়া আবশ্যক হইল। যখন এই কবিতাগুলি ছাপার কল্পনা হইতেছিল তখন এক দিন কবি এই কবিতা-সংগ্রহের কি নাম রাখা যায় তাহার আলোচনা আমার সহিত করিয়াছিলেন। আমি ঐ পুস্তকের নাম রাখিতে বলিলাম—উক্তি। ঐ নাম কবির মনঃপূত হইল না, তিনি বলিলেন—ঐ নামের সঙ্গেও উল্লেখ্য এবং বাংলা ভাষা শব্দের গন্ধ জড়াইয়া থাকিবে। তিনি বলিলেন—নামটা ঠিক হইতে উচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহাও বাংলার কদম্ব ধারণ করিয়াছে। আমি বলিলাম—তাহা হইলে সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া উৎসর্গ রাখিলে হয়। কবি অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—না, নাম থাক উৎসর্গ—ইহার মধ্যে অবশিষ্টতার ভাবও থাকিল এক নিবেদনের ধ্বনিও রহিল।

উৎসর্গের কবিতাগুলি কবির বিশেষ বিশেষ ভাবপর্যায়ের কবিতার সুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা, অথবা ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলিয়া কবিতাগুলি গভীর ভাবে সমৃদ্ধ এবং সরস কবিতা হিসাবেও অত্যাশ্চর্য। ইহার অনেকগুলির মধ্যে জীবনদেবতার ভাব আছে; এবং কবিতাগুলি কবির পরিণত প্রতিভার ছাপ ধারণ করিয়া মহানুশ্যাবান হইয়া উঠিয়াছে।

এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০৮ হইতে ১৩১০ সালের মধ্যে রচিত।

রবি-রশ্মি

অপরূপ

এই কবিতাটি ‘সোনার তরী’ বিভাগের প্রবেশক কবিতা। উৎসর্গ পুস্তকের ৬ নম্বর।

যিনি কবির জীবনদেবতা ও অন্তর্ধারী, তিনিই আবার বিশ্বশ্রুতির সকল সৌন্দর্যের ভিত্তর দিয়া তাঁহার বুদ্ধি চিত্তা হুবহু ধর্ম স্পর্শ করেন। যিনি ভূত্বঃ স্বঃ প্রসব করেন, তিনিই আবার আমাদের দীর্ঘজীবিকে প্রেরণ ও উদ্বেক করিয়া থাকেন। সেই যিনি অরূপ হইয়াও বহুরূপ, যিনি রূপং রূপং বহুরূপং বিভাতি, তিনিই অপরূপ। তিনিই অনির্বচনীয়, অবাঙ্ মনসোগোচরঃ। তাই তাঁহাকে চিনি বলাও যায় না, চিনি না বলাও যায় না। এই অল্প উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নাহং মন্তে হবদেতি নো ন বেদেতি বেদে চ।

যো নসু তদ্ বেদ ভব বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ।

আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে স্তম্বররূপে জানিয়াছি, আমি যে তাঁহাকে জানি না এমনও নহে। ‘আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে’—এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

বস্তামতঃ তন্ত্ৰ মতঃ, মতঃ বস্ত্ৰ ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞান তাম্।

যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উক্তর জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকটে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদের এই চেতনা আছে যে তাঁহারা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ জানিতে পারেন নাই, কিন্তু অসম্যগ্ দর্শী ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি বিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাহারা প্রাপ্তিবশতঃ মনে করে যে তাহারা ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপেই জানিতে পারিয়াছে।

পাপল

এই কবিতাটি “যৌবন-বহ্ন” পর্যায়ের কবিতার প্রবেশক। সফরিতা পুস্তকে কবি ইহার নাম রাখিয়াছেন ‘মরীচিকা’। উৎসর্গ পুস্তকের ৭ নম্বর কবিতা।

উৎসর্গ—সুদূর

বিস্ত্রীণ ও শক্তিশীল পরক্ৰমকাতর কোনো মহাপ্রাণ ব্যক্তি কোনো ছতিকল্পীভিত্ত দেশে গেলে যেমন নিজের অক্ষমতার ও অপরের ব্যাখ্যার পাগল হইয়া উঠেন, তেমনি কবিও যখন স্বীয় অন্তরলোকের সৌন্দর্য প্রকাশ করার উপযোগী ভাষা ও স্বর খুঁজিয়া না পান তখন তিনিও পাগল হইয়া উঠেন। কবির সব চেয়ে বড় ব্যথাই তাঁহার অন্তরলোকের ভাবসম্ভার প্রকাশ করার ব্যথা—সে যেন গতিশীল প্রসব-বেদনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তান গর্ভ ছাড়িয়া বাহিরে আসে ততক্ষণ প্রসূতির স্বস্তি নাই। অন্তরের ভাবসম্পদকে সকলের গোচর করার উপযোগী কথা খোঁজাই কবির জীবনের সাধনা।

কবি নিজের শক্তি ও মাধুর্যের আভাস মাত্র উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, সেই জন্য নিজের নাভিগন্ধে পাগল কস্তুরীমুগের সহিত কবি নিজের তুলনা করিয়াছেন।

মাধুর্য অল্পক্ষণ মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়, সুন্দর মনে করিয়া অসুন্দরকে ধরিয়া ভুল করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই.

যাহা পাই তাহা চাই না।

ঠিক এমনি কথাই কবি শেলী বলিয়াছেন—

We look before and after,

And pine for what is not .

Our sincerest laughter

With some pain is fraught ;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

—Sheilley, *Skylark*

সুদূর

এই কবিতাটি “বিষ” নামক কবিতা-পর্ধ্যায়ের প্রবেশক। সঙ্কল্পিত পুস্তকে কবি ইহার শিরোনাম রাখিয়াছেন ‘আমি চঞ্চল হে’। এটি উৎসর্গ পুস্তকের ৮ নম্বর কবিতা।

অনন্তের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমের অভিমুখে যাত্রা করিবার উৎস্র বাসনা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

“পরিতৃপ্তমান জগতের পশ্চাতে একটা অদৃশ্য শক্তি—বাহ্যকে জীবনী-শক্তি বলা যায়—
ত্রিা করিতেছে। এই জীবনী-শক্তি—বাহ্যকে কবি ‘সুদূর’ আখ্যা দিয়াছেন, সর্বদাই
জগৎটাকে ওলট-পালট করিয়া নুতন ভাবে গড়িতেছে। ইহাকে

unendlickeitsdrang (endless urgency, impulse অথবা impetus)

বলা বাইতে পারে—অসীমের একটা আকর্ষণ। সেটে ইহাকে

das ewig Weibliche (the eternal feminine)

বলিয়াছেন। এইরূপ একটা শক্তি জগতের গতির মূল কারণ। বিজ্ঞান এই শক্তিকে
দেখিতে পার না। সেই জন্তই বিজ্ঞান কেবল নিয়মের রাজ্য ঘোষণা করে। কিন্তু বিজ্ঞান-
কল্পিত নিয়মের জালকে ভাঙিয়া এই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে।”

—ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, রক্তকরবী, উত্তরা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।

কবি অসীমে নিজেকে প্রসারিত করিতে চাহিতেছেন, কারণ তাঁহার মন
কল্পনা অসীম-প্রসারী, এমন কি জীব মাত্রই অস্তরের অসীমের অংশ মাত্র।
সেই জন্ত কবি নিজেকে প্রবাসী বলিতেছেন। এই যে স্থানে কালে এবং
বিশেষ দেহে আবদ্ধ আত্মা ও মন তাহাই মাহুয়ের প্রকৃত অবস্থান নহে।
মন উধাও হইয়া উড়িতে চায়, কিন্তু দেহ ও সংস্কার মাহুকে আবদ্ধ করিয়া
রাখে। কবির মহাপ্রাণ ইহার জন্ত ব্যথা অমুভব করিতেছে।

এই কবিতার সহিত কবির ‘মানসভ্রমণ’, বা ‘বহুধরা’ এবং ‘সুদূর’ কবিতা
তুলনীয়।

কবি নিজেকে যেমন প্রবাসী বলিয়াছেন, তেমনি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও
বলিয়াছেন—

The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting,
Arid cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

—Wordsworth, *Ode on Intimations of Immortality from
Recollections of Early Childhood.*

তুলনীয়—

Ever let the Fancy roam,
Pleasure never is at home.—Keats, *Fancy*

I cannot rest from travel : I will drink
Life to the lees : —Tennyson, *Ulysses*
I am a part of all that I have met ;
Yet all experience is an arch wherethro'
Gleams that untravell'd world, whose margin fades
For ever and for ever when I move —Tennyson, *Ulysses*.

প্রবাসী

মোহিত সেনের কাব্য-সংস্করণের 'বিশ্ব' নামক বিভাগের প্রথম কবিতা ।
উৎসর্গ পুস্তকেব ১৪ নম্বর কবিতা ।

এই অল্প ইহার সহিত ঐ বিভাগের প্রবেশক কবিতা স্রুদের ভাগবত
সাদৃশ্য রহিয়াছে ; সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতাটির সহিতও ইহার কিছু
মিল আছে ।

এই কবিতার মর্মকথা হইতেছে কবি জল-স্থল-আকাশের সহিত একাত্মতাব
অনুভব করিতেছেন, সর্বাঙ্গভূতির জন্ত তিনি নিজের সঙ্গীর্ণ পরিবেশকে
প্রবাস-স্বরূপ মনে করিতেছেন । কবি দেশ-কালাতীত হইয়া সর্বদেশে ও
সর্বমানবে—এমন কি সর্বজীবে সর্ব-পদার্থে নিজেকে পরিব্যাপ্ত দেখিতেছেন ।
ইহা বৈদাস্তিক আইডিয়াব সহিত নিও প্লেটোনিক ডক্ট্রিনের সংমিশ্রণ বলা
যাইতে পারে । কবি যে ঙ্গড় উদ্ভিদ এবং নানা জীবের ভিতর দিয়া
উদ্ভিদ ও অভিযান্ত্রিক হইতে হইতে এই বর্তমান শরীর লাভ করিয়া মহাকবির
মননশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার
পূর্বেই বলিয়াছেন ।

তুণে পুলকিত মাটির ধরা দেখিয়া কবি যে পুলকিত, তাহা কবি অল্প
কবিতাতেও প্রকাশ করিয়াছেন ।—

তুণ-রোমাক ধরণীর পানে

আধিনে নব আলোকে

চেরে দেখি যবে আপনার মনে

প্রাণ ভরি' উঠে পুলকে ।—উৎসর্গ ১৩ নম্বর ।

পৃথিবীকে মাতা-রূপে সন্ধান অতি প্রাচীন—

মাতা ভূমিঃ, পুত্রো অহন পৃথিব্যাঃ । জ্ঞাতি নিবীদেম ভূমে ।

—অথর্ববেদ, ১২।১৮

কুঁড়ি

উৎসর্গ পুস্তকের ৯ নম্বর কবিতা। মোহিত-সংস্কার কাব্যগ্রন্থাবলীর “জন্ম-অরণ্য” বিভাগের প্রবেশক।

জুদু জীবনের কারাগারে বন্দী হইয়া থাকার বেদনা এই কবিতার প্রকাশ পাইয়াছে। কবির বিরাট আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কবি যে একলা নিজের মনে রস-সন্তোষ করিতেন সেই জীবনেরও একটা মোহ আছে, সেই মোহ কাটাইতেও তাঁহার মনে ব্যথা বাজিতেছে, অথচ কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষাও যথেষ্ট প্রবল। না-কোটার কারাগারে রুদ্ধ থাকাতে কুসুমের যে আনন্দ-বিবাদ তাহার উভয়ই কবি-চিত্ত অম্লভব করিতেছে।

জগতে কিছুই নৃথা ও নিষ্ফল নয়, প্রত্যেক পদার্থের একটা-না-একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার আদেশ আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য তখনই সংশোধিত হয় যখন সে জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিজেকে পরিচালিত করিতে পারে।

যে অশ্রুট মন বিশ্বকর্মের জন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই, যে আত্মা বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বমিলনের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাহারই বিলাপে কবি তাহাকে সাহসনা দিতেছেন যে সকলকেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতেই হইবে, এবং কাল ও দেশ অনন্ত অসীম বলিয়া কাহারও অসম্পূর্ণতার জন্ত আক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই, একদিন না একদিন সে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া ধন্য হইবেই!

অনেক সময়ে মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং জগতের নম্বরতা দেখিয়া নিজের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের অক্ষমতা ও বিফলতার জন্ত বিলাপ করে। কিন্তু কবি-প্রতিভা যখন নিজের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তখন তাঁহারই মন হইতে এই অভয়বাকী উচ্চারিত হইতেছে—জগতের সহিত মিলিত হইয়া অগণ-শ্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারিলেই তাঁহার জীবন ও প্রতিভা সার্থক হইবে—অতএব—

জগৎ-শ্রোতে ভেসে চলো যে দেখা আয়ছে তাই। —প্রভাতসঙ্গীত, শ্রোত।

এখনও যাহা পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই, শুধু ফুটিবার আগ্রহে দিন কাটাইতেছে, তাহাব নানা ধরনের অধীরতা ও চুচিন্তা কবি এই কবিতার তিনটি স্তবকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে যে ফাঙ্কন অর্থাৎ সুসময় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার ফোটা হইল না। কবি বলিতেছেন যে—হে অশ্রুট কুঁড়ি, তুমি ব্যস্ত হইও না, ফাঙ্কন অর্থাৎ সুসময় কখনো একেবারে চলিয়া যায় না, সকল সময়ই সুসময়।

দ্বিতীয় স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে,—তাহার গন্ধ তাহার অস্ত্রের কারাগারে বন্দী হইয়া আছে, সেই গন্ধ কেমন করিয়া বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করিবে ও তাহার পরিণতিই বা কী হইবে তাহা না জানিতে পারিয়া সে চুঃখিত বিচঞ্চল। কবি বলিতেছেন,—হে কুঁড়ি, ব্যস্ত হইও না, তোমার অভ্যন্তরে যে গন্ধ বন্দী হইয়া আছে তাহা একদিন না একদিন বহির্জগতে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিবে ও আপনাকে সার্থকতা দান করিবে। জগৎ-বিধান এমনই যে তাহার ফলে তুমি যখনই চাহিবে, তখনই দেখিবে তোমাকে সার্থক করিবার আয়োজন ও সুযোগ জগতে পূর্ব হইতেই পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত রহিয়াছে।

তৃতীয় স্তবকে কুঁড়ি বলিতেছে,—তাহার সার্থকতার পথ যে কি তাহা সে জানে না, এবং সেইজন্য তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। কবি বলিতেছেন,—জগতে সকলের সার্থকতায় যে পথ, কুঁড়িরও সেই পথ। এ জগতে যাহা একাকী, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহা অনর্থক, তাহা ব্যর্থ, এ জগতে তাহাই সার্থক যাহা জগতের অন্তান্ত বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ কুঁড়ি যদি আপনাব সৌন্দর্য সৌরভ ও মাধুর্যের গর্ব দেখাইবার জন্তই কেবল প্রস্ফুটিত হইতে চায়, তাহা হইলে সে ব্যর্থ হইবে। কিন্তু সে যদি তাহার সৌন্দর্যে সৌবভে মাধুর্যে জগৎকে সুন্দর পরিভূষ্ট ও পরিভূপ্ত করিতে চেষ্টা করে, তবেই সে দেখিবে তাহার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী কবি, জন্ম ও জীবন ক্রমাগত সার্থকতার পথে চলিতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এখানে তাঁহার সেই মনোভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ওমর খৈয়াম প্রভৃতি নৈরাশ্রবাদী কবিদের উক্তিভেদে বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরিচয় থাকিলেও তাহা জীবনের উন্নতির জন্ত অবলম্বনেব যোগ্য নহে।

বিশ্বদেব

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ‘স্বদেশ’ বিভাগের প্রবেশক-রূপে লিখিত হইয়াছিল এবং ১৩০২ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শন পত্র ৪৫৭ পৃষ্ঠায় “স্বদেশ” নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা উৎসর্গ পুস্তকের ১৩ নম্বর কবিতা।

এই কবিতায় কবি ভারতবর্ষের মধ্যে বিশ্ববাসীর মিলনস্থান এবং বিশ্বধর্মের বিশ্ববোধের বিকাশ দেখিয়া স্বয়ং বিশ্বদেবকেই নিজের স্বদেশের মধ্যে আবির্ভূত দেখিতেছেন। যে একের ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্র ভারতের তপোবনে উদ্গীত হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী-গাথাই বিশ্বজ্ঞানের মহামন্ত্র। কবি ধ্যান-নেত্রে দেখিতেছেন যে স্বদূর ভবিষ্যতে এই ভাবতের শিকার ফলে দিগ্বিজয়ী পরদেশ-লোলূপ ষোড়শ রণ-স্ফকার অথবা অর্থগুরু বণিকের পরদেশ-লুণ্ঠন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং বিশ্ববাসী সকলে ভারতের উপদেশ জনরক্ষম করিয়াছে—

ঈবা বাস্তুম্ ইবং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগতাং জগৎ।

তেন তাক্তেন ভুক্তাথা মা গৃহঃ কস্তস্মিন্ ধনম্।

ভারতের পবিত্র নির্মল ছদ্ম-শতদলে ভারতের ভারতী অধিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ণ মহাবলী ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কবিকর্ষহার পুস্তকে ‘অভিভারতী’ নাম দিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। কবির মনে স্বদেশপ্রীতি বিশ্বমৈত্রীতে পরিণত হইয়াছে।

আবর্তন

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘রূপক’ বিভাগের প্রবেশক-রূপে এবং আমার সম্পাদিত প্রথম প্রকাশিত চরনিকার মধ্যে কবীন্দ্রের সমগ্র কাব্যের প্রবেশক-রূপে ছাপা হইয়াছিল। ইহা ১৩০২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা উৎসর্গ পুস্তকের ১৭ নম্বর কবিতা।

বিশ্ব-কাব্যের যিনি অনাধি-কবি তাঁহার সৃষ্টি-লীলার আয়রা দেখিতে পাই তিনি অ-ধরাৎক ধরার মধ্যে, ethereal-কে tangible-এর মধ্যে, আশকে জড়ের মধ্যে, spirit-কে matter-এর মধ্যে, অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়। প্রকাশ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যেও আমরা সেই বিশ্বকাব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ও প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই।

অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত্বনাপ্রদ বন্ধনের মাঝে মুক্তি খুঁজিয়া শব্দের
সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। অব্যক্ত অব্যয় নিজেকে পলে পলে ভাব
হইতে রূপে এবং রূপ হইতে ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন।

অসীম অনন্ত এবং সসীম সান্ত্বনাপ্রদ বন্ধনকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে
পারে, নতুবা তাহাদের প্রকাশই সম্ভব হয় না। তাই কবি পরে বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন হৃদয়।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

ইহারও অনেক আগে কবির প্রথম যৌবনে কবি এই তত্ত্বটি প্রকাশ
করিয়াছিলেন—

এ জগৎ মিথ্যা নয় ঐশ্বর্য সত্য তবে

অসীম হতেছে ব্যক্ত—সীমা রূপ ধরি।

যাহা কিছু সূত্র সূত্র অনন্ত সকলি,

বালুকাবরণ—সেও অসীম অপার—

তাঁবি মনে বীধা আছে অনন্ত আকাশ—

কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে।

বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।

আঁখি খুলে জগতের বাহিরে ফেলিয়া

অসীমের অন্বেষণে কোথা গিরোহিমু।

সীমা তো কাঁধাও নাট—সীমা সে তো ভ্রম।

—প্রকৃতির প্রতিশোধ, সন্ন্যাসীর উক্তি।

রবীন্দ্রনাথের আবর্তন কবিতাটির হুবহু অঙ্কুর একটা কবিতা আছে
তত্ত্বকবি দাছর—

বাস কহে হৃদয় কোণে পাঁউ,

ফুল কহে হৃদয় বাস।

ভাষ কহে হৃদয় সত্য কোণে পাঁউ

সত্য কহে হৃদয় ভাষ ॥

রূপ কহে হৃদয় ভাষ-কোণে পাঁউ,

ভাষ কহে হৃদয় রূপ।

আপনের দৃষ্ট পূজন চাহে—

পূজা অগাধ অনুপ ॥

হৃগন্ধ বলে—আমি ফুলকে না পাইলে তো আমার প্রকাশের কোনো সম্ভাবনাই নাই ; আমি হৃদয়, ফুল ফুলকে পাইলেই তবে আমি আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারি। আবার ফুল বলিতেছে—আমি ফুল, আমি যদি গন্ধকে না পাই তবে আমার জীবন নিরর্থক হয়। ভাষা বলে—আমি যদি সত্যকে না পাই তবে আমি মিথ্যা। আবার সত্য বলে—আমি যদি ভাষাকে না পাই তবে তো আমার প্রকাশই অসম্ভব। রূপ বলে—আমি ভাবকে যদি না পাই তবে তো আমি জড় মাত্র। আবার ভাব বলে যে—আমি রূপকে না পাইলে কেবল মাত্র ফাঁকা হাওয়া। অতএব হৃদয় ও ফুল উভয়ে উভয়কে পূজা কবিতো এবং পাইতে চাহিতেছে, এবং এই পূজার রহস্ত অগাধ এবং অন্তিম।

অতীত

“কথা কও কথা কও”

মোহিত-সংস্করণের কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘কথা’ বিভাগের প্রবেশক কবিতা।
ইহা উৎসর্গ পুস্তকের ৩৫ নম্বর কবিতা।

কবি অতীত ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিবেন, তাই তিনি অতীতকে সম্বোধন কবিতা বলিতেছেন—অতীতকাল তো অনাদি অনন্ত, তাক্সা রাত্রির মতন রহস্যাকারে অজ্ঞানার দ্বারা আবৃত। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কত কত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার কতটুকু ভগ্নাংশ ইতিহাস জীবনচরিত্ত কিংবদন্তী জনশ্রুতি ধরিয়া জীবিত রাখিতে পারে। অধিকাংশই অতীতের গর্ভে হারাইয়া গোপন হইয়া যায়, সে-সব সংবাদ আব পবিব্যক্ত হয় না। হে অতীত, তুমি আপনাকে কবির কাছে প্রকাশিত করো।

কিন্তু অতীত কালপ্রবাহে বিলীন হইলেও তাহার পলি পড়িয়া মন উর্বর হইয়া উঠে। জগতের সমস্ত কাহিনী ঘটনা অতীতের কুক্ষিতে লুক্কায়িত হইয়া গেলেও, তাহা লুক্কায়িত মাত্র হয়, বিনষ্ট হয় না। পূর্বজন্মের কর্ম ও জীবনের প্রভাব বর্তমানের উপর পড়িয়া বর্তমানকে গঠন করে।

এই কবিতার সহিত তুলনীয়—কাহিনী বিভাগের প্রবেশক কবিতা—

“কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বাহিয়া চেতনা-বাহিনী।”

Thou hoary giant Time,
Render thou up the half devoured babes,
And from the cradles of eternity,
Where millions lie lulled to their portioned sleep
By the deep murmuring stream of passing things,
Tear thou up that gloomy shroud
—Shelley, *The Daemon of the World*

কত কি যে আসে, কত কি যে যায়

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্কার কাব্যগ্ৰন্থাবলীর ‘কাহিনী’ বিভাগের প্রবেশক। ইহা উৎসর্গ পুস্তকেব ৩৪ নম্বর কবিতা।

চেতনা-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া বোধের বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত কি যে আসে যায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সেই-সব আগন্তুক ভাবাবলীর ভগ্নাংশ-খণ্ড মগ্নচৈতন্তের মধ্যে পড়িয়া থাকে, মন সেই-সব টুকরা একত্র-সংগ্রহ করিয়া কত কাহিনী রচনা কবে। সেই মন একমনা অর্থাৎ একাগ্র, সে অনর্শন, সে কেবলমাত্র স্মৃতি-সমাপ্তি। মন হৃদয়েব সঙ্কীর্ণ, তাহার ভাণ্ডারে সব-কিছুই সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই সঞ্চিত নানা উপকরণ একত্র করিয়া মন ও হৃদয় মিলিয়া নানা অপূর্ব সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টি-কর্ম গোপনে অন্তরের অন্তর্ভালে স্মৃতিব সাহায্যে হয়, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না যতক্ষণ না সেই সৃষ্টি শেষ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। এই যে মন তাহা তো কেবল ইচ্ছা-জন্মের অভিজ্ঞতা নহইয়াই কাজ করে না, মন কেবল তাহার নিজের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়েই পূর্ণ থাকে না, পূর্বপুরুষের পিতৃপিতামহদের সমস্ত মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাব এবং নিজেরও জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতাব উত্তরাধিকারী সে। যে প্রাণ বিন্দু মাতা-পিতার কাছ হইতে দীপ হইতে দীপান্তরে অগ্নিশিখা-সংক্রমণের মতন রূপ-রূপে পবিণত হয়, সে তো তাহার দেহকোষে, মনোময়কোষে ও প্রাণময়কোষে পৈতৃক ও মাতৃক সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইয়াই শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় এবং আপনার পরিবেশের সমস্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে করিতে সে মানুষ হইয়া উঠে। সেই-সমস্ত আপাত-বিস্মৃত কাহিনী তাহার স্মৃতির মধ্যে মগ্ন-চৈতন্তের মধ্যে স্পষ্টচৈতন্তের মধ্যে subliminal self-এবং মধ্যে সঞ্চিত থাকে; যখন দরকার পড়ে তখন মহাজন

মন তাহাব ভাঙারী ব্যাকারের কাছে ঢেক কাটে ছণ্ডী পাঠায় আর গচ্ছিত
আমানত্ ধন স্মৃতিব ধাজনাধানা হইতে আদায় করিয়া আনে।

মরণ-দোলা

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের পৌষ মাসেব বঙ্গদর্শনে ৪৭৭ পৃষ্ঠায়
“বিশ্বদোল” নামে প্রকাশিত হয়।

ইহা মোহিত-সংস্কারণ কাব্যগুণাবলীৰ ‘মরণ’ বিভাগের প্রবেশক কবিতা।
উৎসর্গ পুস্তকের ৪২ নম্বর কবিতা।

কবি জীবন ও মৃত্যুকে দোলাব সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোনো
অন্ধকার ঘরের দরজার চৌকাঠে যদি দোলা টাঙাইয়া কেউ দোল খায়, তবে
সে একবার বাহিরের আলোকে জ্বলিয়া আসে, এবং পরক্ষণেই অন্ধকার ঘরের
মধ্যে চলিয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া যায়। অন্ধকারে তাকাকে দেখিতে পাওয়া
যায় না বলিয়া এ কথা যেমন বলা সম্ভব নয় যে সেই দোল-খাওয়া লোকটি আর
নাই। তেমনি মৃত্যুর অন্ধকাবে প্রাণী আবৃত হইলে বলা সম্ভব নয় যে সেই
প্রাণী আর নাই। মানুষ একই জীবনে একই চেতনার মধ্যে ও একই অভিজ্ঞ
তার মধ্যে জাগ্রত অবস্থা হইতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং পুনর্বার জাগরিত হয়,
সেই জ্ঞান কেহ নিদ্রাকে ভয়ঙ্কর মনে করে না। কিন্তু মৃত্যুর পরে জন্মান্তর
লাভ করিলে মানুষের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না, তাহাব মৃত্যু ও নবজন্ম
একই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে থাকে না বলিয়াই মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, মনে করে
এই বৃষ্টি সব-শেষ। কিন্তু কবিরা মৃত্যুকে নিদ্রাব সহোদর বলিয়াই
জানিয়াছেন—

How wonderful is Death
Death and his brother Sleep !

—Shelley, *Queen Mab*

অনেক কবি মৃত্যুকে নিদ্রায় সহিত তুলনা করিয়াছেন—মৃত্যুর এক নাম
মহানিদ্রা।

To die, to sleep ;
To sleep : perchance to dream ah there's the rub
—Hamlet's Soliloquy

মানুষ অজ্ঞাতকে ভয় করে, তাই চিরপরিচিত জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়া অজ্ঞাত “মৃত্যু-মাধুরী” উপলব্ধি করিতে পারে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলিয়াছেন—মৃত্যু নবজীবনের দ্বার—

কেবলই এই দুর্ঘাটুকু পার হ'তে সংশয়।

জয় অজানার জয়।

মৃত্যু জীবনেরই পরিণতি। মৃত্যু বিশ্বজননীর কোল, সেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, কেহই দুঃখ পায় না।

স্তন হ'তে তুলে নিলে শিশু কঁাদে ডবে।

মৃহর্তে আশ্বাস পায গিবে স্তনাস্তরে।

...সে যে মাতৃপাণি

স্তন হ'তে স্তনাস্তরে কইতেছে টানি' — নবেজ।

কবি রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যুকে পাশাখেলার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাকে তিনি বল খেলার সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন। বল-লোফালুফি খেলার সঙ্গে সিন্ধুদেশের ভক্ত কবি বেকস জন্ম ও মৃত্যুকে তুলনা করিয়াছেন। বেকস অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিন্ধুদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি মাত্র ২২ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাঁহার মাতা খেদ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কবি বেকস মাকে সাব্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—জগজ্জননী ও পাখির জননী এই উভয়ের মধ্যে বল-লোফালুফির খেলা চলে—এবজন ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং অপবে লুকিয়া ধরিয়া লন; সেইরূপেই তো আমার জন্ম আরম্ভ হইয়াছিল—জগজ্জননী আমার জীবনকে ছুড়িয়া তোমার কোলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এখন আবাব আমাকে ছুড়িয়া তাঁহার কোলে ফেলিয়া দিয়া তুমি খেলা শেষ করো।—

উভয় মাতৃ বীচ পেল চলে—

গর্দ জাঁ মোকো দেষ্ট লেষ্ট ॥

তেই তো জন্ম মোকো স্বক হৈ.

খেলু আজ মোকু দেষ্ট ॥

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যেমন জন্ম-মৃত্যুকে দোলাব সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, ভক্ত কবি কবীরও তেমন তুলনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং তিনিও বলিয়াছেন যে জন্ম-মরণ যেন বিধাতার দক্ষিণ ও বাম হাতে অদল-বদলের খেলা—

জন্ম-মরণ-বীচ সেধো অন্তর নহী—
 গল্পে ওর বাম হুঁ এক আহী ।
 জন্ম-মরণ অঁহা তারী পড়ত হৈ
 হোত আনন্দ তই গগন গাঁজৈ ।
 উঠত স্বনকার তই নাম জনহু ঘরে,
 তিরলোক-মহলকে প্রেম বাজৈ ।
 চন্দ্র তপন কোটি দীপ বরত 'হ,
 তুর বাজৈ তই সত্ত্ব সুলৈ ।
 পার স্বনকার তই, নুর বরষত রইহে,
 রস পীঠে তই ভক্ত ভুলৈ ॥—কবীর ।

গগন সেধা মগন সলা নবীন চির আনন্দে
 জন্ম আর মরণ, তাঁর বাজিছে তালি ভুট হাতে ;
 রাগিনী উঠে স্বক্কারিষা কী মর্ছনা কী চন্দে ।
 ত্রিলোক ত'তে রসের ধারা মিলিতে আসি' বিন রাতে ।
 নূর শলী লক্ষ কোটি প্রদীপ সেধা সমুজ্জল,
 বাজিছে তুরী ভুবন ভরি', প্রেমিক হলে কিন্নোলে ;
 পিরীতি সেধা মর্মরিছে, স্মরিছে আলো অনর্গল,
 আপনা ভুলি' ডকত চিখা অমৃত পিয়ে বিহরলে
 জন্ম আর মরণে কোনো তফাৎ নাই—নাউ তফাৎ—
 নাউ তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো' ;
 কবীর কহে সেধানা যেবা হয় সে বোলা অকল্যাণ—
 কোবান-বেহ স্বচীত বালী—অতল সেধা বামে গো' ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিমঞ্জুলা

তুলনীয়—

Our life is a succession of deaths and resurrection : we die, Christo-
 pher, to be born again.—Romain Rolland.

and still depart
 From death to death thro' life and life, and find
 Nearer and ever nearest Him, who wrought
 Not matter, nor the finite-infinite,

—Robert Browning.

Earth knows no désolation,
 She smells regeneration
 In the moist breath of decay.

—Meredith.

মরণ

এই কবিতাটি ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে ২৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সঞ্চয়িতা পুস্তকে কবি ইহার শিরোনাম রাখিয়াছেন 'মরণ-মিলন'। ইহা উৎসর্গ পুস্তকের ৪৮ নম্বর কবিতা।

জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া চাই। যে মানুষ ভয় পাইয়া মৃত্যুকে এড়াইয়া জীবনকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, জীবনের উপরে তাহার যথার্থ শ্রদ্ধা নাই বলিয়া সে জীবনকে পায় নাই। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করিয়াও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজেকে আগাইয়া গিয়া মৃত্যুকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে সে দেখিতে পায়—যাহাকে সে ধরিয়াছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। 'ফাস্তুনী' নাট্যকাব্যের অন্তরেব কথা ইহাই।

যাহাদের অন্তরের মিল হইয়া যায় তাহারা আর বাহিরের রূপ দেখিয়া ভ্রান্ত হয় না। তাই রুদ্রবেশী প্রিয়তমকে দেখিয়াও প্রণয়িনীর আঁখি শুখে ছলছল করে। যাহারা অন্তরেব পবিচয় পায় না, তাহারা বাহ্য কদাকার মৃতিকে সমাদর করিতে পারে না। তুলনীয়—কবির নূতন নাট্যকাব্য 'শাপ মোচন', এবং পুনশ্চ 'পুস্তকে' শাপমোচন কবিতা।

তুলনীয়—

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বনে প্রাণ
সে তো শুধু পলক নিমেষ।
মৃত্যুরে ভরিয়া কেন কাঁদি।—
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি।

—প্রভাত সঙ্গীত, অনন্ত মরণ।

ববীশ্রনাথ মৃত্যুকে আরও অন্ত স্থলে বর বলিয়াছেন, এবং জীবন তাহার বধু।

মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন বধু হবে তোমার
নিভা অমুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কণ্ড আঁধারে কথা ॥

বরণ-মালা গাথা আছে

আমার চিত্ত মাঝে ।

কবে নীরব হান্তমুখে

আসবে বরের সাজে !

সে দিন আমার হবে না ঘর,

কেই বা আপন কেই বা অপব,

বিজ্ঞান রাতে পতির সাথে

মিলবে পতিব্রতা ।

মরণ আমার মরণ, তুমি

কণ্ড আমারে কথা ।

- গীতাঞ্জলি ।

“আমাদের ওই ক্ষাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—
নৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগ্লামী অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহাব
পরিচয় পাই মাত্র । অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ
উজ্জল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্বচনীয় মূল্যবান্ করিতেছে । যখন পরিচয়
পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে
জাগিয়া উঠে ।.....জীবনে এই দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের
আবির্ভাব !”—রবীন্দ্রনাথ, আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ, ২৯৬ পৃষ্ঠা ।

ভক্ত কবি কবীর মৃত্যুকে জীবনের সহিত জীবন-স্বামীর বিবাহ-মিলন বলিয়া
বর্ণনা করিয়াছেন—হে গারিকারা, তোমরা বধু এবং বিবাহের মঙ্গলচাচা গান
করো, আমার গৃহে আমার স্বামী রাজা আনন্দময় আসিয়াছেন । কবীর বলেন,
আমি এক অবিদ্যা পুরুষের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছি ।

গাউ গাউরী চলহনী মঙ্গলচাচা ।

মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভভারা ॥

কঠে কবীর, হম্ বাহ চলে হৈ

পুরুষ এক অবিদ্যাশী ।

তুলনীস—

There^s is no Death ! What seems so is transition ;
The life of mortal breath
Is but a suburb of the life clysian,
Whose portal we call death.

—Longfellow.

We should be colonists, not home dwellers in the world, perpetually dreaming of the voyage home

—Emerson, Essay on Over-Soul

It is at the Life's door that Death knocks—Maeterlinck, *The Princess Maleine*, মেটরলিন্কের *Intruder* এবং *Loss Avenugles* ও ইহার সতিত তুলনীয়।

The fear of Death is universal among mankind, and depends not only on the pain that often accompanies dissolution, but also on the consequences affecting the survivors, i.e., the cessation of all old familiar relations between them and the decomposition of the body

The ordinary process of Death is the separation of the soul from the body as in dreams, the only difference being that in the latter case the separation is for the time being, but in the former it is permanent and final

The belief in continued life has undergone various stages of evolution which glide imperceptibly one into another

—*Immortal Man* by C E Vulliamy

হিমাদ্রি

এই কবিতাটি ‘হিমালয়’ নামে ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ পুস্তকে ২৪ নম্বর হইতে ২৯ নম্বর পর্যন্ত হিমালয়-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি একত্র পঠিতব্য। শিলালিপি, তপোমূর্তি প্রভৃতি কবিতাও বঙ্গদর্শনে ঐ মাসে প্রকাশিত হয়।

‘সঙ্গীতের প্রধানতঃ দুইটি অংশ আছে—একটি অংশ তাহার স্বর বা তান, এবং দ্বিতীয় অংশ তাহার বাণী বা ভাষা। গায়ক যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কোনো ভাষা থাকে না, কিন্তু তাহা কখনও উদাস্ত কখনও অমুদাস্ত এবং কখনও বা স্বরিত হয় এবং সমস্ত স্বরটি উচ্চাশ্রুততা তেজু যেন তরঙ্গিত হইয়া চলিবাছে মনে হয়। তবৎসায়িত দেহ হিমালয়ও যেন এইরূপ একটি পরিজ্ঞে সাম গীতের স্বর পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে বাণীর সন্ধানে ছুটিবাছে।

“আবার কোন গায়কের স্বর খুব উচ্চ প্রায়ে উঠিয়া আরও উঠিতে অক্ষম হইলে যখন ইটাং খাশিরা যায়, এবং তখন গায়ক কেবল হাঁ করিয়া নিশ্চলভাবে থাকে ও তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে, সেইরূপ হিমালয়েরও স্বর যেন অতি উচ্চে উঠিয়া শব্দহারা হইয়া গিয়াছে, এবং ভ্রমণে তাহার চোখ দিয়া প্রশংসা-রূপ অশ্রুধারা পড়িতেছে।

“প্রকৃত পক্ষে, এক শ্রেণীর পর্বত আছে যাহাদের উৎপত্তি ইটোয়ার্ছে পৃথিবীর অগ্ন্যুত্তাপের জন্ম। যে অগ্ন্যুত্তাপের বেগে হিমালয়ের দৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হওয়ার হিমালয় আর উর্ধ্বে বাড়িতে পারিতেছে না, এবং তাহার হৃদয় বন্ধ হওয়াতে সে সঙ্গীম পাখান হইয়া সীমানবর্তীম আকাশের তলে স্তব্ধ হইয়া আছে।

“কবি হিমালয়কে এমন এক পায়কের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন যিনি সুর সংযুক্ত করিয়া আপনার কণ্ঠের উচ্চ করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে বীণা বাজাইতেছেন, অথচ কোন বিশিষ্ট গান এই সুরে তিনি গাহিবেন তাহার ভাষা এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না।

“কবি হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সে বিশ্বব-স্তুতিত বিশ্ববাসীর নিকট কোন্ মহতী বাণী—মেসেঞ্জ—প্রচার করিতে চাহিতেছে? তাহার এই অন্তর্ভেদী বিরাট আকারের মধ্যে কোন্ সত্য ব্যক্ত হইতেছে?

“সঙ্গীতের গ্রাক্ষিক করিলে বাস্তবিক পর্বত-শৃঙ্গের তরঙ্গের স্তায়ই দেখায়।

“কবি হিমালয়কে এক প্রশান্ত আশ্র-সমাহিত ধ্যান-নিমগ্ন বৃদ্ধ তপস্বী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, যিনি যৌবনের হ্রদমনীয় উৎসাহে ও আশ্রনক্লিতে অসীম বিশ্বাসের বলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে যৌবন-মূলভ মাধবতা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শক্তির পরিসর সীমাবদ্ধ উপলব্ধি করিয়া শান্ত সমাহিত হইয়া ভগবানের নিকট আশ্র-সমর্পণ করিয়াছেন। মানুষ যতদিন পণ্ডিত আপনার শক্তির এই নির্দিষ্ট গণ্ডী বুঝিতে না পারে ততদিন পর্বত আপনার আকাঙ্ক্ষারও অন্ত পাষ না, ততদিন পণ্ডিত তাহার আকুলি বিকুলিরও শ্রেন হয় না। তাহার পরে যখন যৌবনের মত্ততা চলিয়া যায় তখন সে হানাহানি ছুটাতুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং স্বভাবতঃই সে সম্ভাবের প্রতি অনাসক্ত হইয়া পড়ে। তখন মানব-জীবনের অপূর্ণ ও সসীম উপলব্ধি করিয়া পূর্ণাৎপূর্ণ অসীমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কবি সেই জগৎ বলিয়াছেন—

তাই আজি মোব মেন শান্ত হিয়া

সীমাবহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছে ন'পিয়া।

“রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বাস্তব দৃষ্টের বর্ণনা করেন না, তিনি প্রকৃতির রহস্য ও তন্মধ্যে যে বিশ্ব চৈতন্য অন্তর্গত হইয়া আছে তাহারই বর্ণনা করেন। কোনো দৃষ্ট কবির মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, উহার মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাকেই ভাবার ও ছন্দের ভিত্তি দিয়া তিনি আকার দান করিতে চেষ্টা করেন। সেই ভাষা ও ছন্দের মধ্যে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের আহ্বান আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গা সঙ্গীত ও সঙ্গীত হইয়া আমাদের কাছে প্রেমপাশে আবদ্ধ করে। হিমালয়ের গাভী মহত্ত্ব ও বিরাটের ছবি কবি তাহার ভাবানুরূপ ভাবার ও গভীর ছন্দের সাহায্যে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন।”

এই কবিতার সহিত শিলালিপি, তপোমুষ্টি প্রভৃতি কবিতা মিলাইয়া একত্র পাঠ করিলে ইহাদের সকলেরই অর্থ সুস্পষ্ট হইবে।

এই কবিতায় প্রভাতের দ্বার বলিতে কবি পূর্বদিক বুঝাইয়াছেন।

তুলনীয়—

কুলকুল-সখী উষা যখন খুসিবে

পূর্বোপার হৈমবার পলকর দিয়া।

—মাইকেল মধুসূদন, মেঘনাদবধ, দ্বিতীয় সর্গ।

যবে ফুলফুল সখী হৈমবতী উষা
মুক্তাময় ফুল পরান ফুলকুশে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ষু রথ, খুলি' মুকমল করে
পূর্বাশায় হৈমস্নায় ।

—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ।

প্রচ্ছন্ন

এই কবিতাটি মোহিত সংস্কার কাব্যগ্রন্থাবলীর “কল্পনা” বিভাগেব প্রবেশক ছিল উৎসর্গ পুস্তকের ৩ নম্বর কবিতা ।

কবি বলিতেছেন যে—“মোর কিছু ধন আছে সংসাবে, বাকি সব ধন স্বপনে ।” অর্থাৎ কবির জীবন-মনের যত কিছু অভিজ্ঞতা তাহার কতক অংশ বাস্তব এবং কতক অংশ কাল্পনিক, কবি সামান্য অভিজ্ঞতাকেও নিজের কল্পনা ও মনন-শক্তির দ্বারা পূর্ণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ব্যাপারও প্রকাশ কবিত্তে পারেন । সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকেই কবি আশ্রয় কবিত্তেছেন ।

ছল

“তোমাবে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলাব ছল ?” এই কবিতাকে প্রেমিক-প্রেমিকার পবস্পর্শেব কাছেও সংগোপন-প্রয়াসী প্রেমের লীলা বলা যাইতে পারে । অথবা কবির যে কবিত্ব-শক্তি, কবির জীবনদেবতা বা অন্তর্দীক্ষা, যিনি কবিকে দিয়া কথা বলাইতেছেন, তিনি কবিকে ধরা দিয়াও ধরা দেন না, কবির মনের মতো যে ভাব উদ্বেক করিয়া দেন ঠিক সেই রকম তাহার প্রকাশ হয় না, তিনি ধরা দিতে আসিয়াও ধরা দেন না, এবং কবিকে দিয়া যাহা প্রকাশ করান তাহাতে বিশ্ববাসী পবিতৃপ্ত হইয়া বাহবা দিলেও কবির নিজের অন্তর পবিতৃপ্ত হয় না ।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্কার কাব্যগ্রন্থাবলীর লীলা-নামক বিভাগেব প্রবেশক । উৎসর্গ-পুস্তকের ৪ নম্বর কবিতা ।

চেনা

“আপনারে তুমি করিবে গোপন কি করি’?” এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর কৌতুক-নামক বিভাগের প্রবেশক ছিল। উৎসর্গ-পুস্তকের ৫ নম্বর কবিতা। ইহার সহিত ছল কবিতাটির বিশেষ ভাব-সমতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে কতক রহস্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেন; কখনো তিনি আনন্দ দেন, আবার কখনো দুঃখও দেন; কিন্তু সেই দুঃখ যে বঙ্গ-রহস্তেরই কপাস্তর তাহা কবি বুঝিয়া মনে সাস্থনা অনুভব করেন।

প্রসাদ

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর “কণিকা”-বিভাগে প্রবেশক, এবং উৎসর্গের ১২ নম্বর। সঞ্চয়িতায় কবি ইহার নাম রাখিয়াছেন “প্রসাদ”।

অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই প্রকাশ পান। তিনি যে বিরাট হইয়াও ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজেকে ধরা দেন ইহা তাঁহার পরম প্রসাদ, বিশেষ অল্পগ্রহ। কবির ভাব অসীম ব্যঞ্জনাভরা, কিন্তু ভাষা সীমাবদ্ধ; সেই সীমাবদ্ধ ভাষার মধ্যে ভাব যে ধরা দিয়া আত্মপ্রকাশ করে ইহা ভাবময়ের লীলা। কণিকার কবিতাগুলি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার অর্থ গভীর, যেন শিশিবকণার বৃকে সূর্যবিশ্বের প্রতিফলন। সূর্য অমিততেজ, তাহাকে ধারণক্ষম একমাত্র আকাশ; কিন্তু সেই সূর্য অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর মধ্যে নিজেকে ধরা দেয়।

নব বেশ

ইহা উৎসর্গ-পুস্তকের ৪২ নম্বর কবিতা। ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর সংকলন নামক বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি প্রথম জীবনে রসের চর্চা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জীবনদেবতার হাতে ছিল বাঁশী, তার সুর ছিল মধুর ঘুম পাড়ানো, সেই সুরে জন্মের রক্ত-কমলের স্নায় হুসিয়া হুসিয়া উঠিত। তখন কবির জীবনের বসন্তকাল। কিন্তু শেষ জীবনে কবি দেখিতেন যে তাঁহার সেই রসের পালা শেষ করিয়া ভরা

ভাস্করের ঘনবর্ষা নামিয়া আসিয়াছে, ছদ্দিন বাদল ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং জীবনদেবতা এখন রুদ্ধবেশে আসিয়া কবিকে ঢুকুর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান কবিত্তেছেন, তাঁহার বাঁশী এখন বিবাদে পরিণত হইয়াছে।

এই কবিতাটির সহিত “এবার ফিবাও মোবে” ও “আবির্ভাব” কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে।

জন্ম ও মরণ

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্কার কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘মরণ’-বিভাগে ‘প্রবাসের প্রেম’ নামে ছাপা হইয়াছিল। ইহা উৎসর্গ-পুস্তকের ৪৯ নম্বর ও শেষ কবিতা। ইহা দুইটি সনেটের একত্র গ্রন্থনে গঠিত।

কবি জন্ম-জন্মান্তরবাদী। তিনি যেমন অনেক কবিতায় আগে বলিয়া আসিয়াছেন যে তিনি কবি-রূপে মানব-রূপে প্রাণি-রূপে জন্ম হইতে জন্মান্তরে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন—এই যাত্রা অনাদি ও অনন্ত। তিনি রূপ-রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে লোক-লোকান্তরে বিচরণ করিয়া ফিবিতেছেন। তিনি এই জ্ঞান নিজেই প্রবাসী বলিতেছেন, এই যে মর্ত্য-বাস ইহা তো সামান্য কয়েক বৎসরের জ্ঞান পাছশালায় বাস, তাহার পরে মেয়াদ ফুবাইলে পরলোকে যাত্রা করিতে হইবে। যে লোকে যখনই তিনি থাকেন তখনই তিনি বিশ্বের প্রেমে বাঁধা পড়েন এবং যিনি পূর্ণাংগ পূর্ণ তাঁহার প্রণয়ী হইয়া কবিও ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া উঠিবেন, এবং তাঁহার সঙ্গীতও পূর্ণতাব সুরে সমৃদ্ধতর হইতে হইতে লোক লোকান্তরে ধ্বনিত হইয়া চলিবে।

১৩ নম্বর

“আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে

তোমারেই ভালোবেসেছি।”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্কার কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘জীবনদেবতা’-বিভাগের প্রবেশক। এই কবিতাটির সহিত অনন্ত প্রেম কবিতার বিশেষ ভাব-সাদৃশ্য

আছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। এই কবিতা-সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলিয়াছেন—

“যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অমূল্য ও প্রতিভুল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে বচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাছে আমি “জীবনদেবতা” নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমাব এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে একাদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহাতে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্তৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন,—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অন্তিমুখাবাব বৃহৎস্রুতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাব অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্ত এই জগতের তকলত। পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেই জন্ত এত বড় বহুতমস্ব প্রকাণ্ড জগৎকে অনাদ্যীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।’—বঙ্গভাষাব লেখক।

৪০ নম্বর

“আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়,
আধারেতে চ’লে যায় বাহিবে।”

মহাকবি শেকস্পিয়ার বলিয়াছেন যে—

All the world's a stage
And all the men and women merely players
They have their exits and entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages

—As You Like It, Act II, Scene vii
Merchant of Venice, Act, I, Scene 1

আমাদের মহাকবি রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন যে এই বিশ্বসংসারে মানবেরা সব নট ও নটী মাত্র, বিশ্বসংসার তাহাদের রঙ্গমঞ্চ, তাহারা বিধাতার বচিত বিশ্বনাট্যের অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। কবি নিজেও একজন অভিনেতা। যে তত্ত্বের হইয়া অভিনয় করে সে অনেক সময়ে ভুলিয়া যায় যে সে অভিনয় করিতেছে, অভিনীত বিষয় তাহার কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাহারা দর্শক মাত্র, যাহারা নির্লিপ্তভাবে কেবল অভিনয় দেখিতেছে তাহারা সমস্ত অভিনয়কে অভিনয় বলিয়া বুঝিতে পারে, এবং অভিনয়ের বিষয়ের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্যও দৃষ্টিগত করিতে পারে। তাই কবি নিজেকে সংসারে

নিঃশব্দ হইয়া সংসার-লালা দেখিয়া বিশ্ববিধানের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে বলিতেছেন।

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর নাট্য-বিভাগেব প্রবেশক ছিল।

৪৬ নম্বর

“সান্ত হয়েছ রণ।”

ইহা মোহিত-সংস্করণেব কাব্যগ্রন্থাবলীতে নারী-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি বলিতেছেন যে পুরুষ কেবল জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া অনেক উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই সব উপকরণকে যথাবিহিত করিয়া সুন্দর শোভন করিতে পারে নারী, এবং পুরুষের রণক্ষত নারীই নিজের করুণা-ধারায় ঘোত কবিতা পুরুষের রণকান্তি অপনোদন কবিতা করে। নারীই পুরুষের গহিনী, সেবিকা, কল্যাণদায়িনী, প্রণয়িনী। নারী পবিত্র নির্মল মঙ্গলময়ী। জীবন-নাট্যের শেষে পুরুষের যখন সংসার বন্ধন হইতে বিদায় লইবার সময় আসে তখন নারীই তাহাকে চোখেব জলে অভিষিক্ত কবিতা বিদায় দেয়, এবং মরণাস্থকালেও সেই নারীই পুণ্যের স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া বিবাহ-বেশে অগ্রদূত সৈন্য কবিতা পুরুষের তপন কবে।

১৫ নম্বর

“আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই

কিমেব বাতাস লেগেছে,—

জগৎ-ঘণী জেগেছে।”

মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘প্রেম’ নামক বিভাগের প্রবেশক কবিতা।

কবি বলিতেছেন যে জগৎ গতিশীল, সমস্ত সৃষ্টি চক্রাবর্তে কুণ্ডলী আকারে ঘূর্ণিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু চক্রের নেমি ঘুরে, তাহার নাতি ও ধুরাব মধ্যবিন্দু স্থির হইয়া থাকে, সেই মধ্য বিন্দু হইতেছে জগৎ-লক্ষ্মী আসন-শতদল—যিনি সকল সৃষ্টির সৌন্দর্যরূপিনী, যিনি উর্দ্ধলী, তিনি অটপল

অপরিবর্তনীয়, তাঁহার প্রকাশ প্রেমে। জগতের সব কিছু অনিত্য, কেবল প্রেম নিত্য পদার্থ, তাহারই দ্বারা অসীমের আভাস মনে সঞ্চারিত হয়। প্রেমে প্রশান্তি, প্রেমে কল্যাণ।

প্রেম যে অবিদ্যার তাহা কবি তাঁহার সাজাহান কবিতায় বলিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

২০ নম্বর

“দ্বারা তোমার ভিড ক’রে যারা আছে।”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘কাব্যকথা’ বিভাগের প্রবেশক।

এই কবিতায় কবি তাঁহার আরাধ্যা জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতিব কাছে কবি নিজেকে সমর্পণ করিয়া কেবল আনন্দের রসের সৌন্দর্যের সাধনা করিতে চাহেন। এই কবিতার সহিত চিত্রা-পুস্তকের ‘আবেদন’ কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। আবেদন কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮ নম্বর

“তোমার বীণায় কত তার আছে।”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণের গ্রন্থাবলীতে ‘প্রকৃতগাথা’-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য মাধুর্য বৈচিত্র্য ইহিতে নিজের কাব্যপ্রেরণা লাভ করেন, এবং প্রকৃতির সুরের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতি যেমন এক দিকে কবিকে অনুপ্রেরণা দান করেন, অপর দিকে কবি আবার প্রকৃতিকে নিজের বর্ণনার দ্বারা সুস্বরভর ও সুস্পষ্টতর করিয়া পরিব্যক্ত করেন। কবি প্রকৃতিকে বলিতেছেন যে, তোমার বীণার সঙ্গে আমার মনোবীণার সুর মিলাইয়া গইব, এবং আমার হৃদয়-বীণ জাগিয়া

আমি তোমার যে আরতি করিব সেই আলোকের দীপ্তি তোমার মুখে পড়িয়া
তোমার মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন করিয়া তুলিবে।

৪৪ নম্বর

“পথের পথিক করেছ আমার,
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।”

মোহিত সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘হতভাগ্য’-বিভাগের প্রবেশক কাব্যতা।

জগতে মানুষ পদে পদে নিরাশ হয়, আঘাত পায়, অপমান সহ্য করিতে
বাধ্য হয়, প্রিয়বিরোগে ব্যথিত হয়, কত বিপদে পড়ে। কবি বলিতেছেন যে,
যত বড়ই বিপদ ও লাঞ্ছনা হোক না কেন, তাহার কাছে নত হইয়া পরাজয়
স্বীকার করা মনুষ্যত্বের অপমান। অতএব ‘হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে কর্ব মোরা
পরিহাস।’ মাতৃষকে বিধাতার বিধান মঙ্গলময় বলিয়া মানিয়া লইয়া
স্ব-শক্তিতে সকল আঘাত সহ্য করিয়া অজ্ঞের ভাবে জীবনযাত্রায় অগ্রসর
হইতে হইবে।

২ নম্বর

“কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া”

মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম বিভাগ হইতেছে ‘যাত্রা’। এই
কবিতাটি সেই ‘যাত্রা’-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

কবি তাঁহার কাব্যজীবনে যাত্রা করিতেছেন। এই যাত্রার আরম্ভ অত্যন্ত
শুভ-সূচনা করিতেছে, কিন্তু চিরকাল যদি ইহা শুভকর নাও হয় তথাপি তিনি
সমস্ত নিরাশা ও অনাদর অগ্রাহ করিয়া কেবলমাত্র জীবনদেবতার নির্দেশ-
অনুসারে চলিবেন, এবং নিজের জীবনের বিফলতার অস্ত্র কাহারও কাছে
কোনো অভিযোগ করিবেন না।

“অঁধার আসিতে রজনীর দীপ

জ্বলেছিন্নু বতগুলি—”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর নিম্নমণ-বিভাগের প্রবেশক, কিন্তু ইহা উৎসর্গে স্থান পায় নাই কেন জানি না।

কবি অন্ধকার বঙ্গনীতে কৃত্রিম আলোক আলিয়া ক্ষুদ্র গৃহ উজ্জ্বল কবিতে প্রয়াস কবিয়াছিলেন, কিন্তু দিবসের আগমনে তিনি দেখিলেন যে বাহিরে আলোকের বন্যাপ্রবাহ বহিয়া চলিতেছে। তাই তিনি রজনীর দীপ নিভাইয়া বাহিরে বৃহৎ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে আসিতে চাহিতেছেন, নিজের সঙ্গীর্ণ মনঃক্ষেত্রে তিনি যে ছিন্নতন্ত্রী বীণা বাজাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা ফেলিয়া সমস্ত বিশ্বচরাচরের সুরে সুর মিলাইতে চাহিতেছেন।

৬ নম্বর

“তোমায় চিনি ব’লে আমি করেছি গরব

লোকের মাঝে।”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘সোনার তবী’-বিভাগের প্রবেশক ছিল।

ভুবন-সুন্দর অখিল-রসায়ত-মূর্তি যিনি তাঁহাকে কবি সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন—আমি আমার রচনার মধ্য দিয়া তোমাকে লোক-সমাজে প্রকাশ করিবার অনেক প্রয়াস কবিয়াছি। সেই জন্ত লোকে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছ সে কে? কিন্তু তুমি তো অনির্বচনীয়, তোমার পরিচয় আমি কেমন কবিয়া দিব? আমার অক্ষমতা দেখিয়া লোকে আমাকে দোষী কবে, আর তুমি তাহা দেখিয়া হাস্ত করো যে আমার দোষ কি, আমি কেমন করিয়া ভুবন-সুন্দরকে অখিল-রসায়ত-মূর্তিকে লোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব।

আমি তোমাকে প্রকাশ কবিবার জন্ত যত ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, তাহার দ্বারা তোমার কতটুকু পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি, তোমার অসীম অনন্ত রহস্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমি তো পারি নাই। কাজেই আমার রচনার মধ্যে একটি অস্পষ্ট আভাস মাত্র দিতে পারিয়াছি। লোকে তাহার স্পষ্ট অর্থ ধরিতে না পারিয়া আমাকে উপহাস করে। কিন্তু তুমি তো আমার প্রয়াসের মূল্য জানো, তাই তুমি লোকের দৃশ্য দেখিয়া হাস্ত করো।

তোমাকে চিনি বলাও যেমন যায় না, তেমনি তোমাকে চিনি নাই বলাও যায় না। তোমাকে তো আমি ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বশোভার মধ্যে দেখিয়াছি, এক তোমার সেই অপরূপ আবির্ভাবকে কথার বন্ধনে ও গানের সুরে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কত নব নব সুন্দর সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়া তোমাকে অলঙ্কারের বন্ধনে ধরিতে চাহিয়াছি। কিন্তু সংশয় কিছুতে ঘুচে না যে তুমি আমাকে ধরা দিলে কি? কিন্তু যে দূর্যাপনা, যে অ-ধরা, তাহাকে ধরিব কেমন করিয়া, অতএব—

কাজ নাই, তুমি যা খুশা তা করো,
যে নাচ দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি, প্রাণ উঠে যেন
পূবকি'।

১৯ নম্বর

‘হে বাজন্, তুমি আমারে

বাঁশী বাজাবাব দিয়েছ যে ভার

তোমার সিংহদ্বারে—”

এই কবিতাটি মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর ‘লোকালয়’-বিভাগেব প্রবেশক।

বিশ্বেশ্বর কবিকে তাঁহার বিশ্বভবনের সিংহদ্বারে বাঁশী বাজাবাব ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন। কবি সমস্ত মানব-সমাজের মুখপাত্র হইয়া সকলের মনের কথা প্রকাশ করিবার ভাব পাইয়াছেন—বিশ্বভবনেশ্বর তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—

এই সব মত বান মক যুগে

‘দেও হবে ভাষা।

ক’বও সেই আদেশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

লাজুক রুদ্র যে কথাটি নাচ কবে

সুরের ভিতবে লুকাইয়া কাঁহ তাহারে।

যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা সংসার-হাটে কেবল বোকা বহিয়া চলে, যাহারা বিশ্বশোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মতন মন ও অবসর পায় নাই, তাহারা কবির বাঁশীর সুর শুনিয়া বোকা ফেলিয়া হাটের কথা ভুলিয়া সেই গান শুনিতে

বলে, এবং তাহাদের স্তম্ভন চেষ্টনা হয়—তাহারা ভাবে আমাদের জগতই তো ফুল ফুটিতেছে, পাখী গাহিতেছে, জগতে আনন্দ-মেলা বসিয়াছে।

কবি এই আনন্দ-বার্তা বহন করিয়া লোকালয়ের দ্বারে দ্বারে বিরাহবিহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে চাহেন, তাহারা নিজেরা নিজের মনোভাব পরিবাস্ত করিতে পারে না, তাহাদের সকলের হইয়া কবি সুখ দুঃখ আনন্দ সৌন্দর্যবোধ প্রণয়কথা প্রকাশ করিয়া চলিবেন। কবি হইতেছেন সত্য শিব সুন্দরের পরগণ্ডর—আনন্দ-দূত।

চিঠি

‘না জানি কারে দেখিয়াছি,

দেখেছি কার মুখ।

প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি !’

এই কবিতাটি ‘চিঠি’-নামে ১৩১০ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে ১১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি কবির অতুষ্ণ কবিতার অন্ততম। ইহা উৎসর্গ-পুস্তকের ১১ নম্বর কবিতা।

ইহা মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘রূপক’-বিভাগে স্থান পাইয়া ছিল। কিন্তু ইহাকে রূপক মনে না করিয়া সাধারণ নর-নারীর প্রণয়ের দিক হইতেও দেখা যাইতে পারে। ‘আবেদন’ কবিতার মতন ইহাতে যে মনুষ্য-হৃদয়ের রস-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মহামূল্য।

মনে করা যাক—একটি নিরক্ষর মুন্না রমণী বহু দিনের প্রতীক্ষার পরে একদিন সকালে উঠিয়া তাহার প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছে। সে তো পড়িতে জানে না, কোন্ পণ্ডিতের কাছে সেই চিঠি পড়াইতে যাইবে? ইহাতে তো তাহার একান্ত আপনার হৃদয়পুরের গোপন প্রণয়-সম্ভাষণ অপরের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর সে তাহার প্রিয়তমের কথা যে-রকম ভাবে বুঝিতে পারিবে, সামান্য কোনো কথার মধ্যে যে অনন্ত মাধুরী সে ধরিতে পারিবে, সেই পণ্ডিত তাহা কেমন করিয়া পারিবে, তাহার তো প্রেমের দৃষ্টি নাই। প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছি, এই বোধের আনন্দে তো জগৎ মধুময় হইয়া গিয়াছে; এবং এই না-বোঝা শিপি সে মাথার কোলে বুকে লইয়া যে

অনির্বচনীয় অনন্তভূতপূর্ব আনন্দ বোধ করিবে, তাহারই আভাস সে বিশ্বচরাচরে প্রতিকলিত দেখিয়া ভরপুর হইয়া থাকিবে। সে নিজেব মনের করুনা ও মাধুরী মিলাইয়া এই লিপিতে যে ভাববস সঞ্চাব করিয়াছে, তাহা যদি সেই লিপির মধ্যে বার্তাবক না থাকে, তবে তো তাহার সুখস্বপ্ন নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব এই লিপি পড়িয়া বুঝিবার কাজ কি? আমার প্রিয়তম আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, এই লাভটুকুই আমার পরম ও চরম লাভ।

এই কবিতাকে রূপক মনে করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পাবে। বিশ্বেশ্বরের সৌন্দর্যলিপি আমাদের কাছে নিত্য-নিবন্তর আসিতেছে, আমাদের প্রত্যেকের বসন্তভূতির মধ্যে তাহাব তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। সেই সহজ অন্তর্ভবকে আমরা যদি গুরু পূর্বোহিত মোলা পরগম্বব ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিয়া এবং শাস্ত্রের নিদেশ-অনুসারে বুঝিতে চাই, তবে তো তাহা পরেব মুখে বসান্বাদ করা হইল, তাহাতে আমার নিজেব পবিতৃপ্তি কোথায়? অতএব শুক মোল্লা, কোরাণ পুরাণ সব মাথায় থাকুন, আমাদের জ্ঞানস্ববেব সহিত কেবল আমার পেমেব যোগই যথেষ্ট।

এই রূপক ব্যাখ্যা ভালো কবিতা বুঝিতে হইলে ‘পূরবী’ কাব্যেব “লিপি” নামক কবিতা এবং Robert Browning এব Feels and Scruples নামক কবিতা দ্রষ্টব্য।

এবং—

বড় মনে তব আশা বলচী
পুশাক সুনচলী তেবী
গমক ভব ভব স্বাস লগায়া,
চত জগায়া মেরী।
এপমে হকো কিয়া উল্লাসা,
ক। পাড দূব সমায়া।
গায়া গক্যা সুর মগববী
মরণ সা বৈন আয়া।
কাংগজ কাল হরক উজালা
ক। ভারী খত পায়া।
ইল্লী বৈনক কৌ রে বলচী,
তুহি রাণ তুলায়া ॥
খলুক খলুক মেরে খত ত কলী,
মখ কব হম কবমান।

—জানকাস বইলী।

“সকালবেলা যখন আসিলে হে দূত, পোশাক সোনালি তোমার। একটুকু বধন গন্ধের নিঃশ্বাস লাগাইলে, চিত্ত জাগাইয়া তুলিলে আমার। রবি রঞ্জিতে আমাকে করিল উদাস, কৌ পীড়া দূর অস্তরে প্রবেশ করিল। গাহিল গেরুয়া সুর—বৈরাগ্যের সুর—পশ্চিম দিক্, মরণেব জায় রজনী আসিল। কাগজ কালো, হরফ উজ্জল, কী স্মরণ লিপি পাইলাম। এত জাঁকজমক কেন হে দূত, তুমিই যে স্মৃতিবিভ্রম ঘটাইলে।” দূত উত্তর দিতেছেন—“ভারী উজ্জল সন্ধ্যা, বিরাট উৎসব, তুমিই একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি। বিশ্বচরাচরে এই লিপি প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, গর্বিত আমি এই বার্তাবহ বলিয়া।”

খেয়া

পুস্তক-প্রকাশের তারিখ পুস্তকের পরিচয়পত্রে নাই। কবি যে উৎসর্গ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তারিখ আছে ১৮ই আষাঢ় ১৩১৩। ইহার অধিকাংশ কবিতাই শান্তিনিকেতনে কবির যে বাড়ী আমাদের কাছে 'টং' নামে পরিচিত ছিল ও এখন যাহার নাম হইয়াছে 'দেহলী' সেই ছোট বাড়ীতে বসিয়া লেখা। কবিতাগুলি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত।

এই কাব্যখানির একটি কবিতা 'কোকিল' ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই ভগবৎ-অনুভূতি অথবা ভগবৎ-ভক্তির কথা। যে ভগবৎ-অনুভূতি মৈবেশ্বরের কবিতার মধ্যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিল, তাহা এই খেয়ার কবিতায় হৃদয়ের ক্ষেত্রে এবং ভক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহাব পরিণতি পবে দেখিতে পাওয়া যায় গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির কবিতায় ও গানে।

এই পুস্তকের সমালোচনা ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে সমালোচক এই বই-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"সমালোচ্য কবিতাগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হইবে না, কবি তাহা নিজেই বুঝিয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন বলিবার উৎসর্গপত্রে এই কাব্যকে লজ্জাবতী নতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

যত্ন ভরে খুঁজে খুঁজে তোমার নিতে হবে বুকে,

ভেঙে দিতে হবে যে তার নীবর ব্যাকুলতা।

.....টিক 'পারের ঘাটের কিনারা' না আস্থন, কিন্তু 'যেরও নহে, পারেরও নহে, যে জন আছে মাঝখানে' অথবা 'দিনের আলো যাব ফুরালো, সন্ধ্যার আলো জ্বলুন না', তাহার। এই কাব্যের দশ বেণী অন্তত কবিতাে পারিবেন। যাহাদের তবী অনেকের তবী মস্ত্রে একত্র ছিল, এক বন্ধরে অনেক কাল ছিল, তাহার। যখন দেখিবে যে এখন কত তরী অন্ত্যচলে তাঁরের তলে, ঘন গাছের কোল ধৌবে, ছায়ায় ঘন ছায়ায় মতো ঘায়, তাহাদের প্রাণে একটু বেশী রকম বাধিবে। যাহাদের 'শেষ হ'য়ে গেছে জগন্মরা আজ', তাহারাই 'ঘাটের পদ' তাকাইয়া কাধিবে।"

এই কাব্যের মধ্যে যে একটি বিশেষ রস আছে তাহা অতি মধুর, হৃদয়-গ্রাহী। কবির ভক্তির মধ্যে কোনো উজ্জ্বল বা আতিশয়া নাই, অথচ অনুভূতি আছে গভীর। সেই জন্য এই কবিতাগুলি মনকে মুগ্ধ করে।

আধ্যাত্মিক রসবোধের প্রকাশ কবির যে যে কাব্যে হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যে কবিত্ব-হিসাবে ‘খেয়া’ কাব্য শ্রেষ্ঠ। ইহার লিরিক রূপটি অল্প সমস্ত কাব্য হইতে ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। ‘গীতাঞ্জলি’ ‘গীতিমালা’ ‘গীতালি’ ‘গান’ ‘নৈবেদ্য’ তত্ত্ব, কিন্তু ‘খেয়া’ কবিতা এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা। ইহার মধ্যেই কবির গূঢ়বাদ বা মিষ্টিসিদ্ধম্ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। এই জন্ত অনেকের মতে—

“খেয়া এক অপূর্ব কাব্য। নৈবেদ্যে যাচা তত্ত্ব ও ভাবরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই ভগবৎপ্রেম ও ভগবানের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা খেয়ার বিচিত্র রসমাধুর্যে পরিণত হইয়াছে। ক্ষণিকায় দেখেছি কবির চিত্তে পরমস্বন্দবেব প্রতি অল্পরাগ জেগে উঠেছে। নৈবেদ্যে দেখেছি, তিনি যে তাঁবই এ প্রত্যয় কবির ভিতবে দৃঢ় হ’য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ভাবে ববীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি খেয়াতে। বৈষ্ণব কবির রাধাব প্রতীকার চাইতে এক ভিস্ময়ে নিবিড়তর এই খেয়ার প্রতীক্ষা।” —ববীন্দ্রকাব্যপাঠ।

ববীন্দ্রনাথ কর্মকে অতিক্রম করিয়া জীবনকে অনন্তের আনন্দময় বসনমুদ্রে বিলীন করিয়া দিবার জন্ত এই খেয়ার ঘাটে উপনীত হইয়াছেন। কবি ‘সব পেরেছিব দেশে’ তাঁহার কুটার ঝাঁধিতে চলিয়াছেন। নৈবেদ্যে কবির নিকটে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ প্রকাশিত—সেখানে ভগবান কবির প্রভু দেবতা স্বামী। খেয়ার ভগবান কবির কাছে বর, ভিখারী। এখন প্রকৃতি বিশ্বেষবের লীলার ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমের ক্ষেত্র।

ববীন্দ্রনাথ এই কাব্যধ্যানি তাঁহার বহু জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন। জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার গায়ে তড়িৎ স্পর্শ করাইয়া প্রমাণ করেন যে আপাতপ্রতীকমান জড়ধর্মী উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণচৈতন্য আছে। তাই কবি নিজের কবিতা-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

বহু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।

বাস্তবিক প্রত্যেক কবির কাব্যই লজ্জাবতী লতাব মতন, বিখ্যাত্তবের ভিতর দিয়া কৃষি বাহা চিত্তে আহরণ করেন তাহাই সেই লতার পত্রে পুষ্পে রঙে গন্ধে রসে ঐচ্ছিক্যে পরিণত হয়। যিনি পাঠক তিনি যদি দরদ দিয়া উহার মর্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করেন তবেই উহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। তাই কবি বহু-পাঠককে বলিতেছেন—

বন্ধ, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ,
হয়ব দিয়ে লাও,—
করণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম পানে চাও।

তুমি আনো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,—
সত্য সেথা কিছু আছে
নিষ যোথা নয়।

খেয়ার কবিতাগুলিতে গৃঢ়বাদ থাকাতো অনেকগুলি কবিতা রূপক হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ খেয়া

এই কবিতাটি ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে ১৪২ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব—

কবি ভগবানের চরণে তাঁহার আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন—আমি এতদিন সংসারে যে-সব কাজের নেশায় মত্ত ছিলাম, আমার সে নেশা কাটিয়া গিয়াছে। হে ভগবান, আজ আমি তোমার চরণে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু তোমাকে পাইতে হইলে আমাকে এই বাসনাসঙ্কল জীবনের পরপাবে বাইতে হইবে। কিন্তু হায়, আমি তো সে পথ চিনি না। ইহার আগে যে-সব মনীষী পরলোকের—বাসনার পরপারের—পথে অগ্রসব হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ যদি দয়া করিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে হয়তো আমি যাইতে পারি। কিন্তু তোমার দয়া ভিন্ন সেই উপায়ও পাওয়া হুড়ক। সংসারের আশা উদ্ভব সব আমার জুরাইয়া গিয়াছে; এখন সংসার আমার কাছে একটা বিরটি অন্ধকার কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে; আমি আর এই অন্ধকারে থাকিতে চাই না। আমার লইয়া চলো হে প্রভু, আমার চির-আলোকের রাজ্যে,— প্রভু, লইয়া চলো আমার হাত ধরিয়া।

প্রথম কলি

ঘুমের দেশ পরলোক। মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার মনে হিংসা ঘেষ প্রীতি অহুবাগ বাসনা বৈরাগ্য প্রভৃতি কোনো চিন্তাই থাকে না, সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা, সফলতার আনন্দ, বিফলতার দুঃখ প্রভৃতি কোনো উদ্বেগ থাকে না, একটা শান্ত স্থির নির্বিকার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, কবির কল্পিত পরলোকও সেইরূপ—সেখানে কোনো চিন্তা নাই, শোক নাই, আনন্দ নাই, উদ্বেগ নাই, আছে কেবল অনাবিল শান্তি ও বিপুল বিবতি।

এখানে কবি তাঁহার হৃদয়ের পরলোক-বিষয়ক চিন্তাকে প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমরা যখন মধুর কণ্ঠেব মধুরভাবপূর্ণ গান শুনি, তখন আমরা আত্মহারা হইয়া নিজের নিজের কর্তব্যের কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। কবির মনে পর্বলোকের চিন্তা জাগিয়াছে, সেই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহলোকেব কাজ তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না। তাই তিনি বলিতেছেন—আজ পরলোকের চিন্তা আমাকে আমার আরক যাবতীয় সাংসারিক কাজ হইতে বিবত করিতেছে।

দিনেব শেষে-কাজ-ভাঙানো গান—আমার জীবনের গণনা-কথা দিন কুরাইয়া আসিয়াছে। আজ কর্ম ব্যস্ত জগতেব কোলাহল ভেদ করিয়া শান্ত স্থির এক সঙ্গীতের ধাবা পরলোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে এবং আমার শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতেছে। কী প্রাণম্পর্শী কী মধুর সেই সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত শুনিয়া আমি সকল কাজ—বাহাতে এতদিন লিপ্ত ছিলাম সেই সব কাজ—ভুলিয়া গিয়াছি।

দ্বিতীয় কলি

আমি দেখিতেছি সংসারের কর্তব্য যথাযথ সমাপন করিয়া জীবন-সারাজে দুই-একজন করিয়া অনেক মহাপুরুষ পরলোকের পথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের গতি কী দ্রুত, কেমন বাণীবীন। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে হয়তো অনেকেই আমার স্বদেশবাসী, এমন কি আমার আত্মীয়, আমার স্বজন, এবং আমারই সমানধর্মী আছেন। কিন্তু আমি তো দূর হইতে তাঁহাদের চিনিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একরূপ সহজে স্বচ্ছন্দে অবাধ গতিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহাও তো আমার চিন্তায় স্থলভাবে প্রতিভাত হইতেছে না। এসো হে ভগবান, আমার জীবনের শেষ কণ্ঠে তুমি আমাকে তোমার কল্পনার রাজ্যে লইয়া চলো।

তৃতীয় কলি

যে বাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। আমি পথের মাঝে পড়িয়া আছি। আমাকে কে আশ্রয় দিবে? আমি আমার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বুঝা নষ্ট করিয়াছি। এখন তাহার জন্ত দুঃখ করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে—নিজের দোষেই যাহা হারাইয়াছি তাহার জন্ত কাহার কাছে নালিশ করিব? আমার আশা উত্তম সব ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু হায়, শান্তি তো পাইলাম না। আজ তাই নিরুপায় হইয়া পথে বসিয়া আছি। হে ভগবান্, আমাকে দয়া করিয়া তুমিই লইয়া চলো।

যাহাদের প্রাণে উত্তম, দেহে শক্তি এবং হৃদয়ে আশা আছে, তাহারা আনন্দে উৎসাহে সংসারের কাজে আপনাদিগকে লিপ্ত রাখিয়াছে, আর বাহারা ভগবানের করুণাব দান, তাহাদের শক্তি উত্তম প্রতিভা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের পরলোকগমনের পথ নিকটক; তাই তাহারা অবাদে জীবনের পথপায়ে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সংসারের কতব্য সাধন করিবাব মতন যাহার সাহস উত্তম ভরসা কিছুই নাই—ভগবানের করুণার দান যে অপচয় করিয়াছে—তাহার সংসারে আর স্থান কোথায়? নির্বিষয়ে পরলোকে যাইবার মতো সম্বলও তাহার কিছুই নাই। আমাব অবস্থা আজ সেই রকম হইয়াছে—আমি না পারিতেছি কেবলমাত্র সাংসারিকতা বৈষয়িকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চিন্ত মোহে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে, আর না পারিতেছি পরলোকের উপযোগী আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিতে—সংসার ও পরলোক এই উভয় লোক হইতেই আমি বঞ্চিত। হে ভগবান্, “তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার!”—আমার কেহ নাই বা কিছুই সম্বল এবং অবলম্বনও নাই।

গাছে যখন ফুল ফুটে তখন গাছের এক অপরূপ শোভা হয়। সেই শোভা দেখিয়া সকলের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু ফুলই গাছের চরম পরিণতি নয়, ফলই বৃক্ষ-জীবনের সার্থকতা। যে গাছের ফুলগুলি বুঝা ঝরিয়া পাড়িয়া না গিয়া গাছকে ফলসম্ভারে পরিপূর্ণ ও গৌরবান্বিত করে, সেই বৃক্ষের জীবন সার্থক। কবি এখানে নিজেকে ঝরা-ফুল ও ফলহীন গাছের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন—তিনি বলিতেছেন—আমাতে যে-সব ফুল ফুটিয়াছিল, অর্থাৎ ভগবান দয়া করিয়া আমাতে যে-সব সদগুণ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেগুলি বুঝা ঝরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে ভাবে সেই গুণগুলির পরিচালনা ও অনুশীলন করিলে আমার জীবন সফল ও সার্থক হইত তাহা না করিয়া বুঝা কার্যে

লেশুলিকে নষ্ট করিয়াছি। কাজেই সাফল্যের গৌরব আমার নাই। তাই আজ নিজের দোষে নিখল জীবনের জন্ত কাদিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। আমি যুঁচিব মতন নিজের পারে নিজেই কুঠারাবাত করিয়াছি।

প্রভাতে যখন সূর্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখন লোকের কর্মশক্তি বিকাশ পায়। আবার বাত্রে যখন জগৎ অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন হয় তখন সেই শক্তি ত্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। তৎসঙ্গেও লোকে রাত্রিতে আলো জালিয়া কৃত্রিম উপায়ে শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তাহাদের কর্তব্য সমাধান করে। ইহাই হইল জগতের সাধারণ নিয়ম। কবিগণ মানবেব বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যকে যথাক্রমে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাল্যে ও যৌবনে মানবেব চিত্ত নানা আশায় নানা সুখকব কল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; সেই আশা ও কল্পনা হইতে মানবেব উৎসাহ-শক্তির বিকাশ হয়। তাই আশামুগ্ধ মানব সোৎসাহে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই আশা-উৎসাহেব অবসান হয় বার্ধক্যে উপনীত হটলে।

কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হইলেই সে সকলেই নিরাশ হইয়া পড়েন তাহা নহে। যাহারা ধর্মপ্রাণ, সাংসারিক জীবনে যাহাবা ধর্মপথে থাকিবা যথাযথ ভাবে কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টিতে পরলোক স্মন্দব-রূপে প্রতিভাত হয়। তখন তাহারা পরলোকের সুখের আশায়, ভগবানের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইবার আনন্দে পূর্ণ হইয়া সংসারের অতীত সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যেব কথাকে তুচ্ছ মনে করেন। বোধ হয়, সাংসারিক নৈরাশ্য তাহাদের জন্যে ছায়াপাত করিতে পাবে না।

কবি বার্ধক্যে উপনীত হইয়া ভাবিতেছেন এখন আর তাহার যৌবনের আশা-উৎসাহ নাই; তাহার দিনের আলো—অর্থাৎ জীবনের আশা-উৎসাহ—ফুরাইল, সাংসারিক আলো—অর্থাৎ পরলোকের সৌন্দর্য—তাহার জন্ত জ্বলিল না—অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহালোকের শক্তি আশা তিনি হারাইয়াছেন, পরলোক হইতেও কোনো আধ্যাত্মিক সমর্থন বা আশার আলোক আসিয়া তাহার মনে লাগিতেছে না; তাই নিরাশ হইয়া ঘাটে—জীবনের প্রান্তে—তিনি বসিয়া পড়িয়া আত্মস্থরে আহ্বান করিতেছেন—

ওরে আর—

আমায় নিয়ে যায কে রে
দ্বিশেষের শেষ খেয়ায়।

শুভক্ষণ ও ত্যাগ

এই ষুগ্ম কবিতা দুইটি ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গদর্শনের ৩৮৩, ৩৮৪ পৃষ্ঠার প্রথম প্রকাশিত হয়।

যখন কোনো মহৎ কর্মের বা মহৎ ভাবের শুভ-আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে বরণ করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য; আমার যথাসাধ্য সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা উহাকে সংবর্ধনা করিতে হইবে। আমার সাহায্য যদি সামান্য ও নগণ্য হয়, আমার নাম যদি কেহ নাও জানিতে পারে, এবং ইতিহাসে যদি আমার নাম নাই থাকে, তথাপি সেই শুভক্ষণকে সমাদর করিতে অবহেলা করা আমার থক্ষে উচিত হইবে না। আমার এই ফলাফল বিবেচনাহীন ত্যাগের জন্য সাংসারিক বুদ্ধিমান সাবধানী বিবেচক লোকে আশ্চর্য হইবে তো হউক, তথাপি কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়াই আমার কর্তব্য আমাকে করিয়া যাইতে হইবে।

রাজার ছলালের যাত্রাপথে আমার বন্ধের মণিহার খুলিয়া উপহার দিতে হইবে। সেই চুনীর হার আমার বৃকের রক্তবিন্দুগুলির মতো ধূলায় পড়িয়া থাকিবে এবং রাজার ছলালের রথের চাকায় গুঁড়া হইয়া একটি রক্তরেখা আঁকিয়া দিবে, এবং কেহ হয়তো লক্ষ্যই করিবে না যে কে কী মহামূল্য নিধি ত্যাগ করিল এবং কাহার উদ্দেশ্যেই বা ভাগ করিল।

“আমাদের ঋণিক-জীবন এবং চির-জীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হ’বে আছে। আমাদের ঋণিক-জীবনই সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চির-জীবন সেই সুখ-দুঃখ নেবে না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের ঋণিক জীবন কেবল রোজ ভোগ করছে, আর গাছের চির-জীবন তার ভিতর থেকে দাঁতহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে।

“আমরা যখন খুব বড় ব্রহ্মের একটা আত্মবিলম্বন করি, তখন কেন করি? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ঋণিক-জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে যায়, তার সুখ-দুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের এই পরিহার, এই আমাদের ঋণিক-জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু আমাদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা আমাদের ঋণিক-জীবনটাকে পরিত্যক্ত ক’রেই আনন্দ পাই, দুঃখকে পলার হার ক’রে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়।”—ছিন্নপত্র, বোম্বাই ২৫।২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সাল। ‘কল্পদ’ কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

“যখন আমরা নিছক হুখ ভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একাধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর অন্তে হুখ ভোগ এবং তাগ স্বীকার কবতে ইচ্ছা করে, দইলে আপনাকে অযোগ্য ব’লে মনে হয়—এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে হুখ মিশ্রিত সেই হুখই স্থায়ী হুগভীর তাতেই ষ্ণার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়।”

— ছিন্নপত্র (পতিসর, ৩০ এ মার্চ ১৮৯৯), ২৫৬ পৃষ্ঠা ।

যখন কবিব চিন্তা দেশের দুন্দশার দুদিনে রাজনৈতিক সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধীয় দুর্গতিতে পীড়িত হইতেছিল, তখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াব ডাক তাঁহার জীবনকে দোটানায় ফেলিয়াছিল সেই সময়ের মনেব ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই দুইটি কবিতায় ।

তুলনাধ—পরবী কাবো দান’ কবিতা ।

আগমন

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে ।

সত্য-শিব-সুন্দর-রূপী ভগবানকে যদি আমরা স্বীকার না করি তবে তিনি রুদ্র-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করান । সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ নিরন্তর হইতেছে, কিন্তু আমরা মোহ-বশত তাহা অস্বীকার কবি, অথবা লক্ষ্য না কবিয়া নিচেতন থাকি ।

হুখ-বাতাব বাজা যখন আসিলেন, তখন তাঁহাব অভ্যর্থনার জন্ত কোনো আয়োজনই হয় নাই আমার, দরিদ্র ঘরে যাহা সামান্য কিছু ছিল তাহা দিয়াই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইল । ইহা ভালোই হইল, ইহাতেই তাগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল,—ইহা তো ধনীরা ভোগোদ্ভূত সামান্য কিছু দান করা হইল না, ইহা দরিদ্রের সর্বস্ব-সমর্পণ হইল ।

‘যখনে আগমন’ ব’লে য কবিতা আছে সে কবিতায যে মহারাজ এলেন তিনি ক । তিনি যে অশাস্তি । সবাই স্নাত্রে ভয়ার বন্ধ করে শাস্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেও মনে কবেনি তিনি আসবেন । যদিও থেকে থেকে ঘারে আবাত লেগেছিল দাঁড় মেঘগন্ধের মতো ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁর রথচক্রের ঘর্ষরধ্বনি ষ্ণদের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ নিবাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আগামের ব্যাঘাত ঘটে । কিন্তু দ্বার ভেঙে পেল—এলেন রাজা ।”

— আমান ঘর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী—পে ৪, ১৩২৪, ২৬ পৃষ্ঠা ।

তুলনীয়—

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি

ভাঙল ঝড়ে,

জানি নাহি তো ডুমি এনে

আমাব ঘবে।

~ ~ ~

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

তাই কি জানি !— গীতিমালা ।

Watch ye therefore : for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning :

Lest coming suddenly he finds you sleeping.

And what I say unto you I say unto all, ...Watch !

—*The Bible*, St. Mark, 13 35-37,

Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not, —*Ibid*, St Luke, 12. 40.

পুরবী কাবে, অপ্রতীতা' কবিতা ।

দান

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ।

বাহাবা দীনাত্মা তাহাবা ভগবানেব কাছে কেবল শ্রুতি ভিক্ষা কবে, কিন্তু ভগবান তো কেবল স্রষ্টাদাতা নহেন, তিনি শিব বলিয়াই কহ; তিনি তো কেবল ভয়ত্রাতা নহেন, তিনি মহদভয় বজ্রম্ উগ্রতম্। বাহাবা সত্যকে ও কল্যাণকে চাহিয়াছেন, তাঁহারা রুদ্ররূপকে ভয় করেন নাই—যেমন সক্রোটস, গ্যালিলিও, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, গান্ধী সত্যের জ্ঞান প্রাণ দিয়াছেন অথবা হুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তবু সত্যস্বরূপ কল্যাণকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই ।

আমি চাহিয়াছিলাম প্রিয়ের গলার ফুলেব মালা, অর্থাৎ শান্তি, কিন্তু সেই প্রিয়ের হাত হইতে পাইলাম ভীষণ তরবারি, অর্থাৎ দারুণ অশান্তি। শান্তি যে বন্ধন ও জড়তা,—যদি সেই শান্তি অশান্তির ভিতর দিয়া অর্জন কুবা না যায়, যদি দুঃখের মূল্য দিয়া তাহাকে অর্জন কবা না যায়। কিন্তু এই অশান্তি

হইতেছে মাঝের কথা, ইহা চরম কথা নয়, চরম কথাই হইতেছে—শাস্ত্রম্
নিবন্ম্ অদ্বৈতম্। চরম ও পরম সত্য হইতেছে রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। কিন্তু সেই
প্রসন্নতা পাইতে হইলে রুদ্রের স্পর্শ পাইতে হইবে।

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তিৰ অন্তবে বধা শান্তি হুমহান্।

অতএব স্রুষ্টিন ত্যাগের সাধনাই জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে।

ভগবান্ যে আমাদেরকে ত্রুৎ-বহনের অধিকার দান করেন তাহা আমাদের
পক্ষে মহা সম্মান। সেই বেদনার মান বক্ষে বহন করিয়া তাঁতার দানের ও
দয়ার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

তুলনীয়—

My bridegroom's bed is cold and hard
My bridegroom's kiss is ice and fire,
My bridegroom's clasp is iron barred,
I am consumed in His desire.
My bridegroom's touch is as a sword
That pierces every nerve and limb,
'Depart from me,' I moan, 'O Lord !
All the night long I spend with Him
—Harriet Eleanor Hamilton-King,
The Bride Reluctant

বালিকা বধু

ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে।

অনেক দেশের অনেক সাধক ও কবি মনে করিয়াছেন যে ভগবান তাঁহাদের
স্বামী এবং তাঁহারা ভগবানের বধু। ভগবানকে বব-রূপে এবং মানবকে বধু-রূপে
বোধ করা বৈজ্ঞব্য ভাব। বৈজ্ঞবেরা মনে করেন যে বিশ্বব্রহ্মাবনে এক মাত্র
পুরুষ আছেন ঈশ্বর, আর সমস্ত জীব হইতেছে গোপী। (তুলনীয় মীরাবাই
এবং জীব গোবিন্দীর সাক্ষাতের কাহিনী।) বাইবেলের মধ্যে সলোমনের
গান, তেতিভের স্তুতি, এবং অন্ত্যস্ত ক্রিস্টান ষিষ্টিক্দের রচনা এবং মুসলমান
সুফী কবি হাকিম প্রভৃতির রচনা এই ভাবে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতেছেন যে বিরাট পুরুষের পার্শ্বে তাঁহার নিজের চিত্ত বালিকা-বধূরই মতো দাঁড়াইয়া আছে ; সেই পুরুষ যে কত বড়, কী যে তাঁহার মহিমা, অবোধ বালিকার মতনই কবি-হৃদয় সেই তথের সন্ধান পূরাপূরি পান নাই। তবু তাঁহার সঙ্গে কবির যে একটি সহজ অথচ নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে, এই বোধটি একদিন না একদিন তাঁহার সমস্ত জীবনের চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে—এই আশাও কবি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

তুলনীয়—

কৃতাস্তঃ কাশ্যো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমতঃ,
ক্রমাদ্ দ্বি ত্রি-ব-মাসৈব মনুজ ইতি জগ্ৰাহ জগৎ ।
ততোঃসো মৎপ্রযান্ অহম্ অপিচ তস্ত প্রিয়তমা,
ক্রমাদ বর্ষে গাতে প্রিয়তমমবং জাতম্ অখিলম্ ॥ —উদ্ভট।

প্রথমতঃ বালিকা বধূর মনে কৃতাস্ত ও কাশ্যের মধ্যে কোনো ভেদ বোধ হইত না, ক্রমে দুই-তিন মাসে তাহার মনে হইতে লাগিল যে ঐ ব্যক্তি মানুষ বটে। তাহার পরে তাহার উপলব্ধি হইল যে উনি আমার প্রিয়, আর আমিও তাঁহার প্রিয়তমা। ক্রমে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রিয়তমময় হইয়া উঠিল।

The bridegroom of my soul I seek,
Oh, when will he appear ?—Cowper.
For me the Heavenly bridegroom waits.
—Tennyson, *St. Augustine's Eve*.
What if this happen to be—God ?
—Robert Browning, *Fears and Scruples*.

কুপণ

ফলের আকাজ্জক ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হইয়া অহং ভুলিয়া যাহা কিছু ভগবানকে সমর্পণ করা যায়, তাহার ফল শতগুণ হইয়া দাতার নিকটে ফিরিয়া আসে। সেই জন্ত হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ—সর্বং কর্মকলং ব্রহ্মার্পণম্ অস্ত, কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন। কোরান ও হাদিসেও এই প্রকারের কথা আছে—ভগবান একমাত্র ধনী, আর সব কবীর ; কে আছে আদাকে

কণা মাত্র দান করিবে আমি তাহা শতগুণে বর্ধিত করিয়া পরিশোধ করিব ;
তিনি অভাব-রহিত ও প্রশংসিত ; দানের ফলে একটি শঙ্ককণা হইতে
যেন শতসহস্র শত উৎপন্ন হয় ; জীবনে আরও পুণ্য অর্জন করি নাই কেন ?

ত্যাগেই বস্তুর প্রাপ্তির পরিচয়। আবাব ফলাফল-বিবেচনাহীন ত্যাগই
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। আমার দিকে কিছুই রাখিলে চলিবে না—আমার কাজ,
আমার দেশ, আমার কীর্তি, আমার সফলতা, আমার শক্তি—এইকণা
আমার আমার বন্ধনের মধ্যে বিশ্বভূবনের অধীশ্বরের প্রমুগ্ধ আনন্দ রূপ
পীড়িত হয় ; সেই আমিহের বন্ধন ছিন্ন করিলেই জীবনের দেবতার
আবির্ভাব সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমার দিকে সঙ্করে ভাব, তাঁহার
দিকে সঙ্করে মুক্তি—এই বোধ যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তখন চিত্ত অধীর
হইয়া বলে—

এ বোমা আমার নামাও বন্ধু নামাও

ভাবেন বেগতে ঠেলিগ চোঁগ

এ যাত্রা মোর নামাও। মোর ভাব।

তুলনায়—

ওগো কাছাল, আমাবে কাছাল কারে

আরো কি তোমাব চাই ?

ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেচ

কী কাতর গান গাই'।

• • • • •

তাব, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও

ক্ষিরে আমি দিব তাই।—কল্পনা।

মোব ফকিরতা মাংগি যাব

মে' দেখছ ন পেলোঁ।

মংগন সে ক্যা মাংগিবে,

বিন মাংগে জো দেখ ॥—কবীর

জো হয় ছাড় হিঁ হাথ তে'

সো তুম লিহা পসার।

জো হয় লেখারিঁ জীতি সো

সো তুম্বু ধীরা জার ॥—দাদু।

কুয়ার ধারে

আমাদের যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা পাইবার জন্য ভগবান্ তৃষ্ণার্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশে আমরা যাহা ত্যাগ করি, তাহা সামান্য হইলেও বড় হইয়া উঠে। মানবের ও অপর জীবের সেবাতে তাঁহারই সেবা করা হয়। খ্রিস্টানদের ঠিক এই রকমের একটি কাহিনী আছে—একটি মৃন্দর ছবিও আছে—কয়েকটি নারী কূপ হইতে জল তুলিতেছে, এমন সময়ে পথশ্রান্ত ক্রাইষ্ট আসিয়া সেখানে তৃষ্ণার্ত হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কত কত মেয়ে তো তাঁহার পাশ দিয়া জলভরা কলস লইয়া চলিয়া গেল, কেহ তৃষ্ণার্তকে জল দিল না। অবশেষে একটি বমণী আসিয়া তাঁহাকে জল দিল, এবং সে পরম আশ্বাসদ লাভ করিয়া ধন্ত হইয়া গেল। তুং—“গহস্থানে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।”—চৈতালি, দেবতার বিদায়।

For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it St. Matthew, 16. 25.

For I was an hungered, and ye gave me meat; I was thirsty, and ye gave me drink, I was a stranger, and ye took me in

—St. Matthew, 25. 35.

তুলনীয়—Parable of The Good Samaritan.

—St. Luke, 10. 30-35.

অনাবশ্যক

জগতে দেখা যায় যেখানে অভাব সেইখানেই যে তাহা মোচন করিবার উপকরণ আসিয়া জুটে তাহা নহে—যাহার অনেক থাকে, তাহারই কাছে আবও অনেক গিয়া জুটে, আর যাহার নাই তাহার অভাব কিছুতেই মিটিতে চায় না। একজন পুরুষ হয়তো কোনো রমণীর একটু প্রীতি, একটু ভালোবাসা পাইলে ধন্ত হইয়া যায়, অথচ সেই রমণী তাহার প্রাণপূর্ণ প্রেম লইয়া চলিয়াছে এমন একজন পুরুষের উদ্দেশে যে হয়তো তাহা গ্রাহ্যই করিতেছে না, সে হয়তো অপর কোনো রমণীর ভালোবাসা পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও দেখা যায় সরস ভূমিতে প্রচুর উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু বেচারী মরুভূমি একটি গাছ পাইলে বতীয়া যায়, কিন্তু তাহার ভাগ্যে তাহা জুটে না; আকাশে শতকোটি জ্যোতিক জ্বলে, কিন্তু যে দরিদ্র তাহার কুটীরে একটি মাটির প্রদীপও জ্বলে না। যেখানে আবশ্যক

মাই সেইখানেই যেন সব গিয়া জুটে। আকাশে কত জ্যোতিষ্ক, সেখানেই
তুলিয়া দেওয়া হইল আকাশ-প্রদীপ; দীপালিতে কত দীপের সমারোহ,
সেইখানেই দেওয়া হইল আর একটি দীপ, রহিয়া গেল আমার ঘর অন্ধকার।

এই কবিতাটি-সম্বন্ধে স্বয়ং কবি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার দ্বারা
ইহার তাৎপর্য স্পষ্ট হইবে।—

"যেয়ার 'অনাবশ্যক' কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে ব'লে মনে করিনে।
আমাদের ক্ষুধার জন্তে বা অতাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে কেনাছড়া। ঘর জীবনের
ভোজে, যে-ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে
বার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত
হয় সে, যে একান্ত আশ্রয় নিয়ে ছাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে
প্রতিদিন বেধে পাকি সংসারে যেখানে অস্তাব সত্য সেখানে থেকে নেবেজ প্রচুব পরিমাণেই
বিশিষ্ট হয় সেই দিকে যেখানে তার জন্তে প্রত্যাশা নেই ক্ষুধা নেই।"

—শান্তিনিকেতন,—৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩।

ফুল ফোটানো

আমাদের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহা আমরা কেবল নিজেব ইচ্ছা-অনুসারে
ঘটাইয়া তুলিতে পারি না। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই। আমাদের
প্রকাশ ভগবৎ-রূপার উপর নির্ভর করে বলিয়াই মহম্মদ বলিয়াছেন—আমার
নিজের কোনো কৃতিত্ব নাই, আমি আলার রহুল বা পরমেশ্বর—মহম্মদ উর্ রহুল
আল্লাহ। আর ক্রাইষ্ট নিজেকে বলিয়াছিলেন—আমি মানব-পুত্র, আমি
ভগবানের পুত্র।

ট্রষ্টব্য—গীতিমালা পুস্তকের 'স্বাক্ষরিক্রয়'-কবিতার ব্যাখ্যা।

তুলনীয়—

নিটুর গরজী,

তুই কি মানস-মুহুর ভাজ্জ'বি আঙনে।

তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুজ বিহনে।

দেখ না আমার পরম গুরু সাই,

যে বৃক্ষগাঙ্গে ফুটার মুহুর, তাড়াহড়া নাই।

কোর লোক প্রচণ্ড,

তাই ওরলা ধও,

এর আছে কোন উপায় ?

কব যে বদন, শোন নিবেদন, দিসনে বেদন

সেই শ্রীভকব মনে

সতত ধাবা আপন তাবা তাঁর বঁশা স্তনে ।

—মদন সেন, বাউল ।

দিন শেষ

এই কবিতাটির সহিত ‘শেষ খেয়া’ কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। আমার কাছে ভবসংসার অতিথিশালা মাত্র, এখানে তাটের লোক আসিয়া বিশ্রাম করে, তার পরে যে যাব ঘরে ফিরিয়া যায়। এই অতিথিশালার কত লোক জীবনের সমস্ত মালিগা ধুইয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া স্বগতে যাত্রা করিয়াছে, কত আশা কত আনন্দ তাহাদেব। কিন্তু আমার পক্ষে এই সংসার নিবানন্দ অন্ধকাব, এখানে আমাকে কে আশ্রয় দিবে ?

দীঘি

দীঘি যেমন স্নিগ্ধ শীতল জলে পরিপূর্ণ, ভগবান তেমনি দয়া ও প্রেমে পরিপূর্ণ। বেলাশেষে তাঁহার কোলে ফিরিবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এখন আব সংসারের কাজ ভালো লাগে না। বধু যেমন অমুরাগে ও আ গ্রহে বাপের বাড়ী ব দিকে চাহিয়া দেখে, তেমনি আগ্রহ জাগিতেছে আমার মনে। কিন্তু এই পথ বড পিচ্ছিল, কিন্তু সেই শীতল অতলতায় অবগাহন করিবার আনন্দে আমার দেহ-মন পবিপূর্ণ। জীবনের অবসানে পরলোকে ভগবানের কোলে যাইবাব পথ নীরব সুগভীর মৃত্যু—তাঁহাব যে আলিঙ্গন তাহা মবণ-ভরা, তাহা সকল বন্ধন মোচন করিয়া হবণ কবিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই যে মহাযাত্রা ইহা একেবারে ভয়ঙ্কর নহে, পথ দেখাইতে সাঁঝের তারা জলিয়া উঠিল, পথে জোনাকির আলোও আছে, এবং মঙ্গল বোধণা করিয়া শঙ্খও ধ্বনিত হইতেছে। যিনি রত্ন, তিনিই শিব, যিনি মৃত্যু, তিনিই নবজীবন।

প্রতীক্ষা

আমি জীবন-সন্ধ্যায় আমার সাংসারিকতা ছাড়িয়া বিষয়বাসনা বিস্মৃত হইয়া তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি, হে ভগবান, তুমি আমাকে করুণা করিয়া গ্রহণ করো। আমার জীবনের যাহা সুন্দর ও পবিত্র সঞ্চয় তাহা তোমাকে অর্ঘ্য দিবার জন্ত প্রস্তুত রাখিয়াছি, এবং তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি প্রেমের শ্রোতে জোয়ার বহাইয়া আমার হৃদয়ের ঘাটে আসিয়া তোমার করুণা-তরঙ্গী ভিড়াইবে, এবং আমাকে তোমার বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবে, এবং সেই মিলন-সুখাবেশে আমাব দেহ মৃত্যুতে শিথিল নীতল হইয়া তোমার চরণমূলে লুটাইয়া পড়িবে, সেই আশাতেই আমি বাসকসজ্জা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রচ্ছন্ন

বিশ্বেশ্বর আপনাকে বিশ্বের সকল বস্তু পশ্চাতে অন্তরাল করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন—তিনি সকল কিছুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া নিজের সকলের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাই লোকে সর্ব কিছুকেই পাইতে চায় কেবল তাঁহাকে ছাড়া। কবি তাঁহার প্রিয়তম জীবনদেবতার জন্ত তাঁহার কাব্যকুসুম চয়ন করিয়া ডালি সাজান, সে ডালি হইতে কত লোকে ফুল তুলিয়া লইয়া যায় নিজেদের উপভোগের জন্ত।

সমস্ত জীবন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিল, কত কত সাধক পবলোকের সম্মল লইয়া ঘরে কিরিল। আমি তোমার প্রতীক্ষায় যে বসিয়া আছি, কবে তুমি দয়া করিয়া আপনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত স্পর্ধার মতন শুনাইবে বলিয়া আমি নীরবে থাকি। আমি যে দীনা ভিখারিণীর মতন, আর তুমি রাজরাজেশ্বর।

তুমি এসো, হে প্রভু, তুমি আমাকে তোমার রথে তুলিয়া লইয়া আমার জীবনকে সার্থক করো, আমাকে বিনষ্ট হইতে নিরোধ না—ক্লম, যৎ তে দক্ষিণঃ মুখং তেন সাং পাহি নিত্যম্, মা মা হিংসীঃ।

সব-পেয়েছির দেশ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাহা কিছু প্রকাশমান তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ—জগতের কোথাও কোনো অভাব নাই, কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূত্ব যাখাতখাতোপান্ ব্যদধাচ্ছাষতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এই বস্তুধা অমৃত-পাত্র, সে স্বমহিমায় ঐশ্বর্যশালিনী। এই বোধ যদি মনে জাগে, তাহা হইলে আর কোনো অভাব বোধ হইতে পারে না। সেই সন্তোষপূর্ণ মনই সব-পেয়েছির দেশ। যেখানে সন্তোষ আছে, সেখানে কোনো লোভ ঘেব হিংসা থাকিতে পারে না, পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা হইতে পারে না। এই সব-পেয়েছির দেশে কোথাও কোনো বাহুল্য নাই, আড়ম্বর নাই, কৃত্রিমতার লেশমাত্রও সেখানে স্থান পায় না, কোঠাবাড়ীর দস্ত সেখানে নাই, সেখানে হাতীশালায় হাতী নাই, ঘোড়াশালায় ঘোড়া থাকার আডম্বর নাই। সব-পেয়েছির দেশে বাবাবন্ধনহীন প্রাণের সরল আনন্দের প্রাচুর্য বিরাজ করিতেছে, প্রাণের সহজ আবেগে বাহা ফুটিয়া উঠে কেবল তাহারই স্থান আছে সেখানে। সেখানে কচি ঘাস, কচি শ্যামলা লতা, মনোরম পুষ্প প্রাণের আনন্দে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানকার কাজকর্ম সমস্ত কিছুই সকলে আনন্দের আবেগে করে, কর্তব্যের তাড়নায় নহে, লোভের বশে নহে—বিনা-বেতনের কর্ম শেষ কবিতা দিনের শেষে সকলে হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরে সেখানে সকলের সঙ্গে সন্তানের অন্তরের নিবিড় মিলনের পক্ষে কোনো বাধাবন্ধ নাই। সেখানে সর্বদা অকৃত্রিম আনন্দ বিরাজ করে। সেখানে কিছুই আইন-কানুন দিয়া বাধ্য করিয়া করাইতে হয় না, কিছুই বাধ্যকর নিয়মেব অবীন নয়,—সব কিছুই স্বধর্মে স্বাধীন। সে দেশে সদাগরের নৌকা কেনা-বেচার জন্ত ঘাটে ভিড়ে না, কাবণ কাহারও তো কোনো অভাব নাই, রাজাব সৈন্তসামন্তও সেখানে নিতান্ত নিপ্রয়োজন। সব-পেয়েছির দেশকে বাহুভাবে বা লঘুভাবে দেখিলে তাহার কোনো তবই জানিতে পারা যায় না। উহার প্রাণের স্পন্দন ও অন্তবেব বহন্ত জানিতে হইলে ঐ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহার অধিবাসী হইতে চাইবে—নিজেকে উহার সঙ্গে যোগবৃত্ত করিয়া উহারই অঙ্গ হইয়া যাইতে হইবে।

কবি এইরূপ সব-পেয়েছির দেশে নিজেকে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন এইটিই তাহার কামনার স্বর্ণ—এখানে তিনি নিজের সমস্ত খোঁজাখুঁজির পালা শেষ করিয়া দিয়া সব পাওয়ার পরম সন্তোষ ও শান্তি মনের মধ্যে লইয়া নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন এবং সেখানে বাস করিয়া তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ
পরিণতির দিকে—অসীমের পানে—পরিচালিত করিবেন। এখানে তাঁহার
পুরস্কার বিনা-বেতনের কাজ—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিকাম সাধনা।
এখানে ‘নাইকো পথে ঠেলাঠেলি, নাইকো হাটে গোল’—

Far from the madding crowd's ignoble strife

এখানে পরমা শান্তি ও বিপুল বিরতি।

তুলনীয়—

My mind to me a kingdom is,
Such perfect joy therein I find
As far exceeds all earthly bliss
The world affords.

—Dyer, *Contentment*

Tennyson-এর *Lotos-Eaters*—নামক কবিতাটিও ইহার নহিত তুলনীয় এবং
Milton-এর *Paradise Lost*-এর—

There is nothing good or bad but thinking makes it so,
The mind is its own place, and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.

—*Paradise Lost*, Bk. 1.

শারদোৎসব

এই অপরূপ সুন্দর নাট্যকাব্যখানির রচনা শেষ হয় ৭ই ভাদ্র ১৩১৫ সালে। আমার সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, যখন আমি ছাত্র, তখনই আমি স্পর্ধার সহিত কবিকে এক পত্র লিখিয়া করমাস করিয়াছিলাম যে আমাদের দেশের ছাত্র অথবা ছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক নাটিকা নাই, এর অভাব পূরণ করিতে পারেন একমাত্র তিনি; ছাত্রদের অভিনয়ের যোগ্য নাটকে কোনো ক্ত্রী-চরিত্র থাকিবে না, এবং মেয়েদের অভিনয়ের যোগ্য নাটকে কোনো পুরুষ-চরিত্র থাকিবে না। আর একটি নাটিকা এমন করা কি যায় না যে কেবল মাত্র এক জন লোকের স্বগত উজ্জ্বল স্বরায় একটি কাহিনী বিবৃত হয় অথচ তাহার মধ্যে নাটকীয় ভাব বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস আমার সেই চিঠির ফলে কবি হস্তকৌতুকে ও ব্যঙ্গকৌতুকে প্রকাশিত হৈয়ালি-নাট্যাগুলি রচনা করেন, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং বিনিপন্নসার ভোজ কেবলমাত্র স্বগতোক্তিতে গ্রথিত একক নাটিকা-রচনাও বোধ হয় আমারই পত্রের দাবীব ফলে হইয়া থাকিবে। ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ নাটো পুরুষ-চরিত্র নাই। কেবলমাত্র পুরুষ-চরিত্র লইয়া শারদোৎসব নাটক রচনা করিলেন কবি এই প্রথম। আমি তখন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসের চার্জে ছিলাম, আমি এই পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের,—প্রাচীন পুঁথির আকারের, এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই। কবির হস্তাক্ষরের যে লেখা হইতে বই ছাপা হয়, তাহা আমার কাছে এখনো সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া আছে এবং যামিনীবাবুর অঙ্কিত ছবি দুখানিও আছে।

ইহা অভিনয় করা হয় আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির পূর্বে। ইহার অভিনয়-উপলক্ষে কবি বিধুশেখর শাস্ত্রীকে একটি সংস্কৃত নান্দী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে আমি বলি যে—এই নাটক যে কবি রচনা করিয়াছেন, সেই কবির রচিত নান্দী পাঠ করা সঙ্গত। তাহাতে কবি বলিলেন—তোমরা

যদি আমাকে আধ ঘণ্টার ছুটি দাও, তাহা হইলে আমি নান্দী লিখিবার চেষ্টা করিয়া দোঁধিতে পারি। আমরা কবিকে ছুটি মজুর করিলাম। তিনি আধ ঘণ্টা পরে কিবিয়া আসিলেন—ইহারই মধ্যে একটি কবিতা ও একটি গান রচনা করা ও সুর সংযোজন হইয়া গিয়াছে। যে কাগজে সেই দুইটি কাটাকুটি করিয়া রচনা করা হইয়াছিল, এবং কবি পরে যে কাগজে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমাকে ছাপিতে দিয়াছিলেন তাহা এখনো আমার কাছে আছে। সেই কবিতা ও গান দুইটি নাটকের অভিনয়ের সূচনা-পত্রে ছাপা হইয়াছিল। গানটি এখন গীতাঞ্জলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে—(৭ নম্বর গান),—‘তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।’ কিন্তু ঐ গানের নীচে যে তারিখ দেওয়া আছে (১৩১৪ অগ্রহায়ণ) তাহা ভুল মনে হয়, কারণ উহা শারদোৎসব রচনার পরে রচিত হয়। নান্দীর কবিতাটি অল্প কোথাও আছে কি না জানি না, বোধ হয় কোথাও নাই। সেই জন্য উহা আমি নিজে উদ্ধাব কবিয়া দিতেছি—

নান্দী

শরতে হেমন্তে শাতে বসন্তে নিম্নায়ে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্য্যধারে যাহার আনন্দ বহিঁ যাব
সেই অপরাপ, সেই অরূপ, কপেব নিকতন
নব নব স্বভাবসে ভা'রে দিন সবা'কার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুল্লের যীর পাখে ঢালিছে অঞ্জলি
কাশের মঞ্জরীরাশি যীর পানে উঠিছে চক্‌লি,
স্বপ্নাঙ্গি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্তে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয় ॥

“তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে”—এই গানটির শেষের লাইনের উপরের দুইটি লাইন কবি প্রথমে নিম্নলিখিতরূপে বচনা করিয়াছিলেন—

এস সব হৃদে হৃদে মর্মে,
এস প্রতিদিবসের কর্ণে।

কিন্তু পবে কাটির সংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এস দুঃখ হৃদে এস মর্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কসে।

এই গানটির আদিরূপটি আছে ছিন্নপত্রে, পত্রিসর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে লেখা এক চিঠিতে (২৯৪ পৃষ্ঠায়)।

নান্দী ও গানটি একই কাগজের দুই পিঠে লেখা, নীল পেন্সিলে। নান্দীতে আশ্বিন মাসের উল্লেখ আছে। অতএব গানটিও আশ্বিন মাসে ১৩১৫ সালে লেখা।

ভারতবর্ষের এক কবির মনে “ঋতুসংহার” বিচিত্র রসমধুর ভাবেব উদ্বেক করিয়াছিল; তাহারই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী এই কবির চিত্তকেও ষড় ঋতু নানা ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। তাহারই প্রথম নাট্যরূপ এই শারদোৎসব।

শারদোৎসব নাট্যকাব্যেব মূল কথাটি কবি স্বয়ং চাই স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে সার মর্ম উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

‘শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক’বে ফাল্গুনী পর্যন্ত ঘটগুলি নাটক লিখেছি, গগন বিশেষ ক’রে মন দিবে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার বুথোটা ই একই। রাজা সেবিষেছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব কবাব জন্তে। তিনি খুঁজছেন তাঁব সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শবৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্তে উৎসব কবতে বোঁরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলা ছেড়ে সে তার প্রভু স্বর্ণ শোধ কবাব জন্তে নিভুতে বসে এক মনে কাজ কবছিল। বাজা বলেন, তাঁব সত্যকাব সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শবৎপ্রকৃতিব সত্যকাব আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি হুংখের সাধনা দিয়ে আনন্দের স্বর্ণ শোধ কবছে—সেই হুংখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বস্ত যে এই হুংখ উপস্তাষ বস্তু;—অসীমেব যে দান সে নিজের মধ্যে পেখেছে, অজ্ঞাপ্ত প্রয়াসেব বেদনা দিয়ে সেই দানের স্বর্ণ সে শোধ কবছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ কবছে, এত প্রকাশ কবতে গিয়েই সে আপন অঙনিহিত সত্যের স্বর্ণ শোধ কবছে। এই নিরন্তর বেদনায তাব আত্মোৎসর্জন, এই হুংখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব প্রত্যেক তা শবৎপ্রকৃতিকে হৃন্দব করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে এ’কে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এব মধ্যে লেশ মাত্র বিরাম নাষ্ট। যেখানে আপন সত্যের স্বর্ণশোধে ‘মথিলা, সেইখানেই প্রকাশে বাধা, সেটপানেই কষখতা, সেইখানেই নিবানন্দ। আত্মাব প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্তেই সে হুংখকে সূত্মকে স্বীকার করতে পারে—ভবে কিছা আলস্তে কিছা সংশয়ে এই হুংখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটা এই—ও তো গাছতলায বসে বসে বাঁশার সুর শোনাবাব কথা নয়।”

—আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৩ পৌষ, ২৯৭ পৃঃ।

“মামুদের জন্ম” তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মামুদের প্রধান শৃঙ্গনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে

যদি ঘর খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান ক'রে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না।.....জন্মের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল সার্থক হয়'.....

“মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভার ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হ'য়ে ওঠে।...তাই নব ঋতুর অভ্যাসে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীর প'রে চারিদিক হতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই জন্মে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জেগে ওঠে তা হ'লে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে।

“সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজের মধ্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর,—সেই নগ্ন আপনার স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে চর্চা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন ক'রে বেড়াচ্ছে। এই উৎসবের পূর্বোক্ত কে? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলতে বার হয়েছেন; লক্ষীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চাষ সোনাকে সে তুচ্ছ কবে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় ব'লেই লাভ সহজ হ'য়ে হুম্মর হ'য়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।

“কিন্তু এই যে হুম্মরকে বোজ্বার কথা বলা হলো, সে কি? সে কোথায়? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা সৌধীন পদার্থ? এই কথাই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রয়েছে।

“শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে ব'লে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করছে। রাজ সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখন মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য।... ”

“দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নি? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্শ্রাব অকুপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করতে থাকে, তখন দেবতা তার মধ্য হ'তে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকেই নূতন আকারে ফিরে পান, আর তখন কি মনুষ্য সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটিয়ে উঠতে থাকে, ততই কি তা হুম্মর উজ্জ্বল হয় না? বাধা কোথায় কাটে না? যেখানে আলস্য, যেখানে বীৰহীনতা, যেখানে আত্মবিশ্বাসনা, যেখানে মানুষ জানে প্রেমে কর্তব্য দেবতা হ'য়ে উঠতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায়, সেখানে নিজের মধ্যে দেবত্বের ঋণ সে স্বীকার করে। যেখানে যাকে সে স্বীকৃতি থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় ব'লে মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগিয়ে একবারে দু'ক' গুণিতে চার—তাকে যে অমৃত দেখা হয়েছিল, সে যে অমৃতের উপলব্ধিতে হৃদ্যাকে তুচ্ছ করতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করতে পারে, হৃৎককে গলার হার ক'রে বেধ, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই অন্তরকে তখন সে শোধ ক'রে দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অন্তরের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য, আনন্দরূপময়ত্ব।

“রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে বলেছিলেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হ’তে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়—কর্মকে এড়িয়ে তপস্শ্রাব ফাঁকি দিয়ে পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলেছেন—তুমি পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।

‘উপনন্দ তার প্রভু নিকট হ’তে প্রেম পেয়েছিল ত্যাগস্বীকারের স্বাভাবিক প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেমদানের সন্ধান ক্ষেত্রে চেষ্টা করে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি কবছে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাই কুশীল। —শারদোৎসব বিচিত্রা—১৩৩৬ আশ্বিন, ৪২১ পৃষ্ঠা।

উপনন্দের ঋণশোধের কথা নিয়ে সন্ন্যাসীতে ও ঠাকুবাদনাতে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাহা পাঠ করিলে কবির ব্যাখ্যা সহজবোধ্য হইবে।

কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাহার দুঃখ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

‘মানুষ সত্যপদার্থ ঘাটা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাষ্ট পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু দ্রব্য তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে তুচ্ছ চাহিয়াই কিছু পায় না দুঃখ কবিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে সে সমস্তই বিবেচ্যেব। কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিত্যগুণ আপনায়।’

এই জন্মই তো শারদোৎসবে কবি বলিয়াছেন—

দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাট রতন তুই ত চিনিস
তোর প্রসাদ দিয়ে ত্বারে কিনিস
এ মোর অতঙ্কার।

কবি-দার্শনিক দুঃখ প্রবন্ধেব মধ্যে আরও বলিয়াছেন—

“দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ ঘাটা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ ঘিয়া ঘাটা না কবিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।”—সঙ্কলন অথবা ধর্ম।

এই শারদোৎসব নাটক পরে ১৩২৮ বা ইংরেজী ১৯২২ সালে ঋণশোধ নামে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বইয়ের সম্বন্ধে কবি অল্প এক স্থানে লিখিয়াছেন—

“মানুষ যদি কেবল মাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করত; তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হতো। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশেষ তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তার ইন্দ্রিয়বোনের জারে জারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রূপে জেগে উঠছে।

“বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের আগের মহলে আপনাই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান স্বজন্মের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলেরই দ্বার খুলে যদি আমরা বিশ্বকে আহ্বান ক’বে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

‘যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায়নি সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করে বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ খি টয়াল্ শী গু নামক কবিভাষ্য অপূর্ণ হৃদয় ক’রে বলেছেন।”

প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে লুসিব দেহ-মন কি অপক্লপ সৌন্দর্যে গ’ড়ে উঠবে, তাবই বর্ণনা-উপলক্ষে কবি লিখেছেন—

“প্রকৃতির নির্বাক নিশ্চেষ্টতন পদাঙ্গের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাই এত বাণিতাব মধ্যে নিঃশব্দিত হবে। ভাসমান মেঘ সন্ধ্যার মাহিমা তারই জন্ত এবং তারই জন্ত উঠনো বৃক্ষের অবনততা, ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটি স্ত্রী তার কাছে প্রকাশিত তাবই নীরব আত্মীয়তা। আপন অবস্থ ভঙ্গিতে এই কুমারী বহুখানি গ’ড়ে তুলবে। নিশাধ রাত্রির তারাগুলি হবে তার ভালবাসার ধন, আর যে সকল নিছৃত নিদ্রা নিদ্রাগুলি বাক্যে বাক্যে উচ্ছলিত হ’বে নেচে চলে সহ্যবানে কান পেতে থাকতে থাকতে কন্দলিনির মাধুর্য তার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হ’তে থাকবে।

“পূর্বেই বলেছি—ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকায় কেবলমাত্র একমহলা, মানুষ যদি তার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না কবে তবে সেটা তার পক্ষে বড় লাভ নব। জগতের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পুণ্য লাভ কবে।

‘এই নিয়ে সন্ন্যাসীতে আর ঠাকুরবাঁধাতে যে কথাবাদ্য হয়েছে নীচে তা উদ্ধৃত করলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন হৃদয় (কন) আজ স্পষ্ট স্বপ্নেতে পাচ্ছি জগৎ আনন্দের স্বপ্নশোধ কবছে। বড় সহজে কবছে না, নিজের সমস্ত দিয়ে কবছে। কোথাও সাধনার এতটুকু বিজ্ঞান নেই সেই জগৎই এত সৌন্দর্য।

‘ঠাকুরবাঁধা। একদিকে অনন্ত ভাঙার থেকে তিনি ঢেলে দিচ্ছেন আব একদিকে কঠিন দুপে তার শোধ চলছে, এই দুঃখের জোরেই পাণ্ডার সঙ্গে দণ্ডার গুজন সমান থেকে যাচ্ছে, মিলন হৃদয় হয়ে উঠছে।

‘বেখানে ঝালন্ত, যেখানে ক্লেশতা, যেখানেই স্বপ্নশোধ ঢিলে পড়ছে, সেইখানেই সমস্ত কুঞ্জী।

‘ঠাকুরবাঁধা। সেইখানেই এক পক্ষে কম প’ড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হ’তে পারে না।

“সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী মর্ত্যলোকে হুংখিনী-বেশেই আসেন। তাঁর সেই তপস্বিনী রূপেই ভগবান যুদ্ধ। শত হুংখের গলে তাঁর পদ্য সংসারে ফুটেছে।

“লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্বী ক’রে শিবকে পেয়েছিলেন, মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীও তেমনি হুংখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সঙ্গে মিলন লাভ করেন। যে মানুষের বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নেই, তপস্বী নেই, হুংখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নেই, স্বতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

“উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হ’তে প্রেম পেরেছিল, ত্যাগ স্বীকারেব দ্বারা প্রতিপনের পথ বেয়ে সে যতই প্রেম দ্বানের সমান ক্ষেত্রে উঠে ততই সে মুক্তির তানন্দ উপলব্ধি করছে। হুংখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। বর্ণের সঙ্গে বর্ণশোধেব বস্মাই বন্ধন এবং তা-ই কুত্ৰীতা।”—শারদোৎসব, বিচিত্রা—১৩৩৬ আশ্বিন, ৪২১ পৃষ্ঠা।

শারদোৎসব নাটকায় এক অপূর্ব সৃষ্টি ঠাকুরদাদাব চরিত্র। ইনি যেন রবীন্দ্রনাথেরই মনের রূপক। সৌন্দর্যের তিতর দিয়া সত্যের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের অন্তর চিরনবীন। এই ঠাকুরদাদা লোকটও ঠিক তেমনি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী চিরনবীন বসিক। তিনি কখনও বেতসিনী নদীৰ তীবে তীরে ছেলের দল লইয়া গান গাহিয়া শারদোৎসব কবিতা ফিরেন, কখনো বা অচলায়তনের বাহিবে অন্ত্রাজ অস্পৃশ্য শোণপাণ্ডুর দলে ভিড়িয়া যান, কখনো বা রুগ্ন অবরুদ্ধ অমলের শব্দার পার্শ্বে রাজার ডাকঘরের চিঠির খবর লইয়া আসেন, আদ্য তিনিই ভোল ফিরাইয়া গুরু বাউল-সর্দার রূপে দাস্তানী বসন্তোৎসবে মাতেন, তিনিই আবার ধনঞ্জয় বৈরাগী নাম লইয়া অত্যাচারের অবিচারের বিবন্ধে অহিংস প্রতিবোধ করেন, তিনি রাজদ্বারে নির্ভীক, দরিদ্র মুক প্রজার মুখপাত্র বন্ধু হইয়া অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন নিজে হুংখ ভোগ কবিতা। তিনি শিঙদেব খেলার সাথী, বিপদে সাহস ও সহায়, সন্ধানন্দ সত্যসন্ধ নির্ভীক বলিষ্ঠ সর্বসহ। তাঁহার চরিত্র শরতের মেঘমুক্ত আকাশের তায়ই নির্মল স্বচ্ছ সুন্দর। এই ঠাকুরদাদাই রাজার সহিত মিলনে পথে অন্ততাপিনী স্মদর্শনার সহযাত্রী, এবং ইনিই ছিলেন বৌ ঠাকুরাণীর হাতে এবং প্রায়শ্চিত্তে ও পরিত্রাণ নাটকে রাজা বসন্ত রায়ের অন্তরে এবং বিভা স্মরমা ও উদয়াদিত্যের সঙ্গে রস-মধুব স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে। শোণপাণ্ডুর সঙ্গে আমরাও জানি—“এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর।”

এই নাটক রচনা ও অভিনয় দেখিয়া যুদ্ধ হইয়া আমি কবিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম এমনি করিয়া ছয় ছতুর উৎসব লইয়া নাটক রচনা করিলে বেশ

হয়। কবি একটু ভাবিয়া শ্রিতমুখে বলিলেন—হ্যাঁ তা করলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের হেমস্তের কোনো বিশেষ রূপ নেই। অল্প ঋতুগুলির নিজস্ব রূপ বা তাৎপর্য আছে, অস্তরের অর্থ আছে, হেমস্তের তেমন কিছু নেই।

এই কথাবার্তার পরের দিন কবি আমাকে বললেন—দেখ, হেমস্তেরও একটা তাৎপর্য পেয়েছি—হেমস্তে সব শস্ত কাটা হ'য়ে যায়, তখন মাঠ হয় রিক্ত, কিন্তু চাষী গৃহস্থের গৃহ হয় পূর্ণ; বাহিরের রিক্ততা অস্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। এই ভাবটি নিয়ে একটা নাটক লেখা যেতে পারে।

আমি আশা করিয়াছিলাম কবি ছয় ঋতুর উপরেই নাটক লিখিবেন। ফাস্তনী ও রাজা বসন্তের উৎসবেরই নাটক। অচলায়তনের মধ্যেও 'উত্তল ধারা বাদল ঝরে'। গ্রীষ্মও দু-একটা কবিতা ভেট পাইয়াছে। কিন্তু হেমস্ত-কাব্যের উপেক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছে। বঙ্গের ঋতু-রঙ্গের মধ্যে কবি পরে যা একটু হেমস্ত-বর্ণনা করিয়া তাহার মান রক্ষা করিয়াছেন।

প্রারম্ভ

ইহার ভূমিকার তারিখ হইতেছে ৩১এ বৈশাখ ১৩১৬ সাল। এই ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—বৌ ঠাকুরাণীর গাট নামক উপভাস হইতে এই প্রারম্ভিক গ্রন্থখানি নাট্যরূপে হইল। মূল উপভাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে। এই নাটকের মধুর চরিত্র কবি বসন্ত রায়কে দেখিয়া মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতি হইতে ত্রিকণ্ট সিংহকেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই নাটকের মধ্যে একটি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে—ধনঞ্জয় বৈবাগী। ইংরেজী ১৯০৮ সালের কাছাকাছি সময়ে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সত্যকাথ্য অত্যাচারীদের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। এই সত্যগ্রহ গান্ধীজীর জীবনে পবে আবও স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সৃষ্টি এই ধনঞ্জয় বৈবাগী যেন মহাত্মা গান্ধীভব ভবিষ্যৎ কর্মণ্ড পরিণত চরিত্রের সত্যিকার ভাবপ্রবণ কবিত্বের স্বকীয় চরিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। যে মহাত্মা গান্ধী পরে অসহযোগ আন্দোলন ও অস্ত্রায় আইন অমান্য করিয়া জগন্মান্ত হইয়াছেন, এবং যে কবি জালিয়ানওয়ালাবাগেব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভীত প্রতিবাদ করিয়া নিজের সম্মানজনক খেতাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দুই মহনীয় চরিত্রের সমাবেশে যেন এই ধনঞ্জয় বৈবাগীর চরিত্র সংগঠিত।

পবে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই নাটকে আরও কিছু পরিবর্তন করিয়া ‘পরিভ্রাণ’ নামে ইহা প্রকাশ করেন। উহাতেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। এখানেও রাজশক্তির অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ হইয়া ধনঞ্জয় বৈবাগী, উন্নয়নদিত্য রাজকুমার এবং সুরমা বুধরাজমহিষী বিপদকে অগ্রাহ করিয়া সত্য ও সত্যের নির্দেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে।

মুক্তধারা নাটকখানিও এই পর্বারের, তাহাতেও ধনঞ্জয় আছে। যে-সব ভীত বুক প্রজারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে পারে না, তাহাদের মুখপাত্র ও বালীমূর্তি এই ধনঞ্জয় বৈবাগী—তিনি বৈবাগী বলিয়া সকলেই তাঁহার আপন এবং সত্য ও সত্য তাঁহার ধর্ম।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলিতে যে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের বচনাব তাবিধ হইতেছে ১৩১৩ হইতে ৩০এ শ্রাবণ ১৩১৭ সাল পর্যন্ত। গানগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে, কতক কলিকাতায়, এবং কতক শিলাইদহে রচিত। এষ্ট-সব গান কবি যেমন যেমন রচনা করিয়াছেন আর অমনি আমাদের ডাকিয়া গাহিয়া গাহিয়া শুনাইয়াছেন। এই জ্ঞাত এই গানগুলির সঙ্গে আমার অনেক মধুব স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের ১০০টি বৈশিষ্ট্য হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত, শেষ গান ৩০এ শ্রাবণ ১৩১৭ তাবিধে রচিত। পুস্তক প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসে। খেয়ার চাব বৎসর পরে গীতাঞ্জলি ভগবানের উদ্দেশ্যে কবি নিবেদন করিয়াছেন। কবির ভগবৎপ্রেম এখন খেয়ার যুগের চেয়েও প্রগাঢ় হইয়াছে, মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে, এবং ভগবান এখন কবির বন্ধু সখা প্রিয় দয়িত স্বামী হইয়াছেন। ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান ভক্তের সহিত মিলনের জ্ঞাত অভিসার করেন, ভক্তও অভিসারিকার মতন আগ্রহান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। উভয়ের বিরহব্যথা-বড় গভীর, ক্ষণমিলনের আনন্দও অতি নিবিড়। একবার কবি বিশ্বেরকে বিশ্বের মাঝেই পাইতে চাহিতেছেন, আবার একান্তে তাঁহার সঙ্কল্প উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইতেছেন। এই জগ্গই কবি একবার ভারততীরে মহামানবের মিলন দেখিতেছেন, দুভাগা দেশকে সকল বিচ্ছেদ দূর করিয়া অদ্বৈতের অদ্বয় অমৃতভব কবিতে বলিতেছেন, আবার কবি নিজেকে প্রেমের মূল্যে বিকাইয়া দিতে চাহিতেছেন।

সচ্ছিদানন্দময় ভগবান আপনার প্রেমের আনন্দ অমৃতভব করিবার জ্ঞাত বিধা বিভক্ত হইবার যে এষণা অনুভব করেন, তাহাই সৃষ্টির মূল। যুগল না হইলে প্রেম হয় না। একময় ব্রহ্মের রস-বিলাস-লালসাই সৃষ্টির কারণ। আনন্দ হইতেই বিশ্বের জন্ম। যিনি এক স্বতন্ত্র ছিলেন, তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তদ্-এবাস্তপ্রাতিষ্ঠান তাত্কাতে প্রবেশ করিলেন এবং সর্বগত হইলেন, যিনি ছিলেন অরূপ তিনি হইলেন বহুরূপ ও অপরূপ—রূপং রূপং বহুরূপং বহুব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের প্রেরণা পাইয়াছেন প্রেমের ও আনন্দের অনুভূতির মধ্যে। তাই তাঁহার সাধনা আনন্দকে প্রেমগীতের অঞ্জলি দিয়া। অবাঙ্ মানসগোচর যিনি, তিনি আনন্দের লীলাবিলাসে বিশ্বের সমগ্র সত্তাকে বহু করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাত্মাকে প্রেমের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে বিকশিত দেখিয়াছেন। সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে আপনার নিজস্ব অনুভূতির সমগ্র বৈচিত্র্যে বিশ্বের আনন্দ-শিহরণে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের লীলায়িত তরঙ্গহিম্মলে কবি বিশ্বকবির সঙ্গে প্রেমানন্দের লিপি আদান-প্রদান করিয়াছেন।

গীতাঞ্জলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনাব মূল তত্ত্ব এই—১। অহঙ্কার মিলনের বাধা। তাহাকে ধ্বংস করার সাধনা প্রথমেই অবলম্বনীয়। অহঙ্কারে বিশ্ব প্রতিহত, আনন্দ সন্ধীর্ণ, প্রেম সঙ্কচিত হয়। ২। সংসারে দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সাক্ষ্যকতা আছে। ইহার প্রেমময়্যেব দ্বীতী। আমাদের অসাড় চিত্তকে তিনি আঘাতের স্পর্শ দিয়া জাগাইয়া তদতিমুখ করিয়া তুলেন। যেমন এপ দীপ দগ্ধ হইয়া গন্ধ ও আলোক বিতরণ করে, যেমন চন্দন ঘুট হইয়া স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ বিতরণ করে, তেমনি মানব চিত্তও বেদনার আঘাতে পূজায় রত হয়। ৩। বিশ্বপ্রকৃতির ও নবসমাজের সর্বত্র ভগবানের সত্তা ও লীলা সাধক-কবি সন্দর্শন কবিতেছেন। ভূমাব সজ্জন পাইয়া তিনি বিশ্বচরাচরে ছোট-বড় সকলের মধ্যে পরমদেবতার সামগান শুনিতে পান। একই সত্তা বিশ্বচরাচরকে পরিবৃত্ত করিয়া আছে—এই বিবাক্ট সত্য সুখ-দুঃখের মধ্যে উত্থান-পতনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহত্তের মধ্যে সর্বত্র সর্বদা অনুস্থিত হইয়া বাহিয়াছে। এই জগতেব মধ্যে একটি শান্তিময় সামঞ্জস্য আছে, যাহাব প্রভাবে সকল বিরোধ সকল অভাব মালিনতা অপূর্ণতা পূর্ণের স্পর্শে মহিমাম্বিত হইয়া উঠে। ৪। অঃএব সবার পিছে সবার নীচে সব-হাবাদের মাঝে স্থান লইয়া মৃত্যু-মাঝে হ'তে হবে চিত্তাভয়ে সবার সমান।

এই কবিতাগুলির মধ্যে এক দিকে কাব্যের নিজের আত্মনিবেদন আছে, অপর দিকে দেশের হৃদশায় বেদনাবোধ আছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ৫০টি গানের ইংবেঞ্জী অনুবাদ ও গীতিমালা প্রভৃতি অন্তান্ত পুস্তকের গান ও কবিতার অনুবাদ করিয়া লইয়া ১৩১৯ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৯১২ সালের ২৭এ মে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে এই অনুবাদ কবিতাগুলি কবি ইয়েট্‌স্ প্রভৃতির প্রশংসা ও বিশ্বয় আকর্ষণ করে।

গীতাঞ্জলি নাম দিয়া সেই অনূদিত কবিতাগুলি ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। তাহা মাত্র ২৫০ কপি ছাপা হইয়া বন্ধুদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার একখানি আমি উপহার পাইয়া গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে কবির কবিত্বখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৩২০ সালের ২৭এ কান্তিক ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর এ দেশে সংবাদ আসে যে কবি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সত্যেন্দ্র দত্ত এই সংবাদ পাইয়া একখানি এম্পায়ার কাগজ কিনিয়া লইয়া আমার কাছে আসেন, এবং সত্যেন্দ্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে মিলিয়া কবিকে সংবর্ধনা করিয়া আমাদের সানন্দ প্রণাম জানাইয়া টেলিগ্রাম করি; কবির নিকটে তাঁহার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম প্রথম পৌঁছিয়া সংবাদ শেষ, তাহার পরে আমাদের টেলিগ্রাম পৌঁছে। ইহাতে সত্যেন্দ্র অত্যন্ত কুণ্ঠ হইয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন, আমি টেলিগ্রাম করিতে জানিলে আমার টেলিগ্রামই সর্বাগ্রে পৌঁছিত।

এই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রবীন্দ্র সাহিত্যের ভক্ত স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে যাইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩এ নভেম্বর ১৯১৩ সালে কবিকে সংবর্ধনা করেন। আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া ইউরোপে আমেরিকায় যে প্রশংসাব প্রাবন বহিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একজন মনস্বী কবির অভিমত আমি এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

Je considère certaines pages du Gitanjali la seule de ses œuvres que je connaisse comme les plus hautes, les plus profondes, les plus divinement humaines qu' on ait écrites jusqu' a ce jour.

—Maeterlinck,

I consider certain pages of the Gitanjali—the only one of his work that I know—the highest, the most profound, the most divinely human that have been written to this day.

ভ্রটব্য—করাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকা (অনুবাদ)—ইন্দিরা দেবী।

—সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২১, ৫৫৯ পৃষ্ঠা।

১ নম্বর গান

কবি ভগবানের চরণে মাথা নত করিয়া পড়িতে চাহিতেছেন কিন্তু এ
অবনতি-স্বীকার বড় কঠিন সাধনা—কবি ইহাব তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন
নৈবেদ্যের এক কবিতায়—

হে রাজেন্দ্র, তব কাছে নত হ'তে গেলে
যে উর্ধ্ব উঠিতে হয়, সেথা বাচ মেনে'
লহ ডাকি' সুহৃৎম বন্ধুর কঠিন
শেলপথে।

এই হৃকর সাধনার প্রথম সোপান আপনার অহংভাব পরিত্যাগ করা ;
কারণ, অহংকার মিলনের বাধা, পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধির বাধা। কোনো মানুষ
নিজের মধ্যে পূর্ণ নয়, সকলের সঙ্গে যোগের সত্যতাতেই সে সত্য। অহংকার
মানুষকে সেই সত্য হইতে বঞ্চিত করে।

মানুষ নিজের ছোট-আমিকে গৌরব দিতে গিয়া নিজের বড়-আমিকে
অপমান করে, খর্ব ক্লান্ত করে। তাই কবি নৈবেদ্যে বলিয়াছেন—

যাক আর সব

আপন গৌরবে রাশি তোমার গৌরব

কর্মযোগ-সাধনের যোগ্যতা লাভের জন্ত ভক্ত কবি প্রাণের আকৃতি
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—ধর্মপথের একটা প্রধান অন্তরায় ভগবানের
নামে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে জাহির করিয়া তুলিবার বাসনা ; সেই
পাপ যেন আমাকে পাইয়া না বসে, আমি যেন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যগ্র না
হই। প্রকৃতির প্রিয় অনুচর বড় রিপু স্বকীয় স্বাভাবিক বেশ পরিবর্তন করিয়া
ধার্মিকতার ছদ্মবেশে সাধককে প্রবঞ্চিত করিয়া পথভ্রষ্ট করিতে চাহে। তাই
ধর্ম-প্রচারের ছলে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচারক-
সমাজে বিরল নহে। অতএব আমাকে রিপু হস্ত হইতে বক্ষা করো এবং
আমি যেন বলিতে পারি—

তোমার উচ্ছ্বাস উক পূর্ণ করণামণ্ড স্বামী,

* * *

মাহ-বন্ধ ছিন্ন করো কল্প-কঠিন আঘাতে,

অশ্রুসজল-মোড় হৃদয়ে থাকো দিবসধামী।

তুলনী—৪৭, ৫৪, ৮২, ৮৮, ১৪৪ নম্বর গান।

৩ নম্বর গান

কত অজানারে জানাইলে তুমি।

প্রেমের আনন্দ-স্বরূপে অগৎ মধুময় হয়; প্রেমের ধর্ম দূরকে নিকট করা, আপনাকে ভুলিয়া পরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা, প্রেমই আমিষের অহঙ্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ঘুচাইয়া দেয়। প্রেমস্বরূপ এককে জানিলে আর কোনো বিভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। প্রেমে সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে, কিন্তু কোথাও যেন আসক্তি প্রবল হইয়া সেই প্রেমকে বন্ধনে পবিত্র না করে। সেই জন্ত কবি বন্ধন স্বীকার করিয়াও সেই বন্ধন মোচনের প্রার্থনা করিয়াছেন—

বৃত্ত কবো হে নবাব সঙ্গে

মুক্ত করো তে বন্ধ। —৫ নম্বর।

যে নৃতনের সঙ্গে মিলন হইবে, প্রেম-বন্ধন হইবে, তাহারই মধ্যে দেখিতে হইবে যিনি পুরাতন শাস্ত্র চিরন্তন তিনিই বিরাজমান। তাহা হইলে আব প্রেম-সম্পর্ক বন্ধন হইতে পারিবে না।

৪ নম্বর গান

বিপদে ঘোর বক্ষা কবো, এ নহে মোর প্রার্থনা।

ভক্ত কবির ভগবানের কাছে যাক্ষা আছে কিন্তু বক্ষনা নাই, দীনতা নয়তা আছে, কিন্তু ভীকৃত্য নাই; কারণ, তিনি জানেন—নাশমায়া বলহীনেন লভ্যঃ।

তুলনীয়—২০, ২২ নম্বর গান

৬ নম্বর গান

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পূজকে।

রবীন্দ্রনাথ ভূমাকে প্রেমের অঞ্জলি দিয়া অভিনন্দন ও বরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে সবই সুন্দর, সবই মধুময়। তিনি সর্বস্বন্ধরে পরম-

সুন্দরকে অসুভব করিতেছেন। প্রাচীন ঋষিদের সচিত্র কণ্ঠ মিলাইয়া এই ঋষি কবি বলিতেছেন—

তেজো বৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পত্ন্যমি।

বোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ —ভাষ্যোপনিষৎ, ১৬।

তোমার যে অতি শোভন কল্যাণতম রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে সর্বত্র দেখি। সেই পুরুষ যিনি, তিনি আমি।

এই বোধ যাহাতে মনের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে এই জন্ত কবি বলিতেছেন—‘চেতন আমার কল্যাণরস-সরসে শতদল সম’ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকুক।

৭ নম্বর গান

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ভগবানের অতুল ঐশ্বর্য ও অপাব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তথাকথিত নিরাকার নহেন, আবার সাকারও নহেন। তিনি অরূপ, অপকূপ, এবং এই জন্তই তিনি বহুকূপ, অনন্যকূপ। তাই কবি সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেন।

অপরূপ কত কণ বরশন। ২২ নম্বর গান।

গীতাঞ্জলি পুস্তকে এই গানটিন বচনাব তারিখ মেওয়া হইয়াছে অগ্রহায়ণ ১২১৪ সাল কিন্তু ইহা ভুল। ইহার বচনার তারিখ ৭ই ভাদ্র ১৩১৫ সালের পবের কোনও তাবিখ হইবে। শারদোৎসব নাটিকাব বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৩ নম্বর গান

আমাব নয়ন ভুলান এলে।

এটি শারদোৎসবের গান শারদোৎসব নাটিকার অনেকগুলি গান এই গীতাঞ্জলি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

কবির প্রেমাস্পদ পরম সুন্দর অভিসারে বাহির হইয়াছেন, যিনি নয়ন-ভুলানো তাঁহাকে কবি হৃদয় মেলিয়া দেখিতেছেন। এই সুন্দরকে তো কেবল চোখে দেখিলে তাঁহার পূর্ণ পবিচর লওয়া হইবে না, তাঁহাকে হৃদয় মেলিয়াও

দেখিতে হইবে, সর্বপ্রাণে অহুভব করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে তিনি ভূত্বঃস্বর্গোক্তের সবিভা এবং তিনি আবার অন্তরে ধীশক্তিব প্রেরয়িতা—যিনি বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু প্রসব করেন, তিনিই মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধও উৎপাদন করেন।

১৬ নম্বর গান

জগৎ জুড়ে উদার হয়ে আনন্দ গান বাজে।

কবি আনন্দরূপম্ অমৃতম বিম্বে দেদীপ্যমান দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছেন সেই আনন্দ-রূপ তাঁহার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। হৃদ্যব আনন্দে ব্যক্তি বিম্বচরাচবের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, প্রেমের মন্মাকিনীধাবার স্বাৰ্ণপবতার মলিনতা দৌত হইয়া যায়।

তুলনীয়—

দাদু যট রে' সুখ আনন্দ হৈ তব সব ঠাহর সেই।
যট রে' সুখ আনন্দ বিন সুখী ন দেখা কোট।
যে সব চরিত তুমহারে 'মোহন মোহে সব ব্রহ্ম'ড খণ্ড।
মোহে পবন পানী পরমেশ্বর সব যুনি মোহে ববি চ'ডা ॥
সায়র সপ্ত মোহে ধরনীধরা অষ্টকুলা পবনত মেক মোহে।
তিন লোক মোহে জগজ্জীবন সকল ভবন হেরী সেব মোহে ॥
মগন অগোচর অপব অপব'পার জো রহ তেরে চরিত ন জানাই।
রহ সোভা তুমহকো সোচই হৃদ্যব বলি বলি জাউ দাহ ন জানাই।

হে মোহন, এই যে সব ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড, ইহা তোমারই লীলাচরিত, ইহার সকলে আমাকে মুগ্ধ করে। পবন বায়ু রবি চন্দ্র সবই আমাকে মোহিত করে হে পরমেশ্বর। সপ্ত সাগর অষ্টকুলাচল পর্বত মেক সবই আমাকে মুগ্ধ করে হে জগজ্জীবন। এই তিন লোক আমাকে মোহিত করে। সকল ভবনে তোমারই সেবা শোভা পাইতেছে। অগম্য অগোচর অপার অসীম যে এই তোমার চরিত তাহা তো আমি জানি না। এই শোভার তুমি সুশোভিত হে জ্ঞানর, আমি দাছ তোমার বাহিরে বাইতেছে, তোমাকে তো আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না!

২১ নম্বর ও ১২ নম্বর গান

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিনায়।

কবির প্রেমাম্বল তাঁহার জীবনে প্রেমাজিসারে আসিতেছেন রুদ্ররূপে।

২৩ নম্বর গান

তুমি কেমন ক'রে গান করো যে শুণী।

যিনি কবিমর্নিষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ তাঁহার কাব্যরচনা এই বিশ্বচরাচর। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বকবির বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়া অবাক হইয়াছেন এবং তিনি সেই বিশ্বসুরের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইতে অজস্র গান রচনা করিয়া চলিয়াছেন। তাই কবি পরে বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে নিজের সুর মিলাইবার কথা অল্প একটি গানে বলিয়াছেন

আজিকে এই সকালবেলাতে

ব'সে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেনাতে।

২৪, ২৫, ২৬ নম্বর গান

কবির মনে অমুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়াই বিরহাশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার যখন বিরহ আসিয়াছে তখন ধীরতা মধুরতা তন্ময়তা তাহার চিত্ত পূর্ণ করিয়াছে। জগতের সঙ্গে জগদীশ্বরের মিলনের মধ্যে একটি চিরবিরহ আছে। এই অল্পই মিলন এত সুন্দর মধুর হই, এবং মিলনের জন্ত এত ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়া থাকে। সকল সৌন্দর্যের মধ্যে অনির্বচনীয়কে অনুভব করিবার ব্যগ্রতা এই বিরহ। কবি নিজের বিরহকে বিখে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছেন। ভক্তের যে বিরহ, সেই বিরহ-বাখ্য ভগবানের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন

তুমি আমার হৃদয়ে দূরে,

ডাক্বে তাবে নানা সুরে,

আপনার বিরহ তোমার

আমায় নিল কাণ।—গীতিমালা।

২৯ নম্বর গান

প্রভু, তোমা লাগি আঁধি জাগে।

কবি প্রিয়তমের জন্ত বাসকসজ্জা করিয়া পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

৩০ নম্বর গান

ধনে জনে আছি জড়ারে হাব।

কবি অহং ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র। ঋণ ছাড়িয়া অধণ্ডকে অবলম্বন করিতে অধণ্ডের মধ্যে ঋণ্ডকেও পাওয়া হইয়া যাইবে।
কবি অনুভব করিতে চাহিতেছেন যে

ঈশা বাস্তব্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন তাজেন ভুঞ্জীথাঃ বা গৃথঃ কস্তশ্চিৎ ধনন্ ॥

৩৩ নম্বর গান

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।

বরকে বধুর মৈনতি—যিনি ছিলেন অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত তিনি হইবেন আজ হৃদয়েশ্বর। তুলনীয় খেয়াল 'বালিকা বধু' কবিতা।

মানুষ স্বল্পবুদ্ধি। সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যাহা নির্গণ করিতে চেষ্টা করে তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত হয়। অতএব যিনি সব-কিছুর শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পান সেই চিরায় পরমেশ্বরের বিধানের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা শ্রেয়। তাই কবি বলিতেছেন

বা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,

বা বুঁজি সব ভুল বুঁজি হে।

এমন কথা 'তিনি আগেও একাধিক বার বলিয়া আসিয়াছেন

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,

যাহা পাই তাহা চাই না।—উৎসর্গ, পাগল।

খুঁজিতে গিয়া বৃথা খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেই করি দূর।

—উৎসর্গ, চিঠি।

৩৪ নম্বর গান

আবার এবা ঘিরেছে মোব মন।

এরা অর্থাৎ সামান্য তুচ্ছ ক্ষুদ্র বা কিছু। তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার
পাইবার উপায় একমাত্র—ভূমাকে নিত্য নিরন্তর নিজেব চেতনার মধ্যে
জাগ্রৎ করিয়া রাখা।

নিষত মোব চেতনা' পবে রাগ
আলোকে ভরা উপব হ্রিভুবন।

৩৫ নম্বর গান

আমার মিলন লাগ' তুমি হাসতু কবে থেকে।

এই জগৎ যেমন বহুমান চলমান, এই জগতের স্বামীও তেমনি নিত্য
নবনবায়মান। লোক লোকান্তরেব ও জন্মজন্মান্তরেব মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির
যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবন পূর্ণ পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে,
সেই পথেই—যিনি সকল পথের অবসান, যিনি পরম পরিণাম, তিনি সঙ্গি-
রূপে পথিক-রূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেন। কবির জীবনে জীবনে লীলা করিবার
জন্তু তিনি যাত্রা করিয়া বাহিব হইয়াছেন। এই জন্তুই তো এই পরিচিত
জগদন্তুর মধ্যে সেই অদৃশ্যের^{*} ছায়া পড়ে; এবং সেই মিলনানন্দের
পরিচয় পাইয়া কবি বলিয়াছেন

রূপ-মাগবে ডুব দিখোঁছ
অকপ বতন আশা কবি।

—৪৮ নম্বর গান।

৩৬ নম্বর গান

এস হে এস সজল ঘন, বাঘল বরষণে ।

নববর্ষার আগমনে

বাধিয়ে উঠে নীপের বন

পুলক-ভরা ফুলে ।

উছলি উঠে কলরোদন

নদীর কূলে কূলে ।

এ কী আশ্চর্য বৈপরীত্যের একত্র সমাবেশ । যেখানে ব্যথা সেখানে
পুলক, এবং সেখানেই আবার কলরোদন । ইহার কারণ

আনন্দ আজ কিসের ছলে

কাঁদিতে চার নয়ন-জলে,

বিরহ আজ মধুর ত'য়ে

করেছে প্রাণ ভোব ।

— ৪৩ নম্বর গান ।

৪৫ নম্বর গান

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ ।

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির উপভোগের জন্ত
যজ্ঞেখর আয়োজন করিয়া নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছেন ।

তুলনীয়—

ভারী জলসা আজ্ঞা দাবত, তুঁতি টক মিহ্মান ।

—জ্ঞানদাস বস্বোলী ।

৫৮ নম্বর গান

তুমি এবার আমার লহ তে নাথ লহ

কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন যে আমি তো নিজেকে
তোমার কাছে সম্প্রদান করিয়া দিতে পারিলাম না, তুমিই এখন আমাকে

করণা করিয়া গ্রহণ করো। কিন্তু আমার মধ্যে কলুষ ও ফাঁকি আছে বলিয়া আমাকে সেই দোষে পরিত্যাগ করিয়ো না। তুলনীয়—৭৬ নম্বর গান।

৬০ নম্বর গান

এবার নীরব করে দাঁড়াই তুমি আমার মুখের কবিরে।

রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়া যেমন কবি-বাণীকে নিজের সূত্বে অহুপ্রাণিত করিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, তেমনি ভগবানের হাতে কবি স্বয়ং যেন একটি বাণী, বিশ্বকবির সূত্বে এই মানব-কবির জন্ম-রক্তে সূরের দ্বারা নির্গত হইতেছে। কবি মাঝেই যেন পরমকবির এক একটি জীবন্ত কবিতা।

তুলনীয়—

ধন্য আমি বাণীতে তোমার

আপন মুখের কৃষ্ণক।—বাউল

৬১ নম্বর গান

বিশ্ব যখন নিরামগন, গগন অন্ধকার।

বিশ্ব যখন মোহমুগ্ধিতে নিমগ্ন, তখন কবির সদাজাগ্রত চিত্তে পরমসুন্দরের সাড়া লাগে। কিন্তু তাঁহাকে তো কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়া উপলব্ধি করা যায় না, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অনন্তের ভিতর দিয়া তাঁহার ক্রমাগত আগমন।

সে যে আসে আসে আসে।—৬৩ নম্বর গান।

৬২ নম্বর গান

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

জ্বলিয়ে তুমি ধরায় আস।

১৭ পৌষ, ১৩১৬ সালে রচিত হয় এবং ৬ই মাঘ মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে গীত হয়। ইহা তত্ত্বকে, সাধককে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত।

৬৬ নম্বর গান

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে

মানবের জীবধাত্রা তো অনাদি কালের কাহিনী ॥ মানব ক্রমাগত অগসর হইয়া চলিয়াছে যিনি পূর্ণতম তাঁহারই সহিত মিলনের জ্ঞাত—নিজেকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার জ্ঞাত। যে জীবনে যেখানে মানব থাকে সেখানেই সে পূর্ণের সহিত মিলনের সাধনাই করে। যিনি নামরূপের অতীত, তাঁহাকে বহু নামে ডাকা এবং বহু রূপে দেখা সম্ভব। তাই কবি সেই অনাম ও অরূপকে বলিয়াছেন ‘তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।’ কেবল একাকী থাকার কোনো আনন্দ নাই, এইজন্ত ভগবান নিজেকে বহুতে পরিণত করিয়াছেন—প্রেম দেওয়া ও লওয়ার খেলা খেলিবার জ্ঞাত, এবং কবিও বুঝিয়াছেন—‘আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগলপ্রেমের স্রোতে’। এবং এই ‘যুগলপ্রেমে’ মগ্ন জীব ‘পুরাতন প্রেমে নিত্য নূতন সাজে’ জন্ম জন্মান্বরের বহিঃ দিয়া অগসর হইয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রের প্রতি, প্রবাসী, স্বদূর, ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য।

৬৭ নম্বর গান

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই।

কারণ, আমি ক্ষুদ্র, আর তুমি বিরাট, তুমি ভূমা।

৭৫ নম্বর গান

‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশ।

চরম সত্য ও পরম সত্য হইতেছে রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। অশাস্তিকে অস্বীকার করিয়া যে শান্তি তাহা সত্য নয়। ইহা বুঝিয়াই কবি বজ্রের বাঁশ আর ঝড়ের আনন্দ-বীণার ঝঙ্কার নিজের জীবনে সাধিয়া লইতে চাহিতেছেন। কবি ত্যাগের সাধনাকে ও বেদনা-বরণের সাধনাকে সকল সাধনার চেয়ে বড় করিয়া জানিয়াছেন।

তুলনীয়—৭৮ নম্বর গান।

৮৪ নম্বর গান

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি

আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রাকে নৌযাত্রার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন অনেক দেশের অনেক কবি—ফরাসী কবি বোদলেয়ার বলিয়াছেন ‘হে মৃত্যু! বন্ধ কাশ্চেন ! এবার নোঙর তোলো ।’

৮৯ নম্বর গান

চাই গো আমি তোমাকে চাই,

তোমাঘ আমি চাই—

এই কথাটি সদাষ্ট মনে

বলতে যেন পাউ ।

মানব ভগবানকে চাহে, কিন্তু সেই বোধ সর্বদা জাগ্রত থাকে না । কবি সচেতন ভাবে সেই সাধনা করিতে চাতিতেছেন । পিতা নোহসি—তুমি আমাদের পিতা, ইহা তো সত্য, কিন্তু পিতা বোধিঃ—তুমি যে আমাদের পিতা, এই বোধ যদি সচেতন হইয়া মনে না জাগ্রত থাকে তবে তাতা আমার জীবনে সত্য হইয়াও সত্য নয় ।

৯৩ নম্বর গান

দেবতা চান নব বই দাঁড়ায়ে,

অপান তান আদব করিনে ।

বৈষ্ণবধর্ম মানবের সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্তর্ভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু কেবল মাত্র ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখিয়া যে সম্বন্ধের ভাব, তাহাকে বৈষ্ণব সাধকেরা প্রেম-সাধনার প্রথম ও নিম্ন সোপান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । এইজন্ত চৈতন্তদেব সনাতন গোষ্ঠ্যমীকে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন

ঐশ্বর্যজ্ঞান-সেধানায়ে সঙ্কুচিত জীতি ॥

কেবল-সুখ-প্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে ।

ঐশ্বর্য দেখিলে নিম্ন সত্ব না মানে ॥

—চৈতন্তচরিতামৃত, ১৯শ পরিচ্ছেদ । মধ্য, ৮ম ব্রহ্মব্যা ।

অন্তএব ভগবানকে পিতা সখা ভাই প্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া সর্ব সম্পর্কের মাধুর্য অমুভব করিতে হইবে এবং তিনি সর্ব মানবের মধ্যে বিরাজমান ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বপ্রেমিক কবি সর্বভূতে সর্বভূতেশ্বরের আবির্ভাব অমুভব করেন—তিনি অমুভব করেন সর্বং খনিৎ ব্রহ্ম। কবির এই বিশ্বাসভূতি নূতন নহে, অতি শৈশব হইতে তিনি ইহা অমুভব করিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন—তুলনীয় প্রভাত-উৎসব, শ্রোত, এবার কিরাও মোরে, ইত্যাদি।

নিখিলের স্মৃৎ, নিখিলের দুঃ, নিখিল প্রাণের জীতি।

একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি ॥

—অনন্ত প্রেম।

৯৫ নম্বর গান দ্রষ্টব্য।

১০২ নম্বর গান

তে মোর দেবতা, ভরিবা এ ঘেহ প্রাণ

কবি যেমন নিজের সার্থকতা জীবনদেবতার মাঝে পাইয়াছেন, তেমন ইহাও বুঝিয়াছেন যে জীবনদেবতাও প্রেমিকের মতন কবির গানের পাত্রে আপনার সৃষ্টির আনন্দ-সুখ পান করেন। কবি তাঁহার প্রেমে পরমকবিকে সার্থক করেন, এবং নিজেও সার্থক হন। প্রেমে প্রেমের বিষয় ও প্রেমের আশ্রয় উভয়েই থন্ড হন।

১০৩ নম্বর গান

এই মোর সাথ যেম এ জীবন মাঝে

ভূমি বিরাট, তোমার আকাশ অনন্ত, তোমার আলোকধারা অক্ষরন্ত,
আর আমার চিত্ত ক্ষুদ্র, আমার প্রেম অল্প। আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি-দ্বারা
তোমার বিরাট অমুভবকে আমি যেন কখনো খণ্ডিত না করি, তোমার
অসীমতাকে আমি যেন সঙ্গীর্ণতার গতি টানিয়া প্রতিকূল না করি।

১০৪ নম্বর গান

একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে।

আমি একাকী ভগবানের প্রেমাভিসারে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি,
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে আমার আমিষ, অহঙ্কার, ছোট-আমি। প্রেমাভি-
সারে যে চলে, সে কি কাহারও সন্মুখে প্রিয়ের সহিত গিলিত হইতে পারে?
আমার লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার ছোট-আমি তো ছোট লোক, সে
ইহাতে লজ্জা অশুভব করে না, সঙ্গও ছাড়ে না, সে আমাদের মিলনে কেবল
বাধা হইয়াই থাকে।

তুলনীয়—

পীতম বুলাওও অনহর-কী পার-সে,
কোন বেশরম আজ তের সাখ জাউ।—কবীর।

প্রিয়তম ডাকিতেছেন অন্ধকাবের গাথ হইতে, এমন কে নির্গল্ভ আছে যে এই অভিসারের
সঙ্গী হইবে?

ভারততীর্থ

১০৭ নম্বর কবিতা

(রচনার তারিখ ১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭)

কবির কাছে তাঁহার স্বদেশ বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি, কাজেই এই স্বদেশ
বিশ্বেশ্বরের মন্দির, তীর্থস্থান, বিশ্বমানবের মিলন-ক্ষেত্র, জগন্নাথ-ক্ষেত্র। কেহ
বিশেষী বা বিধর্মী বলিয়া কবির কাছে অবহেলিত বা অনাদৃত নহে, তাঁহার
কাছে কেহ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য স্বেচ্ছ নহে।

তুলনীয়—

তোমার লাগিয়া কারেও রে শ্রু,
পথ ধেড়ে খিটে বলিষ না কড়ু.
যত জ্ঞান আছে সব জ্ঞান মোরে
তোমা পানে র'বে টানিতে।

সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম

আমার স্বপ্নশানিতে ।

সবার সহিতে তোমার বীধন

হেরি যেন দগা—এ মোর সাধন,

সবার সঙ্গে পারি যেন মনে

তব আরাধনা আনিতে ।

সবার মিলনে তোমার মিলন

জাগিবে স্বপ্নশানিতে ॥

—নৈবেদ্য ।

নূতন নাটিকা চণ্ডালিকা দ্রষ্টব্য । এবং তুলনীয়—

Better pursue a pilgrimage

Through ancient and through modern times

To many peoples, various climes,

Where I may see saint, savage, sage,

Fuse their respective creeds in one

Before the general Father's throne !

—Robert Browning, *Christmas Eve*.

Passage to India !

Lo, soul, seest thou not God's purpose from the first ?

The earth to be spann'd, connected by net-work,

The races, neighbors, to marry and be given in marriage,

The oceans to be cross'd, the distant brought near,

The lands to be welded together

—Whitman, *Passage to India*.

অপমান

১০২ নম্বর কবিতা

(রচনার তারিখ ২০ আষাঢ়, ১৩১৭)

জাতিভেদের দ্বারা, জ্রীলোকদের প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা ভারতবর্ষ বহু বর্ষ ধরিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারই ফলে আজ সে বিশ্বভাষ্য নিজে অস্পৃশ্য অস্বাক্ষ অগ্ন্যঙ্কের হইয়া পড়িয়াছে—এই কথা কবি বহু স্থানে বারংবার বলিয়াছেন । 'মাতৃবকে অপমান করার পাশে ভারতবর্ষ ভগবানের স্মার-বিচারে অপমান-রূপ শাস্তিই প্রতিকূল-স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু ভগবান্ পণ্ডিতপাবন, তিনি কাহাকেও হীন পণ্ডিত বলিয়া অবহেলা করেন না ।

তুলনীর—

You cannot do wrong without suffering wrong ; . . The exclusionist does not see that he shuts out the door of heaven on himself, in striving to shut out others.

—Emerson, *Essay on Compensation*.

জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেরে ভিখারী, অতু প্রেমের ভিখারী ।

সে যে এসেছে এসেছে কাঙালের সভার মাঝে এসেছে এসেছে ।

কোথা রইল ছত্র দণ্ড, কোথা সিংহাসন,

কাঙালের সভার মাঝে পেতেছে আসন ।

কোথা রইল ছত্র দণ্ড ধ্বংসে লুটায়,

পাতকীর চরণ বেণু উড়ে পড়ে পায় ।

পতিতের চরণ-বেণু শোভে তোমার পায় ।

জ্ঞানের অগম্য, প্রেমে দাসের অমুখাস,

সবার চরণতলে গ্রহু তোমার বাস ।

—বাউল ।

১২০ নম্বর গান

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে ।

মন্দিরের মধ্যে সমস্ত মানব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে আরাধনা তাহা
তো জগন্নাথের আরাধনা নহে, জগতের একটি প্রাণীকে যে ঘৃণা করিয়া দূরে
সরাইয়া রাখে, তাহার প্রণাম তো বিশ্বব্রহ্মের পায়ে গিয়া পৌঁছায় না, কারণ

যেখান থাকে সবার অধম দ্বীনের হাতে বীন

সেইখানে যে চরণ তোমার রাজ্যে—

সবার পিছে, সবার নীচে,

সবহারাদের মাঝে ।

যখন তোমার প্রণাম করি আমি,

প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় আমি,

তোমার চরণ যেখান নামে অপমানের তলে

সেখান আমার প্রণাম নামে না যে,

সবার পিছে সবার নীচে

সবহারাদের মাঝে ।

—১০৮ নম্বর গান ।

সমস্তকে স্বীকার করিলেই তবে অনন্ত অসীম পরমেশ্বরের সম্যক ও সমগ্র উপলব্ধি হইবে, কিছুকে ত্যাগ করিয়া মুক্তি নাই, স্বয়ং ভগবান বলিয়া ফিরিতেছেন—

জগতে বরিত্ররূপে ফিরি দয়া করে ।

গৃহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ধরে ॥

—চতালি ।

১২১ নম্বর গান

সীমার মাঝে অসীম ডুমি বাজাও আপন হৃদয় ।

তুমি এক দিকে বিশ্বাতীত, অন্ম দিকে বিশ্বময় ; এক দিকে নিগূর্ণ নেতিবাচক, অপর দিকে সগুণ ; তিনি এক হইয়াও বহুত্বপূর্ণ জগতেও আধার । একই আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত কবিয়া বহুর মধ্যে অন্তহিত থাকিয়া বহুকে একত্রে ধারণ করিয়া আছেন—হৃদ্রে মণিগণা ইব । এই অনন্তের সুর সান্ত্বে মধ্যে বাজে বলিয়া আমরা অন্তর্ভব করিতে পাবি যে আমরা বদ্ধ জীব নই, আমাদেরও মুক্তি আছে, আমরা অমৃতন্ত পুত্রাঃ অ-মৃত । এই বৃহত্তর আনন্দের দিকটা ধাঁহাদের জীবনে যত বেশি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার মানবজন্ম তত বেশি সার্থক হইয়াছে । আমাদের কবি ঋষি তাঁহার জীবনে এই সার্থকতা লাভ কবিয়াছেন ।

১২২ নম্বর গান

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর ।

ভাগ্যে জীব নিজেকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র সত্তা মনে করে, তাই তো উত্তরের বিরহ-মিলন এত আনন্দ । নহিলে ঈশ্বরের আপনাতে আপনি থাকতেই বা কি আনন্দ, আর আমাদেরই বা ব্রহ্মনিবাশে কি আনন্দ ? এইজন্ত বৈষ্ণব সাধকেরা বলিয়াছেন

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় যুগা দ্রাস ।

ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় উল্লাস ॥

—চতুস্তরিতারুত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

১২৬ নম্বর গান

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার।

কবি পূর্বের অলঙ্কারবহুল ভাষা ত্যাগ করিয়া এখন সহজ সরল ভাষায় প্রাণের আকৃতি ব্যক্ত করিতেছেন। নৈবেদ্য পর্য্যন্ত কবির ভাষা ছিল অলঙ্কার-ভূষিত। পরের রচনার প্রসাদগুণই হইয়াছে অলঙ্কার।

১৩১ নম্বর গান

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

ভগবান্ নিজের সৃষ্টিতে, নিজের সৃষ্ট জীবের নিজেকে উপলব্ধি করেন। কবি যেন পরমচৈতন্যময়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, অথবা সেই চৈতন্যই হইয়া উঠিতে পারেন, এই প্রার্থনা নিরন্তর করিয়াছেন। এই ভাবের দ্বারা তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান অনুপ্রাণিত। কবি মাংসের আবরণ ভেদ করিয়া জ্ঞানের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন।

১৩৩ নম্বর গান

গান দিবে যে তোমায় খুঁজি।

আমাদের কবি কেবল কবি নহেন, তিনি গানের রাজা। তিনি গানের অঞ্জলি দিয়া প্রিয়তমের পূজা করেন। যখন মাহুষের ভাব গভীর হয় তখন আর গন্তে তাহা কুলায় না, তখন সে পশ্চের আশ্রয় লয়; সেই ভাব আরও গাঢ় ও গূঢ় হইলে তখন আর কবিতাতেও কুলায় না, তখন সে গানের স্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই কবি অন্তর বলিয়াছেন।

মন দিবে যে নাগাল বাহি পাই,

গান দিবে তাই চরণ ছুঁয়ে যাই,

স্বরের ঘোরে আপনাকে বাই ডুলে,

বন্ধু বলে ডাকি ঘোর প্রভুকে।

১৩৪ নম্বর গান

তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।

কারণ, তুমি অনন্ত, আর আমার জীবনযাত্রাও অনন্ত। আমি
অনন্তপথযাত্রী।

১৩৫ নম্বর গান

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে।

ফরাসী কবি পাঙ্কাল তাঁহার মিস্তেয়ার ছ ভ্লেমুস কবিতায় যে ব্যাকুল
স্পন্দনের কথা বলিয়াছেন, কবি বিশ্বপ্রাণের সেই স্পন্দন অনুভব করিতে
চাহিতেছেন, ইহা কেবল আনন্দের স্পন্দন। বিশ্বপ্রাণের অন্তর্ভুক্তি এবং সেই
প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্তি হইতে এই আনন্দ স্বতঃই উৎপন্ন হয়।
তুলনীয় —

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াচে বিশ্ব দিগবিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তাহা লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;... ..

* * *

সেই ধূগ-ধূগাস্তরের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।—নৈবেদ্য।

১৩৮ নম্বর গান

আমার চিন্তা তোমার নিত্য হবে, সত্য হবে।

সত্য কালক্রমাবধিত ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানে অপরিবর্তিত, আবার সত্য
সচল সক্রিয়। এই সত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা হওয়ার সাধনাই সকল মনশী করিয়া
থাকেন।

১৪২ নম্বর গান

মনকে আমার কাগাকে

কবি নিজের ক্ষুদ্র-আমিকে বিসর্জন দিয়া আমার পারে বাইতে চাহিতেছেন।
এই যে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে পৃথক্ ভাবি ইহাই তো মায়া। ইহা যদি
হয়, তবে

ভূমি আমার অনুভবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা।
সরিয়ে দিবে মাগাকে,
মনকে, আমার কাগাকে।

১৪৪ নম্বর গান

নামটা যেদিন ঘুচ্বে নাথ।

কবি নিজের অহঙ্কারের ক্ষুদ্রতার গণ্ডী হইতে, আপন মন-গড়া সঙ্কীর্ণতা
হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। উপাধি, খ্যাতি, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি
সমস্তই মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের বাধা।

১৪৭ নম্বর গান

জীবনে যত পূজা হলো না সারা।

কবির চক্ষে সকল অসম্পূর্ণতাই পূর্ণতারই অগ্রদূত, বিফলতার সোপান
দিয়াই সফলতার উপনীত হওয়া যায়।

১৫৬ নম্বর গান

শেষের মধ্যে অশেষ আছে।

মৃত্যু যদি সকলের শেষ হয় তবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমাদের তো
অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে—সেই ভূমা তো সত্য শাস্ত অমৃত। তাই জীবন-বরণ
একই জীবন-প্রবাহের অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যু জীবনের সম্পূর্ণতা-লাভের সোপান

বা দ্বার। এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্ত থাকিলা যায়, মরণের পরে
বে অনন্ত জীবন আসে সেখানে সকল অভাবের সম্পূরণ হয়। জীবনের সকল ক্লম
বিরোধ গ্লানি ও অসম্পূর্ণতা মরণের পূতধারার বৌত হইয়া যায়—তাহার পরে
অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ !

ভুলনীর—পূর্ববী কাব্যে 'শেষ' কবিতা।

ঋতব্য—কাব্যপরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী। গীতাঞ্জলির বৈকব্যভাব—বঙ্কিমচন্দ্র
দাস, স্তব্ধবিশিক সমাচার, আঘাত ১৩৩৫। গীতাঞ্জলি—নবেদ্য বসু, বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৫।

রাজা

যে রূপক নাট্যের আরম্ভ হইয়াছিল শারদোৎসবে, তাহারই পৰ্যায়ভুক্ত এই রাজা নাটক। ইহা ১৯১০ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা ১৩১৭ সাল। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে এই নাটককে অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া কবি আর-একটি নাটিকা প্রকাশ করেন অরূপ রতন। সেই অরূপ রতন নাটিকার ভূমিকায় কবি স্বয়ং এই নাটকদ্বয়ের মৰ্মকথা বিবৃত করিয়াছেন—

“সুদৰ্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাঙারে সক্ষম করা যায়, যেখানে ঘন জন পাতি, সেইখানে সে বনমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিবেদন করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আস্তান করেন, সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয় লইতে ভুল হইবে না, নহিলে যাহারা মন্দির দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাঙ্গিকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদৰ্শনা এ কথা মানিল না। সে স্বপ্নের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আশ্রয় লাগিল, অহরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা দিগা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিকাণ্ডের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিষ প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহাব সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ জন্মে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে বঁাহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।”

কবি অগ্রজ বলিয়াছেন—

—“রাজা নাটকে সুদৰ্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে-অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিলে, অন্তরে বাহিরে যে যোগ অশান্তি জাগিলে তুলিলে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলিলে পৌছিলে যিলে। প্রণয়ের যথোপযুক্ত পথ।আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পরে গবেষণা। কিন্তু তাকে যদি বাধাই যদি তবে শেষ কথা বলা হলো না, সেই ব্যাধিতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।”

—আমার ধর্ম, প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

কবি অজ্ঞান বলিয়াছেন—

সুদর্শনা অন্ধকার ঘরের রাজাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন সুরঙ্গমা আর ঠাকুরদাদা। “আপনার অভিজ্ঞতার ভিতরে ভগবানকে না পাইলে কি আর পাওয়া!” পড়িয়া তো আছে শাস্ত্রের রাজপথ। কিন্তু ‘অন্ধকারের স্বামী’ চাহেন না আমরা সেই মজুর-খাটা, সরকারী পথ ধরিয়া তাঁহার মন্দিরে যাই। শাস্ত্রের আলোকে তিনি বিশেষ করিয়া আমাদেরই নহেন, সেখানে তিনি সবকারী। এই অন্ধকার কক্ষে তিনি আমার চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, প্রেম-নিয়ন্ত্রিত সেবার দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের।……অন্ধকারের সাধনা ঘাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সব স্থানেই দেখিয়া থাকেন—ভুল তাঁহার হয় না। ঠাকুরদাদা এই সাধনার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুবঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা।”

“এই নাটকখানির একদিকে অন্ধকার গৃহচারিণী বাণী অজ্ঞানকে বসন্তের উৎসবে উন্নত বহু জনাকীর্ণ নগরী। কবি নাটকটিকে চিত্রাকর্ষক করিতে একটি নাটকীয় দৃশ্যের dramatic contrast-এর সাধা লইয়াছেন। নাটকে এই রকম দৃশ্যগত দৃশ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব। ‘ডাকঘরে’ দেখিতে পাই পথপার্শ্বে বাতায়নে একাকী ক্লগ্ন বালক অমল, সমুৎপন্ন পথে ক্ষীতকার সংসার তাহার মোড়ল দইওয়ালা পাশরাওলা ফকির ও ঠাকুরদার দল লইয়া ছুটিয়াছে। শারলোৎসবে বেতসিনোতীরচাবী বালক উপনন্দ ষণ্ঠশোধে বাস্ত; অজ্ঞান ছুটিব আনন্দে বালকের দল, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর ও সম্রাট বিজয়াদিত্য। রক্তকরবীতেও একই দৃশ্য। রক্ত ধনভাণ্ডারের দেওয়ালের বহু উল্লে’ ছোট একটি বাতায়নের মতো এই হাণ্ড সন্ধানী যক্ষপূরার বুকের উপরে রক্তনের ভালোবাসার কাক্সল পরা নন্দিনী। এখানেও সেই একই পাল্য। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা। এই কক্ষটিতে রাজাকে তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইবে প্রথমে; তার পরেই না তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিবে বাহিরের আলোকে।” -রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের আলোচনা, শাস্ত্র-নিকেতন, ১৩৩২ প্রাবণ।

রাণী সুদর্শনা ভুল করিয়া সুবর্ণের রূপে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া অপমানে অভিমানে রাজাকে ত্যাগ করিয়া পিজালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনিবার করিবার জন্ত সাত রাজার মারামারি কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। রাজা ইহাতে খুঁসি হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে এইবার এই আঘাতে সুদর্শনার ভ্রম শুটিবে। ছয়টা রাজা অন্ধকারের আসল রাজার কাছে দণ্ড পাইল, কিন্তু পুরস্কার পাইল কাকীরাজ—যে লরিয়াও হারে নাই, বারে বারে

বীরের মতো রাজাকে আঘাত করিয়াছে। সত্যকে স্বীকার করো, অথবা আঘাত করো—মারামাঝি অল্প কোনো পস্থা নাই।

“রাণী ভুল করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। শব্দকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন—সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি আসক্তিতেই তাঁহার রক্ষার বীজযন্ত্র। তিনি যখনই জানিতে পারিলেন এ সৌন্দর্য প্রকৃত নহে—ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—‘ভীন্ন! ভীন্ন! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই! এমন অপদার্যের জন্মে নিজে একে এত বড় বকনা করেছি।’ কিন্তু বঞ্চিত যাঁহা হইয়াছে তাঁহা বাণীর চোখ, জন্ম নহে। ... এতদিনে বাণীর ভুল ভাঙিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে ঘাটা সুন্দর লাগে তাঁহাব চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্যের জন্ম ‘মাকাজ্জা’ জাগিল—তাঁহার অজ্ঞকার ঘরের মাধনা পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অজ্ঞকার ঘরের স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূজা দিতে পথের ধলাঘ বাড়ির হইলেন।” রাজা নাটকের আলোচনা।

রাজাকে পাঠিতে হইলে সকল অহঙ্কার ও অভিমান তাগ কবিতা দীনবেশে পথের ধলাঘ নামিতে হইবে—বিলম্বে আরামে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে তপস্রার দ্বারা চুপের দ্বারা জয় করিয়া পাঠিতে হইবে। যিনি “আঁধার ঘরের রাজা” তিনিই যে “দুঃখরাতের রাজা” (খেয়া, আগমন)।

“রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যস্ত নাটকের মতো এপনিও ভাবপ্রধান নাটক ঘটনা প্রধান নহে। প্রধানতঃ ইহার মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নহে—নাথক নাগিকাব চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া। সংস্কৃত ভাষায় নাটকে দৃশ্য কথা বলে। কিন্তু এই জাতীয় নাটকে কাব্যের অনেকটাই অদৃশ্য রহিয়া যায়। সবটা দেখিতে হইলে দৃষ্টির সহিত কল্পনার সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটকে কল্পদৃশ্যকাব্য বলিলে অগ্রাঘ হয় না।—বাজা নাটকের আলোচনা।

“রাজা” নাটক রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ ও ‘গীতমালা’র মাধ্যমের স্রষ্টা; সুতরাং যে অধ্যাত্ম-আকৃতি ও আকাঙ্ক্ষা আমবা এই যুগের কাব্যের মধ্যে পাই, ‘বাজা’র তাহাই রূপ পাইয়াছে নাট্যকীয় ভাবে রূপকের মধ্যে, যেমন ‘নবেশ ও গীতাঞ্জলি’র মধ্যে পাইয়াছিলাম ‘খেয়া’র রূপক কাব্য। ‘রাজা’কে আমরা lyrical drama বলিব, অর্থাৎ ইহার বিকসিতি বাহিরের ঘটনার দ্বারা ভাষ্যমাত্র নহে; উহা অণুরের আশ-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন অমুভূতির রূপ। সেইজন্য আমরা ইহাকে রূপক-নাট্য বলিব না, ইহাকে lyrical নাট্য বলিব।”—কাব্যপরিক্রমা, ২য় সংস্করণ।

রাজা নাটকের নাট্যবস্তুটি একটি বৌদ্ধ গল্প হইতে লওয়া, কিন্তু কবির হাতে পড়িয়া তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

এই 'রাজা' নাটকের পারিশাস্টিক দৃষ্টে বসন্ত ঋতুর আকর্ষণকেই কবি আবাহন করিয়াছেন। শারদোৎসবের ছায় ইহাও একখানি ঋতু-উৎসবের নাটক।

ঐষ্ট্রা—*God The Invisible King*—H. G. Wells (1917).

আমার ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবাসী ১৩২৪ পৌষ, ২৯৭ পৃষ্ঠা। কাব্যপরিভ্রম—অজিতকুমার চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সংস্করণ। রূপকনাটোর ভূমিকা—নৌহাররঞ্জন রায়, ভারতবর্ষ ১৩৩৬ প্রাবণ। অচলারতন, অরূপরতন, কাক্তনী—স্বধাময়ী দেবী, জয়ন্তী, ১-৩৩৮ বৈশাখ।

অচলায়তন

ইহা নাটক। ইহা ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রে সমগ্র ছাপা হয়। উৎসর্গের মধ্যে তারিখ ছিল ১৫ই আষাঢ় ১৩১৮। ইহা নাটক-রচনা শেষ হওয়ার তারিখ অনুমান করা বাইতে পারে। শিলাইদহে লেখা। ইহার পরে কবি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কন'ওয়ালিস ট্রীটেব বাড়ীর ছাদে পাঠ করিয়া আমাদের শোনান।

১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে এই নাটককে সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয়োপযোগী এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম রাখেন গুরু। প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল। এখন এই অচলায়তন শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ গৃঢ়ার্থক মূল্যবান শব্দ হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাটকের ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং এইরূপ দিয়াছেন—

“যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভাব হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্ তৎ কবরো বদন্তি—দুঃপের দুর্গম পথ দিবে সে তার ভয়ভরী বাজিয়ে আসে—আন্তঃ সে দিগ্দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু ব'লেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাঝা বলহীনেন নভাঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

আমি তো মনে করি আজ যুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন ব'লে। তাঁকে অনেক দিনের চাঁকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন ব'লে কেউ প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তিনি যে সমারোহ ক'রে আসবেন তার জন্তে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল। যুরোপের হৃদয়না যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী ব'লে ডুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আঙন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল,—তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, আপন সম্পদ ছেড়ে পথের ধূলোকে উপর দিয়ে বেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই গীতাণির একটি পদ্যে আছে—

এক হাতে গুণ কুপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।”

—আমার বর্ষ, প্রবাসী, ১৯২৪ পর্ব, ২২৭ পৃষ্ঠা।

অগৎ সচল। এই সচলতার মধ্যে যে বা যাহা অচল হইয়া থাকিতে চায়, তাহাই একদিন অকস্মাৎ গুরুর আগমনে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হয়, এবং তখন অনড়কে বাধা হইয়া নড়িতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড অচলায়তন, একজটা দেবীর কালনিক ভয়ে, হাচি টিকটিকি পাঁজি পুঁথি গুরু পুরোহিত শাস্ত্র ইত্যাদি কত কিছুই নিষেধে সে হাজার বৎসর ঘরের দ্বারই খুলে নাই। তাই মহাগুরু আসিয়াছেন ঘর ভাঙিয়া মুসলমান আক্রমণের ভিতর দিয়া। তাহাতেও চৈতন্য হয় নাই, তাহার পরে আসিয়াছেন নানা ইউরোপীয় জাতির আক্রমণের ভিতর দিয়া। এখনো কি চৈতন্য হইয়াছে? এই পাষণপ্রাচীর যে ভাঙিয়াও ভাঙিতে চায় না। তবে ‘বাঁচাখানা হুলছে মুহু হাওয়ার’। হয়তো পিঞ্জরের বিহীন একদিন মুক্ত আকাশপ্রাঙ্গণে ডানা মেলিয়া উড়িবে। তখন সে নিষেধকে নিজে বাঁচাই করিয়া দেখিয়া মানা বা না-মানা স্থির করিবে।

শারদোৎসবের শ্রায় অচলায়তনে কোনো স্ত্রীলোকের ভূমিকা নাই।

এই নাটকের কথাবস্তুর পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

“উপাখ্যানটির মধ্যে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি—ইহারা পরস্পরের সহোদর জাতা, স্তব্ধতাং সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অথচ একজন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, অপর জন মূর্তিমান নিষ্ঠা; পঞ্চক বাহ্যিক কিছু আচার, বাহ্যিক কিছু প্রাচীন প্রথা বাহ্যিক নিষেধ তাহাকেই আবৃত করিবার জন্ত উদ্ভ্রান্তভাবে ব্যস্ত। তাহারই জ্যেষ্ঠ মহাপঞ্চক নিষ্ঠার নিচু, আরতনের সকল প্রাচীন প্রথায় তাহার অচলা ভক্তি। মোটকথা, নিষ্ঠা ও নিজস্বপনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে। কিন্তু কবি এই বিরোধকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। গুরু আসিলেন, অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস হইল, বাহিরের আকাশ দৃশ্যমান হইল, বাহিরের বাতাস আরতনের প্রাঙ্গণে বহিল। অশুশ্রুত কর্তক শোষণপাণ্ড সকলে আসিল। যনে হইল পঞ্চকের জয়, বিদ্রোহেরই জয়। কিন্তু মহাপঞ্চকের নিষ্ঠাকে কেহ অপ্রভা করিতে পারেন না। সেই বিরুদ্ধ আরতনেই নৃতন করিয়া সাধনার আরোহণ হইল, নিষ্ঠার মধ্যেই সত্যের রশ্মি আছে। চঞ্চলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে, চঞ্চল বিদ্রোহ সম্বন্ধিত হইলে সত্যকে অন্তরে পাইবার অবসর হয়।

“রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনের মধ্যে যে কথাটি বিশেষ ভাবে জাগিতোছিল তাহারই রূপ পাই এই নাটকে। ধর্ম ও সমাজ-বিবেক রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী; তিনি চিরদিনই হিন্দুসমাজের জীর্ণ সংস্কার ও মলিন আচারকে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিভক্তি তিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়া হিন্দুজাতির সংস্কৃতির মূল আদর্শকেই সর্বোচ্চ স্থান দিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-বটে, তবে তিনি হিন্দুও। তিনি একাধারে পক্ষের বিদ্রোহ ও মহাপক্ষের নিষ্ঠা। হিন্দু সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিলে যখন সর্ব জাতি সব মানব সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সেই দিনই হিন্দু সার্বক। রবীন্দ্রনাথ সেই হিন্দুকে বিশ্বাস করেন বাহা প্রগতিকের স্বীকার করে ও সংস্কৃতিকেও ত্যাগ করে না। এই সময়ের এই দৃশ্য তাহার অবচেতন মনে এই নাটকীয় রূপ দইরাছিল।”

—রবীন্দ্র-জীবনী, ৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য—অচলায়তন, অরূপ-রতন, কাক্তনী—সুধাময়ী দেবী, জয়ন্তী, ১৯৩৮ বৈশাখ। রূপক-নাট্যের ভূমিকা—নীহারব্রজ রায়, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৬। গুরু—সন্তোষচন্দ্র নজুমদার, সবুজপত্র, ১৩২৪ বৈশাখ, ৩১ পৃষ্ঠা; অচলায়তন—হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সবুজপত্র, ১৩২৪ ভাদ্র, ৩০০ পৃষ্ঠা; পক্ষ—হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সবুজপত্র, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, ৪৮২ পৃষ্ঠা।

ডাকঘর

নাটিকা। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে, ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা তিন দিনে লেখা, শাস্ত্রনিকেতনে কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। এই অভিনয় দেখিতে মহাত্মা গান্ধী, লোকমাতুল টিলক, মাননীয় মালবীয়ারজী, খাপাড়দে, লাক্ষণ্য রায় প্রভৃতি বহু দেশ-সেবক সমবেত হইয়াছিলেন। অভিনয় অসাধারণ সুন্দর হইয়াছিল। এই সময়ে কবি 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানটি রচনা করেন। সেই গান শুনিয়া মালবীয়ারজী বারংবার বলিয়াছিলেন—ঠিক হায়, ঠিক হায়, হুমলোক ছায়াভর-চকিতমূঢ়। রাজা অচলায়তন যেমন lyrical drama ইহাও তেমনি।

মাধব সংসারী বৈষয়িক লোক। সে ধন সঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু তাহার সম্পত্তি যে ভোগ করিবে তাহার এমন কোনো নিকট আত্মীয় নাই। সে পরের ছেলে অমলকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছে, অমল তাকে পিসেমশায় বলে। পরকে আপন করিয়া ধরিয়া বাধিবার জন্ত মাধবের সতত চেষ্টা, সে কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অমলকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, বাহিবে বাইতে দেয় না। কিন্তু জগতে সব কিছুই চলিছে—অমলের জানালায় পাশ দিয়া দইওয়ালার যাত্র, স্নান ফুল তুলিতে যাত্র, দরে পাঁচমুড়া পাহাড়ের চূড়া দেখা যাত্র, রাঙা মাটির পথ নিরুদ্দেশের ইঙ্গিত মেলিয়া দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে। সংসারী বিষয়ী লোক সব ছাড়িয়া নিজের হাতের তৈয়ারী গণ্ডির মধ্যে সব কিছু তরিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু রাজার ডাকঘর হইতে অহরহ নিরন্তর চিঠি আসিতেছে দূরে চলিবার। যাহার মন আছে, দেখিবার মতন চোখ আছে, সে সেই চিঠি পড়িয়া তাহার মর্ম গ্রহণ করে। অমলের কাছে বিজ্ঞ বিষয়ী ও সংসারী মোড়ল উপহাস করিয়া সাধা কাগজ দিয়া বলে—এই তোমার রাজার চিঠি। কিন্তু সেই সাধা কাগজেই ঠাকুরদাধা রাজার আত্মান ও নিয়ন্ত্রণ দেখিতে পান। জগতে যত আলো রং গন্ধ স্পর্শ সুর গান শব্দ ভালোবাসা সবই তো সেই রাজার ডাকঘরের মোহর-মারা চিঠি—সবই তো আমাদের ক্রমগত ডাক দিতেছে যেখানে আছি সেখানে হইতে বাহির হইয়া চলিবার জন্ত নুতনকে অচেনাকে অজানাংকে বরণ করিয়া লইবার জন্ত। বিষয়ী সংসারাসক্ত

মাধব যতই কেন আগ্লাইয়া রাখুক না, একদিন রাজার ডাক-হরকরা মৃত্যু-রূপে আসিয়া হাজির হইল, তখন আর অমলকে সে নিজের কাছে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিল না, অতি-সাবধানী কবিরাজের ব্যবস্থা পণ্ড হইল, মোড়লের উপহাস বার্থ হইল। সেই রাজার ডাককে অবহেলা করেন নাই ঠাকুরদাদা। অমল চলিয়া গেল, কিন্তু সে রহিয়া গেল প্রেমের স্মৃতির মধ্যে—সুখা শেষ কথা বলিয়া গেল—“তাকে বোলো যে সুখা তোমাকে ভোগেনি।” প্রেমেই তো সুখা—অ-মৃত—প্রেম কিছু হারায় না, সে কিছু ভোলে না।

এই নাটিকাটিতে “সুদূরের পিয়াসী” রবীন্দ্রনাথের রুজু জীবন হইতে বাহির হইয়া পড়িবার একটি করণ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টব্য—ডাকঘর, সপ্তোষচন্দ্র মজুমদার, শাস্ত্রিনিকেতন, ১৯৩৩ ভাস্ক-আশ্বিন।

গীতিমালা

১৩১৮ সালের চৈত্র মাস হইতে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত সময়ের রচনা গান ও কবিতা একত্র করিয়া এই গীতিমালা প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী ১৯১৪ সাল। ইহার গান ও কবিতাগুলি শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে, ইংলেণ্ডে, জাহাজে ও রামগড় পাহাড়ে লেখা।

প্রেমময়কে কবি ইহার আগে গানের অঞ্জলি দিয়াছেন। কিন্তু দূর হইতে কেবলমাত্র সপ্নমন্ডরে গীতাঞ্জলি দিয়া ভক্ত কবিহৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইল না। কবি এবার প্রিয়তমের গলায় পরাইলেন গীতিমালা। গীতিমাল্যের ভাববস্তু নূতন নহে, তবে প্রকাশ নূতন। জীবাত্মার তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল সোনার তরীতে, পূজা করিল নৈবেদ্যে, পারে পৌছিরাছিল খেয়াতে, তাহার পরে তীর্থরাজের চরণে সমর্পণ করিল গীতাঞ্জলি, এবং এই বারে তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিল গীতিমালা। গীতাঞ্জলি-যুগের বিরহবাথা এখনো ঘুচে নাই। তবু ষাঁহার বিরহে আমি কাতর তিনি যে আমারই, তিনিও যে আমার মিলন-প্রয়াসী এই বোধের তৃপ্তি গীতিমাল্যে উকি মারিয়াছে। ভক্তের পূজা সজ্ঞাপনের পূজা—প্রিয়ের কাছে অভিসার তো সজ্ঞাপনেরই বাপার—কৌন বেশরম তের সাথ বাই—এইটি গীতিমাল্যের মূল স্তর। কবি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যিনি অন্তরতম তিনি নানা রূপের মধ্য দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতে প্রয়াসী—বিশ্বপ্রকৃতিও তাঁহারই স্পর্শের অঙ্গ।

দ্রষ্টব্য—কাব্যপরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী।

আত্মবিক্রয়

৩১ নম্বর

“আমাদের বাহা প্রেষ্ঠ প্রকাশ তাহা আমরা কাহাকেও কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারি না; তাহা আমাদের আয়ত্তের অতীত, তাহাতে আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নাই। মূল্য লইয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলেই তাহার উপরকার আবরণটি মাত্র পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত

হইতে সরিয়া যায়। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই, ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা করিলেই প্রকাশিত হইতে পারি না। কাহারো কাহারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে যে, অশ্রুর ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টানিয়া বাহির করিয়া লইতে পারে।”

(ছিন্নপত্র, কলিকাতা ৭ই অক্টোবর ১৮৯৪, ৩০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কবি নিজেকে সম্প্রদান করিতে চাহিতেছেন—বল লোভ কাশনার কাছে নয়,—আনন্দময় সবলতার হাতে, অহেতুকী প্রীতির কাছে। কিন্তু তাঁহাকে আরও করিবার জন্ত রাজার বল ব্যর্থ হইল, ধনীর লোভ-দেখানো ব্যর্থ হইল, সুন্দরীর রূপের প্রলোভনও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তাঁহাকে খেলার স্তখে বিনা মূল্যে জয় করিয়া লইল শিশু—অকারণ ও সরল ভালোবাসা কবির মনের উপর জয়ী হইল।

তুলনীয়—

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them (his disciples).

And said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.—St. Mathew, 18.2-3.

দ্রষ্টব্য—ছিন্নপত্র, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

গীতালি

এই পুস্তকখানিতে ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ৩রা কাতিক পর্যন্ত লেখা কবিতা ও গান স্থান পাইয়াছে। ইহা পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া বাহির হয় অগ্রহায়ণ মাসে। ইংরেজি ১৯১৪ সালে।

এই বইখানির সঙ্গে আমার অনেক সুখকর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। ঐ সালের আশ্বিন মাসে আমি কবির কাছে কিছুদিন যাপন করিবার অত্র পূজার ছুটি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। একদিন কবি আমাকে বলিলেন—চাক্র, আমি যে খাতার কবিতা লিখছি সেই খাতাখানি রখী আর বোমা আমাকে দিবেছেন, তাঁরা আমার হস্তাকর রক্ষা করবেন বলে। গানগুলি প্রেসে ছাপতে দিতে হবে, তুমি যদি এগুলি নকল করে প্রেসের কপি তৈরি ক'রে দাও।

আমি ২১এ আশ্বিন পর্যন্ত লেখা সমস্ত গান ও কবিতা নকল করিয়া কবিকে দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এগুলি কেমন হইয়াছে। আমি বলিলাম—একটা গানের অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্তঃগুলি ভালই হইয়াছে।

কবি আমার কথা শুনিয়া চটিয়া গেলেন, আমাকে রুট স্বরে বলিলেন—তুমি কিছু বোঝো না, এ ঠিক হয়েছে।

আমি আমার বুদ্ধির অন্নতা স্বীকার করিয়া লইলাম; এবং কবিকে গম্ভীর দেখিয়া প্রশংসা করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আমি আহাঙ্গাদি করিয়া বেগুন্ধে ঘুরাইয়া পড়িয়াছি। রাত্রি তখন এগারোটো বাজিয়া গিয়াছে। কঠাৎ কবির আছহানে ঘুম ভাঙিয়া গেল—চাক্র, তুমি কি বুঝিয়েছ?

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া মশারির দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, এবং মশারি সরাইয়া কবিকে আমার বিছানায় বসাইলাম। তিনি বলিলেন—তুমি ঠিক বলেছ, ঐ কবিতাটার মানে আমিই বুঝতে পারি না। দেখ তো বললে এনেছি, এখন হয়েছে কি না?

সেই পরে-লেখা কবিতাটি গীতালির মধ্যে ছাপা হইয়াছে—সেটি ২৩ নম্বরের গান—

যে থাকে পাক না দ্বাবে,
যে যাবি যা না পারে।

কিন্তু পূর্বে যে গানটি লিখিয়াছিলেন, তাহাও সুন্দর হইয়াছিল, এখন আমি তাহা বুঝিতেছি। কবি আমাকে যে তিরস্কার কবিয়াছিলেন তাহারই ক্ষোভ ভুলাইয়া দিবার জন্য গানটিকে বদল করিয়া আমাকে অত বাত্রে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। পূর্বে বচিত ও পরিত্যক্ত গানটি নিয়ে উদ্ধার করিয়া বাখিয়া দিলাম—

কেন আর	মিথ্যা আশা	বাসে।
ওবে তোর	শুভ ধ'বে কেউ	গাবে না রে,
এ'তামার	বাগ্মিশেষের	ভাবের পাখী
'তামাবেষ্ট	একটা কেবল	গল' ডাকি',
যা রে হুই	'বজন পথে	চ'লে যা বে।
ওদের ই	জন্ম কু'ড়ি	'শিব রাতে
ন'সে যে	চাপের ভল্লব	দপেক্ষাতে।
মেটাতে	এ'রবে না'ত	সাঁধার নিশা
হোমাব এই	কাটা ফুলের	চণ্ডাল তুলা,
সে'য তাই	চখে তাছে	পূ'বর পারে।

কবির এই গানটিরই রচনার স্থান ও কাল ছিল ১৭ ভাদ্রসকাল, সুকল : পরে যে গানটি রচনা কবিয়া গীতালিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার রচনার স্থান শাস্ত্রিনিকেতন, এবং কাল আশ্বিন মাসের কোনো তাবিথের রাতি। অথচ গীতালিতে যে গানটি আছে তাহার নীচে আগে রচিত গানেবই স্থান-কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।

গীতালি উৎসর্গ উপলক্ষ্যে যে আশীর্বাদী কবিতাটি আছে তাহা কবির পুত্রকে ও পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য কবিয়া লিখিত : ইহা যে আকারে ছাপা হইয়াছে, তাহা তিন বার পৰিবর্তনের পরে। প্রথমে আমি এক রকম নকল করি, পরে নকলের উপর কবি অনেক সংশোধন ও পরিবর্তন করেন, এবং অবশেষে তাহাও বাতিল করিয়া যাহা রচনা করেন তাহার মধ্যে পূর্বের রচনার অল্প কয়েক লাইন মাত্র রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার পরে কবির সঙ্গে আমরা বৃদ্ধগড়াতে যাই ২৬এ আশ্বিন। কতকগুলি

কবিতা সেখানে এবং বুদ্ধগয়া হইতে ‘বরাবর’ পাহাড়ে বৌদ্ধ গুহা দেখিতে ঘাইবার পথে বেলা স্টেশনে ও পাক্কীর মধ্যে রচিত হয়।

গয়া হইতে কবির সহিত আমি এলাহাবাদে গেলাম। সেখানেও কতকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছিল। সেই কবিতাগুলিকে যখন ছাপিতে দেওয়া হইল, তখন কবির রচনা এক অভিনব ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই নূতন রকমে রচনাগুলি পরে ‘বলাকা’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতালির প্রথম গানটি একটি গ্রীক ছন্দেইর অনুকরণে লিখিত।

কবির এত দিনের সব কামা বাখা প্রিয়মিলনের সার্থকতাব শ্রীতে মত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে গীতালিতে। গীতালিতে এই সার্থকতার স্তব্ধ স্মরণই প্রধান। কবি “নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন বাখা” সঙ্গ কবাব ভিতরে সিদ্ধির ও মুক্তির স্বাদও পাইয়াছেন। এখন প্রকৃতি এবং হৃদয় যেন পরস্পরের প্রতিচ্ছবি এবং রসস্বরূপেই লীলাক্ষেত্র।

কবি আশীর্বাদ কবিতাটি প্রথমে লিখিয়াছিলেন—

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁবে
তোমরা তাঁহারি ধন আনোকে আঁধাবে।
জ্যেগেছি অনেক রাসি, ভেবেছি অনেক,
কণেক বা আশা হয়, আশরু কণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুমাদের চেষ্টা—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
এমন করিয়া বলো কাটে কত কাল;
মাঝি যে তাহারি হাতে ছেড়ে দিহু তাল।
আমার প্রদীপধানি অতি ক্ষীণকায়া,
বতটুকু আলো দেখ তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিহু কেনে;
তায় আলো তোমাদের নিক বাহ যেনে।
হুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই,
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

পরে বদল করিয়া নিম্নলিখিত লাইনগুলি করিলেন—

সংসারে কণেক আশা, আশরু কণেক।

‘এমন করিয়া বলো কাটে কতকাল’ লাইনটি কাটির একবার লিখিলেন—

এ ভরী আশারি ব’লে যেরেহিহু ভেবে।

পুনরায় কাটিয়া করিলেন—

এক পরের লাইনের ‘হাল’ কাটিয়া করিলেন ‘এবে’।

এ তরী আমারি বলে এত মরি ভেবে।

সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক—লাইনের পরে যোগ করিলেন
নূতন চারি লাইন—

সত্য ঢাকা পড়ে মোর ভয়ে ভাবনায়,

মিথ্যার মূর্তি গড়ি ব্যর্থ বেদনায়।

বিষ আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দের ভরা,

মোর সৃষ্টি মায়া দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

এই শেষ লাইনটি লিখিবার আগে লিখিতেছিলেন—‘মায়া দিয়ে মোহ’
এবং সেই অসমাপ্ত লাইন কাটিয়া শেষ লাইনটি লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু পরে যখন বই ছাপা হইল তখন কবি ইহার অনেক পরিবর্তন
করিয়াছেন দেখিলাম। কোড়ুলগাঁ পাঠক-পাঠিকারা বইয়ের সঙ্গে এই খসড়া
পাঠ মিলাইয়া দেখিলে কবি-মনের একটু পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন।

যাত্রাশেষ

১০৭ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের কা্তিক মাসের সবুজপত্রের ৪১৯ পৃষ্ঠায়
প্রথম প্রকাশিত হয়।

যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে নবপ্রভাতের আলোক প্রচ্ছন্ন হইয়া
থাকে, জাধারের আলোক-বাগতা (পূবরী, সমুদ্র), তেমনি মৃত্যুর মাঝে
প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে প্রাণ। রাত্রি যদি তাহার গভীর অন্ধকারের মধ্যে
দুঃখ শোক মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আশ্বাদ পায় বলিয়াই ঐচ্ছিয়া থাকিতে
পারে। সেই উদয়াচলের—পরলোকে বা নবজীবনের—পথে আমি
তীর্থধাত্রী, আমি একাকী মৃত্যু-সন্ধ্যার অমৃগামী হইয়’ চলিয়াছি, আমার
দিনান্ত অর্থাৎ জীবনাবসান মৃত্যুপারের দিগন্তে লুটাইয়া পড়িতেছে।

সেই নূতন জীবনের আভাসই তারায় তারায় স্পন্দিত। প্রত্যেক
প্রকাশের পূর্বাঙ্কুরা ধ্যান সমাধি—বাক্যকে বুদ্ধরূপে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে

ভূগর্ভবাস স্বীকার করিতে হয়; বাক্যে ও কর্মে পরিণত হইবার পূর্বে চিন্তাকে মনের গুহার অজ্ঞাতবাস করিতে হয়। মরণোত্তর-কালের সুখস্বপ্ন তাই আমার চিন্তাকে সাড়া দিতে বলে।

প্রত্যক্ষের পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষ, রূপের পশ্চাতে অরূপ, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু। দিবসের আলোক নির্বাণ হইলেই দেখিতে পাই অনির্বাণ তারকার জ্যোতি; জীবনের অবসানেই দেখা দেয় পরলোকের আনন্দ ও সর্বাশ্রয়ের করুণা। অতএব আমি নির্ভয়ে আমার জীবন-সাম্রাজ্যের সকল সাধনা লইয়া—জ্ঞান দিবসের শেষের কুসুম চয়ন করিয়া—নবজীবনের কূলে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি।

হে আমার জীবনাবসান, আমার সকল ভালোমন্দ তোমার মধ্যে নিহিত রহিল। অন্তর্ধানী জীবনদেবতা, তোমার সঙ্গে আমার যে জন্ম-জন্মান্তরের যোগ তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। জীবনের অনেক সাধই অপূর্ণ বহিয়া গেল ইহাও স্বীকার করিতেছি।

জীবনের সফলতা বিফলতা সব মিলাইয়াই তো আমার এই আমিষ। অতএব কিছুই ফেলিয়া দিবার বা অবশেষে কবিবাব বস্তু নহে, সমস্ত মিলাইয়াই জীবনবিধাতা জীবনের পূর্ণ পবিগতি ঘটাইতেছেন। জগৎ নম্বর, প্রত্যক্ষ। কিন্তু যাহা চিরন্তন অপরিণামী তাহা অপ্রত্যক্ষ, অগোচর; তাহা প্রত্যক্ষের ভিতবেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই হইল সৎ—সত্য, ভূমি, ব্রহ্ম। সকল বার্তা থগুতা চেষ্টা ইচ্ছা মিলিয়াই সম্পূর্ণ সফলতা—‘পূর্বের পদ-পবন তাদের ‘পরে।’

ঋষি-কবির পারগামী দৃষ্টিতে হৃদয় বিরোধ অশাস্তি বিফলতা প্রভৃতি সকল অসম্পূর্ণতাই একটা পূর্ণতার পূর্বসূচনা। কবি জ্ঞানেন—‘সীমার মাঝে অসীম ভূমি বাজাও আপন ‘সুর।’ কবি সীমার মধ্যে অসীমতার স্রসজ্জ্বলি দেখিতে পাইয়া আনন্দ-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বলিতে পারেন।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে—এই কথাটি মনে

আজকে আমার গানের শেষে জাগ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। —গীতাঞ্জলি।

All we have willed or hoped or dreamed of good, shall exist.

—Robert Browning, *Abt Vogler*.

ফাস্তুনী

ইহা নাটক। ১৩২২ সালের ফাস্তুন মাসে লেখা, ইংরেজী ১৯১৬ সাল।
বৈশাখ মাসে ১৩২৩ সালে শাস্ত্রনিকেতনে প্রথম অভিনয় হয়, জাহ্নুমারী মাসে
পুনরায় কলিকাতায় অভিনয় হয় বাঁকুড়া ছুভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্ত।
নাটকের 'ফাস্তুনী' নামেই পরিচয় যে ইহা বসন্তের জয়গান। 'বসন্তের পালা'
নামে 'ফাস্তুনী'র প্রবেশক ও ফাস্তুনী নাটক একত্র ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের
'স্বপ্নপত্রে' জুড়িয়া প্রকাশিত হয়। ২২ সালের মাঘ সংখ্যায় ইহার অপর
প্রবেশক 'বৈরাগ্য সাধন' প্রকাশিত হয়।

ফাস্তুনী নাটকের অন্তর্গত ভাব কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয়
পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার ষপার্থ আত্মা নেই বলে
জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিজীষিকায় প্রতিদিন মরে।
যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দ্বৈত পায়, যাকে সে ধরেছে
সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনি, তখন পিছন দিকে
তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই,
তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দার মৃত্যুর তোরণ-ঘরের
মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাস্তুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এট যে, মৃত্যুর
বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনাগ্রাসে
হবার জো নেই। জরার অবসান, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নব-জীবনের আনন্দে
পৌছানো যায়। তাই মৃত্যুর বললে,—আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী
করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দ্বৈত পাই। জরা
সমাজকে ঘনিষ্ঠে ধরে, প্রাণ অচল হ'য়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে ধলন করে
নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-বসন্তের
উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো মুরোপে চলেছে। সেখানে নূতন যুগের
বসন্তে হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চির-নবীন অমর সৃষ্টি প্রকাশ
করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার এমানে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ফাস্তুনীতে
বাউল বলেছে—'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ! বারা ম'রে
অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিনলিঙ্গন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের
বিচার করিনি; আমরা পাথরের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ছুটে বেরিয়েছি।

আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হ'লে বসন্তের দশা কি হতো?'—বসন্তের কচি পাতার এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝ'রে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বানী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হ'লে জরাই অমর হতো—তা হ'লে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হলুদে হ'য়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সরসর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির নবীনতা প্রকাশ করে—এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরন ক'রে জীবন্ত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

“মানুষ তার জীবনকে সত্য ক'রে বড় ক'রে নূতন ক'রে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সম্ভ্রান্ত তার যে-জীবনটা বিকশিত হ'য়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ ক'রে। মানুষ বলেছে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ ক'রে দে বারে বারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমার সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।

—গীতিমাল্য।”

ভ্রষ্টব্য—অচলারতন, অরূপ রতন, কাল্কনী—মুখামুখী দেবী, অযতী, ১৩৩৮ বর্ষণ।

বলাকা

১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩২৩ সালের বৈশাখ পর্যন্ত কবি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের রচিত কবিতাগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, বাংলা ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে সত্য স্থির—অচল। শঙ্করাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—কালত্রয়াবাধিতং সত্যম্—সত্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে সমভাবে অবস্থিত, সত্য ত্রিকালে অপরিবর্তিত। কিন্তু বর্তমান যুগের দর্শনের বাণী হইতেছে—সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বলেন—গতি নাই এমন বস্তু জগতে নাই, বাহ্যতে গতি নাই, তাহা নিছক কল্পনা মাত্র; তাহা সত্য নহে। গতির বাণী ইউরোপে বের্গস প্রথম প্রচার করেন, এ জ্ঞান তাঁহার দর্শনকে গতিবাদ বলা হয়। যাহার জীবনীশক্তি আছে সে আর-সকল জিনিসকে নিজের করিয়া লইয়া তবে নিজেকে প্রকাশ করে; তাহার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে,—খণ্ডভাবে দেখিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। গতি বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র নয়—বস্তু ও স্থান-কালের সম্পর্ক মাত্র গতি নয়, গতি এক স্থিতি হইতে অপর স্থিতিতে পরিণতি মাত্র নয়। কাল অবিভাজ্য, অনন্ত-প্রবাহ, কালে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নাই। স্থানও অনন্ত, কেবল মাত্র বস্তুর সহিত বিশেষ সম্পর্কে কাল ও স্থানকে প্রবিভক্ত মনে হয়।

Space is a plenum, co-extensive, because in the concrete identical, with the totality of all existent and extended bodies. There is no empty space either between bodies or between their parts. The structure of space and the structure of the extended bodies that fill space is one and the same. Similarly time was held to be identical in the concrete with motion and continuous change. There are as many times as there are motions.

আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে নিরবচ্ছিন্ন স্থান বা কাল বলিয়া কিছু নাই, কেবল বস্তুর গতিতেই আমাদের মনে স্থান ও কালের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব একমাত্র গতি সত্য। (দ্রষ্টব্য—The New Cosmogony Journal of Philosophical Studies, July 1929.)

অতএব সত্য অনন্ত প্রবহমান অবিভাজ্য। ইহার গতি রুদ্ধ হইলেই সৎ জীবনহীন হইয়া জড়বস্তুতে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথও বলাকা পুস্তকের সমস্ত কবিতার মধ্যেই এই গতি-বাদকে সৎ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গতি, কেবল গতি, ক্রমাগতই চলা। থামিলে গেলেই—

উচ্ছিন্না উঠিলে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

কিন্তু কবি এইখানেই তাঁহার কথা শেষ করেন নাই। উদ্দেশ্যহীন কেবল গতি আমাদেরিগকে কোনো গম্যস্থানে লইয়া যায় না, সে গতিতে ক্লান্তি আনে প্রাণ অতৃপ্তি অনুভব করে। এই জন্যই কবি নবম কবিতাতে—তাজমহলে— গতির মধ্যে আনন্দের রূপ দর্শন করিয়াছেন—

সে স্মৃতি তোমাবে ছেড়ে

গেছে বেড়ে

সর্বলোকে।

জীবনের অক্ষয় আলোকে।

অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গ স্মৃতি

বিশ্বের ঐতি মাঝে মিলাইতে সম্রাটের ঐতি।

এইখানে আমাদের কবি-দার্শনিক বের্গস্কে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বের্গস্ গতি কেবল অফুরন্ত চলা মাত্র; তাহা কোনো লক্ষ্য-স্থান নির্দিষ্ট নহে, কোনো আনন্দ-স্বাদা অনুপ্রাণিত নহে। এতখানে বের্গস্ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব—কবি কেবল গতিতেই তৃপ্ত থাকিতে পাবেন নাই, তিনি আনন্দেরসের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। বের্গস্ জীবনের মধ্যে কেবল গতি দেখিয়াছেন, তিনি অসীমের সহিত জীবনের কোনো যোগ দেখিতে পান নাই; সত্য তাঁহার নিকট ভালোমন্দের অতীত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই তিনি জীবনের উদ্দেশ্য, গতির লক্ষ্য নির্দেশ করিতে পাবেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতিতে মানবের মুক্তি নয়,—

দুঃস্বাদ অস্তরে পশি, অবৃত না পাই যদি খুঁজে,

সত্য বহি বাহি মেলে দুঃখ মাঝে দুখে (৩৭ নম্বর)।

তবে তো লম্বাই পণ্ড।

আমাদের দেশের আর একজন শক্তিশালী লেখকও গতির মধ্যেই সত্যকে দেখিরাছেন—

“এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া নিত্য কোনো বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে ; যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে, এ বিশ্বাস আব্রাহাম, এ ধারণা কুসংস্কার।

“তোমরা বলো চরম সত্য, পরম সত্য ; এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যমান।……তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাস্ত সনাতন অপোর্বক্ষেয় ! মিছে কথা ! মিথ্যার মতোই একে মানবজাতি অগ্রহ সৃষ্টি ক’রে চলে। শাস্ত সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।”

—পরব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্যকে গতিতে স্বীকার করিয়াও এক বিশেষ লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইয়াছেন—মামুষ ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবে দেবত্ব লাভ করিবার জন্ত—

নিষ্কারুণ হৃৎকরাতে

মৃত্যুবাতে

মামুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মতিমা।

—৩৭ নম্বর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গতি-বাদ বলাকার যুগে নূতন উপলব্ধি নহে, ইহা তাঁহার আবাল্যের কবিতার মধ্যেই বরাবর ছিল—কবি আত্মকেশোর অমৃতব করিয়া আসিয়াছেন যে কি জড়-বিশ্ব, আর কি প্রাণী-বিশ্ব দুইয়েরই মাঝে এক অবিরাম অবিশ্রাম গতিবেগ আছে—‘অলক্ষিত চরণের অকারণ আবরণ চলা !’ এই গতিময় কবিতাগুলিকে একত্র করিয়া মোহিতচন্দ্র সেন ‘নিষ্ক্রমণ’ নাম দিয়াছিলেন। কবি চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন—আগে চল আগে চল ভাই ! কিন্তু বলাকার যুগে এই গতিবাদ একটি বিশেষ বেগ ও রূপ লাভ করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে এই গতির মাঝেই বিশ্বের প্রাণশক্তির বিকাশ। গতি শূন্য হইলেই আবির্ভাব আবর্জনা জমে ও মৃত্যু উপস্থিত হয়—

যে নদী হারারে স্রোত চলিতে না পারে,

সহস্র শৈবালদ্বীপ বাধে আসি তায়ে ;

যে জাতি জীবনহারে অচল অসাড়,

পড়ে পড়ে বাধে তারে জীর্ণ লোকচারণ।

সর্বজন সর্বক্ষণ চলে ঘেঁই পথে,

তুণ্ডুগ্ন সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;—

যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে

তনু-মন্ত্ৰ সংহিতায় চরণ না সরে।

—চৈতালি, দুই উপমা।

অতএব কবির মত যে গতিশ্রোতে গা ভাসাইতে পাবিলেই মুক্তি।

এই গতিশীল বিন্দুপ্রকৃতির রূপ বলাকায় ছন্দোলালিত্যে ও শব্দসম্পর্কে কাব্যসাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে। কবির প্রত্যেক কবিতা অদ্ভুত অনন্তের ইঙ্গিতে ভরপুর। যত্ন্য তো কবির কাছে কোনোদিনই পরিসমাপ্তি নয় ; আর এই পৃথিবীটুকুই মানব-জীবনের কারাগার নহ ; এই মানব-জীবন—

কাননের পর্বশ্রোতে ভাসিছে সঙ্গাই

ভুবনের ঘাটে ঘাটে।

* * * *

আকাশের প্রতি তাবা ডাকিছে তাহারে।

তার নিমন্ত্ৰণ লোকে লোকে

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

—সাজাহান।

কবি তাঁহার যৌবনে মানসী পুস্তকে 'নিফল কামনা, নামে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা অসম অমিত্র-ছন্দে লেখা। সেই অসম অমিত্র-ছন্দকে মিত্রাক্ষর করিয়া একটি নতুন রূপ, লালিত্য ও বেগ দান করিয়া কবি এক অপূর্ব নতুন সৃষ্টি করিয়াছেন বলাকার ছন্দ।

এইরূপ বহু দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় বলাকা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে অগ্রতম।

এই বলাকা কাব্যখানি কবি স্বয়ং শাস্ত্রনিকেতনে ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ; প্রত্যোক্তকুমার সেনগুপ্ত সেই ব্যাখ্যানের নোট লইয়া ১৩০৮-১৯ শাস্ত্রনিকেতন পত্রে প্রকাশ করেন। সেই নোটগুলি এবং আমি লিখিয়াছি গিয়া ও পত্র লিখিয়া কবির যে-সব অভিমত সংগ্রহ করিয়াছিলাম সেট লব নিম্নাইয়া এই পুস্তকের কবিতার ব্যাখ্যা লিখিতে যাইতেছি।

উষ্টব্য—বলাকা ও বেপ্স—শিশিরকুমার মৈত্র, বল্লাবঙ্গী ১৩৩১ বৈশাখ ২৬৭ পৃষ্ঠা।

কাব্যবিচারে বলাকার স্থান—উমাগড় ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৩৯।

নবীন

১ নম্বর

রচনার তারিখ ১৫ বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। ইহা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের সপ্তম পৃষ্ঠায় 'সবুজের অভিযান' নামে প্রকাশিত হয়।

যৌবনই চলার বেগে জীবনের পরিচয় প্রকাশ করে। যৌবনই সমস্ত পরখ করিয়া লইতে চায়—শাস্ত্রবাক্যও বিনা-বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে চায় না—সে বলে 'যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে।' যৌবনের মধ্যেই মানব-জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার শক্তির প্রাচুর্য তাহার মনে পথ খুঁজিয়া লইবার প্রেরণা জাগায়, সে বলে—'পথ আমাদের পথ দেখাবে,' 'চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে,' 'জীর্ণ জরা ঝরিয়ায় দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেবার দিবি।'—ফাল্গুনী।

এই জন্তই এই অশান্ত ও অশান্ত যৌবনের প্রতি কবির অপরিণীম শ্রদ্ধা,— কারণ, যৌবনেই মানুষের জীবন বিকাশ লাভ করে। কবি তাঁহার ফাল্গুনী নাটকে ও বহু কবিতায় যৌবনের জয়গান করিয়াছেন। কবির নিজেরও চিরদিন যুবা থাকিবার ইচ্ছা। তিনি ক্ষণিকান্তে কবির বয়স কবিতায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাঁচা—যাহাদের মনে কোনো সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই, যাহাদের হৃদয় স্থগিত হইয়া যায় নাই।

পাকা—যাহারা সংস্কারে বদ্ধমূল, জড়ভাষাপন্ন, এবং যাহাদের উন্নতি পরিণতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে। যে স্থিতিশীল সে কাজের বাহির, সে নৃতনের পথে গতির সাধনা করিতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রশ্রয়যোগ্য—

Generally the elderly are conservatives; perhaps because, as some psychologists inform us, we are incapable of absorbing new ideas by twenty-five and the memory effects a charitable compensation, recalling only what was pleasant in the golden days of youth. With eyes fixed on the future, the young find monotony boring, and it is their ardour that forces on social revolutions. Accepting the accomplished fact, their elders give it their blessing and gravely take the credit.

শিকল-দেবী—মানুষের জীবনে সমাজে ও ধর্মে ভূগাংকার আবর্জনার মতো যে-সব গ্রাণ-শক্তি-হিংস্রাণী অনাচার ও কুসংস্কার জমা হয় তাহাই মানুষের শৃঙ্খল ও বাধা। ইহাকেই মনসী বেকন Idol বা অসত্যের বিগ্রহ বলিয়াছেন। কালাপাহাড় যেমন অসত্য দেখকার চিরপাত্র,

নবীনও তেমনি। কিন্তু নবীনের প্রলয়-লীলার মধ্যে কেবল ধ্বংস নাই,—নব-সৃষ্টির আয়োজনও আছে। নবীনের অভ্যুদয়ে বত-কিছু নিয়মের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং সকল বাধা হইতে মুক্ত হইয়া সে নূতন সৃষ্টির পথ করিয়া দিতে পারে।

ভুলভুলো—ভুল না করিলে কেহ সত্যকে লাভ করিতে পারে না। ভুল করিয়া সংশোধন করিতে করিতে তবে লোকে সত্যের সাফল্য পায়। অতএব ভুল করিবার সুযোগ পাইলেই মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারে।

যার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটোরে ব্রহ্ম।

সত্য বলে আমি তবে কোথা দিবে চুক। —কণিক।

বিবাক্তি কর অবাধ পানে—নবীনের নেতৃত্বে গতিকে অবলম্বন করিবার অজানার সন্ধানে আনন্দের যাত্রা করিতে হইবে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার মূল্য তো জানার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া গিয়াছে। অজানাকে জানাই হইবে নবীনের সাধনা। কেবল শত্রু মানিবা গতানুগতিক ভাবে নির্দিষ্ট চিন্তাচরিত পথে যাহারা চলে তাহারা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে। নূতনকে পাইতে হইলে নূতন পথেই চলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—“এই প্রকাশের জগৎ এই গৌরাসী তা'র বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে' চলেছে—এ কালের দিকে ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাধা নিয়মের মধ্যে বাধা থাকতেই তা'র মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব ক'রে চূপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না—সে কুল খুঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এহ বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সবলকে অতিক্রম ক'বে বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে যে চলেছে সে কেবল ঐ অব্যক্ত অগাসের টানে। অব্যক্তের দিকে আরোহণ দিকে প্রকাশের এই কুল-খেয়ানো অভিসার যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটা-পথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে। ...

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালের বাঁশি শুনেতে পেলেন না তা'রা কেবল পুঁথির নজির জুড়ো ক'রে কুল আঁকড়ে ব'সে রইল—তা'রা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা আনন্দলোকে জন্মেছে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য-লীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

—জাপান-দ্বারী।

সবুজ নেশা—নবীন সমস্ত নূতন ও তাজা সৃষ্টির জন্ত ব্যগ্র, এই ব্যগ্রতাই তাহার সবুজের নেশা ও ঝড়ের মধ্যে তড়িতের বেগ। নবীন নূতন সৃষ্টির দ্বারা ধরতীকে হৃদয়রত্ন সযত্নতর করিয়া তুলে—ইহাকেই কবি বলিতেছেন যে তুমি নিজের গলার মালা দিয়া বলভকে হৃদয়রত্ন করেও ও হৃদয়জিত করো। বলভের আগমনে পৃথিবী নবীন শোভার সজ্জিত হয়। নবীনের চেষ্টাতেও নূতনের আবির্ভাব হয় নবীন প্রকৃতির সৌন্দর্যকেও হৃদয়রত্ন করিয়া তুলে।

রবীন্দ্রনাথ এই রকম কথা অনেক জায়গায় বলিয়াছেন।

তুলনীয়—

“জুলে বাই জীবনের ধর্ম তার নৃতনত্ব ; যা তার অগ্রাণের প্রাচীন আবরণ তাকেই মনে করি চিরকালের । সেই বোঝার ভারে আনে ক্লান্তি, আনে নিশ্চেষ্টতা । তাই মাঝে মাঝে স্রবণ করুতে হবে সেই প্রাণের নির্মল নবীন রূপ, সে প্রাণ বারে বারে পুরাতনের মলিনতা বর্জন ক’রে নব জন্মে আপন কক্ষপথ প্রদক্ষিণের নূতন প্রারম্ভে প্রবৃত্ত হয় । জড় বস্তুর কোনো লক্ষ্য নেই । কিন্তু জীবনযাত্রা মানব-জীবনের একটা ব্রত,—নিজেকে সম্পূর্ণ করার ব্রত ।……মনুষ্যের ব্রত যদি আমরা গ্রহণ ক’রে থাকি—আনতে হবে মনে নবজীবনের নবপ্রারম্ভতা । সেই নব-প্রারম্ভতার বেগ যদি দুর্বল হয় তা হলেই জর হয় মৃত্যুর । চিন্তা যখন আপনাকে নূতন ক’রে উৎপলিত করবার শক্তি হারায় তখনই জরা তাকে অধিকার করে ।”

—১লা বৈশাখ, শ্রবাসী ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ, ১৬২ পৃষ্ঠা ।

দেশী বিদেশী বহু কবিও যৌবনের ও নবীনতার জয় ঘোষণা করিয়াছেন ।
যথা,

বালপনা গল সেলী বনৈহৌ । —কবীর

আমি আমার তাক্রণ্যকে ফকীরের মালা করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি ।

Crabbed Age and Youth

Cannot live together :

Youth is full of pleasance,

Age is full of care :

Youth like summer morn,

Age like winter weather.

Youth like summer brave.

Age like winter bare :

Youth is full of sport,

Age's breath is short.

Youth is nimble, Age is lame :

Youth is hot and bold,

Age is weak and cold.

Youth is wild, and Age is tame :

Age, I do abhor thee,

Youth, I do adore thee. —Shakespeare.

If thou regret'st thy youth, why live ?

The land of honourable death

Is here :—up to the field and give

Away thy breath !

Seek out—less often sought than found

—A soldier's grave, for thee the best ;

Then look around, and choose thy ground,

And take thy rest. —Byron.

The end of life is not comfort, but divine being.

—A. E. (George Russel), also Emile Verhaeren of Belgium.

The whole secret of remaining young is to keep an enthusiasm burning within, by keeping a harmony in the soul.

—Amiel's Journal, *The Secret of Perpetual Youth*.

জীবনে বিপদ বরণ করিয়া জীবনকে জয়ী করিবার কথাও অনেক কবি বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন—

Be thou, Spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one,
Drive my dead thoughts over the universe,
Like withered leaves, to quicken new birth ;

* * * *

Be my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy ! O Wind,
If winter comes, can Spring be far behind !

—Shellev, *Ode to the West Wind*.

Then, welcome each rebuff
That turns earth's smoothness rough,
Each sting that bids nor sit nor stand but go !
Be our joys three-parts pain !
Strive, and hold cheap the strain ;
Learn, nor account the pang ; dare, never

grudge the throe !

—Robert Browning, *Rabbi Ben Ezra*.

Knowing the possible, see thou try beyond it
Into impossible things, unlikely ends ;
And thou shalt find thy knowledgeable desire
Grow large as all the regions of thy soul.

—Lascelles Abercrombie, *The sale of St. Thomas*.

Never was mine that easy faithless hope
Which makes all life one flowery slope

To heaven ! Mine be the vast assaults of doom.
Trumpets, defeats, red anguish, age-long strife,
Ten million deaths, ten million gates to life,
The insurgent heart that bursts the tomb.

—Alfred Noyes, *The Mystic*.

কট্টব্য :—Sir Arthur Quiller-Couch—*Studies in Literature*. সেখানে তিনি Meredith যবদে বলিতে গিয়া বলিতেছেন —“No poet, no thinker, growing old, had ever a more fearless trust in youth ; none has ever had a truer sense of our duty to it :

'Keep the young generations in hail,
And bequeath them no tumbled house.'

২ নম্বর

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো !

১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসের সবুজপত্রের এই কবিতাটি 'সর্বনেশে' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। নবীনকে কবি বলিতেছেন সর্বনেশে কারণ সে পুরাতনের প্রতি মমতা দেখায় না, সে পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া লোপ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু সর্বনেশেকে ভয় করিবার কোনো কারণও নাই; সর্বনেশে গতিই বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ।

কুটব—১ নম্বরের বাখা।

৩ নম্বর

আমরা চলি সমুখ পানে

আমরা পশ্চাতের দিকে দৃকপাত না করিয়া অনবরত সমুখের দিকে ধাবিত হইব, এবং সমুখে চলিতে পারাতেই মুক্ত—সমুখধাবনে আমরা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমতে গিয়া পৌছিব।

শব্দ্য

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২১ সালের সবুজপত্রের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শব্দ্য মজলুমের সময়ে বাজানো হয়, যুদ্ধে যোদ্ধাদের উদ্বোধিত করিবার জন্য বাজানো হইত। এই শব্দ্য হইতেছে বিধাতার আহ্বান—ইচ্চার ফলি যুদ্ধের আহ্বান ঘোষণা করে—সেই যুদ্ধ অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অজ্ঞানের সঙ্গে। উদাসীনভাবে এই শব্দ্যকে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দিতে নাই। সমস্ত আসিজেই হৃৎ-স্বীকারের আদেশ বহন করিতে হইবে ও প্রচার করিতে হইবে। শব্দ্যের শব্দে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অসত্যের সঙ্গে

যুদ্ধের জন্ত মিলিত হইতে হইবে এবং নব যুগকে মঙ্গল সহ আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে—এই কথাই পাকজন্ত শব্দে সতত ধ্বনিত ও উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। গতির বাণীই অভয়শব্দ ঘোষণা করে। তাহার ধ্বনি কানে গেলে বিরাম-বিশ্রাম ছুটিয়া যায়, একটা গতির উদ্‌গমনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই শব্দ অশান্তি মহাবাজের জয় ও ‘আগমন’ ঘোষণা করে।

চলেছিলাম পূজার ঘরে ইত্যাদি—আমার জীবন সজ্জায় মনে হইয়াছিল যে শান্ত হইয়া নিকপদ্রবে পূজা-অর্চনা করিয়া বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

রক্তজবা ও বজনীগন্ধা—বখন জীবনসজ্জায় শান্তির স্নিগ্ধ বজনীগন্ধা চয়ন করিবার জন্ত উদ্‌ঘোষ করিতেছিলাম তখন সংগ্রামের উপযোগী রক্তজবার মালা গাথিবার তাগিদা ও আদেশ আসিবার উপস্থিত।

ভাকল বুঝি নীরব তব শব্দ—কুজতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বিরাট বিষয়ক্ষেত্রে যোগ দিবার আহ্বান বুঝি আসিল।

যৌবনের পরশমণি—সকল জড়তাকে দূর করিয়া ফেলিবার যে শক্তি যে বনে আছে তাহাই আমার মনে স্ফোরক বিধা দাও। দুষ্ক মন্ডন করিলে যেমন নবনীত উৎপন্ন হয়, তেমনি জীবন সংস্কারের ভিতর হইতে মঙ্গল আহরণ কবিবার জন্ত নবীনদিগকে সকল প্রকার গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইতে হইবে। মঙ্গল্য পরিবেষ্টন হইতে তাগাদিগকে মুক্তি পাইতে হইবে ও অপরদের মুক্তি দিতে হইবে।

অন্ধ—জীবনের উদ্দেশ্য সন্ধান উদ্যোগ।

অন্তরু—অভ্যন্তর পুরাতন বর্জন করিয়া নূতনের দিকে অভিনবের মধ্যে যে সংগ্রাম ও তপস্বী আদে তাহাই তাগাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া লইয়া যাতনে।

আরাম চেরে পেলেম শুধু লজ্জা—তুলনীয় খেয়া পুস্তকের ‘দান’ কবিতা।

ব্যাবৃত্ত আহুক নব নব—শান্তি হয় বন্ধন, যদি তাহাকে অশান্তির ভিতর হইতে লাভ করা যায়। রক্তের রক্ত মূর্তিকে বাদ দিয়া উগার যে প্রশ্রুতা, অশান্তিকে অধীকার কবিয়া যে শান্তি, তাহা তো জড়ত্বের নামাত্রব, তাহা স্বপ্ন, তাগ সত্য নহে।

He (Saint John) said, I am the voice of one crying in the wilder ness, Make straight the way of the Lord

The Bible, St. John, 1 23

প্যাড়

৫ নম্বর

এই কবিতাটি-সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলিয়াছিলেন—

“এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা।……যে সময়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাহাকে আমার চিত্ত এই

ভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হ'য়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুদিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্ত তিনি আসছেন? এই কবিতায় ছুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হ'য়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?”

১ম শ্লোক—যখন চারিদিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বহিতেছে, এমন দুদিনে নাবিকের কি ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি ক'ব' ছাড়লেন? কি সঙ্কল্প তাঁহার মনে ছিল বাহাব জন্ত পরম দুদিনে নিয়মের দাব' সংযত লোকসমাজের কলকে ত্যাগ করিয়া। তিনি মত্ত সাগর পাড়ি দিতে বাহিব হইয়া পড়িয়াছেন?

২য় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরেব আভাস আছে 'সেই আভাসট' এই যে—কোনো একটি গোববহীনা পূজারিণী এক জায়গায় তজান' অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালাইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, যুদ্ধের সাগর পার হইয়া' নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করিবার জন্ত এত প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছাড়িয়াছেন। যে অঙ্গনে কাহারো দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনাব আয়োজন হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে আসিতে হইলে যুদ্ধেব ভিতব দিয়া আসিতে হইবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাহির, ঘনছাডাব এ কী সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা লইয়া তিনি নৌকা বাহিয়া আসিতেছেন! বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ লইয়া উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দ্রব্য একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জবী। তিনি যাহাকে খুঁজিতেছেন তাঁহাকে তো তবে মণিমাণিক্য দিবেন না তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জবী লইয়া আসিতেছেন। এরই জন্ত এত কাণ্ড? হাঁ, এই টুকুই জন্ত নাবিকের নিষ্কমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারে বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপবৃক্ষ। দিনের বেলা সেই সৌরভ সন্মোচনে থাকে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহার সৌন্দর্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল লইয়া নাবিক বাহির হইয়াছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নব-প্রভাতের উপহার লইয়া নবীন যিনি তিনি আসিতেছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অপেক্ষা করিতেছে তাহাকে সমাদরের মালা পরাইয়া দিতে

তিনি বাহির হইয়াছেন। সে রাজপথের পাশে রহিয়াছে; তাহার লোককে দেখাইবার মতো ঘর-দুয়ার নাই—তাহারই জন্ত নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বাহির হইয়াছেন। সেই তপস্বিনীর রূক্ষ অলক উড়িতেছে, পলক সিক্ত হইয়াছে, তার বরের ভিত ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়া বাতাস হাঁকিয়া চলিয়াছে। বর্ষার বাতাসে তাহার প্রদীপ কম্পিত হইতেছে—ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়াইয়া দিয়া তাহার দৈন্ত-দশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাইতেছে, তাহার আশঙ্কা হইতেছে যে বর্ষার বাতাসে তাহার কম্পমান দীপশিখা কখন নিবিয়া যাইবে। সে এক প্রান্তে বসিয়া আছে তাহার নাম কেহ জানে না। কিন্তু তাহারই কাছে নাবিক আসিতেছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বাহির হইয়াছেন তাহা নয়! কত শতাব্দী হইল তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছে, কত দিন হইতে কত কাল-সমুদ্র পার হইয়া তিনি আসিতেছেন এখনও রাত্রির অবসান হয় নাই, প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসিবেন তখন কোনো সমারোহ হইবে না, তাহার আগমন কেহ জানিতেই পারিবে না। তিনি আসিলে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া আলোকে ঘর ভরিয়া যাইবে। নূতন সম্পদ কিছু পাওয়া যাইবে না, কেবল দৈন্ত ঘুচিয়া যাইবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করিয়াছিল তাহা ধন্ত হইয়া উঠিবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার মনে অনেক দিন ধরিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল যে তাহার প্রদীপ জ্বলিয়া প্রতীক্ষা করা বার্থ হইল বৃথা, কিন্তু তাহার সেই সংশয় ঘুচিয়া যাইবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষার মিলিবে না, সে প্রেমের মীমাংসা নীরবে হইয়া যাইবে।

ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবের ভিতর দিয়া ইতিহাস-বিখ্যাত সাগর পার হইয়া পুরস্কারের বরমালা লইয়া আসিতেছেন। সেই মালা কে পাইবে? আজ বাহারা বলিষ্ঠ শক্তিবান্ধনী, তাহাদের জন্ত তিনি আসিতেছেন না। তাহারা যে ঐশ্বর্যের জন্ত লাগারিত; কিন্তু তিনি তো ধনবরের বোঝা লইয়া আসিতেছেন না। তিনি প্রেমের শক্তি বহন করিয়া, সৌন্দর্যের মালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। আজ তো-শক্তিমাদের সেই মাল্যের জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া নাই, তাহারা যে রাজশক্তি চাহিয়াছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অকনে বসিয়া পূজা করিতেছে, আমার নাবিক রাজনীপকার

মালা তাহারই জন্ত লইয়া আসিতেছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাইতেছে, মনে করিতেছে তাহার অজ্ঞাত অন্ধনে পথিকের পদচিহ্ন বুঝি পড়িল না। সে যখন মালোপহার পাইয়া ধন্তা হইয়া যাইবে তখন সে বলিবে—তোমার হাতের প্রেমের মালা চাহিয়াছিলাম, ইহার বেশি কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নাই। ধনধান্তে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার সাধনা যে করিয়াছে, এই কথা যে বলিতে পারিয়াছে, সে দুর্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক, নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরাইয়া দিবেন। ইহারই জন্ত এত কাণ্ড, এত যুগযুগান্তরের অভিসার! হাঁ উহারই জন্ত। সকল ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বাণী এইই।

“গত মহাবুদ্ধে এক দল লোক অপেক্ষা ক’রে বসেছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আরেক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অধ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছেন। বিষে যারা পরাজিত অপমানিত, তারা যজুঃষেদ্রের চরম ধানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আশ্রয়ের বিপরীত পথে চলেছে, কিন্তু তবুও যদি তারা প্রতীপ না নেবার, তপস্তার ঘনি কান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি ক’বে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ ক’রে দেবেন।”

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৯, আচাণ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা
প্রজ্ঞাতকুমার সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

কোনো বিশেষ যুদ্ধ বা ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত না করিয়া সহজ সাধারণ ভাবে এই কবিতার অর্থ গ্রহণ করা যাঠিতে পারে।—

গতি অনন্তের প্রতীক। গতির আহ্বানবাণী ঝড়ের ও উত্তাল ঢেউয়ের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায়। গতির নিমন্ত্রণ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের কাছে অজানা কূলের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

এই যে অহরহ নৃতনের আমন্ত্রণ আসিতেছে, তাকে কে স্বীকার করিয়া অকূলে আসিবে তাহা এখন কাহারও জানা নাই। যে এখন অধ্যাত অজ্ঞাত হইয়া আছে, সেই হয়তো উহাকে স্বীকার করিবে এবং তাহার দ্বারা বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

এই যে আহ্বান আসিতেছে তাহার অঙ্গসরণ করিলে ধনসম্পত্তি লাভ হইবে

না। কেবল আশ্বপ্রসাদ মাত্র ইহার পুরস্কার—ইহাই তাহার প্রিয়ের হাতের রক্তনীলগন্ধার মঞ্জরী।

যাহার জন্ত অকস্মাৎ এই নাবিক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন সে তো অতি অধ্যাত, কেহই তাহাকে এখনও চিনে না, সে পথপ্রাস্তুবাসী। কিন্তু তাহাকেই বিখ্যাত কবিগা তুলিবার জন্ত নাবিকের এই অভিযান ও অভিযাত্রা।

এই নেয়ের আহ্বান তাহাকে যে বরণ করিয়া লইবে, তাহার সকল দৈন্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং তাহার আশ্ব-অবিশ্বাস চিরকালের জন্ত ঘুচিয়া যাইবে।

ছবি

৬ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কি বোঝেন তাহা ‘তিনি এক প্রসঙ্গে বাক্ত করিয়াছেন। তাহা জানিলে, এই কবিতা বোঝা সহজ হইবে বলিয়া তাহা অগ্রে উদ্ধৃত কবিতেনি।

“ছবি বলতে আমি কি বুঝি সেই কথাটাই খালস ব’বে বলতে চাই।”

“মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দ্বিগে জগৎটাকে ‘জাহে’ বলে জড়ানো করে নেবার আমরা না পাই কবকাশ, না পাট শক্তি। সেই জন্ত জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলছি। সত্যের বিস্তৃত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ’য়েই মরা পেলুম।”

“ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে, আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে ‘চলে দেখ’, তা হ’লেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেন-না যা আছে তাই সব, যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।”

“কেউ না ভেবে বলেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে, দৃষ্ট অদৃষ্টে, বাহ্যে অদ্ব্যয়ে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে পরিমানে স্বাধীন ধ্বংসে ধ্বংসে পারে, ‘জাহে’ বলে ধ্বংসের সার সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়, তাতে আমাদের উৎসাহ সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হ’য়ে উঠে।

“আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অসুস্থতা আছে, সেই অসুস্থতাকেই আমরা স্বপ্নের অসুস্থতা বলি। গোলাপ-ফুলকে ফুল বলি এই অসুস্থই যে,

গোলাপ ফুলের দিকে আমার মন যেমন ক'রে চেয়ে দেখে, ইটের চেলার দিকে তেমন ক'রে চায় না। গোলাপ-ফুল আমার কাছে তার ছন্দে রূপে সহজেই সত্তা-রহস্যের কী একটা নির্বিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি—বলি, তুমি আছ।

“একদিন আমার মালী ফুলদানী থেকে বাসি ফুল ফলে দেবার জন্তে গগন হাত বাড়ালো, বেকবী তখন ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠল—লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে পাও না। তখন চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল—হা, তাই তো বটে! 'ঐ বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আমি আর সম্পূর্ণ দেখতে পাইনে। যে আছে সেও আমার কাছে নই,—নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, হুতরাং আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হলাম। বেকবী সেই বাসি ফুলগুলিকে তরলের মধ্যে সংগ্রহ ক'রে নিবে চ'লে গেল।

“আর্টিস্ট তেমনি ক'রে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিষেব দিলে অকুলি নির্দেশ ক'রে বলুক, 'ঐ দেখ আচ্ছ'। হৃদয় ব'লেই গাড়ে তা নয়, আছে ব'লেই হৃদয়।

‘সত্যকে সকলের চেয়ে অবাবাহিত ও সুস্পষ্ট ক'রে অস্তিত্ব করি আমার নিজের মধ্যে ‘আমি’ এই ধ্যানটি পুনরতই আমার মধ্যে বাজছে। তেমনি স্পষ্ট ক'রে যেখানেই আমরা বলতে পারি ‘তাছে’, সেখানেই তার সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগতির মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়। আজি অল্পভূতিতে আমার সে হৃদয়, তার যানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা প্রোজগার করি বা হাজার টাকা আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্ছে এট যে, আমি যে সত্তা এটা আমার কাছে নিঃশেষ, তল কটা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নিষিদ্ধার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিধে যেখানেই, তেমনি একান্ত ভাবে ‘তাছে’ এই উপলব্ধি করি, সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্তার একাকে সেখানে ব্যাপক ক'রে জানি।”—রবীন্দ্রনাথ, ওবাসী, ১৩৩৩ কাঙ্ক্ষন, ৬২১ পৃষ্ঠা।

বের্গস'র প্রধান কথা এই যে—গতির ভিতরেই সত্যকে খুঁজিতে হইবে, নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্য নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে—intellectual concept-এর মধ্যে সত্যকে পাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথও দেখাইয়াছেন যে—এক দিকে আছে সত্য, অপর দিকে আছে কেবল ছবি—একটা intellectual concept মাত্র, যেমন রাক্ষস বক্ষ কিম্বদ, dragon unicorn ইত্যাদি। কিন্তু সেই ছবি সত্য হইয়া উঠে যখন তাহার সঙ্গে আমার জীবনের অল্পভূতির মিলন ও সংযোগ ঘটে, তখন সে আর ছবি থাকে না।

এই অল্প একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—

The drama of lines and curves presented by the humblest design on bowl or mat partakes indeed of the strange immortality of the youths and maidens on the Grecian Urn, to whom Keats says :

'Fond lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal. Yet do not grieve ;
She cannot fade ; though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair.'

—Vernon Lee, *The Beautiful*.

১ম স্ট্যাঞ্জা

“ঐ যে আকাশের নক্ষত্র দ্বারা পথে একত্র বীড় রচনা ক’রে রয়েছে, ঐ যে ঐহ উপগ্রহ স্বর্গ চলে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো হাতে তীর্থযাত্রার চলেছে, তুমি কি তাদের মতো মত্যা নও ? আজ কি তুমি কেবল চিত্র-রূপে রয়েছে ? ছবি দেখে এই প্রশ্ন কবির অন্তরে উদ্ভিত হলো।” এই ছবি খুব সম্ভব কবির পত্নীর। তিনি যখন বুদ্ধগয়া হইতে এলাহাবাদে যান, তখন সেখানে উহার ভাগিনের সভাপ্রকাশ পদ্মোপাখ্যায়ের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন ; সেইখানে বোধ হয় কবি নিজের পত্নীর প্রতিকৃতি দেখিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

২য় স্ট্যাঞ্জা

“জপতের বা-কিছু সবই চলার পথে রয়েছে। তুমি কি কেবল চিরচকলের মাঝখানে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাকবে / জগৎ-যাত্রার পথে যে-সব পথিক বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কি তোমার যোগ নেই ? তুমি সকল পথিকের মাঝখানেই আজ অথচ তাদের থেকে দূরে আছ ; তারা চকলতার গতি পেয়েছে, তুমি শুষ্কতার বন্ধ।

“এই যে ধরণীর ধূলি, এ অতি তুচ্ছ, কিন্তু এও ধরণীর বরাহকল-রূপে বাতাসে উড়ছে। এই ধূলিগুণ কত বিকার, কত পরিবর্তন, কত গতির লীলা। বৈশাখে জল কোটে না, শুকিয়ে ঝ’রে বার, যখন ধরণী বিশ্ববার মতো তার আভরণ ত্যাগ করে, তখন সেই তপস্বিনীকে এই ধূলি গৈরিক বস্ত্র পারের দেয়। আবার যখন বলন্তের মিলন-উষা আসে, তখন সে ধরণীর পারে পত্রলেখা এঁকে দেয়। এই যে তুল বিধের পারের তলার আছে, এরা অহির, এরাও অক্ষুরিত বর্জিত আলোলিত হচ্ছে, উন্মুল হচ্ছে ও রান হচ্ছে। এদের মধ্যে নানা বিকাশ ও পরিবর্তন আছে বলেই এরা সত্য। তুমিই কেবল ছবি, বরাবর এক ভাবে শুষ্ক বন্ধ হির হয়ে আছ।

৩য় স্ট্যাঞ্জা

“আজ তুমি ছবিরে আবদ্ধ আছ বটে, কিন্তু তুমিও তো একদিন পথে চলতে। নিঃবাসে তোমার বন্ধ জলে উঠতে। তোমার আপ তোমার চলার কেরার দ্বখে দুঃখে কড় নুতন নুতন রঙ্গ রচনা করেছে। বিশ্বের হৃদয়ে এঁদের রঙ্গ জাল দ্রব-কর-লীলাবিত হচ্ছিল। সে জাল কতদিনের জন্যে। তখন আবার নিজের জগৎ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ভাবে

যে জগৎ বিশেষ ভাবে আমারই, তাতে তুমি কত গভীররূপে সত্য ছিলে। এই জগতের হৃদয়ের স্তম্ভিত বা-কিছু আমি ভালোবেসেছি তার মধ্যে তোমার নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে, হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রীকে তুমিই তোমার ভালবাসা দিয়ে বাধুধ্বজিত করেছিলে। তুমি নিখিলকে রমণ্য ক'রে তুলেছিলে—তোমার মাধুর্যের তুলিতে বিশ্ব হৃদয়ের মধু হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আনন্দময় বার্তাকে তুমি মুষ্টিমতি বাণীরূপে আমার কাছে বহন ক'রে এনেছিলে।

৪র্থ স্ট্যাঞ্জা

“আমরা দুজনে এক সঙ্গে যাত্রা ক'রে চলেছিলাম। হঠাৎ অনন্ত-রাত্রি অর্থাৎ মৃত্যু তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম, তুমি নিশ্চল হ'য়ে গেল। দিন ও রাত্রি আমার স্বপ্নদুঃখ বহন ক'রে নিয়ে চলল, আমার চলা আর থামল না। আকাশের সাগরে আলো-অন্ধকারের জোয়ার ভাঁটার পাল্লা চলেছে। আমি পথ দিয়ে যাত্রা করেছি, সেই পথের দুধারে কুলের দল চলেছে—কদম্ব শিউলি নাগকেশর করবী, নানা ক্ষতুতে এদের উৎসবের যাত্রা। আমার দুঃস্বপ্ন জীবন নিশ্বাস মৃত্যুর মধ্যে দিবে ছুটেছে—অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত ধ্বংস হ'তে হ'তেই তারা প্রাণের পথ কেটে দিচ্ছে। তাই মৃত্যুই কিঙ্কণ বাজিয়ে জীবনকে শক্তি করছে, নানা দিকে প্রসারিত ও প্রবাহিত ক'রে দিচ্ছে। আজ জানি না পরকালে কি ঘটবে, তথাপি অজানা তার বাঁশি বাজিয়ে আমাকে দূর থেকে দূরে ডেকে চলেছে, আমাকে ধরছে। ক'রে নিয়ে চলেছে। আমি প্রতিদিনের চলাকে ভালোবাসি বলেই জীবনকে ভালোবাসি। অজানার স্বর শুনে চলা আমার ভালো লাগে। তুমি আমার সঙ্গে চলেছিল, হঠাৎ এক সময়ে একেবারে পথ থেকে নেমে গেল। আমরা ক্রমাগত চলেছি,—আর তুমি হঠাৎ এক জায়গায় টাঁড়ালে, সেখানেই স্তম্ভিত হ'য়ে ছবি হ'য়ে রইলে।

৫ম স্ট্যাঞ্জা

“আমার হঠাৎ মনে হলো, এ কী প্রলাপ বকছি। তুমি কি কেবল ছবি? না, না, তুমি তো শুধু ছবি নয়। কে বলে তুমি কেবল রেখার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে রয়েছ? তোমার মধ্যে যে স্বপ্নের আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল ও মৃতি গ্রহণ করেছিল, তা যদি এখনও না থাকত তবে এই নবীর আনন্দবেশ থাকত না। তোমার আনন্দ যে-বাণীকে বহন ক'রে এনেছিল তা তো থাকেনি। বিশ্বের যে-অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধ'রে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তা যদি না হতো, তবে বিশ্বের এই স্বপ্নচিহ্ন থাকত না। তোমার চিত্ত কেশের যে ছায়া, তা বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে রয়েছে। তা যদি বিশ্ব থেকে মিলিয়ে যেত তবে স্বপ্নের আনন্দের মধ্যেই কতি ঘটত, সেই সঙ্গে মাধবী-বনের স্বর্নরায়মাণ ছায়া লুপ্ত হ'য়ে স্বর্নপ্রাণ হ'য়ে যেত।

“তুমি আমার মাঝে সেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে আছ, তুমি আর পৃথক হ'য়ে থাকলে না। তোমাকে আমি যে ভালোবাসি, সে ভাল বাইরের। তুমি আমার

জীবনের চতুর্ভলোক থেকে যন্ত্রচৈতন্তের জীবনে চ'লে গেছে। আমি ভুলে গিরেহিলাম যে তুমি আমার অন্তরের গভীর দেশে গেছ। আকাশের তারা রাত্রিকে বেটন ক'রে আছে, আমরা কত সময়েই তাদের কথা সচেতনভাবে ভাবি না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকাবে চলার মধ্যে তাদের দিকে চোরে না দেখলেও তাদের সঙ্গীতে ও আনন্দে আমাদের মন অলক্ষ্যে পূর্ণ হ'রে যায়। তখনই পক্ষে চলতে চলতে ভাবছি যে কুলকে ভুলেছি, কারণ সচেতনভাবে তাকে চোখে দেখছি না। কিন্তু আমার যাত্রাপথে সেই ফুল প্রাণেব নিঃশ্বাস বায়ুকে স্তম্ভুর করছে, ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ ক'ছে। আমি ভুলি বটে, তবুও ভুলি না।

আমাদের চেনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে কেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে স'ন্সার সৃষ্টি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ পোশন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইরা তাহার সমস্ত স্তরপর্ধ্যায় কেহ আধিকার করিতে পারে না। উপর হইতে বতটা দৃষ্টমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পের ধেগে যে নিগূঢ় অংশ উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।' পক্ষভূত, অথওতা।

'আমি তোমাকে বিশেষভাবে মানস চক্ষে দেখছি না ব'লে যে ভুলে রয়েছি তা নয় বিন্দুতির কেন্দ্রবলে ব'লে তুমি আমার রক্তের দোল দিবেছ। তুমি 'চোখের বাইবে' নই ভিতরে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেই ক্ষুদ্রই আজকের বহুজরার শ্রামলতাব মধ্যে তোমার শ্রামলতা আকাশের নীলিমার মধ্যে তোমার নীলিমা দেখছি। তুমি যে আনন্দ দিবেছ, বিশ্বের আনন্দেব মধ্যে তা মিলয়ে আছে।

আমি যখন গান গাই তখন কেউ জানে না যে তোমাব মূর তার ভিতরে ধনিত হ'য়ে উঠেছে।' তুমি কবির বাহরে ছিলে, কিন্তু অন্তরের যে কবি সঙ্গীত কাব্য রচনা করছে তাব প্রেরণা রূপে তুমি আজ মর্ম্মরূপে রয়েছ—তুমি আজ কবিচিন্তাবিশারিণী। তুমি কবিত্ব অধরে কবি হ'য়ে রইলে, আর বাইবের নিখিল বাপ্ত হয়ে থাকলে। অতএব তুমি শুধু জবি মাত্র নও।

'তোমাকে একদিন সকালে অর্থাৎ সচেতন অবস্থায় লাভ করেছিলুম, তার পরে গান এলো যত্নরূপে তুমি অন্তরালে চ'লে গেলে। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে গেলে, রজনীর অন্ধকারে অর্থাৎ যন্ত্রচৈতন্তে ও যন্ত্রচৈতন্তের মধ্যেই গভীরভাবে তোমাকে আবার কবে পেলার।'—আত্মনিকৈতন, চত্র ১৩২২।

তুলনী—পূরবী কাব্যে 'পূরবী,' 'কৃতজ্ঞ' কবিতা।

শাজাহান

৭ নম্বর

এই কবিতাটি প্রথমে ১৯২১ সালের সবুজগছের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় 'তাজমহল' নামে প্রকাশিত হয়।

১ এই কবিতাটি বলাকার সকল কবিতার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার ভাবার কারুকার্য, গভীর ভাবব্যঞ্জনা ও মনোহারিণী কল্পনার প্রসার ইহাকে মনোরম করিয়াছে। ইহার কবিত্বময় ঐশ্বর্য অতুল্য। ২

৩ এই কবিতাতে কবি বলিতে চাহিতেছেন যে রাশি রাশি বস্তুস্বৰূপে সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর-বেদনার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। ভারতসম্রাট শাসাহান রাজশক্তি ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্তরের বেদনাকে চিরন্তন করিবার মানসে তাজমহল নির্মাণ করেন।

কিন্তু স্মৃতির চিরন্তনত্ব কেবল স্মৃতিতে পর্যবসিত নয়, স্মৃতির সঙ্গে দে প্রীতি জড়িত হইয়া থাকে, সেই প্রীতিতেই স্মৃতিতেই চিরন্তনত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আবার, কি জড়বিশ্ব, কি প্রাণীবিশ্ব, ছইয়েবই মধ্যে আমরা দেখিতে পাই এক অবিরাম অবিশ্রাম গতি। এই গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির বিকাশ। এই গতি যেখানে ধামিয়া যায় সেখানেই যত আবিলতা, যত আবর্জনা জমিয়া উঠে—সেখানেই নিদারুণ মৃত্যুর আবির্ভাব হয়। এই গতিশ্রোতেই মুক্তির পথ। ৩

৪ সেই জন্ত ব্যথিত বিরহী যদিও বলিতে চায়—‘ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই ত্রিয়া’।—তথাপি সে ভুলে, ভুলিতে বাধ্য হয়, কাবণ, বিচ্ছেদেব বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিবস্থায়ী। অথচ অত্ন দিকে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্য নয়।

‘মৃত্যু যেন তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা তীরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে কিরে দাখ, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হ’য়ে গেল। জানি এই গভীর বেদনাটুকু যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হ’য়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক, এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য,—বিস্মৃতি সত্য নয়। এক একটা বিচ্ছেদ এবং এক একটা মৃত্যুর সমস্ত মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যাথাটা কী ভয়ঙ্কর সত্য। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল জন্মক্রমেই নিশ্চিত থাকে। কেউ থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হ’বে ওয়ে—কেবল যে থাকবে না তা নয়, কারো মনেও থাকবে না।’

—হিরণ্যক. (সাদাপুর, ৪ঠা জুলাই ১৮৯১) ৮৮ পৃষ্ঠা।

৫ শাসাহানের জন্ম-বেদনা অপক্লপ তাজমহলের চেয়েও অধিক সত্য; তাই স্মৃতিমন্ডিরে কত বন্দী হইয়া নাই। চিন্তা-বেদনা এক আধারেই নিজেছে। চিরদিন বন্দী করিয়া ও বদ্ধ করিয়া রাখে না, ক্রমাগতই সে আধার হইতে

আধারান্তরে চলিয়া যায়। বেদনার এই আকার পাণ্ডুর পিণাসা অনন্ত—কোনও সসীম আধারে তাহার এই পিণাসা মিটে না, অসীমকে না পাইলে তাহার আর তৃপ্তি নাই।

যদি তাজমহলের জ্ঞান মানবের শ্রেষ্ঠ কীর্তিতেও জীবনকে ধরিয়া রাখা না যায়, তাহা হইলে জীবনের সত্যকে কিরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে? বের্ণস বলিয়াছেন যে—জীবনের স্বরূপ হইতেছে অনন্ত প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—জীবনের প্রকাশ হইতেছে ‘বিরাট নদী’।

আবার, মানব তাহার কীর্তির চেয়ে মহৎ। অতএব শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁহার আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—উহার মধ্যে তাঁহাকে কুলায় না বলিয়াই এত বড় সীমাকেও ভাঙিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নাই যাহার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলে তাঁহাকে ধ্বংস করা হইত না, আত্মাকে মৃত্যু লভয়া চলে কেবলই সীমা ভাঙিয়া ভাঙিয়া। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্পর্ক তাহা কখনই চিরকালের নহে,—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই বন্ধন। সেই সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রেব মতো খসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশ মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

শাজাহান অর্থাৎ কীর্তিমান মানুষ বা জীবন, যে, কিছুতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না, সে কিছুতেই বন্দী হয় না বলিয়াই তাহার কীর্তি বিলাপ কবিতা বলে—

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,

ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

যে চলিয়া যায় সেই হইতেছে সে, তাহার স্মৃতি-বন্ধন নাই, আর যে অহং কীর্তিতেছে সেই তো ভার বস্তুর পদার্থ। “আমি—আমার” করিয়া যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা “আমি”। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল, যে মানুষটা বলে, তাহারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে,—আর মুক্ত হইয়াছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী—তাঁহাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারত-সাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের অংশকারীম অস্তিত্বে।

মাহুষ যে অতি প্রিয় জনকেও চিরকাল মনে করিয়া রাখিতে পারে না, এ কথা কবি আগেও বলিয়াছেন—এমন গভীরভাবে নয়, একটু রঙ্গ করিয়া—
কণিকার মধ্যে ‘অনবসর’ কবিতায়।

এই কবিতাটি এবং ৯ নম্বর কবিতাটি তাজমহলের চমৎকার প্রশস্তি।
এই তাজমহলের প্রথম প্রশস্তি রচনা করেন শ্রদ্ধা সম্রাট শাজাহান। তিনি
তাজমহলকে বলিয়াছেন—

জগৎসার! চমৎকার! প্রিয়ার শেষ শেষ!

অমল তার কবর ছার তন্তুর তার তেজ!

* * *

কুম্ব-ঠাম খেরান ধাম অমল মন্দির,—

ইহার পর ধাতার বর সন্ধাই রয় স্থির।

—মণিমঞ্জুষা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, ১২৭ পৃষ্ঠা।

তাহার পরে কত কত লেখক তাজমহলের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহার
আর ইয়ত্তা নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা এডুইন্স আর্নল্ড, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

সম্রাটের অনিমেষ ভালোবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্গ।

স্বস্তি-মন্দিরেই যে স্বস্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না, সে কথা দ্বিজেন্দ্রলালও
বলিয়াছেন—

কিস্ত যবে ধূলিলীন হইবে ভূমিও.

কে রাখিবে তব স্মৃতি? তে সমাধি। চিরস্থায়ীবি।

সত্যেন্দ্র দত্ত তাজমহলকে বলিয়াছেন—

প্রেমের ফেউল ভূমি মরণ-বেলায়.

শিরোমণি ভূমি ধরণীর!

—অজ-আবীর।

Not architecture as all others are,

But the proud passion of an Emperor's love

Wrought into living stone, which gleams and soars

With body of beauty, shricing soul and thought;

—Sir Edwin Arnold.

৯ নম্বর কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তাজমহল কেবল যে
শাজাহানের প্রিয়া-বিরহের বেদনা বহন করিতেছে তাহা নহে—

বেথা বাক-বয়েছে প্রেমদী—
রাজার প্রাসাদ হ'তে রীনের কুটারে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবিয়ে করিল মহীয়নী ।

• • •
আজ সর্ব-মানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষণ-মন্দরীয়ে
আলিঙ্গনে মিরে'
রাজিঙ্গন করিছে সাধনা ।

চঞ্চলা

৮ নম্বর

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি তখন এলাহাবাদে ছিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে কবি ছাদের উপর বসিয়া ছিলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া অগণ্য নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে কবির মনে এই ভাবোদ্বেগ হইল যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিপুল স্ফুর্জনী-শক্তির স্রোত বহিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহারই ঘূর্ণাবর্তে কত শত সৌরমণ্ডল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃদ্ধদের মতো শেষ হইয়া যাইতেছে। ঐ মহাব্যোমের বিরাট সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে কত কত আলোকের ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়া আবার নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো ইয়ত্তা নাই। ইহাকেই কবি বিরাট নদী-রূপে অদ্ভুত করিয়াছেন। জীবন-ব্রাহ্মণ্ড ঐ একটি বাণী, 'অলঙ্কিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'।

। এই কবিতাটি বুঝিতে হইলে করাসী দার্শনিক বের্গস জগৎ সম্বন্ধে যে নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা জানিলে ভালো হয়। বের্গস বলেন— জগতের মধ্যে, আমাদের মধ্যে, সদাসর্বদাই পরিবর্তন চলিতেছে, এবং দুইটি পরিবর্তনের মাঝামাঝি অবস্থাটিও কেবলই পরিবর্তন মাত্র। এমন কোনো 'অবস্থিতি চিহ্ন' বা স্পৃহা নাই প্রতিদুহুতেই যাহার পরিবর্তন হয় না।

"We change without ceasing, and the state itself is nothing but change. There is no feeling, no idea, no volition, which is not undergoing change at every moment: if a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow."

অন্তঃপরিবর্তন ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। অপরিবর্তনশীল কোন সত্তা স্বীকার করিতে পারা যায় না, আবার কোনো বস্তুর পরিবর্তন হয় এমন কথাও বলা চলে না, কারণ পরিবর্তন স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে সেই বস্তুটির একটি অপরিবর্তিত অবস্থা ছিল বাহার পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা যতদূরেই দেখি না কেন কেবল চিরপরিবর্তনই আমাদের চোখে পড়ে। জগতে পরিবর্তনের যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে কিছুই স্থির থাকে না। সমস্ত কিছুই রূপান্তর ঘটিতেছে এবং ঘটিবেই। বের্গস ইহার নাম দিয়াছেন ‘Becoming’ অর্থাৎ ‘হওয়া’। যদি বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে এক গতি ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। এই গতিকে কেহ বলেন কম্পন, কেহ বলেন ইথারের ঢেউ, কেহ বা বলেন নেগেটিভ ইলেক্ট্রন। একটি নদীর ধারার সঙ্গে এই পরিদৃশ্যমান জগতের তুলনা করা যাইতে পারে। এই যে অনাদি অনন্ত স্রোত, এই যে জীবনধারা, এই চরম ও পরম শক্তি চলন্তী শাস্তী। কিন্তু এই শক্তির গতি যে অবাধ, বাধাবদ্ধহীন, তাহা নহে। চলিতে চলিতে হঠাৎ বাধা পাইয়া প্রতিহত হইয়া এই শক্তি ফিবিয়া দাডায়। চৈতন্যশক্তির এই যে প্রতিঘাত, এই বিপরীত গতি, বের্গস’র মতে ইহারই নাম বস্তু। জীবনধারা যেন একটি উৎস, তাহার ধারা কেবলই উপরে উঠিতে চায়। যে জলকণাগুলি উপরে উঠিয়া আবার পড়িয়া যায়, সেগুলিই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। অতএব বস্তুও গতিরই একটি অবস্থা মাত্র, বুদ্ধির দ্বারা আমরা নিরবচ্ছিন্ন গতিধারাকে ধ্বংস করিয়া বস্তু-রূপে দেখি। কিন্তু বাস্তবিক কালের কোনো বিভাগ নাই, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলিয়া কালের কোনও বিভাগ করাই সম্ভব নহে। বের্গস বলেন, “অতীতের অবিরত প্রবাহ নিবন্ধে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, বর্তমান সেই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি হাইফেন্ মাত্র, বর্তমান বলিয়া কিছুই নাই, কারণ যে মুহূর্তকে আমরা বর্তমান বলি তৎক্ষণাৎ তাহা অতীত হইয়া যাইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ আসিয়া সেই বর্তমান নাবিক কালবিশুর স্থান অধিকার করিতেছে।”

টিক এই কথাই কবি রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।
ডিমি এই করিতায় বলিয়াছেন—

কার্ণের কোন মুহূর্তই স্থির হইয়া নাই—তাহাদের ক্ষিতর সিয়া

পরিবর্তনের। প্রবাহ অদৃশ্য বেগে নিরন্তর চলিয়াছে ; সেই প্রবাহ-বেগে সবই ভাসিয়া চলিতেছে। বিখ্যেয় প্রবাহ কালকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কাল বিরাট্। ভরা নদীর স্রোত লক্ষ্য-গোচর হয় না, তাহার বেগ বুঝা যায় তাহার উপরে প্রবমান ফেনপুঞ্জের গতি দেখিয়া। কালপ্রবাহেরও খর-গতি-বেগ বুঝিতে পারা যায় তাহার উপরে প্রবমান তারকাপুঞ্জের গতি দেখিয়া। কালের বেগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কারাহীনতা হইতে কার্য্য পরিগ্রহ করিতেছে। জলের বেগে কেনার উৎপত্তি হয়, তেমনি কালের বস্তুহীন বেগে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে—কারাহীন স্বপ্নের বেগে যেমন বস্তু জাগিয়া উঠে তেমনি। গাছের মধ্যে যে বেগ তাহা বীজ হইতে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হইতে কাণ্ডে, কাণ্ড হইতে পাতায়, পত্র হইতে ফুলে, ফুল হইতে ফলে, ক্রমাগত রূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া চলে। চলাটাই সর্ব্বত্র রূপ হইয়া উঠে। চলাটাই রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া, পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিতেছে। সেই চলা ভৈরবী বৈরাগিনী অনন্তপথবাজিনী। তাহাব পথের ভই ধারে সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু ; কিন্তু কাহারও দিকে তাহার দৃকপাত নাই। বস্তুর প্রবাহ যখন চলে তখন তাহা দেশে কালে বিভক্ত হইয়া চলে। জল যখন চলে তখন তাহা বহু দেশের স্রোতস্বিনী ; কিন্তু বাধা পাইলে তাহা হয় একটি স্থানের প্রাবন। চলার দ্বারা সমস্ত কিছুই ভার-সামঞ্জস্য হয় ; এবং চলা স্থগিত হইলেই সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয় ও তখন বস্তু ভার হইয়া উঠে। যখন কোনো ভারী বাক্যে করিয়া ভার বহন করে, তখন যতক্ষণ সে চলে ততক্ষণ তাহার চলার দোলা লাগিয়া তালে তালে তাহার কাঁধের ঝাঁকও ভুলিতে ভুলিতে চলিতে থাকে, তাই তাহার কাঁধের ভার বহন করা সাধ্য হয় ; কিন্তু যখন সে চলা ধামাইয়া স্থির হয়, তখন তাহার কাঁধের ভার হুবহু বোঝা হইয়া তাহাকে পীড়া দেয়।

গতি প্রবাহ কোনো রকমে প্রতিহত হইলেই তৎক্ষণাৎ বস্তুস্থাপ জড়ো হইয়া উঠে। বের্গস ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। স্থিতিতে বস্তুর স্থাপ জমা হইয়া উঠিলে তাহার রূপের বৈচিত্র্য কুটিবার অবকাশ লুপ্ত হইয়া যায়। বস্তুর আত্মদানে, তাহার নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দেওয়াতে জমাইতেছে প্রাণ, আর তাহার সঙ্করে জাগিতেছে মৃত্যু। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে বস্তু হইতেছে তাপ চাপ পরমাণু-সংস্থান প্রকৃতির বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র—অণু পরমাণু তো পৃথিবীরই সমষ্টি মাত্র—ইলেকট্রন প্রোটন নিউক্লীয় প্রকৃতির। তাই একটি বস্তু তাপ ও পরমাণু-সংস্থানের ভিন্নভাষ্যে

বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—একই বস্তু হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন যে জল, সেটি কখনো তরল হইয়া নদীতে প্রবাহিত হইতেছে, কখনো বাষ্প মেঘ হইয়া আকাশে উড়িতেছে, কখনো প্রাপ্ত তাপ হইয়া এগ্নিতে গতি সঞ্চার করিতেছে, আবার কখনো বা জমাট কঠিন হইয়া তুষার-পর্বতে পরিণত হইতেছে এবং আপনার আকার-সংঘাতে টাইটানিক জাহাজ চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে ! নদীর জলে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর দিয়া কত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহার ভার বোধ করা যায় না। কারণ, সেই অগাধ জলরাশি সচল বহমান। কিন্তু এক কলসী জল তুলিয়া মাথায় চাপাইলে তাহা দ্রবহ বোধ হয়, কারণ সেটা স্থির। বস্তু যখন চলে তখন তাহার ভার ভার থাকে না, বস্তু-প্রবাহ থামিলেই তাহা ভাব হইয়া পড়ে।

‘কবি চঞ্চলা কাল-নদীকে অথবা ভবনদীকে ডুই কাপে দোঁখিয়াছেন—
ভৈরবী-বৈরাগিনী, এবং নটী চঞ্চলা অপ্সরী। গ্রন্থ-নক্ষত্রের বর্ণনের মহাছন্দে
যেন ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে কবির ভাবোচ্ছ্বাস।’

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বস্তু কেবল গতি বা বাধা মাত্র—বেগ যখন কোনো অবস্থায় স্থিরতা লাভ করে তখন সেই বাধার ফলে বস্তুতে পরিণত হয়। গতিবেগ বাধা পাইলে চলন্ত ট্রেনের কলিশনের মতন উচ্ছ্রিত হইয়া উড়ু দেয়াল হইয়া উঠে।

বৈরাগিনী কোথাও সংস্কৃত হইয়া না থাকিয়া ক্রমাগত যে নিরুদ্ধেশ যাত্রা করিয়া চলিয়াছে তাহাতেই জগৎ-সঙ্গীতের অনাহত স্রব উৎপন্ন হইতেছে।

অসীম বে দূর, তাহার প্রেম সর্বনাশা, সমস্ত সঞ্চয় ও বর্তমানতাকে বিনাশ করিতে করিতে তাহার যাত্রা। সেই অভিসারিকার চলার দোলা লাগিয়া দোলার বেগে তাহার বক্ষের হার ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে অমনি নক্ষত্রের মণি উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই চলার বেগে তাহার কানে বিদ্রাতের ঢুল ঢুলিতে থাকে—যেমন ভাগবতে অভিসারিকা গোপিকাদের কানের ঢুল ঢুলিয়া ঢুলিয়া আগে বাড়িয়া বাড়িয়া কোন্ দিকে কুক আছেন তাহা নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল, তেমনি এই অভিসারিকার সমস্ত কিছু চলার বেগে তাহাকে নির্দেশ করিয়া দিতেছে। সেই অভিসারিকার অঞ্চল হইতেছে তৃণ-পল্লব ফুল-ফল—তাহাও চলার বেগে হুঁশিড়েছে চুপুটিতেছে। বিশ্বের মধ্যে এবং মানুষের জীবনে সমাজে ইতিহাসের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চলার যে লীলা হইতেছে, তাহার অপেক্ষপাতা প্রত্যক্ষ করিয়া

কবি যেন আমল্যে মৃত্যু করিতেছেন—তাহার কবিতার ছন্দে সেই মৃত্যুর স্ফোটা লাগিয়াছে।

মহাকাল মৃত্যুগতিশীল, তাই যে-মুহূর্তকে বেঁধে বলি 'তুমি আছ' অমনি সেটা 'নাই' হইয়া যায়। এই জন্ত বেগ'ন' বলিয়াছেন যে বর্তমান বলিয়া কিছু নাই, যে মুহূর্তে বাহ্যকে বর্তমান বলি সেই মুহূর্তেই তাহা অতীত হইয়া যায়—অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ—আর তাহাদের মধ্যে হাইকেন্দ্ৰ হইয়া আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান। বাহ্য থাকিয়াও নাই, বাহ্য এক মুহূর্তে থাকিয়া সেই মুহূর্তেই নাই হইয়া যায়, তাহা বিজ্ঞ, তাহাতে কোনো আবর্জনা কলুষ লাগিতে পায় না, তাই তাহা পবিত্র। ক্রমাগত এই ষাণ্ডা ও না-খাকার ঘন্ডের মধ্য দিয়া কালের যাত্রা—তাহারই চরণস্পর্শে ধূলি তাহার মলিনতা ভোলে, এবং মৃত্যু প্রাণে পর্ববসিত হইয়া চলে। এই মহাকাল যদি স্থগিত হইয়া যায়, তবে সমস্ত বিশ্ব জড় হইয়া বাইবে, আকারহীন chaos হইয়া পড়িবে। বাহ্য অপরিবর্তিত তাহা জড় জীবনহীন। নদীর মৃত্যুর ছন্দে মৃত্যু জীবন হইয়া উঠিতেছে, সৃজন-প্রলয়ের চিরশূন্য নির্বাল আকাশে নিখিল বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

যে চকলা গ্রহ-নক্ষত্রে সর্বত্র মৃত্যু করিতেছে, সেই প্রাণীর জীবনের মাঝেও মৃত্যু করিতেছে—প্রাণ মানেই 'অলঙ্কৃত চরণের অকারণ আবরণ চলা।' সমুদ্রের তরঙ্গে যে চলা দোলা, তাহাও সেই তৈরবিগী বৈরাগিণী নদীরই চলা। সেই চলার বেগে প্রাণ যেন স্বরণ-ধারার মতন যুগে যুগে রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিতেছে—জন্মজন্মান্তরের রূপ ঘুচাইয়া ঘুচাইয়া এবং ইচ্ছাঘের ও আবাল্যের রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রাণের যাত্রা।

কবি সেই কালস্রোতে ভাসিয়া এই অম্বে মহাকবি হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুর রাশিতে হইলে এ জীবন-কালের সমস্ত সঞ্চয় ধন মান বশ ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া চলিতে হইবে, নদীর কূল যেমন নদীর ধারাকে প্রবাহিত করিবার জন্তই আবশ্যক, তাহাকে বন্ধ করিবার জন্ত নয়, তেমনি মানবের জীবনের সমস্ত উপার্জন তাহাকে অগ্রসর করিয়া অসীমের অনন্তের পানে লইয়া বাইবার কাজে যদি না লাগে তবে তাহা বন্ধন হইয়া উঠিবে। কবি ক্রমাগত অতল আঁধারের ভিতর দিয়া অকূল আয়োকে যাত্রা করিতে বলিতেছেন। জীবনের পথেই হইতেছে অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ ও প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ, যাত্রার

ভুলনায়—

And see the spangly gloom froth up and boil.

—Keats, *The Pot of Basil*, xli.

Yet all experience is an arch wherethro'

Gleams that untravell'd world, whose margin fades

For ever and for ever when I move

—Tennyson, *Ulysses*

ভ্রষ্টব্য—বার্গসে।—বিনয়েন্ড্রনাথায়ণ সিংহ উত্তরা ১০৪০ অগ্রহায়ণ, ৪০৫ পৃষ্ঠা।

১০ নম্বর

১৩২১ সালের মাঘ মাসের সবুজপত্রের ৬৬২ পৃষ্ঠায় “উপহাৰ” শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

মানুষ সচেতন ভাবে পুণ্যলোভে ভগবানকে যাহা সম্প্রদান করে তাহা অতি নীচ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের সমগ্র চরিত্র ও জীবন যদি পুণ্যময় হইয়া উঠে, যদি তাহার জীবনযাত্রাই ভগবানের নিদেশানুরূপ হয়, তবে তাহার জীবনের প্রত্যেক কর্মে প্রত্যেক চিন্তায় প্রত্যেক ইচ্ছায় ভগবানের আনন্দ ও তৃপ্তি হইবার কথা পুণ্যলোভে যদি দান করি অথচ আমার স্বভাব যদি দয়ালু না হয়, পুণ্যলোভে যদি পূজা কবি অথচ আমার মনে যদি পূজাব ভাব স্থায়ী হইয়া না থাকে, তবে সেই-সব অন্তঃকরণ পণ্ডিত্রমাত্র। আর যদি মহানির্বাণ-তত্ত্বের আদর্শ—যৎ যৎ কর্ম প্রকৃর্বাতি তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যদি গীতাব অন্তঃশাসন—

যৎ করোষি যদ্ অশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদ অর্পণম্ ॥”

জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ বিতরণ করেন আনন্দে আমার জীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করিয়া।

ব্রহ্মজ্ঞানার্থের মতে ধর্ম বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের বিষয় নয়, ইহা বাহিরের কাহারও নির্দেশের মুখাপেক্ষী নয়—গুরু মোক্ষা বেদ কোরান ধর্ম-রক্ষক বলিতে কেবল সেইটুকু পালন কবাতেই ধর্ম পর্যবসিত নয়। ইহা যদি প্রতি মুহূর্তে মানবের জীবনে প্রকাশ পায়, যদি ইহা জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ

হইয়া উঠে তবেই তাহা প্রকৃত ধর্মপদবাচ্য ও পরমেশ্বরের প্রীতিতে গ্রহণীয় হয়। এ সম্বন্ধে কবি বহু পূর্বেই লিখিয়াছেন—

“আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মতো উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনার তাকে জয়দান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে স্থখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হবে মরতে পাবি। যা মুখে বক্তৃতি, যা লোকের মুখে শুনে প্রতাহ আরাতি করছি, তা যে আমাদের পক্ষে কতই মিথ্যা। তা আমরা বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট গড়ে তুলছে।

—ভিন্নপত্র (কুষ্ঠণ, ৫ই অক্টোবর ১৯২৫) ৩৪১ পৃষ্ঠা।

বিচার

১১ নম্বর

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩১১ সালের সবুজপত্রের মাঝ মাঝে প্রকাশিত হয়।

১ম স্ট্যাঙ্ক

রিপু উদ্যম হইয়া উঠিলে পূর্ণকে আচ্ছন্ন ও স্তান করে পূর্ণের সৌন্দর্য উপলব্ধি না করিয়া যাহাযা তাঁহাকে খণ্ডিত করিয়া প্রচ্ছন্ন করে, তাহাযা তাঁহাকে অপমান করে। কবি এই অপমানের বিচার প্রার্থনা করিতেছেন সেই পূর্ণাৎ পূর্ণের কাছে।

কিন্তু বিচার তো প্রার্থনা করিবার আগেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিচার তো নিরন্তর চলিতেছে। কলুষিতকে ক্রমাগত বিচার করিতেছে বাহ্য পবিত্র, যাহা স্কন্দর—যে নিজেই অস্কন্দর সে কখনো কলুষিতের বিচার করিতে পারে না। কলুষিতের বিচার চলে তাহার বিপরীত স্কন্দরের দ্বারা—আত্মালকে বিচার করিতেছে শাস্ত্র সপ্তর্ষি নিরবচ্ছিন্ন ও অকুণ্ঠিত শুচিভাবে এবং সৌন্দর্যের আদর্শ মাননযোগ্য—সৌন্দর্য নিজেই কলুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিচার। নৈতিক বিত্বকারই নীতিব্রহ্মের চরম বিচার। যখন বিধাতা অনাচারী পাপীদেরও জন্ত তাঁহার বিচারশালায় সুরতি পুষ্প পবিত্র সমীরণ ও বিকলজ্বলন, আরোহণ করিয়া রাখেন, তখন সেই পাপীরা এই করুণার প্রভাবে সেই স্কন্দরকে আর অস্বীকার করিতে পারে না।

বলাক।

২য় স্ট্যাঙ্কা

যেখানে জাযা অধিকার সভা স্বস্ত নাই সেখানে নিজের লোভকে অক্ষয় করিয়া তোলা চুরি—সেই চুরি যেখানেই করা হোক তাহা স্কন্ধের ভাণ্ডারেই করা হইয়া থাকে ; এবং সেই অনাচারের ফলে যিনি প্রেমে সব দিতে প্রস্তুত তাঁহাকে অপমান করা হয়, তখন প্রেমই আহত হয়, কারণ প্রেমের প্রতি অনাচার প্রেমেরই ব্যভিচার কবি অপমানের শাস্তি প্রার্থনা করিতেছেন প্রেমিকের কাছে ।

কিন্তু তাঁহার শাস্তি তো না চাহিতেই চলিতেছে—অনাচারীর পাপের জ্ঞান যখন তাহার জননীর অশ্রু বরে, সতী স্ত্রী স্বামীর অনাচারের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীত হইয়া সমস্ত রাজি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহার সংপথে প্রত্যাবর্তনের জ্ঞান, পাপীর অনাচারে যখন তাহার বন্ধুর হৃদয়ে ব্যথা লাগে, তখনই তো তাহার শাস্তি ও বিচার চলিতে থাকে ।

৩য় স্ট্যাঙ্কা

সে যেখানেই চুরি করুক না কেন, পরস্বাপত্তরন মাত্রই পরমেশ্বরের ভাণ্ডারে চুরি ; কারণ,—

ঈশা বাস্তব্ টম্ সর্প দ্য কথ্য জগতায় জগৎ ।

তেন তাজেন ভূজীখা মা গৃধঃ কস্ত শিন্দ ধনং ।

এই অপরাধের গুরুত্ব এত অধিক যে কবি তাহার জ্ঞান কোনো শাস্তি বা বিচার প্রার্থনা করিতে সাহস করিলেন না, তিনি সেই দুর্ভাগ্যের জ্ঞান মার্জনা প্রার্থনা করিলেন—তাহার এই অপরাধ রুদ্ধ দয়া করিয়া মুছিয়া ফেলুন, রুদ্ধের দণ্ড ভোগ করিতে হইলে সে তো একেবারে পিষ্ট বিনীত হইয়া যাইবে ।

কিন্তু রুদ্ধের কাছে তো প্রশ্রয় নাই, যেখানে সংশোধনের কোনো পথ না থাকে সেখানে তিনি ধ্বংস করিয়া তাহার সংশোধন করেন । স্কন্ধের যেমন অস্কন্ধের বিচারক, এবং প্রেম যেমন অপ্রেমের বিচারক, তেমনি চোরকে বিচার করে তাহার পুঞ্জীভূত পাপ । নৈতিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে রুদ্ধ আগ্রহ হইয়া জ্ঞানদণ্ড ধারণ করেন । মানুষ অপরের সহিত সম্পর্কে সত্য ও ত্রাণপরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই হইল বিধাতার বিধান । সেই বিধান না মানিয়া যে সেই সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া জগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, রুদ্ধ তাহার বিচার করেন—এ বিচার লোকনিন্দার, নৈতিক দিক্কারে, তাহার অধঃপতনে ।

কৃত্ত সমস্ত আবর্জনা মার্জনা করেন, অপসারিত করেন, তিনি তাহা উপেক্ষা করেন না, ক্ষমা করেন না। মার্জনা মানেই ধ্বংস। পুরাতন অপসারিত না হইলে নূতনের সৃজন হয় না, এবং নূতনের সৃজনেই কৃত্তের মার্জনা প্রকাশ পায়।

নির্দয় গতির মধ্যে কবি যেমন আনন্দ দর্শন করেন, নির্মম কৃত্তের ভিতরও তেমনি তিনি মার্জনা করুণা লক্ষ্য করেন।

তুলনীর—

Throw away thy rod,
Throw away thy wrath,
O my God,
Take the gentle path !

* * *

Then let wrath remove,
Love will do the deed,
For with love
Stony hearts will bleed

—Herbert (17th cent), *Discipline*

প্রতীক্ষা

১২ নম্বর

ভগবানের কাছে অজস্র দান পাই আমরা। তাঁহার দয়ার দান আমরা আমাদের বন্ধনে পরিণত করি, নিজেদের আশঙ্কির দ্বারা, তাঁহার দানব অনেক অমর্যাদাও করি আমরা। কিন্তু যখন মানুষ ভগবানের দানের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সেই অজস্র বিপুল ঋণের বোঝা তাহার কাছে দুর্ব্বহ চইয়া উঠে। ভগবানের কাছে অবাচিত দান এত পাওয়া যায় যে সেই প্রশ্নয়ে আমাদের চাওয়াও ক্রমাগত বাড়িয়া চলে, চাওয়ার ও ভিক্ষুকপনার আর অন্ত থাকে না। এই ভিক্ষুক জীবনে ক্লান্ত হইয়া কবি নিজেকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন—আমি তোমাকে এইবার দিব এবং আমার সর্ব্ব দিয়া তোমার ঋণ কবজিৎ পরিমাণেও দি পাবি শোধ করিব। আকাশ যেমন স্নেহে কিছুকে ধারণ করিয়া থাকিয়াও নিলিপ্ত নির্মল মুক্ত রিহ্ন, তেমনি আমি তোমার হাতে নিজেকে দি। তোমার অজস্র দান পাইয়াও ভারবুক চইয়া

থাকিব—বাহা আমি তোমার হাত হইতে বরমাণ্য-রূপে পাইয়াছি, তাহাই তোমাকে ফিরাইয়া দিয়া তোমাকে জীবনে বরণ করিয়া লইব, আমাদের মালা-বদল হইয়া যাইবে।

১৩ নম্বর

পৌষ মাস যেন তপস্বী—সে সর্বরিক্ত হইয়া পূর্ণতার সাধনা করে। সেই পৌষ মাসের তপোবনে হঠাৎ বসন্ত-কালের মাতাল বাতাস কেমন করিয়া প্রবেশ করিল—শীতের দিনে বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল। ইহাতে কবির মনে হইল যেন বার্ষিক্যের দিনে মনের মধ্যে যৌবনের স্মৃতির উদয় হইয়াছে। শীতের অন্তরে যেমন অমর হইয়া বসন্ত লুকাইয়া থাকে, তেমনি বার্ষিক্যের জরার অন্তরালে যৌবন-স্মৃতি অমর হইয়া থাকে, এবং তাহা এক একটা সামান্য উপলক্ষ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। এই বার্ষিক্য যে জৌর্গতা তাহারও পরপারে আবার এক নবযৌবন অপেক্ষা করিয়া আছে, জন্ম-জন্মান্তরের যৌবনের মালা আমারই গলায় হুনিয়াছে ও হুনিবে।

পুলিন্দ—পূরবা কাব্যে—বঁ বন বেধন-বেধনা রসে উজ্জ্বল আমার দিনগুলি।

২১ নম্বর

এই কবিতাটি যদিও ৮ই মাঘ ১৩২১ সালে লেখা হইয়াছিল, তথাপি ইহার রচনা হইয়াছিল ২৯এ পৌষ কবির মনে। কবি এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় কিরিতেছিলেন, সঙ্গে ছিলাম আমি। ২৯এ পৌষ রেল-গাড়িতে তিনি ২০ নম্বরের কবিতাটি রচনা করেন। রেল-গাড়িতে আসিতে আসিতে কবি দেখিলেন যে রেল-লাইনের দুই ধারে বুনো গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই ফুলের সমারোহ দেখিয়া কবি আমাকে বলিলেন—দেখ, কবে বসন্ত আসিবে তাহার খবর লইয়া এই-সব বসন্তের দূত আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহারা ছ দিন বাদেই খরিশা মরিয়া যাইবে, ইহাদের সঙ্গে কলস্তের সাক্ষাৎ ঘটবে না। কিন্তু ইহারা যে বসন্তের আগমনী তাহাদের সঙ্গের গন্ধে মধুতে গাহিয়া যাইতে পারিল এই আনন্দেই তাহারা অকাল

ধরণ বরণ করিয়া লইতেছে হাসিমুখেই। ইহাদের সম্বন্ধনা করিয়া আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আমি কবিকে বলিলাম—বেশ তো লিখুন না।

কবি হাসিয়া বলিলেন—তুমি তো বলিলে, লিখুন না। কিন্তু আমি লিখি কেমন করিয়া। আমাদের দেশে বুনো ফুলের, পাখীর গাছে—কি কোনো নাম আছে? ইংলণ্ডের লোক অতি সামান্য বুনো ঘাসের ফুলেরও নাম রাখিয়া ফুলের সম্মান রাখিয়াছে, তাহারা প্রকৃতির দানের সমাদর করিয়াছে; আর আমাদের বৈরাগ্যের দেশে সব কিছুতেই উদাসীনতা, যদি বা কোনোটা ফুল সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহার পরিচয় অভিধানে কেবলমাত্র ‘পুষ্প বিং’ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাদের কোন্ নামে আমি পরিচয় দিব আমার কবিতায়?

আমি বলিলাম—আপনি ইহাদের নাম রাখুন, এবং সেই নামেই ইহাদের পরিচয় অমর হইয়া থাকিবে।

কবি হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু সে নাম কে বুঝিবে। আমার পণ্ড্রম হইবে।

কবি কলিকাতায় ফিবিয়া সেই বসন্তের অগ্রদূত ফুলদের সম্বন্ধনা করিয়া কবিতা লিখিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া শুনাইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম—যত সব বুনো অনামা ফুল আপনাব কবিতায় হইয়া গেল পাগল চাঁপা আর উন্নত বকুল।

কবি হাসিয়া বলিলেন—কী আর করি বলো। লোকের চেনা নামেই সেই অচেনাদের চেনালাম।

৩৪ নম্বর

১ম স্ট্যাজা

“আমি আজি আমার মনের জানালার দিকে আপনাকে স্থাপন করলুম—
আমার মনকে বাইরের দিকে মেলে ধরলুম। তোমার চিত্ত দেখানে কাজ
করছে সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার জন্তে তাকে ঘন হুললুম। আমি
দিকে কি ভাবছি, আমার মিজের কি গুণ চুপে আছে, তার দিকে আমি
স্বাক্ষর আর ডাকাতলুম না, এক তখন অসুস্থ বসন্তে পারলুম যে বিধে তুমি

আপন মনে কাজ করুছ। যখন নিষ্ক্রিয় থাকি তখনই তো তোমার ডাক শুনতে পাই।

“আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌লুম? আমি আজ আমার হৃদয়ের ডাককে বাইরে দেখ্‌লুম। আমি যখন অন্তরে নিবিষ্ট হ’য়ে থাকি তখন অনুভব করতে পারি যে তুমি আমার ডাকছ। তখন আমার মধ্যে তোমার যে ডাক রয়েছে তা এসে পৌঁছায়, তোমার-আমার মধ্যে যোগাযোগকে জানতে পারি—বিশ্বের মধ্যে তোমার কর্মচেষ্টাকে আমি অনুভব করতে পারি। আজ আমি দেখ্‌লুম ফুলের মধ্যে পাতার মধ্যে তোমার ডাক রয়েছে। মনের জানালা খুলে দেখি যে তোমার ঐ অন্তরের বাণী চৈত্র মাসের সমস্ত পত্র-পুষ্পের মধ্যে বাইরে ছড়িয়ে আছে। তাই আজ আমার আর কোনো কর্ম নেই, তোমার ডাক শুনে আমি কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। অন্তরের ধ্যানের দ্বারা বাইরের ইন্দ্রিয়ানুভবের দবজা বন্ধ ক’রে যে ডাক মনের মধ্যে শুনতে চেষ্টা করি, আজ সেই তোমার আহ্বান-বাণী যেন পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে চারিদিকে দেখ্‌লুম। আজ তাই কেবল চেয়ে আছি—আমার সব কর্ম ঘুচে গেছে।”

২য় স্টাঞ্জা

“আমি আমার নিজের সুরে যে গান গাই তা আবরণের মতো। কারণ, আমি গাইবার সময়ে তোমার বিশ্বগাণিনীকে আচ্ছন্ন ক’রে ফেলি। আজ আমার নিজের সুরের সেই পর্দা তোমার গানের দিকে উঠে গেল, তোমার সঙ্গীত আমার কাছে প্রকাশিত হলো। আমার নিজের গান যখন বন্ধ হয়েছে তখন আমি অনুভব করছি—এই সকলের আলোই আমার নিজের গানের মতো। আজ আর আমার গানের দরকার নেই, কারণ, প্রভাত-আকাশ আমারই গান প্রকাশ করছে, কিন্তু সে গানের সুরটা তোমার। তাই আমার নিজের সুরের প্রয়োজন রইল না। আমারই সঙ্গীত সকলের আলো আর আকাশকে পূর্ণ ক’বে প্রকাশ পাচ্ছে।

“আজ আমার মনে হলো আমারই প্রাণ তোমারই বিশ্বে তান তুলেছে তোমার বিশ্বের সৌন্দর্যের আকাশের গানের কোনো মানে থাকে না, যদি না আমার মন তাতে সাড়া দেয়। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে তাদের যোগ আছে। বিশ্বের বা কিছু মধুর ও সুন্দর তা আমারই চিন্তে ধনিত

ও প্রতিকলিত হচ্ছে ব'লেই তা মধুর ও সুন্দর। যে-জগৎ আমার চেতনার মধ্যে সাড়া না পায় তা বোবা জগৎ। তাই আমার গানের সুরগুলিকে আজ তোমার জগৎ থেকে কিরে শিখে নিতে হবে। আমি আমার নিজের সুর ভুলে গিয়ে নিজের গানকে তোমার সুরে ধ্বনিত দেখছি,—আর সে সুর তোমার কাছে শিখে নিচ্ছি।

“বিখে বা রমনীয়, বা মধুর দেখছি—যার থেকে রস উপভোগ করছি—তারা চিত্তের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন সুন্দর বস্তু নয়। আমার মনের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাই এসবকে সুন্দর করেছে। বিশ্বের গাছ-পালা দেখে যে ভালো লাগছে সেই ভালো লাগাটাই হচ্ছে তার সৌন্দর্য।

“কুলের মধ্যে আমারই গান আছে, কিন্তু সে গান কার সুরে বাজছে। সে তো আমার নিজের সুরের সা রে গা মা নয়,—তা যে স্বতন্ত্র একটি সুরে পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের সৌন্দর্যে আমার যে আনন্দসন্তোষ, তাব মধ্যে আমি আমার মনেব গান পাচ্ছি, সে গান আমার নিজের বাঁধা সাবধেয়মা সুর নয়—তা তোমার নিজেরই সুর। তাকেই আমি শিখে নিচ্ছি। আমি আনন্দিত না হলে আমার নিজের গান হ'তেই পারত না।

“আমি যখন নিষ্ক্রিয় থাকি তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার সুর শুনি, কুলে পাতায় আমার নামে তোমার ডাককে দেখতে পাই। আজ তাই গাঁইতে চেষ্টা করছি না—আমার খুলী মনকে বিখে মেলে দিয়ে ছ। আজ কলগুলি যে সঙ্গীতের মতো জেগে উঠেছে, এতে আমার হাত আছে—আমার চিত্তই তাদের মাধুর্য দান করেছে—অথচ সেই সুর আমার নিজের নয়—সে গান কুলেরই সুরে রচিত। আমার হৃদয়কে মেলে দিয়ে আমার গানকে তোমার সুরে গুনতে পাবার সৌভাগ্য লাভ করছি।”

৩৫ নম্বর

“এই যে সকালে আকাশটি শিশিরে চকমক করছে, ঝাউগাছগুলি রোয়ে লেগল কুসুম—এরা বাইরের জিনিস হ'লে আজ কি অন্তরের এত কাছে ধাসতে পারত? এই ঝাউ আর আকাশ এমন নিবিড় ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে যে আমি অনুভব করছি যে এরা বেন মনের ব্যাপারেরই অংশ—যদিও এরা কৃতকর্মের ব্যাপার, নয়। কারাগ, এরা যদি কেবল বস্তুপিত্ত দিয়েই

গড়া হ'ত তবে এমন ক'রে আমার মনের মধ্যে স্থান পেতে পারত না,—
বাইরেই থেকে যেত, তাদের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থেকে যেত।

“আজ ঝাঁউগাছের ঝালর আর শিশির-ছলছল আকাশ এমন নিবিড়
ভাবে আমার মনকে পূর্ণ করেছে যে আমার মনে হচ্ছে এরা যেন আমার
হৃদয়ে পড়ের মতো ফুটে উঠেছে। বাইরের বিশ্ব যেন আমার মনেরই
সামগ্রী, যেন অকূল মানস-সরোবরে পড়ের মতো ফুটে রয়েছে। আজ
আমি এই ধূলোবালির মধ্যে বস্তুবিষেই কেবল স্থান পাইনি। আমি আজ
জানতে পারলুম যে এই বিষটি একটি বানী, আর তাব মধ্যে আমি একটি
বানী, বিষটি একটি গান, আর আমি তার মধ্যে একটি গান; এই বিশ্বের
মহাপ্রাণের একটি প্রকাশ আমি, অন্ধকারের বুক-কাটা তারার মতো।
আজ যেন আমার অস্থিচর্ম নেই আজ যেন আমি অন্ধকারের হৃদয় বিনীর্ণ
ক'রে উন্মিত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল আলোক। আজ বিশ্ব আমার খুব
কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।”

৩৬ নম্বর

১৩২২ সালের কার্তিক মাসের সবুজপত্রের ৪১৮ পৃষ্ঠায় “বলাকা” শিরোনামে
প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই কবিতাটি কান্দীর জীনগরে লেখা। কবি সন্ধ্যাবেলা বজরার ছাদে
বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে এক ঝাঁক বলাকা তাঁহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া
গেল। তাহা দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কবি-চিত্তে যে ভাবতরঙ্গ খেলিয়া গেল তাহাই
এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতার বিষয় ও নাম হইতে সমগ্র
বইয়েরই নাম হইয়াছে বলাকা। যাযাবর পাখীর ঝাঁক অনন্ত আকাশপথে
উড়িয়া যাইবার সময়ে কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল যে জগতের সমস্ত
কিছুই যাযাবর, গমিষ্ঠ, প্রাণ হইতে জড়পদার্থ পর্যন্ত। যে গতিবেগ কবি
আবাল্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া নানা কবিতায় নানা সময়ে প্রকাশ
করিয়া আসিয়াছেন, সেই গতির বাণীই শুনাইয়া গেল বলাকার নিক্রম্বেশ
যাজ্ঞা—এক সেই জন্ত এই কবিতাটি হইয়াছে নিখিল জগতের তীর্থযাত্রার
জরগাম। কবি এই দেশ ও কালের বাহিরে, লোক-লোকান্তরে ও কাল-
কালান্তরে নিজেকে প্রসারিত করিয়া বিশ্বজগতে যে চিরন্তন গতিক্রিয়া আছে

তাহাই অনুভব করিতেছেন—তাহার মন সেই বিবাগী হৃৎসরলাকার যাত্রা দেখিয়া প্রাচীন ঋষির মতনই উদাত্ত স্বরে বলিয়া উঠিয়াছে—‘শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পূত্রগণ, হেথা নয়, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোনোখানে সকলের যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে। কাহারও কোথাও স্থির হইয়া স্থগিত হইয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া সন্ধীর্ণ-সীমায় বন্দী হইয়া থাকিবার হুকুম নাই।’

যাযাবর পাখীরা যেমন নিজের বহুযত্নে গড়া পরিচিত ও আরামের বাসা ফেলিয়া অজ্ঞাত দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, নিখিল-প্রাণ তেমনি অনুভব করে—

সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। — প্রবাসী

অতএব এখানে থামিলে চলিবে না—‘আগে চল আগে চল ভাই।’

অন্ধকার নামিয়া আসিতেই ঝিলম নদীর বাঁকা জলধারা ঢাকা পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া কবির মনে হইল যেন কেহ একখানি বাঁকা তলোয়ার কালো খাপের মধ্যে ভরিয়া রাখিল। এই রকম উপমা এক ইংরেজ কবির কবিতাতে দেখা যায়, সেই কবি পাভাডের চূড়াকে খাপ খোলা তলোয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

I'm homesick for my hills again
My hills again !
To see above the Severn plain,
Unscabbarded against the sky
The blue high blade of Costwold lie ;

* * * *

—F. W. Hurvey (born 1888).

এবং বিস্তাপতি বলিয়াছেন—

রজনী ছোট হো দিবস বাড়।
জান কামদেব করবাল কাড় ॥

শীতের অবলম্বে বসন্তের আগমনের সূচনা করিয়া ক্রমশ রজনী ছোট ও দিবস বড় হইতেছে, যেন কামদেব কালো খাপের ভিতর হইতে চক্চকে তলোয়ার আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতেছেন।

বিনের আলোতে যখন ছাঁটা লাগিল, তখন রাজি কালীর জোয়ার লইয়া উপস্থিত হইল—সেই জোয়ারের, যজ্ঞের তারা, কুলের, মতন আসিয়া আসিতে

লাগিল। সেই আচ্ছন্ন অন্ধকার যেন স্রষ্টার অব্যক্ত গুহ্মরানো শব্দশৃঙ্খলের জমাট রূপ—সমস্ত প্রকৃতি যেন কথা কহিতে চাহিতেছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন কেবল অব্যক্ত একটা শব্দ হয়, তেমনি যেন অব্যক্ত এক বাণী অন্ধকার ভরিয়া রচিয়াছে বলিয়া কবির মনে হইতে লাগিল।

সহসা বিজ্যৎ-ছুটার স্রাব হংসবলাকার পাখার শব্দ নিকর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আকাশের বকে রেখা টানিয়া চলিয়া গেল। ঝড়ের মধ্যে যে গতির উদ্ভাসনা, সেই উদ্ভাসনার বশেই যেন বলাকা পক্ষবিস্তার করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধতা যেন তপস্বী করিতেছিল মৌনী হইয়া, শব্দময়ী অপ্সরা সেই পক্ষধ্বনি তাহার মৌনতা স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া গেল এবং সেই ভাষটন ঘটিতে দেখিয়া দেওলার-বন শিতবিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কী! এ কী! এ কী গো!

সেই পাখার শব্দে নিশ্চলৈব অন্তরে চলার আকাজ্জা জাগিয়া উঠিল। কবি নিশ্চলৈবও অন্তরে অন্তরে চির-চঞ্চলের আবেগ অনুভব করিতেছেন। বৈশাখের মেঘ যেমন কালবৈশাখী ঝড়ের তাড়নায় আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া চলে, তেমনি বাধাবন্ধহারা হইয়া ছুটিয়া যাইতে, চাহে পর্বত—পর্বত অচল বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহা বাস্তবিক অচল নহে, পর্বত অতি ধীরে হইলেও মানবের অগোচরে অগ্রসর হইয়া চলে, তাহারও বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, কত কত শিলা নির্ঝরে নদীতে খসিয়া পড়িয়া প্রবাহিত হইয়া দূর-দূরান্তে চলিয়াছে, শিলা ঘুট হইয়া হইয়া পলিমাটিক্রমে সমুদ্রে উপনীত হইতেছে, স্তূতরাং পর্বতও চলিতেছে। গাছও চলিতেছে—কালের মধ্যে স্তম্ভাদ ও স্তরস সঞ্চার করিয়া প্রাণীদের প্রলুক করিতেছে, তাহাদের বীজ দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া ফেলিতে, শালগাছের বীজের গায়ে পাখা গজায় দরে উড়িয়া পড়িবার জন্ত, কার্পাস ও শিমুল গাছের বীজের গায়ে তুলা জন্মায় বীজগুলিকে নানা স্থানে উড়াইয়া দিবার জন্ত—এমনি করিয়া এক দেশের গাছ অন্ত দেশে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যেন সঞ্চার অন্ধকারে কবিকে কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে—

আমি চঞ্চল হে,

আমি স্রুতুর পিয়াসী! —স্রুতুর।

সেই হংসবলাকার পাখার বাণী নিখিলের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে’

স্বকৃতার আবির্ভাব মারাজালের মতম স্বকৃতার অন্তর্নিহিত গতির আবেগকে কবির অসোচন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই পাখা-বিবাকী পাখীরা যেন সেই আবির্ভাব উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গেল। তখন কবি দেখিতে পাইলেন—খাটির উপরে তৃণদল বধিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, ইহা যেন তাহাদের উড়িয়া চলিবারই প্রয়াস। খাটির নীচে কত কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ বীজ তাহাদের অঙ্গুর উৎপত্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহাও যেন তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিবার প্রয়াস। পর্বত চলিয়াছে, অরণ্য দীপ হইতে দীপান্তরে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রপুঞ্জও আবর্তিত হইতে হইতে কোন্ অজানা হইতে অজানার দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে—সেই অজানাকে না জানিতে পারার বিরহ-বেদনার সমস্ত আকাশ ক্রন্দসী হইয়া উঠিয়াছে, নক্ষত্রগুলি যেন সেই কালো-মেরের কপোলে আলোকময় অশ্রুবিন্দু করিয়া পড়িয়াছে। তুলনীয়—

.....তুনিলাম নক্ষত্রের রক্তে রক্তে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন, ... —পূরবী, সমুদ্র।

মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কামনা ভাবনা লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী হইতে অল্প শতাব্দীতে, এক যুগ হইতে অল্প যুগে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত বিশ্বশক্তি ও বিশ্বচেষ্টা যেন আকুল স্বরে চীৎকার করিয়া চলিতেছে—এখানে থামিলে চলিবে না—চলো, চলো, চলো—চলৈবেতি! চলৈবেতি!

এই নিরন্তর চলিবার আহ্বান আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন যুগে ধ্বনিত হইয়াছিল, আবার এই নবীন যুগে স্ববির জাতিকে চলার বাণী শুনাইলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ধ্বনির বলিয়াছিলেন—

নানা জাতীয় জীব অস্তীতি রোহিত শুভ্রম।

পাপোদ্যদ্যবরোজনঃ ইন্দ্র ইচ্ছতঃ সখা।

—চলৈবেতি, চলৈবেতি।

হে রোহিত, চিরকালিই তুমি আসিতেছি যে-কাজি চলিতে চলিতে প্রান্ত হইয়াছে আহার আর জীব ইয়ত্তা থাকে না। প্রেত জনও যদি হইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে তুমি হইয়া যায়। যে চলিতেছে সর্ব দেখতা তাহার সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক। অতএব হে রোহিত, স্বাধির হস্ত, স্বাধির হস্ত চলিতে থাকুক।

পুলিনো চরতো জন্মে ভূকুং আত্মা কলগ্রহিঃ ।

শেরেস্ত মর্বে পাগুনাঃ জন্মে এপথে হতাঃ ॥ —চরবেতি, চরবেতি ।

যে বিচরণ করে তাহার প্রতিপদক্ষেপে পুষ্প প্রস্তুতি হওয়ায় তাহার পথ
অমরময় হইয়া উঠে, তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং সে
নিতাই বৃহত্তর ফললাভ করে। যে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে
বিচরণ করে, তাহার সকল পাপ প্রেমের দ্বারা হতবীর্য হইয়া মরিয়া মরিয়া
তাহার পথের উপর শুইয়া পড়ে। অতএব চলো, চলো ।

চরন্ বৈ মধু বিলতি চরন্ স্বাহন্ উদ্ধবন্ ।

শ্রুত পথ জ্ঞেয়াৎ যো ন তদ্রসতে চরন ॥ —চরবেতি চরবেতি ।

যে চলিতে থাকে সে মধু লাভ করে, যে চলে সেই অমৃতময় স্বাদ ফল লাভ
করে। ঐ দেখ সূর্যের কী দীপ্ত মহিমা—সে যে চলিতে চলিতে কখনো
তদ্রাবিষ্ট হয় না। অতএব চলো, চলো ।

তুলনীয়—

Not there not there, my child ! —Mrs Hemans.

You road, I enter upon and look around,
I believe you are not all that is here,
I believe that much unseen is also here
Allons ! whoever you are, come, travel with me !
Travelling with me you find what never tires.

* * * * *

Allons ! we must not stop here,
* * * * *

Allons ! the road is before us !

—Walt Whitman, *The Song of the Open Road*

৩৭ নম্বর

এই কবিতাটি ইউরোপের মহাবৃদ্ধ স্মরণ করিয়া লেখা বলিয়া মনে হয়।
যখন যরণে যরণে আলিঙ্গন লাগিয়াছে, স্তম্ভুর গর্জন শোনা বাইতেছে,
তখন কবি অল্পভব করিতেছেন যে এই প্রলয়-ভাঙনের ভিতর দিয়া রক্ত
স্রোতকে সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতেছেন—মিথ্যা অস্ত্রার পাপের দ্বারা
যখন সত্য আত্মার হইয়া গিয়াছে, তখন সেই সত্যকে মানি-নিরুদ্ধ করিবার
কাজ এই আয়োজন। এই বিক্ষোভের ভিতর হইতেই নবযুগের উদার

অত্যাশ্রয় হইবে—অতএব কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না, সকলকে চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইয়া নূতনকে সত্যকে জ্ঞানকে আবাহন করিয়া লইতে হইবে। এই যে বিশ্বজোড়া সংঘাত জাগিয়াছে, এই যে ক্রমের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ কাহার দোষে হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। বিশেষ যদি কোথাও একটু পাপ অস্তায় অসত্য প্রবল লইয়া উঠে তাহার জন্য বিশ্ববাসী সকল নরনারী দায়ী, এবং তাহার ফলভাগীও হইতে হয় সকলকে—

এ আবার এ তোমার পাপ।

যে পাপের তার এতদিন নানা স্থানে নানা জনে জমাইয়া তুলিতেছিল, তাহারই আঘাতে রক্ত আজ জাগ্রত হইয়াছেন—দেবতার ও মানবতার অপমান তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এই মৃত্যুর সঙ্গুখে দাঁড়াইয়া আমাদের সকলকে বলিতে হইবে—

তোরে নাহি করি ভয়,

এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি ভয়।

তোর চেয়ে আমি সত্য—এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেশ।

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

এই মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে হইবে, এই মিথ্যার বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইবে, এই পাপেব পক্ষে নামিয়া পুণ্যপঙ্কজ উদ্ধার করিতে হইবে। এই যে কত দেশের কত বীরহৃদয় শোণিত দিয়া পাপ অস্তায় দ্রাবণ করিতে চাহিতেছে, এই যে কত মাতার ও স্ত্রীর অশ্রু ঝরিতেছে, ইহাতে কি পাপ দূর হইয়া পৃথিবীতে নূতন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না? এই যে এত দুঃখ ও আত্মবলিদান, ইহার জন্য তো বিশেষর বিশ্ববাসীর নিকট ঋণী হইতেছেন, তাঁহাকে তো পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। যাত্রি যেমন তপস্যা করিয়া দিবসকে ডাকিয়া আনে, তেমনি এই পাপের প্রারম্ভিক দ্বারা পুণ্যকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। সাত্ব্য বশন মৃত্যুকে বরণ করিয়া মানবতার ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠিতেছে তখন তো সেই মানবতার মধ্যে দেবত্বের অঙ্গর বহির্ভূত রাখা হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো লেশের কবির হসে-বদ্বৈঃ

৩৮ নম্বর

কবিতাটি শিলাইদহে লেখা। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমপক্ষে “নূতন বসন” শিরোনামে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

কবি কাহারও নিকট হইতে একখানি নূতন বসন উপহার পাইয়াছিলেন। সেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া কবির মনে হইল—আমার সর্বদেহে আমার অন্তরে আমার চিন্তায় ভাবনায় আমার প্রেমে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা তো অন্ত নাই, সেই নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা যেন আজ নূতন বস্ত্ররূপে আমার সর্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। গান যেমন বাঁধা সুর অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন তানের উচ্চাসে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তেমনি আমার দেহ নূতন কাপড় পাইয়া প্রতিদিনের বাঁধা গাণ্ডীকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

যিনি চিরনূতন, তাঁহার কাছে আমার ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা হয়। তাই আজ এই নূতন বসন পরিধান করিয়া আপনাকে যেন এই প্রথম তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার হৃদয়ের প্রেমের রং অফুরন্ত—তবু তাহার তৃপ্তি নাই, সে আরো আরো আরো চায়। সেই রঙের নেশাতেই তো নানা রঙের বসন পরিয়া যিনি সকল রঙের রঙ্গী তাঁহার সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া তুলিতে চাই।

নীল রং অনন্তের অকুলের বর্ণ—তাই আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, আমাদের ভগবান নীলমণি। আজ আমি সেই নীলবর্ণের বসন পরিধান করিয়া অনন্তের অনন্ততাকে আমার বসনের বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতেছি। নদীর এ পার সবুজ, কিন্তু যে পার অজানা অচেনা সেই দূরের পারে নীলের পাড়—

দূরাদ্ অরুণক্রান্তিতত্ত্ব তথা

আভাতি বেলা লবণাশ্রুগাণ্ডেঃ।

আজ এই নীল বসন গায়ে দিয়া আমার দেহে মনে দূরের ডাক লাগিয়াছে—যাহা আরম্ভ তাহা ত্যাগ করিয়া অনায়ত্তকে ধরিতে বাজা করিতে হইবে, যেমন করিয়া দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলে বৃষ্টিভরা জ্ঞান কোণের নব মেঘ। যে দিক্ হইতে মনোহরণ কালের বাঁধা বাজিতেছে সেই দিকে কুল ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-বাজার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

৩৯ নম্বর

মহাকবি শেক্সপীয়ারের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পনের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে লিখিত এই কবিতাটি। ১৩২২ সালের পৌষ মাসের সবুজপত্রের ৬০৫ পৃষ্ঠায় 'শেক্সপিয়র' শিরোনামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪০ নম্বর

মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতরে ও চেতনার ভিতরে সঞ্চিত হইয়া থাকে; মানুষ পুরুষাণুক্রমে জন্ম-জন্মান্তরের যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই পুঞ্জীভূত ফল তাহার বর্তমানের বোধ ও অনুভবটুকু। মানুষ যাহা অনুভব করে, তাহার অন্তরালে তাহার অবচেতনার মধ্যে কত কিছু জমা হইয়া রহিয়া যায় যাহার সম্পূর্ণ সন্ধান জানা যায় না। এই অনুভবের মধ্যে তাহার কত লক্ষ পূর্বপুরুষের এবং কত লক্ষ বৎসরের সঞ্চয় আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

৪১ নম্বর

মানুষ সমস্ত জীবন ভরিয়া এবং জন্ম-জন্মান্তরে পুরুষাণুক্রমে যাহা অনুভব করে, তাহাই তাহার বর্তমান অনুভবে রূপ পায়, এবং সেই বহুগুণসম্পন্ন আনন্দ তাহার মৃত্যুর অন্তিমভূতির মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাই সামান্তে তাহার এত আনন্দ, তুচ্ছ বস্তুতে এত সৌন্দর্য্য সে অনুভব করে। কবি এই আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করিবার সৰ্ব্ব বাণী অন্বেষণ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, কেমন করিয়া এই মৃত্যুর মধ্যে অনন্তের আবির্ভাবকে তিনি ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

৪৩ নম্বর

ভগবান্ মানুষের জন্ম-বারে বারে বারে নানা ছুতার আগিয়া উপস্থিত হন— সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে চাহেন, সকল প্রেমের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ, প্রশংসা যশ নিন্দা হুৎ হুৎ সকলেই মধ্য দিয়া তাঁহার আগমন আমাদের জন্ম-বারে। কিন্তু আমরা এমনি দৃঢ় যে সংসারের

সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আপনাকে বন্ধ করিয়া তাঁহার আগমনকে উপেক্ষা করি। তার পরে যখন সব কর্মাবসানে রজনীর অন্ধকারে একা বসিয়া নিভেজে একাকী বোধ হয়, তখন মনে পড়ে তিনি কত মাধুর্যের মধ্য দিয়া কত রূপ-রসের মধ্য দিয়া আমাদের কাছে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার অভ্যর্থনা করি নাই। কিন্তু সেই ফিরিয়া যাওয়া তো নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নহে, সেই ফিরাইয়া দেওয়াই আমাদের মনে পড়াইয়া দিবে যে আমাদের কাছে তিনি অভিসারে আসিয়াছিলেন, এবং তিনি ফিরিয়া গেলেও আবার আসেন।

৪৫ নম্বর

দুঃখ আসিয়া থাকে, আসিয়াছে, তাহাতে ভাবনা কি? এই জগতের তো সবই নম্বর, সুখ যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে, তবে দুঃখই কি চিরস্থায়ী হইবে? সমস্তই কেবল মরিয়া মরিয়া চলিয়াছে—শৈশব মরিয়া কৈশোর, কৈশোর মরিয়া যৌবন, আবার যৌবন মরিয়া বার্ধক্য আসে,—এই এক দেহেই কতবার মৃত্যু ঘটে। এই জীবনে কত সুখ আসিয়াছে, গিয়াছে; কত দুঃখ আসিয়াছে, তাহাও গিয়াছে। তবে এই দুঃখই কি বক্ষে চাপিয়া বিরাজ করিবে? মাহুঘের সুখ দুঃখ ভয় ভাবনা সমস্ত মিলাইয়া নিরাকারই তো আকার গ্রহণ করিতে করিতে চলিতেছেন। অতএব হে জীবনপথের পথিক, হে অনন্ত তীর্থযাত্রী, চলার আনন্দে গান গাহিয়া চলো, পথের ক্লেশ স্বীকার না করিলে পথের প্রান্তে গম্য স্থানে উপনীত হইবে কেমন করিয়া? এই জীবনের অবসানও নূতন জীবনের দিকে যাত্রা, সেখানেও আবার নূতন সুখ নূতন প্রেম প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব ভয়-ভাবনা কিসের? আমি কবি হইয়া জন্মিয়াছিলাম। সেই আনন্দ আমার পরজন্মের সমস্ত আনন্দে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যে জীবনদেবতা এই জন্মে আনন্দ লাভ করিলেন, তিনিই তো জন্মান্তরের সাথী হইয়া থাকিবেন। সে তো অধর—তাই

তারে নিয়ে হ'ল না ঘর বাধা,

পথে পথেই নিত্য তারে সাধা

এমনি করে আসা-যাওয়ার ভায়ে

প্রেমের জাল বোনো—

চিরকাল চলিতে থাকিবে।

এই কবিতাটি প্রথমে ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের সবুজপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় “নববর্ষের আশীর্বাদ” শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

কবি পুরাতনকে কখনো আমল দিতে চাহেন নাই। যৌবনে যখন ‘কড়ি ও কোমল’ রচনা করেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন—‘হেথা হ’তে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।’ সর্প যেমন তাহার জীর্ণ নির্মোক মোচন করিয়া নব কলেবর ধারণ করে, তেমনি মানুষকে সমস্ত জীর্ণতা পরিহার করিয়া হৃৎকের তপস্বী করিয়া অমর হইতে হইবে। কাল যেমন ক্রমাগত বর্তমান হইয়া চলিয়াছে, তেমনি মানবকেও অনন্ত যাত্রাপথে চলিতে হইবে—পথের ধূলা গায়ে যদি লাগে, পথের কাঁটা পায়ে যদি বিঁধে, পথের সর্প যদি দগা ভুলিয়া পথরোধ করে, তবু চলিতে হইবে। যে তীর্থযাত্রী তাহাব জন্ত আরাম নহে, সে তো ঘরের মমতার বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহার তীর্থে পৌছানোই হইবে না। এই হৃৎক সস্থ করিয়া চলিতে পারার মতোই তীর্থের মাহাত্ম্য, পুণ্যের আগ্রহ প্রকাশ পায়; এই হৃৎকই তীর্থরাজের সফল সম্প্রদান। হৃৎক বিরোধ বিপদ মূর্তার বেশেই অসীমের আবির্ভাব হয় মানবজীবনে। সেই সমস্তকে স্বীকার করিয়া যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে নূতনের অভিসারে। যাহা কিছু কুসংস্কার আছে তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু আসক্তি আছে তাহা পরিহার করিয়া সেই অচেনা কাণ্ডারীকে অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে পুরাতনের মোহ দূর হইয়া নূতনের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, যাত্রীর জীবন ধন হইবে।

মাধবীলতায় ফুল ফুটিয়াছে। তাহা দেখিয়া কবি ভাবিতেছেন—

“এই আনন্দ ছবি যুগযুগের প্রজ্ঞার ছিন্ন, আজ তা বিকাশিত হল। যে সভা অপ্রকাশিত ছিল, আজ তা রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। বহিঃপ্রকৃতিতে এই মাধবীর বিকাশ যেমন সভা যেমন আনন্দ আনয়ন করে যে আনন্দ প্রস্তুত হল, সেও তেমনি সভা।” একটি আবার বাহিরে এবং অন্তর আবার গভীরে, তাই যখন তাঁর পরম্পরের তুলনার কেউবা বেশি কেউবা কম-সভা নয়।

মানুষের যে আনন্দধারা আদি কবিতার প্রকাশ করুন তা তেঁা একটি ভাবে আবারই কল্পনা থেকে উদ্ধৃত নয়। রূপকল্প শিল্পী কারোও হিঁদে যে সৌন্দর্যকে রূপদান করে, যে

আনন্দকে কুটিয়ে তোলে, তা তো সেই রসমধুর্য বা মানুষের কত প্রেমে অলঙ্কিত হয়ে কাজ করছিল।—মানুষের সেই অব্যক্ত উত্তম কবি বা শিল্পীর রচনার রচিত হয়ে উঠে। এই রচিত হয়ে ওঠবার তপস্বী গৃহভাষে সকল মানুষের মনের ভিতরে আছে। সকল মানুষেরই মন আপনার বিচিত্র ভাবোত্তমকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা করছে। সেই সকলের ইচ্ছা কখনে কখনে স্থানে স্থানে লাভ ক'রে সফল হয় উঠছে। আমাদের মনে যে-সকল ইচ্ছার উত্তম, আনন্দের উত্তম, অন্তর্গত হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে, তা'রাই হচ্ছে মানুষের সকল সৃষ্টির মূল-শক্তি। তা'রাই চিত্রীর তুলিকায়, কবির লেখনীতে, মূর্তিকারের ক্ষোদনীবস্ত্রে প্রকাশিত হতে থাকে।

অনেক সময়ে 'বসন্ত-কাননে একটু হাসি' আমাদের মনে যে আনন্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়, মনে হয়, হয়তো এ কোনো দিন বাহিরে কিছুতে বিকশিত হয়ে উঠবে না। কিন্তু মনে আশা আছে যে তা বার্থ হয়ে যায় না। লোহিতমাগর দিয়ে যেতে যেতে আমি একবার আশ্রয় স্থাপন দেখেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল যে এই অপূর্ণ বর্ণচ্ছটার সমাবেশকে তঁো ধ'রে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম যে বাইরের প্রকৃতির রূপের উজ্জ্বল আমার মনে ছায়া দিয়ে চলে গেল, সে ছায়াও তো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই যে অমৃতমুহুর্তে সৌন্দর্যে ডুব দিলুম, এর শেষ পরিণতি অপ্রকাশের বেদনার মধ্যে নয়—এই অমৃতভূতি আমার অন্তরলোকে আপন জায়গা ক'রে নিলে। সেই আমার অন্তরলোক সকল মানুষের অন্তরলোকের মামিল। সেইখানে এই-সমস্ত ব্যক্তিগত অমৃতভূতির প্রকাশ ও লয় আকাশে মেঘের প্রকাশ ও লয়, অরণ্যে মাধবীর বিকাশ ও ব'রে গড়ার মতোই স্থিতিলাভের আন্দোলন হচ্ছে বাহির থেকে অন্তরে, আবার অন্তর থেকে বাহিরে। আজ আবার চিন্তে যে আনন্দ দেখা দিয়েছে সে যদিও আমার চিন্তের মধ্যেই আছে, তবু তার মধ্যে একটি বেরিয়ে আসবার প্রয়াস আছে। তাই সে ধাক্কা দিচ্ছে রুদ্ধবারে। সমস্ত মানুষের মন জুড়ে এই ধাক্কাটি নিরন্তর চলছে। সেই ধাক্কাটি হচ্ছে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছা। ইচ্ছা নানা উপলক্ষ্যে জাগ্রত হচ্ছে ব'লেই মানবসমাজে সৃষ্টির কাজ চলছে। এর প্রেরণা, সৃষ্টাত্মকতার মতো আবশ্যকের প্রেরণা নয়, কেবলমাত্র প্রকাশের প্রেরণা। অতএব লোহিতসমুদ্রে আকাশের যে বর্ণভঙ্গিমা আমার মনের মধ্যে একদিন আনন্দের ঢেউ হয়ে উঠেছিল, সেই ঢেউ নিশ্চয় আমার রচনার সাধনায় বারবার তেলা দিয়েছে। আজ বসন্তে বাইরে যে মাধবীমঞ্জরী আমার অন্তরে আনন্দরূপ নিয়েছে সে আমার মনের সাধারণ প্রকাশ চেষ্টার মধ্যে একটি শক্তিরূপে রয়ে গেল—আমার নানা গানের নানা সুরে তার কোলা লাগবে—আমি কি তা জানতে পারব?"

বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি যেমন ফুল হইয়া বিকশিত হয়, অন্তর-প্রকৃতির শক্তিও তেমনি আনন্দসৃষ্টির রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়।

১৬ নম্বর

১৩২২ সালের ফাস্তুন মাসের সবুজপত্রের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় ইহা “রূপ” শিরো-
নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গতি যে কেবল গতিতে পর্যবসিত থাকিতে চায় না, তাহার লক্ষ্য যে সকল
সময়েই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া, নিরাকার হইতে সাকার হওয়া, এই পরম
সত্যটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য। এই কবিতাটিতে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব
নিহিত আছে।

গতিতে বস্তুর রূপ কুটিয়া উঠে, আর স্থিতিতে বস্তুর রূপ জমা হইয়া
একাকার হইয়া যায়। ‘চঞ্চলা’ কবিতার বাখ্যা দ্রষ্টব্য।

‘চারিদিকে বিশ্বের বস্তুরাশি যেন হাফা ক’রে হেসে উঠেছে। শূন্যে বালিতে তাহের
করতালি হচ্ছে, তার উল্লসভাবে নৃত্য করছে। বস্তুর সংঘাতে বস্তুর যে লীলা হচ্ছে, যেন তারই
কোলাহল শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে রূপের মত্ততা। রূপ বস্তুর আকারে গতি পেয়েছে, তাব
সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

চারিদিকে বস্তু-পুঞ্জ সত্তা ধারণ ক’রে প্রকাশের মত্ততার মেতে উঠেছে। তাই যেন
আমার মন তাহের খেলার সান্নিধ্য হতে চায়। বস্তুর বল আমার ভাবনা-কামনাকে বলছে,
‘আমাদের খেলার সঙ্গী হও—লক্ষ্যপোচর হও, ধূলিবালির মধ্যে রূপ ধারণ করো।’

মানুষের যে অব্যক্ত স্বপ্নের বল তারা যেন কুল পেলে বেঁচে যায়। তারা অপ্রকাশকে
পেরিয়ে বস্তুর ডাঙার স্রষ্টার সঙ্গে মিলতে চায়। তারা যেন মজ্জমান প্রাণীর মতো অস্তরের নীচ
থেকে ইটকাঠের মুষ্টি দিয়ে ধরলী আঁকড়ে ডাঙার উঠতে চায়।

এমনি ক’রে মানুষের চিত্তের চিন্তাগুলি বাইরে কঠিন আকার ধারণ করছে। মানুষের
শহরগুলি আর কিছু নয়, তারা মানুষের সেই ভাবনা ও কামনারই ব্যক্ত প্রকাশ। কোনো
শহর কেবল কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টি নয়। মানুষের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ম্যান, স্ট্রীট ও আকাঙ্ক্ষা
রূপ-সংগত হুস্পট হতে চাচ্ছে, তারই যেন লোহা-লকড়ের ভিতর দিয়ে এই শহরের স্পর্শপোচর
হয়েছে। দ্বিপ্রহরগরীতে কত সন্ধ্যা এসেছে, আবার তারা চলে গেছে, ম’রে গেছে। কিন্তু
দ্বিপ্রহর তাহের ভাবনা, ইচ্ছা, প্রতাপ কালে কালে স্তরে স্তরে জ্বলে উঠে ইটকাঠের মধ্যে
আপনাকে প্রকাশ ক’রে এই মহানগরী তৈরী ক’রে গেছে। চিত্তের বেষ্টনকে বাধ দিলে
বস্তুগুলি কেবল মাত্র খোলস হয়ে ঝাঁড়ায়; চিত্তের যে কঠিন চেট্টা দিয়েকে রূপ দিবার প্রয়াস
পেয়েছে, সেই চেট্টাতেই নগর নগরী হয়েছে।

যে-সকল চেট্টা রূপ ধারণ করতে পারুল, তাহের তো আজ স্বেচ্ছা, কিন্তু যেগুলি এখনো
ব্যক্ত হয়নি, তারাও যে র’য়ে গেছে। অতীতের পূর্বগিতামহদের কামনা, ধ্যান-তপস্বী কি লুপ্ত
হয়ে গেছে? না, তারা যে শূন্যে লুপ্ত কানাকালি ক’রে কিংবা, তারা বলছে, ‘আমাদের বাণী
পেলে আপনাদের প্রকাশ করি। আমাদের কোনো আখ্যায় নেই, তোমাদের বাণী সেই আখ্যায়

দেবে। আমরা যে অন্তরের কথা বলতে চাই, শ্রুত হতে চাই।' লোকালয়ের তীরে তীরে এমন কত অশ্রুত বাণী যুগে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে আলো নেই। কিন্তু অতীতের সেই অব্যক্ত ইচ্ছা-চেষ্টা বর্তমান কালের আলোর তীরে, প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছে। তারা সব পুরাকালের আলোকহীন বাড়ী। প্রকাশের ঘাটে উঠতে পারলে তারা বাঁচে।

তারা চিন্তা-ভ্রম ছেড়ে ছুটেছে। তারা রূপ পাবার তাশায় অন্ধ-মত্ত পাড়ি দিয়ে চলেছে। তারা আকাশের তুফান কাতর হয়ে নিরাকারকে আঘাত করেছে। তারা কতদিন ধরে অব্যক্ত মত্ত পার হবার জন্ত যাত্রা করেছে—বলছে 'কোথায় গেলে তাকার পাই? তারা প্রকাশ হবার জন্ত কবির সাহায্য প্রার্থনা করছে।

(৪র্থ শ্লোক)

আমার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগে, আমরা সবাই তাকে রূপ দিতে পারলাম না। কিন্তু তারা বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ পারে কোন্ তপস্রায় গিয়ে তাদের গতি শেষ হবে? তারা সব পাড়ি দিয়েছে। কে জানে কোন্ ঘাটে উঠবে? কিন্তু তারা জানে যে, একদিন তারা নূতন আলোতে বিকশিত হবে। কত যুগ যুগান্তর থেকে মানুষের মনে প্রেমের জন্ত শান্তির জন্ত যে-সকল আত্মন তুষা জ্বলিয়েছিল, তারা যুগে যুগে মানব সমাজের নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কোনো না কোনো বাবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে। পুরাযুগের মানুষের চিরবাহিত আকাঙ্ক্ষার দল একযুগের পাড়ি শেষ করে নবযুগে রূপের বন্ধরে এসে ঝুঁকল। আজকের দিনে যে-সকল ব্যক্তিবিশেষ ওচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে কত গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তপস্রা ক'রে, তাদের অসুখ কামনাগুলি পাড়ি দিয়ে বসেছে—হয়তো তারা কোনো ভাবী কালে অসুখ-আলোতে একাশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কত গ্রাস্তন, দূরবর্তী অতীতের ইতিহাসে এদের জন্ম হয়েছিল, তখন তো কেউ জানতে পারবে না। আজ তারা বাসাছাড়ি পার্বীর ধ্বংসের মতো মানস-লোকের নীড় তাগ ক'রে ডানি মেনেছে। তারা যোঁদন বাসায় পৌঁছেবে, সেদিন কোন্ নীড় তাগ ক'রে তারা এসেছে তা কেউ জানবে না।

আমার ভাবনা কামনা নিয়ে কোন্ এক কবি/ষ কবিতা লিখবে, কোন্ এক চিত্রকর যে ছবি আঁকবে, কোন্ এক রাজপুত্রীতে যে হর্ষাভরা হবে, আজ দেশ তাদের কোনো চিন্তা নেই। আজ সেইসব অস্বস্তিত বজ্রতুমির উদ্দেশ্যে বর্তমানের মানুষ ভাবী কালের দিকে মুখ করে তীর্থ-যাত্রীর মতো চলেছে। হয়তো কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রামের রণস্রোতের কুৎসার আজকের দিনে আরও তপস্রার আহ্বান রয়েছে। করাসীবিজ্ঞবে মানুষের যুগ-সংকীর্ণ ইচ্ছা ও বেৎনায় আত্মন ছিল। তাই তারা ডাক শুনে পেয়ে সংগ্রাম-স্থলে এসে পৌঁছেছিল। যে ইচ্ছা আজ বলহীন করতে পারুল না, ভাবী কালের কোন্ ভীষণ সংগ্রামে তাদের ডাক রয়েছে।"

জগতে অসংখ্য অশ্রুত বাণী অতৃপ্ত বাসনা ব্যক্ত হইয়া আকার পাইবার জন্ত ছটকট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বর্তমানের নিম্নলতা ও অপ্রকাশ ভাবী কালে সফলতা ও প্রকাশ পাইবার জন্ত ব্যাকুল; অসুখ নিরাকার

চিন্তাবেননাগুলি আধারের অধেষণে অস্থির। এইজন্ত ইহারা সব গতি এই বেননাগুলি সত্য বলিয়া গতিও সত্য। কিন্তু এই বেননা যেমন কেবলমাত্র বেননাতেই পর্যবসিত থাকিতে চায় না, গতিও তেমনি চিরকাল কেবল গতি হইয়াই থাকিতে চায় না। এইজন্ত আমাদের ভাষায় সুব্যবহার নাম গতি; আর দুর্ব্যবহার নাম দুর্গতি। চিন্তের বেননা এক আধারেই নিজেকে চিরদিন বন্ধ রাখে না, ক্রমাগতই সে আধার হইতে আধারে গতিশীল। এজন্ত তাজমহল, সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।’ বেগ্‌স্‌ আধার স্বীকার করেন না; গতি চিরকালই গতি, গতিই কাল। নগর প্রভৃতি স্থিতিশীল জিনিস কল্পনা মাত্র, বুদ্ধির সৃষ্টি; সত্যের হিসাবে ইহার মূল্য শূন্য।

১৭ নম্বর

(১ম শ্লোক)

“যতক্ষণ বিশ্বকে ভালো বাসি নি ততক্ষণ আমার জীবনে তার দান কিছু কম পড়েছিল। তখন তার আলোতে সব সম্পদ পূর্ণ হয় নি। কারণ যখন আলোর মধ্যে আনন্দকে দেখি তখনই আমার কাছে তার সার্থকতা আছে। কেবল এই ব্যাপারটি যখন আমার কাছে সপ্রমাণ হল তখনও তার আসল তাৎপর্য (significance) আমার কাছে সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন ভুবনের দিকে চেয়ে থেকে আনন্দের উদ্বোধন হল, তখন যে আলো আমার মনের সঙ্গে মিলন সম্পাদন করল তার সত্য আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। আমি যতক্ষণ ভুবনকে ভালো বাসি নি ততক্ষণ সমস্ত আকাশ দীপ হাতে চেয়ে ছিল—আমার আনন্দের দ্বারা তার আলোর সত্য পূর্ণতা লাভ করবে বলে। আকাশ সূর্যচন্দ্র তারার বাতি জালিয়ে অপেক্ষা ক’রে আছে—কখন আমি প্রেমের আনন্দ-দৃষ্টি দিয়ে তার সত্যকে উপলব্ধি করব। সেই বহুবৎসর ধ’রে দীপ জালিয়ে এই আনন্দের অপেক্ষা ক’রে আছে, কখন আমার জীবন তারার পূর্ণ সত্যকে পাবে।

(২য় শ্লোক)

“রৈদিক প্রেম পান গেয়ে এল—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল, সেইবৎ
কি-বেদ কালকল্পিনি হল।; ভুবনের সঙ্গে আমার পরিণয় হল, সে বললে—

আমি তোমার বরণ কর্ণলুম। আমার প্রেম বিশ্বের গলায় আপন মালা পরিয়ে দিয়ে হেসে পাড়াল। সে তার দিকে হেসে চাইল—তারপর একটা কিছু দিল। যা গোপন বস্তু কিন্তু যা চিরদিনের জিনিস, সে তাকে সেই আনন্দসম্পদ দিয়ে গেল যা তার তারার আলোর চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে রইল। এই সম্পদ উপহার পাবে ব'লেই ভুবন তারার দীপ জালিয়ে অর্থা সাজিয়ে পথ চেয়ে ব'সে ছিল—কবে আমার প্রেমের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হবে, সে এলে ভুবনের গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তারার আলোর মধ্যে এই প্রতীক্ষা ছিল। যেদিন প্রেম এল, সেদিন সে এমন কিছু দিয়ে গেল যা ধ্রুব-তাবার ধ্রুব হয়ে রইল, যা ভুবনকে পরিপূর্ণতা দান করল।

১৮ নম্বর

(১ম শ্লোক)

“আমি বতকর্ণ স্থির হয়ে আছি ততকর্ণ বস্তুসমূহ ভার-স্বরূপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন,—আমাব পক্ষে দ্রব হই। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ধনজন যা কিছু জমতে থাকে তা কিছুই চলে না; তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তাব পাতার মধ্যে ব'সে ব'সে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এই জায়গায় ব'সে ব'সে কেবল খাচ্ছি আর জন্মাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। হঃখ নূতন সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে জীবনের চুল পেকে গেল, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

(২য় শ্লোক)

“আমি যেই চলতে শুরু করলেম, অমনি মন তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারিদিক থেকে এঁটে দিবেছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের ঝাড়া তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে আনন্দের আবেগে যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinionion-এর) দুর্গে বদ্ধ হয়ে বাঁধা আইডিয়ার মধ্যে থাকলে সে

যুদ্ধ হয়ে ওঠে। বা চলে না, স্থির হয়ে জমতে থাকে তা মলিনতার আবর্জনা।
মন যতই নূতন পরিবর্তনের মধ্যে চলছে ততই সে নব নব সম্পদে ভূষিত
হচ্ছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (purified) হতে পারে না।
চলার জানেই সকল বস্তু ধৌত নির্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে
পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি (vigour) সেই
সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায়।
সে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্কা হতে চায় না। তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা
জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে
চালনা করা। চলার আনন্দরস পান ক'বে মনের যৌবন বিকশিত হয়।

(৩য় শ্লোক)

“আমি থামব না। আমি বলব না যে, ‘আমার চলা সারা হয়ে গেল,—
হুতরাং এখন আমি যা সঞ্চয় করেছি তাই দিয়ে-থুয়ে আমি গৃহস্থ হ’য়ে
বসলাম।’—আমি যাত্রী, আমি সন্মুখপানে চলব। কে পিছন থেকে ডাকছে,
আমি তার কথা শুনব না। আমি আর সঞ্চয়—স্থবিরতা—মৃত্যুর গোপন
প্রেমে ঘরের কোনে লুকাব না। আমি ঘর-ছাড়া হয়ে পথের পথিক হব।
আমি চিরযৌবনকে মালা পরাব। ঐ যে চিরযৌবন চলেছে পথিকের
বেশে, তাকে আমি আমার যা-কিছু নিজের রচনা, সৃষ্টি, নিজের যে-সব
দেবার জিনিস সমস্তই দেব। যে বারধা সঞ্চয়ের দুর্গে সতর্ক বুদ্ধির দেওয়ালে
বন্ধ হয়ে ব’সে আছে, তার আয়োজনকে আজ দূরে ফেলে দিয়ে আমি হাল্কা
হয়ে চলব।

(৪র্থ শ্লোক)

“হে আমার মন, অনন্ত গগন যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ হয়ে গেছে। যে
রথ তোমার নিয়ে চলেছে, বিশ্বকবি তার মধ্যে ব’সে আছেন। গ্রহতারা
রবি যাত্রার গান গাইতে গাইতে চলেছে। মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলার আনন্দে
পূর্ণ হয়ে গেছে।

১৯ নম্বর

(১ম শ্লোক)

“আমি জগৎকে ভালো বেসেছি ব’লে এতে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেঁধে ক’রে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাত-সন্ধ্যায় আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি—তারি আমার চৈতন্তের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অশুভব করেছি যে জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাৎ নয়। আমি জীবনকে আলো ভালোবাসি না ব’লে আমার কাছে জগতের আলোকে ভালোবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালোবাসা। আমার জীবনকে কখনো জগৎ-ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতুম, তবে এই অশুভুতি হয় তো থাকত না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি ব’লে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালোবাসা এক হ’য়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্ত এক হয়ে গেছে ব’লে, চৈতন্ত থেকে বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা abstraction। জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে, তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

(২য় শ্লোক)

“এও যেমন একটা সত্য; তেমনি এই কল্পবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও তেমন সত্য। এমন একদিন আসবে যখন আমার যে বাগী ফুলের মতো ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেই দিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অকণোদয়ের আবহানে ছুটছে, সে দিন তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবাহী বলবে না—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পাখিব জীবনের যে এমনি ক’রে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

(৩য় শ্লোক)

“জগৎ জীবনকে এমন একান্ত ক’রে চাচ্ছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে সে কত ক’রে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের

যারা এই চাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে। এ সত্য। তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাদের মরতে হবে, সেও সত্য। তবে কি ক'রে এই contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই? যদি মিল না থাকে, তবে জগৎকে যে চাইলুম, সে যে আমাদের ভোলালে, তা যে একটা মস্ত প্রবন্ধনায় গিরে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দ-সম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন ক'রে সব ছাড়তে হয়, তবে তো কোনো মানে থাকে না।

“অথচ কোনো ক্রুরতা তো বিশ্ব বলীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড় প্রবন্ধনাকে বহন ক'রে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,—তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হ'লে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্ব তার দংশনের ছিন্ন ফুটো বেথে দিয়ে যেত। তবে, মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো ক'রে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সস্ত্র কোটা ফুলের মতো আমার সামনে বয়েছে? এহ সৌন্দর্যের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ যদি তাই হত, তবে তার প্রত্যেক দংশন ভবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন ক'রে কালো ক'রে শুকিয়ে ফেলত।”

[আলোচনা]

(১)

‘এমন একান্ত ক'রে চাওয়া’—এমন ক'রে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন ক'রে যে জগৎকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, এই দুটোই যদি সমান সত্য হরেনও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার এই প্রবন্ধনা থেকে যেত, তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রুরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এর উত্তর এই কবিতায় নেই,—কিন্তু সেটাকে এমনিভাবে বলা যেতে পারে।—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন (renewal) হয় না। [‘রক্তস্রাব’ে, আমি এই কথাই বলেছি। ‘কাদুরী’ ‘বলাক’র সমসাময়িকতা] সীমাকে পথে গড়ে ধরুতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণকণার না হলে

সে যে জীবন্ত হয়ে রইল। রূপ (form) যদি স্থির হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবেই তো অচলরূপে তার সমাপ্তি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে বইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা (elasticity) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুন তার মনের প্রসারণ-শীলতা চ'লে গেল, তখন আবার একটা নবদুগ তার বাণীকে বহন ক'রে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিল। অসীমের প্রকাশ (manifestation) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

এই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে, তা নয়। মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে—বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির কঁাক আছে কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমার দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিধে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ (term) আছে, এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক এক সময়ে ঠেলা আসে। তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে, ততক্ষণ তার বুদ্ধি সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে। কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনেরও এমনি ক'রে adjustment হয়, তার পরিণতির দ্বারকে ভাঙতে হয়—বিশালতর মুক্তিক্ষেত্রের জন্ত।

এটা কোনো দার্শনিক speculation-এর কথা নয়, এ হচ্ছে poetry-র কথা,—সত্যের positive দিক হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negative দিকও আছে। যদি সেটাকেই বড় ক'রে দেখতুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়ত। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর লিহুদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে সত্যের positive দিকটা। তবে এছোটো দিকের মধ্যে সামগ্রিক কোথায়? যখন সীমার রূপের

ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্ত গতি নেই, তখন তাকে কারাগারকে ভেঙে ফেলেই বার বার শাখত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

(২)

ষ্টপফোর্ড ক্রকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র (cycle) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ করব তখন স্থিতির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্বকার জীবনে কি হয়েছিল, এখন আমার সামনের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে, তখন পিছন ও সামনের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

‘জীবনদেবতা’র group-এর কবিতাগুলিতেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কি বলতে চেয়েছি। ‘কে সে, জানি নাই তারে’—এই ভাবের মধ্যে দিয়ে groping করতে করতে অজ্ঞাতভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলুম। আমার চক্র সম্পূর্ণ হল, আমার অল্পভূতির রেখাটি আবর্তন করে এসে আরেক বিন্দুতে মিলল,—একটি পরিস্ফুট হল, আমি বুঝতে পারলুম।

তেমনি করে জীবনের এক একটা চক্ররেখা (cycle) আছে। যখন তা সম্পূর্ণ হবে তখন অল্পভূতির ভিতর দিয়ে মর্মগত (significant) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল যখন সবটা শেষ করি তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যানধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা কেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই—আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্থিতিগুলি ঐক্যধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct-এর। যে পাখীর ছানা (chick) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা জগৎ আছে। তার আবেগনট বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উটো। কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinct-এ—তারই প্রেরণার সে ক্রমাগত খোলসে বা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ (impulse) আছে, তার বিশ্বাস তাকে বলে দিচ্ছে,—‘এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আব্ররকে ভেঙে ফেল।’ অথচ খোলসের গভীর মধ্যে এই জগৎ জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতাও তেমনি আমরা দেখতে পাই। সব ধর্মের systemএ একটা অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে; তা কেবল বলছে যে এই যে যা দেখছি তা শেষ কথা (absolute) নয়। ধর্মতত্ত্ব বলছে যে বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্তমান আছে যে, যা দেখেছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা চেয়ে বেশী মূল্যবান। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ আমাদের instinctএ আছে। 'যাবজ্জীবনং সুখং জীবনং, ঋণং কৃষা স্তুতং পিবেৎ' এ তো ঠিক কথাই—বিষয়ী লোকেরা এই কথা বলছে। কিন্তু মানুষ কিছুতেই মনে করতে পারছে না যে এতেই সব শেষ। সে তর্ক করুক আর যাই করুক, তার instinct তার দেওয়ালে এই ধাক্কা মারতে ক্রটি করছে না, যা প্রত্যক্ষ-গোচর তাকে সে আঘাত করছে, ঠোকার মারছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চ'লে আসছে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক, যাকে তর্কের দ্বারা বোঝান যায়—তাকে মানুষ অবিশ্বাস ক'রে এসেছে। বর্বরদের তো এ বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানাত্মশীলন (culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমাকে স্থির রাখতে পারল না, এগিয়ে নিয়ে গেল, তখন সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গভীরে অতিক্রম করে বর্তমান আছে, তাকে তখন আমি লাভ করলুম। মানুষ যেন জ্ঞান-জগতে কল্প গভীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তেমনি আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবেষ্টন আছে, তার মধ্যকার সত্যকে নেবার জন্য আমার personalityতে 'ভূমৈব সুখম' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছি না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকার দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত, 'অমৃতান্তে ভবন্তি', তারাই অমৃতকে লাভ করে।

প্রত্যেক formএর মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে—খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে, একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে যা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিমান ক'রে চলেছে। মৃত্যুতে formএর কোনো বিনাশ হয় না, তার renewal বা নতুন নতুন প্রকাশ হয়।

তুমি যখন আমার সমাদর ক'রে পাশে ডেকেছিলে, তখন তব হয়েছিল পাছে তোমার সেই আদর থেকে আমি একটুও বঞ্চিত হই, পাছে অসন্তর্ক্ক হয়ে আমার কিছু নষ্ট হয়—কোথাও সম্মানের কোনো হানি হয়। তখন

আপন ইচ্ছা-মতো যে নিজের রাস্তায় চলব তার উপায় ছিল না—যে পথে চললে আপনাকে সহজে প্রকাশ করতে পারি সে-পথে চলতে থিখা হয়েছে। আমি চলতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে গেছি, পাছে এদিক ওদিক এক পা নাড়তে গিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করি। তুমি যখন আমার সম্মান দিলে তখন এই বিপদ হল,—আমি যে আমার মতে সহজ-পথে চলব তা’ হল না, আপনাকে সহজে বহন করে নেবার ব্যাঘাত ঘটল। পাছে আমি কোনো সময়ে তোমার সম্মান হারাই, পাছে কোথাও গেলে ক্ষতি হয়—এই আশঙ্কা আমি দূর করতে পারি নি।

আজ আমি মুক্তি পেয়েছি। তোমার সম্মানের বাঁধনে বাঁধা ছিলাম, আজ মুক্তি বেজে উঠেছে—অনাদরের কঠিন আঘাতে তার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। অপমানের ঢাক ঢোল বেজে উঠল—আমি সম্মানের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলাম। আজ আমার ছুটি—যে-খোঁটা আমার মনকে বেঁধেছিল, তা’ আজ ভেঙে গেল, হাত-পায়ের বেড়ি খসে গেল। যা দেবো আর নেবো দক্ষিণে বামে তার পথ খোলসা হল। যখন সম্মানের বেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পা ফেলেছিলাম তখন আমার ভাবনা ছিল, কি দেবো আর নেবো। কিন্তু এবার দেবার নেবার পথ খোলসা।

আমার এক সময় ছিল যখন আমাকে কেউ জানত না। আমি বিশেষ অনায়াসে বিহার করেছি, স্বছন্দে আকাশ-পৃথিবীতে উপরে উঠেছি, নীচে নেমেছি, কে কি বলবে, কাড়বে তা’ ভাবি নি। সে-সময়ে আমার সম্মানের অধিকার ছিল না। আজ আবার আকাশ-পাতাল আমার খুব করে ডাক দিল, আজ আমি অনাদৃতের দলে। যে লাক্ষিত, তার ভাবনা নেই—সমস্ত জগতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে কে তাকে থামায়? এই যে আমি ঘরের মধ্যে সম্মানের বেষ্টনে ছিলাম, আজ তা ঘুচে গেল। আমি আশ্রয়কে হারিলাম। আজ আমার ঘরছাড়া বাতাস মাড়াল করে দিল, আর আমার ভয় নেই। যখন রাগে কোনো তারা খসে পড়ে, তখন সেই তারার একসময়ে তারকাসমাজে যে সম্মানের আসন ছিল তাকে সে হারিয়ে বসে, “হুঁ পুরোজা নেই” বলে আকাশে ঝাঁপ দেয়। তেমনি আমি আজ বরণটারে ছুটে চলেছি, বলছি “ভয় নেই, সব বাঁধন ছিঁড়ল।”

(৪র্থ শ্লোক)

আমি কাল-বৈশাখীর বাঁধন-ছিন্ন মেঘ । এবার ঝড় আমাকে তাড়া দিল,
অপমানের ঝড় অচলা স্থিতি থেকে আমাকে পথে বা'র করে দিয়েছে ।
সন্ধ্যাবির সোনার কিরণ আমাকে সন্ধ্যানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল । যখন
কালবৈশাখী তাড়া দিল, তখন আমি স্বর্ণ-কিরীট অন্তপারে ফেলে দিয়ে ঝড়ের
মেঘ হয়ে বজ্রমাগিকে ভূষিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম । আমি সেই বাঁধন-হারা
বৈশাখের মেঘ—একা একা আপন তেজে ঘুরে বেড়াব । বাইরের সন্ধ্যান
আমাকে আলোকিত করেছিল, কিন্তু এখন আমার ভিতরে বজ্রমাগিকের তেজ
আছে, সেই তেজ আমাকে গৌরবান্বিত করেছে,—বাইরের অন্তরবির কিরণ
নয় । যে-সন্ধ্যান আমাকে বাইরে টেনেছিল, আমি তাকে ফেলে দিয়ে আপন
অন্তরের মহিমায় একলা পথে বার হয়েছি ।

আমি অসন্ধ্যানের মধ্যে মুক্তি পেলাম । সকলের চেয়ে চরম সমাদর যা'
তা' বাইরে নেই, তা' অন্তরে । যখন বাইরের খ্যাতির ঘটা ঘুচে যায়, তখনই
একমাত্র তোমারই আদর অন্তরে পেয়ে থাকি । সেটাই সমাদরের শেষ,
তাতেই মুক্তি হয় । যা' অপরের অপেক্ষা রাখে তা' আমার পক্ষে বন্ধন ।
লোকের কথার উপর, স্ততিবাদের তারতম্যের উপর তার নিয়ত পরিবর্তন
হয় । কিন্তু তোমার আলো যখন অন্তরে আসে, তখন আপন যথার্থ স্বরূপকে
জানি ; তোমার চরম সমাদরে আমার বন্ধন মোচন হয় ।

গর্ভে যখন সন্তান থাকে তখন সে মাকে দেখে না । মা যখন তাকে মাটির
উপর দূর ক'রে দিল, তখন যেন সে সমাদরের বেটন থেকে অসন্ধ্যানের ধরণীতে
বিচ্যুত হল । কিন্তু তখনই শিশু মাকে দেখতে পেল । যখন সে আরামে পরি-
বেষ্টিত হয়েছিল, তখন সে মাকে জানে নি, দোখ নি । তুমি যখন আদরের মধ্যে
সন্ধ্যানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত কর—তার হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে
জড়িত কর, তখন তোমাকে আমি জানতে পারি না, সেই আশ্রয়কেই জানি ।
কিন্তু তখন তুমি সন্ধ্যানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেল, তখন সেই
বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে
মুক্ত হ'য়ে তোমার মুখ দেখতে পাই । যখন সন্ধ্যান থেকে মুক্ত হ'য়ে তোমার
থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, তখনই তোমাকে দেখতে
পাই ।"—শান্তিনিকেতন, ১৩৩০ আষাঢ় ।

দুই নারী

এই কবিতাটি ১৩২১ সালের সবুজপত্রের কাঙ্ক্ষন মাসে “দুই নারী” শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বজনের প্রথম রূপে দুইভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী। তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনা-রাজ্যে আধিপত্য করেন। আরেকজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, আর অত্রটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আরেকজন পূরণ করেন।

একজন তপস্তাকে ভঙ্গ ক’রে দেন। সেই ভাঙনে, যে-আলোড়ন জেগে উঠছে সে যেন তাঁর উচ্ছ্বাস। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে-বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংগুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্ত কাল আসে তখন অস্ত্র মূর্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে পূর্ণতার ভিতরে সম্বৃত করেছে; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অগংঘম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী সেই বসন্তের আবেগে বাইবেব তাপে আন্দোলিত করে দিলেন, অস্ত্র জন তাকে শিরিরস্নাত ক’রে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান্ ক’রে তুললেন।

হেমন্তকালে যখন ফসল ফসল, তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ-বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার শান্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্বাদের দিকে উল্লেখ তুলে ধরে।

পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অর্ধেক আছে। কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়—তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে, ফলে পরিপক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমা-রেখার মধ্যে পর্যাপ্ত হত, তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন কল্যাপের দিক দিয়ে দেখে, তখন বুঝে যে জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ ক’রে অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করছে।

সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশের মত। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে লবণের ব্যঞ্জন

আছে তার দ্বারা মনে হয় যে সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বলতে গিয়ে খেমে বাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিষ্কৃতি নেই; কারণ সেই কবিতা বা চিত্র বলাকে অতিক্রম করে, যা অনির্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করতে এবং এই সংঘর্ষের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি, যখন মনে হয় যে মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি, তখনি বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিত্তি দিয়ে জীবনের পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

আমাদের জীবনের এই ব্যঙ্গনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করেছে। একজায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে তো সে ঠেকে যায় নি—তাহলে হয় তো মৃত্যু তাব কাছে ভয়াবহ হত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল, তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হল। তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম বলে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থলই অনন্তের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি, তিনি উদ্ধৃত বাসনাকে সেই পবিত্র সঙ্গমতীরে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অগ্নিজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন, যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্যব হিতি।

উর্বলী আর লক্ষ্মী, এরা মানুষের দুটি প্রবর্তনার প্রেরণার প্রতিক্রিয়া। সর্বভূতের মূলে এই দুই প্রবর্তনা আছে। একটি শক্তি, সে ভিতরে বা-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্ঘাটিত করে, এবং আরেকটি শক্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্বতার মধ্যে সফলতার পর্যাপ্তিতে নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

ভাঙা-চোরা যখন চলতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে। সেই উদ্ধাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলতাতেই তার সমাধি হত, তবে দুর্গতির আর অন্ত থাকত না। তাই দেখতে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে, তিনি বাধন-ছাড়া-তানকে শয়ের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ করেন। যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয়, তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে ত একা নয়, গতি প্রবর্তিত করবার সঙ্গে সে আছে;

গতি নিয়ন্ত্রিত কন্যার জন্তে আরেক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই ত বিখের সৃষ্টি-সদ্বীত।

কালিদাসের “কুমারসম্ভব” আর “শকুন্তলার” মধ্যে এই দুই শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্তা যখন ভাঙল তখন অনর্থপাত হল, আগুন জলে উঠল। সেই অগ্নি আবার নিবল কিসে? গৌরীর তপস্তা দ্বারা।

‘শকুন্তলার’ প্রথমার্শে ঠিক এই ভাবে ট্রাজেডিকে দেখান হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্তার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হয়ে জননী হয়ে শাস্তিচিহ্ন হলেন, তখন তাঁর ইষ্টলাভ হল।

কালিদাসের এই দুটি কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্তনার কথা উজ্জল ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ্য করে শক্তির বিবিধ মূর্তি দুটে উঠেছে। সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্তভাবে শিবের সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কা এল যার থেকে, তাকে আমরা কল্যাণী বলিনে। তবু সে না হলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট, তখন তাঁর থাকা না থাকা সমান। যে-শক্তি চকল করে, তাকে বর্জন করে যে শাস্তি, সে শাস্তি মৃত্যু;—তাকে সংযত করে যে শাস্তি তাতেই সৃষ্টি; অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ ভাব সরলতার মধ্যে যে-শাস্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মতো। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখেই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবন পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখন সে সত্যের চরুপথ প্রদক্ষিণ সাক্ষ্য করলে। এই প্রদক্ষিণযাত্রার প্রথম বিপক্ষ বেদনা, শেষ পরি-সমাপ্তিতে শান্তি।

গোটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন, আমার মনে হয় শেঁটা তিনি খুব ভেবে-চিন্তেই লিখেছিলেন। একথা আমি আগেও বলেছি। তিনি বে বলেছেন যে কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্ত্যকে একত্রিত করেছেন। এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিরের উক্তি নয়। হুঁড়ি থেকে কোটা কাউট, প্রথমে নির্জনে বাস করছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই হুঁড়ির মধ্যে পাপের,

আঘাত ছিল না। তিনি বলেন যে এখানেই যদি সব শেষ হত তবে এই দুর্গতির যথার্থ পরিসমাপ্তি হল না;—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়ত, তবে তো তাতে ফল ধরত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, জগতের ভাল-মন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সঙ্গে সরল মনে আলবালে জল-সেচনে ও হরিণশিশু প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হত না। যেখানে জীবনের পতন, চূর্ণ সেখানে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কালিদাস তাকে তো শেষ করতে দেন নি। তিনি Problem of Evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জগতে কিছুই স্থির হয়ে নেই, তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে, কোনো জারগায় ছেদ নেই।

কোনো আধুনিক শিল্পী কালিদাসের মতো 'শকুন্তলার' দ্বিতীয় অংশটা লিখতেন না। ট্রাজেডি দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু আসলে অন্তিমের পরম সত্য ট্রাজেডি নয়। তাকে কক্ষচ্যুত, তার গতিবেগ বিক্ষিপ্ত করে, না আত্মবিকাশের পথে তাকে নিরত উৎসাহিত করে? সেই আত্মবিকাশের লক্ষ্যস্থানে শান্ত শিবঃ অর্ধেতঃ আছেন বলেই আঘাত-সংঘাতের বেগ একান্ত হয়ে বিশ্বকে নষ্ট করে না। গাছ থেকে ফল ভেঁটে হয়ে পড়ে। সেটা একান্তভাবেই ক্ষতি হ'ত, যদি কোথাও ফলেব প্রত্যাশার কোনো সার্থকতাই না থাকত।

দেবাসুরের যখন সমুদ্রমন্ধান হল, তখন সেখানে গরল পান করার দেবতা ছিলেন। তাই সে গরল অমৃতকে অভিজ্ঞত করত পারেনি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশ-মূলক (didactic) বলবে। কিন্তু যা ধর্মনীতির দিক দিয়ে ভালো সেও কল্যাণ নীতির দিক দিয়ে ভালো হবে না এমন তো কোনো কথা নেই। শিবের সতী সৌন্দর্যেরও সতী। উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যমণ্ডে বিশ্ব মত্ত হয়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্যহ্রদয় দেবতা পরিতৃপ্ত হলেন। দেখতে পাই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণমূর্তিকে যন্ত্রপূর্বক পরিহার করতে চায়, পাছে পাঠকেরা বলে বসে এ মূর্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড় হয়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর বলবার সাহস তার নেই।

সত্যকে বিকল্প ক'রে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোসামুদি করে না। সত্যের হৃদয়রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইহুল-মাটারী বলে ঘৃণা করে। একথা ভুলে যায়—নীতি-বিশ্বাসের ইহুলমাটারী কল্যাণকে সত্য এবং হৃদয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত করে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছিন্ন ঘুটিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হ'লেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।

মানুষ যে স্বর্গকে খোঁজে, তাকে সে পৃথিবীর বাইরে মনে করে। তাই সেই স্বর্গে পৌঁছবার জন্য সে সমস্ত তাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়। যে-স্বর্গকে মানুষ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে জানে, তা অস্পষ্ট, অব্যক্ত, সৃষ্টিছাড়া।

আমি অনেকদিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টিছাড়া স্বর্গে অব্যক্তের ভিতরে শূন্যে শূন্যে ঘুরেছিলুম। সেই স্বর্গ যা অক্ষুট ছিল,—যার অবস্থা প্রকাশের পূর্বকার অবস্থা, তার থেকে যেই আমি মাটিতে জন্মালুম, পরম সৌভাগ্যে এই ধূলা-মাটির মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলুম, অমনি স্পষ্ট কপলোকে স্থান পেলাম।

আমার এই জন্মলাভ যেন অনেক দিনকার সাধনাব ফলে। এই স্বর্গের ধারণা যেন কেবল একটা ইচ্ছারূপে ছিল, তা প্রথমে রূপ ধবে নি।

অনেক দিন পর্যন্ত যেন সৃষ্টিনাট্যের নেপথ্যগত একটি ইচ্ছা স্বর্গের মধ্যেই ঘুরছিলুম। ভাবকের মনের মধ্যে যখন কোনো একটা ভাব থাকে, তখন সে একটি বৃহৎ অপ্রকাশের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যেই সে-ভাব একটু রূপ গ্রহণ করল, অমনি অনেকখানি ভাবের নীহারিকা ব্যক্ত আকার ধারণ করল, অতখানি ব্যাপক অক্ষুটতা যেন সার্থক হয়ে গেল। যে-স্বর্গ অব্যক্ত তা অনন্ত অসীম হতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিমাণে রূপ দান ক'রেও অনন্ত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে। তাই আমার পক্ষে মানুষ হয়ে জন্মানো কত বড় কথা। এই যে আমি আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করছি, তার মধ্যে যেন অব্যক্ত অসীমের সৌভাগ্য বহন করছি। এই যে আমি ধূলামাটির মানুষ হয়েছি, এই হওয়ার মধ্যেই কত যুগের পুণ্য। আমার দেহে স্বর্গ তাই কৃতার্থ।

সেই স্বর্গ আমাকে আশ্রয় ক'রে খেলা করতে পারল। আমাকে নিয়ে যে-অমৃত্যুর ঢেউ উঠল তার সংঘাতের ঝোলে সে আপনাকে দোলাতে পারল। স্বর্গ আমার মধ্যে নিত্যনবীন আনন্দজটীর লীলারিত হচ্ছে, আমার ভালোবাসা বিজ্ঞান-বিলম্ব, লাভ ক্ষতি এই সমস্তকে আপন খেলায় তেজে-চুরে নানা রঙে বিভূষিত করছে।

স্বর্গ নীরব ছিল, তার মুখে বাণী ছিল না। আমি যেই গান গাইলুম অমনি সেই স্বর্গ বেজে উঠল। সে আমার প্রাণের গানে আপনাকে খুঁজে পেল। আমার মধ্যে অব্যক্ত আপনার যে লক্ষ্যকে খুঁজছে, তাকে আমার প্রাণের গতির মধ্যে অভিব্যক্তির মধ্যে লাভ করেছে। তাই অসীম আকাশ আজ আমার মধ্যে নিবিষ্ট, তাই আমার স্মৃতিচারণের চেউয়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ সংহত।

আজকে দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে শব্দধ্বনি উঠেছে সে তো আমার প্রাণেরই ক্ষেত্রে, আমারই মধ্যে। সাগর তার বিজয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে—সে তো বাজছে আমারই-চিহ্নকূলে। আমি প্রাণ পেয়েছি, চেতনা পেয়েছি, এই জন্তই তো অঙ্গনে অঙ্গনে শব্দলোকের শব্দ বেজে উঠল,—নইলে বাজবে কোথায় ? তাই তো ফুল ফুটেছে। পূরাক্ষনারা যেমন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে উল্লুঙ্গনি করতে করতে ছুটে আসে, তেমনি আমি আসাতে ফুলের স্ববর্ণা-ধারার মধ্যে হলফুল বেধে গেছে, অনন্ত স্বর্গ মাটির মায়ের কোলে আমার মধ্যে জন্মেছে,—বাতাসে এই বাতাস চারিদিকে প্রচারিত হল।

এ পর্য্যন্ত এই শোকগুলির মানে যা বললাম তাতে একে একরকম ব্যাখ্যামাত্র করা হল। কিন্তু কবিতা তো তত্ব নয়, তা রস। কবি যে-আনন্দের কথাটা এই কবিতার বলতে চাচ্ছে সে হচ্ছে প্রকাশের আনন্দ।

সন্তান যখন বাপমার কোলে জন্মাল, তখন বিপুল আনন্দে ঘর ভরে উঠল,—এ যেমন আমাদের মানবগৃহে, তেমনি অসীমের ক্ষেত্রেও ; রূপ যখনই বাস্তব হয়ে উঠল তখনও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। বাস্তব হচ্ছে কোন্‌খানে ? আমারই চৈতন্তের আলোকিত ক্ষেত্রে। এই জন্তে আমার চোখে যে মুহূর্তে দৃষ্টি জাগল অমনি যেন সোনার কাঠিৰ স্পর্শে একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব উঠল জেগে। যেই আমার কাজের দ্বারে চৈতন্ত এসে দাঁড়াল, অমনি শব্দের জগতে এ কী কোলাহল ! এই যে আমার চিন্তের প্রাঙ্গণে প্রকাশের মহামহোৎসব উঠেছে, কবি তারই বিচিত্র বিপুল আনন্দের কথা এই কবিতার বলেছে। এর তত্ত্ব কত লোকে কত রকম করে বুঝবে বোঝাবে ; কিন্তু এর রসটুকুই কাব্যে প্রকাশ করা চলে।

বা স্পষ্ট নয়, ব্যক্ত নয়, সেই ঠিকানাহীন দেশকে আমি ‘স্বর্গ’ নাম দিচ্ছি।

পৃথ্য সঞ্চার করলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে এই কথাই চণ্ডি কথ্য ; কিন্তু আমি বলছি যে আমি স্বর্গ থেকেই পুণ্যের জোরে মর্ত্যে নেমে এসেছি। আমি যখন

গণ্ডীবন্ধ প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হলাম, তখনই আমার সকল অপূর্ণতা সম্বন্ধে মর্ত্যের মধ্যে স্বর্গ খুলে গেল।

এই স্বর্গমর্ত্যের ভাবটা বহুপূর্বে আমার বাণ্যকাল থেকেই আমাকে অতুসরণ করেছিল।

অল্পবয়সে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি এক রকম ক’বে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে “যে ভববন্ধন-সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে, আমি তাকে ছিন্ন ক’বে অসীম প্রাণকে পাবার জন্ত তপস্শ্রা করব।” সে লোকালয়কে তুচ্ছ মানা, অন্ধতার গহ্বর ব’লে সমস্ত ত্যাগ ক’রে দূরে চ’লে গেল। আকাশের রস বর্ণগন্ধচ্ছটা সব তার চৈতন্তের থেকে অপসারিত হল, সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার ক’রে অসীমকে পাবার জন্ত পণ ক’ল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট মেয়ে দেখা দিল, সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ন্যাসীব মনে দিক্কার হল। সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃত মায়াবিনী দত্তা হয়ে এমনি ক’রে মেয়েটিকে পাতিয়েছে। সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমাব মধ্যে আবদ্ধ ক’রে চায়। এই সংগ্রাম এখন চলছে, তখন একদিন সে ক্রোধেব বেশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল। মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল ব’লে জেনেছে তার সেই অবলম্বন চ’লে যাওয়াতে সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যতদূরে স’রে বেতে লাগল, ততই মেয়েটির হৃদয় তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে লাগল। শেষে মেয়েটি বে বাস্তব, মায়া নয়—তা, সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বৃদ্ধি পাবল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল,—তার মাধুর্য্যে, মানুষ্যের স্নেহপ্রীতিসম্বন্ধের সরসতার তার মন ভ’রে উঠল। সে বললে,—“ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কণ্ডলু—দূর হয়ে যাক এসব আরোজন। সীমাকে বর্জন ক’রে তো আমি কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ ক’রে পেয়েছিলুম ব’লেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি—তার বাইরে তো সেই অনন্তস্বপ্নের প্রকাশ নেই!” —এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল স্তর।

‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ের প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাণ্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, একথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে। ‘অবিজ্ঞা’ বা সীমার কোথেকেই একান্ত ব’লে

জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে; আবার অসৌম্যের বোধকেই একান্ত ক'রে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে; কিন্তু যখন বিজ্ঞা অবিজ্ঞাকে মিলিয়ে দেখে তখনই সত্যকে জানে।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা ব'লে কিছু নেই। সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মানতে হবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' সন্ন্যাসী সীমাকে 'না' করে দেওয়ার যে মুক্তি, তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল; কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

ভেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত ক'রে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে চায়, সে কিছুই পায় না। আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডিতারও সীমা নেই।

৩০ নম্বর

(১ম শ্লোক)

যে-দেহভেলা অবলম্বন করে এতদিন জীবনশ্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলুম, সেই ভেলাকে এবার ভাসিয়ে দাও। তাকে ফেলে দাও, সে চলে যাক। তার সঙ্গে আমার আর কোন যোগ নেই, এবার তার কাজ ফুরালো। অমুক ঘাটে পৌঁছব কি না, আমার কি হবে, আলো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কোন পথ বেয়ে যাবে?—এসব প্রশ্ন নাই করলুম, এর উত্তর নাই বা জানলুম!

(২য় শ্লোক)

না-জানার দিকে যাত্রা করাই তো আমার আনন্দ। অজানাই আমাকে এখানে এনেছিলেন—তিনিই আমাকে আমার এই জন্মগ্রহণের দ্বারা জানা-শোনার বন্ধনে বেঁধেছিলেন, আবার তিনিই তো সব গ্রহি খুলে সব চুকিয়ে দেবেন। আবার ঠিক সব খাপ খেয়ে যাবে, কোনোখানে অসামঞ্জস্য থাকবে না। জানা এসে ব'লে ব'লে সব বাঁধে। তাই আমরা এখানে এসে সব বরকন্না গুছিয়ে নিই, নানা পরিচয়ের মধ্যে খুব ক'রে সব জেনে নিই, 'এ আমার অমুক, সে আমার অমুক।' এইসব জানাজানির ভিতরে বন্দী হই। এমন সময়ে হঠাৎ অজানা খামকা এসে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে জানার বাঁধন সব ছিঁড়ে দেয়।

(৩য় শ্লোক)

এই ভেলার যে হালের মাঝি সে তো অজানা। সেই অপরিচিতই আমার কর্ণধার। সে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অজানাই আমার জানার বন্ধন কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে আমাকে মুক্তি দেয়। সে থেকে থেকে বার বার মুক্তি দিতে দিতে আমাকে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তাই ত আমার সামনের দিকে যে অজানা আছে, তাকে আমি ভয় করতে চাইনে। —আমি জানি সেই আমার হালের মাঝি, সে আমার এই জীবনেও আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যত্ন হঠাৎ এসে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়। আকস্মিক ঘটনা আমাকে দ্রুত করে।—এমনি ক'রে নির্দয় যিনি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন ব'লে অপূর্বের অপরিচিতের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভাঙিয়ে দেন।

(৪র্থ শ্লোক)

তুমি ভাবছ যে, যে দিন চলে গেছে তাকেই ভালো জানি, অতএব তারই পুনরাব্রাতি হোক, তাকেই বারে বারে ফিরে পাই। কিন্তু তুমি যে-কূল ছেড়েছ, সে কূলে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। তোমার কি পিছনের পরেই একমাত্র নির্ভর? ঐ পিছনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য? যা অতীত তাই কেবল তোমার প্রধান সম্পদ, এমনি কি তুমি ভাগ্যহারা? কেন তুমি বলতে পারলে না সামনের পরে তোমার বিশ্বাস আছে, সেখানে তোমার ভয় নেই? পিছন তোমাকে কিছুতে বেঁধে রাখবে না, এতেই তোমার আনন্দ হোক!

(৫ম শ্লোক)

ঘটা বেজেছে, সভা যে ভেঙে গেল,—নৌকো ছাড়তে হবে, জোয়ার উঠেছে। তিনিই অজানা দাঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে মনে করি, কিন্তু দাঁর মুখ দেখা আমার হয় না। তাঁকে জানি না ব'লে একটু ভয় হয় বই কি, একটু বুক দুলে ওঠে, মনে হয় কি জানি কেমন ক'রে অজানা আমার কাছে দেখা দেবে। এই শ্রাবল পৃথিবী তার স্বর্বাংলোক নিয়ে এবারকার মতো দেখা দিল; আবার অজানা কেমন করে দেখা দেবে কে বলতে পারে? এই পৃথিবীতে অসংখ্য বৈকি স্বর্বাংলোকে লোকালয়ের নানা দৃশ্য, নানা ঘটনা, নানা ব্যবহার মধ্যে অজানাকে ক্রমশঃই জানার জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করতে করতে চলেছি।

অজানাকে কেবলি জানা, না-পাওয়ারকে কেবলি পেতে থাকাকেই তো জীবন বলে। এই জীবনকে তো ভালোবেসেছি, অর্থাৎ সেই অজানাকে লেগেছে ভালো। সমুদ্রের এ পারে তাকে ভালো লেগেছিল, সমুদ্রের ওপারেও তাকে ভালো লাগবে।

২৮ নম্বর

(১ম শ্লোক)

তুমি মানুষ ছাড়া আর-সব জীবকে যেটুকু দিয়েছ সে সেইটুকুই প্রকাশ করে। পাখীকে স্তর দিয়েছ, সে সেই বাঁধানুরের দানটি বারবার ফিরিয়ে দেয়, তার বেণী সে দেয় না। আমাকে তুমি যে-স্তর দিয়েছ, সে স্তর তোমার, কিন্তু আমি তার বেণী তোমায় ফিরিয়ে দিই—আমি যে-গান গাই, সে গান আমার।

(২য় শ্লোক)

তুমি বাতাসকে ধ'রে রাখোনি। তার কোনো বাঁধন নেই, সে অনায়াসে তোমার সেবা ক'রে, বিশ্বকে বেঁটন ক'রে কাজ করে। আমাকে তুমি যত বোঝা দিয়েছ তাকে আমার ব'য়ে ব'য়ে বেড়াতে হয়। আমার সেই বন্ধন থেকে মুক্তিকে আপনিই উদ্ধাবন করতে হবে। আমি একে একে নানা বন্ধনদশার পাশমোচনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর থেকে মৃত্যুতে আপনাকে রিস্তাহস্ত ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাব। আমি তোমার সেবার জন্ত স্বাধীনতা অর্জন করব। এই হাতছাটকে মুক্ত করে তোমার কাজের জন্ত নিযুক্ত করব, বলব,—তোমার আদেশে তোমারই কাজে এখন থেকে প্রবৃত্ত হলাম। তুমি আমাকে বন্ধন দিলে, কিন্তু আমাকে ভিতর থেকে মুক্তিতে বিলীন হতে হবে,—আমার কাছে তোমার দাবী বেণী।

(৩য় শ্লোক)

তুমি পুণিয়ার হাসি ঢেলে দিয়ে—ধরনীকে হস্তময় সৌন্দর্য দান করেছ। ধরণীর অন্তরালে যে-রস নিহিত আছে, সে ফিরে সেই রসকে ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আমার তুমি ঐশ দিয়েছ, তার ভার আমার বইতে হচ্ছে। সমস্ত

জীবনের এই দুঃখকে অক্ষমলে ধুয়ে ধুয়ে তাকে আনন্দ ক'রে তুলে আমাকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে—তোমার কাছে নিবেদন করতে হবে। আমি দিনশেষে মিলনক্ষেত্রে সকল দুঃখকে আনন্দময় ক'রে তোমার কাছে নিয়ে যাব—আমার উপর এই ভার রয়েছে।

(৪র্থ শ্লোক)

তুমি তোমার এই ধরণী মাটি দিয়ে তৈরী করেছ, এই ধরণী আলো-অন্ধকারে সুখ-দুঃখে মিলিত হয়ে রয়েছে। আমার তুমি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছ, কিন্তু কিছু সম্বল সঙ্গে দিলে না,—একেবারে হাত শূণ্য ক'রে দিয়েছ, আর আড়ালে থেকে তুমি আমার দেখে হাসছ। তুমি আমাকে এমন অবস্থায় মাটিতে রেখে দিয়ে বলল, “তোমার উপর ভার হচ্ছে এখানে স্বর্গ রচনা কর'বার। তুমি অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভিন্ন ক'রে, মৃত্যু থেকে অমৃতকে বহন ক'রে এনে তোমার আপনার জীবন দিয়ে এই মর্ত্যালোকে স্বর্গ গ'ড়ে তুলবে, তোমার উপর এই ভার রইল।”

(৫ম শ্লোক)

প্রকৃতিতে সব জীবকে তুমি তোমার দানের দ্বারা ভূষিত কর'লে এবং যাদের যা দিয়েছ তারা সেই সম্পদকেই প্রকাশ কর'ছে। কেবল আমার কাছে তোমার দাবী রয়েছে, আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই আমি নিজের প্রেম দিয়ে যে-অর্থ্য রচনা করে দিচ্ছি, সেই রত্নের দান তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বন্ধে তুলে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার পরিমাণ অল্প। কিন্তু আমি যে দান তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তা অনেক বেশী।

তুমি আমাকে অল্প দিয়ে তোমার জীবলোকে ছোট নগণ্য প্রাণী ক'রে দাওনি। কারণ, আমার প্রতি তোমার যে-দাবীর জোর আছে তাতে আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন তা আমার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। আমি কেবল স্বর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তোমার দাবী আছে ব'লে তা সঙ্গীত হয়ে প্রকাশিত হয়। তুমি আমাকে বন্ধন দিয়েছ, কিন্তু বলো যে এই বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে ফেলতে হবে। তুমি চাও যে আমি মুক্তি লাভ করি। তোমার দাবী আছে ব'লেই মানুষকে দুঃখের উপর কলুষিত করে সেই

দুঃখকে আনন্দধারার ধৌত করে পূর্ণ ক'রে তুলতে হয়,—মানুষের জীবনের গতি তাই মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। কিসে তার চুঃখমোচন হয়, সেই সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হয়। তুমি পৃথিবীকে আপনি রচনা করলে, কিন্তু স্বর্ণ রচনা করবার ভার দিলে মানুষের উপর। পৃথিবীতে মানুষের যে সৃচনা হল তাকে তো জ্যোতির্ময় বলা যার না। কিন্তু মানুষকে সেই শূন্যতা থেকে এই মর্ত্যধামেই অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত স্বর্ণ রচনা ক'রে তুলতে হবে। তাই মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই—তার বিরাম নেই, শান্তি নেই। তার সঙ্গে তোমার এই যে কঠিন সন্ধক স্থাপিত হয়েছে তারই তাগিদে সে আপনার অন্তর্নিহিত সম্পদকে ক্রমাগত ব্যস্ত করে। তাই তোমার জ্ঞাত্য তাব যে প্রেমের অর্ঘ্য রচিত হয়, তাকে তুমি বহুমুখ্য রংয়ের মতো আদরের সঙ্গে বন্ধে তুলে নাও।

মানুষ তার ইতিহাসে যে মুগ্ধন নিয়ে যাত্রা আবস্ত কবে, তাব মধ্যেই তো সে থেমে থাকে না। সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম-কর্মতে সে ক্রমাগত উদ্ভ্রম হ'য়ে উঠছে। মৌমাছিবা গগন চাক বাপ্তে স্রব কবে, তখন যাব যে পরিমিত সামর্থ্যটুকু আছে সে সেই অন্তর্যাবে একই বাঁধাপথে কতাব স্থির ক'রে নিয়ে কাজে লেগে যায়। কিন্তু মানুষ তো সন্ধীর্ণ পথে চলে না; তার যে কোথাও দাঁড়াবাব জো নেই। তার হাতে যে উপকরণ আছে তাকে বিশালতব ক'রে তুলতে হয়। সে আপনাকে আরো বিকশিত করবে, সে আরো এগিয়ে চলবে। ইতিহাসে তাব এই আহ্বান রয়েছে।

মানুষের বর্তমান ইতিহাসেও এই বাণী রয়েছে। সে অতীত মানবদের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না—যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী সম্পদ দিয়ে তাব সাজি ভরতে হবে। মানুষের এই গৌরব আছে। সে পৃথিবীকে স্তম্ভর ক'রে তুলল, বল্ল—এই মাটির ধরা আমাদের যা দিয়েছে, আমি তার চেয়ে আরো বেশী একে দিয়েছি।

“চুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে”—যেখানে অপূর্ণতা সেখানেই শক্তির ধ্বজা, সেখানেই দুঃখ। যখন মানুষের বাইরের অবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ঘটে, সে জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যকে পায় না, তখন তাব জীবন-বীণা ঠিক সুরে বাজে না। ‘এই যে চুঃখের বাধা মানুষের পথ বোধ করে, এরই ভিতর থেকে তাকে পথ কেটে বার হতে হবে। সে শক্তি খাটিয়ে মহত্বকে বাধামুক্ত ক'বে প্রকাশ করবে, সকল আন্তরিক দৈন্ত অপসারিত ক'রে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই তার লক্ষ্য। তার এই গোড়াকার দৈন্তই যদি চরম হত, তবে সে

একরকম ক'রে বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারত। কিন্তু তার অন্তরে ধর্মবুদ্ধি বা আর কোনো অহুত্বের চেতনা আছে যা তাকে ক্রমাগত মহত্বের পথে, লক্ষ্য পানে চালিত করছে।

২৯ নম্বর

এই কবিতা আগের কবিতার আত্মবিশ্লিষ্ট। এমন যেন কেউ মনে না করেন যে এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি; এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তি বিশেষ নয়, 'আমি' মানে হচ্ছে যে—আমি ব্যক্তজগতের প্রতিনিধিস্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্টি হই নি; এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আদ্য: যিনি, তাঁর প্রকাশ ছিল না—তা বিশ্বাস করা যায় না।

(১ম শ্লোক)

তুমি যে কোনো সময়ে অব্যক্ত ছিলে তা নয়, কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি কোথাও নেই, তবে সেই অবস্থায় কি রকম হবে এখানে তাই আমি বলেছি। আমি যখন নেই, তখন তুমি আপনাকে লেখতে পাও নি। সে অবস্থায় কারো জ্ঞেয় তোমার পথচাওয়া ছিল না। এই যে সূর্য-চন্দ্রের ভিতর দিয়ে আজ ধীরে ধীরে আমার বিকাশ হচ্ছে, এই যে আমার এই চলার জন্ত তোমার অপেক্ষা আছে, এই যে তুমি আমার জন্ত প্রতীক্ষা ক'রে থাকো, তখন এসব কিছুই ছিল না। যখন আমার অস্তিত্ব ছিল না ব'লে আমি কল্পনা করছি, তখন এই যে ত্ব'পারের আকাঙ্ক্ষার আবেগের হাওয়া আজ বইছে, সেদিন তা ছিল না। আজ আমার থেকে তোমার কাছে, আর তোমার থেকে আমার কাছে কিছু কিছু aspiration, আকাঙ্ক্ষা আসছে বাচ্ছে—আমাদের উভয়ের মধ্যে দেওয়ার-নেওয়ার আদ্য-বাওয়ার হাওয়া বইছে। কিন্তু সেদিন তা ছিল না—এপারের সঙ্গে ওপারের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

(২য় শ্লোক)

আমার; মতোই তোমার সৃষ্টির থেকে জাগরণ হল। আমার মতোই বিশ্বের প্রকাশ হল—কিন্তু যেন যুগ থেকে উঠল। আদ্যকার যে হল

হুটল, তা আমার অন্তই বিকশিত হল, নইলে তার দরকার ছিল না। আমাকে তুমি এখানে নিয়ে এসে কত রূপে যে ফোটাচ্ছ তার ঠিক নেই। তুমি কত রূপের দোলায় আমাকে দোলালে (“আমাকে” অর্থাৎ আমার নিয়ে যে বিশ্ব, যে দৃষ্ট, সেই সকলকে)।

তুমি যেন আমাকে বিক্ষিপ্ত ক’রে দিলে। আমাকে এমনি করে ছড়িয়ে দিলে ব’লেই তোমার কোল ভ’রে উঠল। তুমি আমাকে কিরে কিরে নব নব রূপান্তরে নতুন ক’রে ক’রে পাচ্ছ।

(৩য় শ্লোক)

আমাকে এই নানা ভাবে পাওরাতেই তোমার আনন্দ। আমি এলাম এমনি সব শক্তি হয়ে উঠল—নইলে তার আগে সব স্তব্ব ছিল। আমার মধ্যেই তোমার দ্বংখ, আমি এসেছি ব’লেই তোমাকে দ্বংখ দিলাম। আমি এলাম ব’লে যে আনন্দের উদ্বোধন হল, তার মধ্যে ভেজ থাকত না, যদি দ্বংখ তাকে না জালাত—আমার দ্বংখের ভিতর দিয়েই সেই আনন্দশিখা জ’লে উঠছে? জীবনমরণের এই যে আন্দোলন এ আমার নিয়েই হয়েছে। আমি এলাম ব’লেই তুমি এলে। আমার স্পর্শে তুমি আপনাকে স্পর্শ করলে, আমার পেয়ে তোমার বক্ষ ভরে উঠল।

(৪র্থ শ্লোক)

আমার কত অভাব ক্রটি অসম্পূর্ণতা আছে, তাই আমার চোখে লজ্জা, মুখে আবরণ; আমি সেই আবরণের ভিতর দিয়ে তোমায় দেখতে পাই না। তাই আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, পদে পদে বাধা আছে ব’লে জীবনে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হল না। কিন্তু আমি জানি যে আমি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন আছি ব’লে তুমি অপেক্ষা ক’রে আছ—কবে এই আবরণ উল্কাটিত হবে। এই আবরণ একদিন খসে প’ড়ে যাবে না তা নয়—কারণ তোমার আমাকে দেখবার জন্ত কৌতুকের অন্ত নেই। তুমি ক্রমশঃ আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি পেতে চাও। আমাকে দেখবে ব’লেই তুমি এক আলো আলিয়েছ, তুমি আমার আত্মার সঙ্গে পরিচিত হবে বলেই আমার এই স্মৃতির আলো জলছে।

[আলোচনা]

(১)

“আমি এলেম, এল তোমার হুঃখ”—বিশ্বের হুঃখ তো আমার সীমাব মধ্যেই আছে। তোমার প্রকাশে যদি হুঃখ এসে থাকে, তবে সে তো আমিই বসে এনেছি। তোমার আপনার মধ্যে হুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি। আমার এই হুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অষ্টমের মধ্যে যেটা বৈত সেটাই বড় কথা। শুধু monism তো negative। সীমা সম্পর্কিত হুঃখের বিচিত্র নীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।

এই কবিতার “আমি” মানে হচ্ছে সৃষ্ট জগৎ।

(২)

আমাদের দেহ হচ্ছে অসীমের প্রতিকল্প। সূর্যের আলো, প্রাণ, বাতাস, জল, আমার দেহ—এরা সব আকস্মিক জিনিস নয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অসীমের background আছে। আমার মন যদি একটা isolated fact হয়, তবে আমি কিছুই জানতে পারব না। কিন্তু আসলে আমার মনেব একটা বাস্তবতার background আছে বলেই আমি বুদ্ধির ও চৈতন্যেব জগৎকে পাচ্ছি।

বিজ্ঞান এ পর্যন্ত বলে এসেছে যে প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে ছেদ আছে। প্রাণবান্ জিনিস প্রাণেই নিঃসৃত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। বিজ্ঞান একে Radio-activity-র গতিশীলতা বলেছে। কিন্তু জগতেব প্রাণের এহ গতিবেগ অসীমেরই গতিশীলতার একটা প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে অণু-পরমাণু কিছুই স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা নিজের বেগে চলেছে—nucleus এর চারিদিকে electron-গুলি সৌরজগতের আবর্তনের মতো ঘুরছে, কিন্তু এদেরও অসীমের background আছে। আমরা কি বলতে চাই যে, এই যে আমরা আপনাকে জানি, আমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বনিরূপের চিবন্তন যোগ রয়েছে, এটা কেবল একটা আকস্মিক যোগ, আর দেহমনের উপব যে personality আছে, তার কি infinite background নেই? এ হতেই পারে না। “অগ্নং ব্রহ্ম”—আধিভৌতিক জগতেও অসীম আছেন, তার আনন্দের মধ্যেই তাঁর personality-র বিকাশ। আর এক অর্থে

impersonal। আপনাত্তে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্যবোধের মধ্যে যে আনন্দ আছে তাকেই personality-র বোধ বলা যায়। আমার personality তখনই হৃৎ পায় যখন বাইরে কিংবা অন্তরে এই ঐক্যেব বিচ্যুতি ঘটে।

শৈশব থেকে এ পর্য্যন্ত যে একটা ঐক্যধারার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি— যার মধ্যে আমার আনন্দ আছে, সেই ঐক্যের ভাবটিকেই আমি personality বলেছি। অসীমের personality ও আমার ঐক্যবোধের মধ্যে harmony আছে। যখন অসীমস্বরূপ হৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন, তখনই তাঁর মধ্যে আনন্দ ও প্রেম জাগে। বন্ধুদের আত্মার প্রেমের মধ্যে এক জায়গার বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ঐক্যহ্রদ আছে। বিশ্বের মূলেও এই ব্যাপারটি আছে। আমি আব এক ‘আমি’র প্রতিকল্প। আমার অন্তরের উপলব্ধিতে জীবলোকের নাট্যলীলা (drama of existence) আছে। আমার থাকার মধ্যে বিশ্বের মূলেব এই থাকা আছে। আমি মানে একমাত্র ‘আমি’ নয়, আমার ভোগ কবা, দেখা, জানার উপর যে আমিভ আছে তাই। আমি এসেছি ব’লেই হৃৎ পায় আছে, আনন্দ আছে। আমি এসেছি ব’লেই এপার থেকে ওপাবের চিরন্তন যোগাযোগ চলেছে।

৩১ নম্বর

তোমার নিজের বিশ্বে তোমাব অধিকারের কোনো থকতা, কোনো বাধা নেই। তোমার মধ্যে কোনো অভাব নেই, তুমি পূর্ণ। অভাব যদি না থাকে তবে তো ঐশ্বর্য থাকার কোনো মানেই থাকে না। কেননা অভাবের অভাবকে তো ঐশ্বর্য বলে না, অভাবের পূর্ণতাকেই বলে ঐশ্বর্য। চাওয়া ব’লে তোমার কিছু নেই। স্মৃতবাং পাওয়া ব’লে তোমার কিছু থাকতে পারে না। তা হলে তোমার ঐশ্বর্য, তোমার আনন্দ থাকে কই?

তোমার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই ব’লেই আমার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজন সৃষ্টি করেছ। তোমার বিশ্বকে তুমি আমার ভিতর দিয়ে কিয়ে পাচ্ছ, যেন হারানো ধনকে নতুন করে লাভ করছ। তোমার যে সম্পদ।

তোমার ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ হয়েই আছে, সে তো তোমার পক্ষে অতীত ;
তাকেই তুমি নিরত আমার মধ্যে দিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে
বহমান করে দিচ্ছ।

প্রতিদিনের জাগরণ দিয়ে আমি প্রতিদিন সোনার স্বর্ষোদয় কিনে থাকি।
আমাকে যদি না কিনতে হত তাহলে এ স্বর্ষোদয়ে কোথাও কোনো আনন্দ
থাকত না, এ স্বর্ষোদয়ে প্রভাতী গান জাগত না। প্রতিদিন এ'কে নতুন
ক'রে পাই ব'লেই তো এ'তে আনন্দের মূল্য লাগে। এ'কে ধীর পেতেই
হয় না, তাঁর কাছে এর আনন্দ কোথায়? তাই ত আমার পাওয়ার ভিতর
দিয়েই তোমার প্রভাতের আনন্দ তোমাকে স্পর্শ করে।

তোমার হাতে রসের পরশ-পাখরখানি আছে। কিন্তু তোমার মধ্যে
যদি রস সম্পূর্ণ হয়েই থাকে, তাহলে সেই পরশ-পাখরখানিকে তুমি চিন্বে
কি করে? ক্ষণে ক্ষণে তুমি তাকে যাচাই করবে ব'লেই তো আমি আছি।
তোমার প্রেমের স্পর্শরশ্মি লেগে আমার চিত্ত সোনা হয়ে ওঠে, সেই
সোনাই তোমার যথার্থ সম্পদ, আমার অভাব, আমার অপূর্ণতা, আমাব
বাখার ভিতর দিয়েই তুমি তাকে লাভ কর। তোমার পরিপূর্ণতা যখন
আমার শূন্যকে পূর্ণ করে, তখন তুমি আপন পূর্ণতার স্বরূপটিকে নতুন
নতুন ক'রে দেখতে পাও,—তোমার প্রেম আমার প্রেমের ভিতর দিয়ে
প্রতিকলিত হয়ে তোমার কাছে পৌছয়—তোমার কাছে তোমার প্রেমের
পরিচয় আমারই মধ্যে।

৩২ নম্বর

আজ এই দিনের শেষে এই যে সন্ধ্যা আপন কালো কেশে সূর্যাস্তের
মাসিক পরেছিল, তাকে আমি গঁথে নিয়েছি। তাকে বিনামূল্যে এই
কবিতার গঁথে নিয়ে চলার হার ক'রে নিলুম। এই মাজ, এই ক্ষণে ঐ
খুশির-পড়া চক্ৰবাকের নিজার ঘায়া দীরব নির্জন পন্থার তীরে সন্ধ্যা যেন
তার নির্মাণ দিয়ে পূজার নিবেদিত সোনার ফুলের মালা দিয়ে সমস্ত আকাশ
পাই হয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে ধেবে ব'লে এগেছিল! প্রকৃতি লক্ষ্যহীননের
এই মালা পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করতছিল। সেই মালা যে আমার মাথায়

ঠেকিয়ে গেল, আমি তা অস্তরে অনুভব করলুম। ঐ যে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশে নীহারিকাকে শ্রোতে ভাসিয়ে দিল, ঐ যে আকাশে ছায়াপথে তারার দল ক্রমে ক্রমে সঁরে যাচ্ছে, তা চোখের সামনে পদ্মার তরঙ্গহীন স্রোতের প্রতিবন্ধের মধ্যে দেখছি, যেন সন্ধ্যা সেই তারার দলকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ যে সন্ধ্যা সোনার চেলি রাত্রে আঙিনার অন্ধকারে বিছিয়ে দিয়েছে, সে যেন নিদ্রায় অলস দেহ নিয়ে সেই চেলি মেলে দিয়েছে। আর ঐ যে রাত্রির কালোঘোড়ার রথে চ'ড়ে সন্ধ্যা সপ্তর্ষির ছায়াপথে আগুনের ধূলা উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিল—এই তো সব চোখ মেলে দেখলুম! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সন্ধ্যা এসেছিল, এত বড় কাণ্ড, এত বাটা, কেবল একজন কবির জন্তই হল। তার কাছে এসে সন্ধ্যা তার করুণ স্পর্শ রেখে গেল। অনন্তকালের মধ্যে এমন অনুপম সন্ধ্যা একজন কবির কাছে দেখা দিল,—এত আয়োজন, এই আশ্চর্য ব্যাপার তাকে স্পর্শ করে চ'লে গেল। এমনি ক'রে তুমি এক নিমেষের পজপুটে অনন্তকালের ধনকে ত'রে দাও—এমন যে অমৃত তা ক্ষণকালের ভিতরে সার্থক করে তোলে—এই তো তোমার লীলা।

৫৩ নম্বর

এই যে আমি চলেছি, জীবনের গথে নানা অভিজ্ঞতাব্য ভিতরে আমার যে বিকাশ হচ্ছে, বিশ্বে এটা একটা সার্থক ব্যাপার। আমি আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্যে বিশ্বকে বহন ক'রে নিচ্ছি। আমি চিন্তের আবরণ উন্মোচিত ক'রে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব, এর জন্তে বিশ্বে অপেক্ষা আছে। বিশ্ব আমার ক্রমিক বিকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমার চিন্তা যতটুকু পরিণামে গিয়ে ঠেকে তারই জন্ত বিশ্ব প্রতীক্ষা ক'রে আছে।

আমার মধ্যে যে শক্তি যে আকাঙ্ক্ষা আমাকে চালাচ্ছে, তা বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্বের মধ্যেও এই অগ্রসর হবার, পরিব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা আছে—তা কেবল আমারই একলার সামগ্রী নয়। তাই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে বিশ্বে আনন্দ আছে। যদি আমার চলা এমন বিচ্ছিন্ন সত্য হত, তবে বিশ্বে এমন গতিবেগ থাকত না, বিশ্ব মুন্ডে যেত। কিন্তু আসলে একটি যুগৎ ক্ষেত্রে আমার আকাঙ্ক্ষার স্থান আছে। এই অনুভব ক'রে এই কবিতা লেখা।

(১ম শ্লোক)

আমার মধ্যে কি একান্ত নিঃসঙ্গতা আছে, চিন্তা ছাড়া বাইরে কি আমার কোনো সার্থকতা নেই? হ্যাঁ, আছে। আমার দোসর আছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার আকাঙ্ক্ষার সুর মিলছে। অসীমের পথে আমার চলার শব্দ তাঁর কানে ঠেকছে। এই বিশ্বের যে রূপরসগন্ধ আমার চিত্তে আঘাত করছে, তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বের আনন্দ আমাকে নিয়েই পূর্ণতা লাভ করছে। আমাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের বিকাশ হচ্ছে। যখন আমার চিন্তা সঙ্কুচিত হয় না, আপনাকে উদ্ঘাটিত করে, তখনই এই সূর্য চন্দ্র তারা পূর্ণ আলো দেয়, সেই শুভক্ষণে বিশ্বের সৌন্দর্য সুন্দরতম হয়ে প্রকাশিত হয়। আমি পায়ে পায়ে এগোছি, আর বিশ্বজগৎ প্রতি পদক্ষেপে পূর্ণকিত হয়ে উঠছে। আমি যে চলেছি এর শব্দ কেউ শুনে বা শুনে না, তা আমি জানি না; কিন্তু আমার চলার ধ্বনি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমি জানি যে আমার এই যে আলো-অন্ধকার স্রষ্টা-স্রষ্টার ভিতর দিয়ে যাত্রা, এব পদশব্দ একজন শুনতে পাচ্ছেন।

(২য় শ্লোক)

এই যে জন্ম থেকে জন্মে নব নব জীবনের মধ্যে দিয়ে আমার পন্থটির এক একটি দল উদ্ঘাটিত হচ্ছে, এ তো তোমারই চিন্তা-সরোবরের মধ্যে। তোমাবানাস-সরোবরে আমি পন্থটির মতো বিকশিত হয়ে উঠছি—নব নব জীবনে তার দলগুলি গুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপার দেখবার জন্য সকল গ্রহ তারা চারিদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে, এদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তারা সব আমারই জন্য আলো দান ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তোমার যে জগৎকে সৃষ্টি করেছে, তা যেন অন্ধকারের বৃত্তের উপর তোমার আলোর মঞ্জরী,—যেন তাতে একসঙ্গে অনেক ফুল খ'রে রয়েছে। সেই মঞ্জরী তোমার সৃষ্টি হস্ত পূর্ণ ক'রে রয়েছে; কিন্তু তোমার স্বর্গ তো অমন ক'রে চোখের সামনে প্রকাশিত হয় না, সে লাজুক, সে আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারার বিভিন্ন প্রকাশের মতো একটি শুচ্ছে সে তুটে গুটে নি, সে যেন পাতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা ফুলের মতো। কিন্তু তোমার এই গোপন স্বর্গটি যেখানে, সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন। তোমার লাজুক স্বর্গ প্রবেশের নব নব বিকাশের ভিতরে একটি একটি দল বেলে দিচ্ছে, মঞ্জরীর মতো

তার একেবারে পূর্ণবিকাশ হয় না। আমার অন্তরের ভিতরে তোমার সেই স্বৰ্গ, আমার প্রেমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপড়িগুলি খুলে দিচ্ছে। সেই গোপন উদ্‌ঘাটনের দিকে তোমার দৃষ্টি, তাতেই তোমার আনন্দ।

৪৫ নম্বর

(১ম শ্লোক)

কে বলেছে, যৌবন, তুমি স্থবের গাঁচাতে ছোলা জল খেয়ে বাস ক'বে।
কে বলেছে তুমি বাঁধা নিয়মে আহার কর'বে আর ঝিমুবে আর তোমার গাঁচার চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে? আরে বাপু, তুমি কাঁটাগাছের উপরে চ'ড়ে ফিঙের মত পুচ্ছ নাচাও না কেন? গাঁচার মধ্যে ব'সে ব'সে তোমার বাঁধা খোরাকী খেয়ে কাজ কি?

তুমি পথহীন সাগরপারের পথিক, তোমার ডানা চঞ্চল, অক্লান্ত। তোমাকে আজ্ঞা অজ্ঞানা বাস! সন্ধান ক'বে নিতে হবে,—জানার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঝড়ে যে বজ্র আছে, তার মধ্যে দুঃখ-বেদনা থাকুক না কেন, তাকেই তুমি ঝড় থেকে ছিন্ন ক'বে নিয়ে আসতে পার—আবামের জিনিসকে তুমি চাও না—এহ তোমার দাবী।

(২য় শ্লোক)

যৌবন, তুমি কি আয়ুকে চাও? তুমি কি নিবাপদেব চণ্ডীমণ্ডপে গম্ভীর হয়ে ব'সে থাকবে, এই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা? তুমি কি আয়ুব কাডাল হয়ে থাকতে চাও? না, তুমি যাকে সন্ধান কর'ছ, সে যে মরণ। তুমি তো আয়ুর স্পৃহা রাখো না, তুমি যে অমৃতরস পান করতে চাও। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সেই সুখকে আহরণ কর'বে। মৃত্যুই সেই অমৃতের পাত্রকে বহন কর'ছে। তুমি জীবনের যে সার্থকতাকে চাও। তোমার সেই প্রিয়া মরণ-ঘোমটার ভিতরে অবগুপ্তিতা, সে মানিনী। তাকে পাবার সফলতাতেই তোমার পরিতৃপ্তি। তার আবরণকে উদ্‌ঘাটন ক'রে তুমি তাকে দেখ।

(৩য় শ্লোক)

কোন জ্ঞান তুমি সাধতে চাও? শাস্ত্রকারের পোকাকটা শুকনো তুলট কাগজের পুঁথির মধ্যে কি তোমার বাণী আছে? তোমার বাণী যে দক্ষিণ-

হাওয়ার বীণার আছে। তার সুরে যে অরণ্য জেগে ওঠে। সেই বাগীকে কি তুমি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বার ক'রবে? যে বাগী শুনে অরণ্যে নব-কিশলয়ের উদগম হয়, সেই বাগীই তোমার। তুমি তো পুঁথির পাতার মধ্যে খড়খড় সর্সর্ করছ না; তুমি ঝড়ের ঝড়ার শুনে বেরিয়ে পড়। তোমার বাগী ডেউরে তার বিজয়ডঙ্কা বাজায়।

(৪র্থ শ্লোক)

এই যে একটুখানি প্রাণের গভীর মধ্যে কোনো রকমে বেঁচে আছ, তোমার এই মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। তুমি যে চিরকালের,—যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন, তোমার বিজয়ডঙ্কা বাজবে। সূর্যের আলোক যেমন কুয়াশাকে ছিন্ন ক'রে কেলে, তেমনি তোমার যে দীপ্তিশিখা তা বরষের এই কুহেলিকাকে ছিন্ন ক'রে কেটে ফেলবে। যেমনতর কুঁড়ির বাইরে যে পত্রপুট, তা' সেই খড়্‌খড়ে পাতা কেটে ফেলে ভিতরের ফুলটিকে উদ্ভিন্ন করে, তেমনি বরষরূপ কুঁড়ির বাইরের যে আবরণ সেটা হয় জীর্ণতা, তার বন্ধ ছুঁফাক ক'রে তোমার অমর স্বরূপটি—যা অরবে না মরবে না—তোমার সেই চিরনবীন প্রকাশটি, জবা বিন্দীর্ণ ক'রে ফুটে উঠুক।

(৫ম শ্লোক)

তুমি কি ভোগের মানিতে জড়িত হয়ে ধূলিতে আসক্ত হয়ে থাকবে? তুমি কি ভোগের আবর্জনার বোঝার মানির ভারে লুপ্তিত হয়ে থাকবে? তোমার যে পবিত্র আলোর উজ্জলতা আছে, মাথার সোনার মুকুট আছে। যে কবি তোমার কবিতা রচনা করে, সে হচ্ছে আমি—তার উদ্ব-শিখা উজ্জলভাবে অলুতে থাকে। আত্মন তোমার কবি, যে তোমার জয়গান করে। স্বর্ষ তোমার মধ্যে আত্মার প্রতিবিম্ব দেখে। তুমি কি আত্মহুখে ভুলে ধূলায় পড়ে থাকবে? স্বর্ষ যে তোমার মাথার উপর উঠবে, তাকে কি সোজা হয়ে কাড়িয়ে অস্তিত্বহীন করবে না?

ঐক্য ও আশাশুভাকাঙ্ক্ষী। নবীন, সুদূর, বলাকা প্রভৃতির কাব্য।

পলাতকা

পলাতকার কতকগুলি কবিতা ১৩২৫ সালের সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে এই বই প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন অসম ছন্দে বলাকার কবিতা রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে অসম ছন্দে পণ্ডে গল্প রচনা করিতেছিলেন এবং ছন্দময় গণ্ডেও গল্প রচনা করিতেছিলেন। পণ্ডে রচিত গল্পসমষ্টি হইল পলাতকা, এবং ছন্দময় গণ্ডে রচিত গল্পসমষ্টি হইল লিপিকা। লিপিকা গণ্ডে রচিত হইলেও তাহা কবিতা শ্রেণীতে গণ্য হইবার যোগ্য, তাহার গল্পগুলির মধ্যে আখ্যায়িকা অপেক্ষা হৃদয় ভাব ও রসের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। এই দুই পুস্তকের মধ্যে কবি কত গভীর কথা কত সহজভাবে বলিয়াছেন, তাহা বই দুখানি পাঠ করিলে সহজেই অনুভব করা যায়। পলাতকার প্রত্যেক গাথার মধ্যে কবির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, হৃদয় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, সমবেদনা, সামান্তের মধ্যেও অসামান্ততার আবিষ্কার, অত্যাচ্ছ কবিত্বের সহিত গ্রথিত হইয়া আশ্চর্য রকমের সহজ ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ি ও কোমল হইতে ছোট কবিতার ছোটগল্প বলিবার যে শক্তি কবি দেখাইয়াছিলেন, এবং যাহা কথা ও কাহিনীর মধ্যে পরিণতি লাভ করে—তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে এই গল্পগুলিতে। কবিতা ও কাহিনী যে একসঙ্গে গাথা যাইতে পারে, তাহার পরিচয় দিলেন কবি এই পুস্তকে।

কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবী এই সময়ে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু অবধারিত। সেই বিনামায়ামুখী কন্যার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবির মনে হইয়াছিল যে, জগতের সব কিছুই পলাতকা। কাহাকেও এখানে ধরিয়৷ রাখা যায় না। সেই ভাব মনে লইয়া কবি যতগুলি গল্প লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশের নারিকাই হইতেছে জীলোক। প্রায় সব গল্পগুলির প্রতিপাত হইয়াছে বিচ্ছেদ ও বিদায়, এবং মৃত্যু।

এই কাহিনীগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ যোগ কবি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, এবং বৈষয়িক জগতের অন্তরালে যে এক

অনির্বচনীয় ভাব-জগৎ আছে তাহার যবনিকা উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক কাহিনীর উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা ও আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া কবি এক একটি মারাত্মক রচনা করিয়াছেন, যাহাতে সমস্ত কাহিনীটি সত্য হইয়া দরদে ব্যথায় মমতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের বরে অভিজাতবংশীয় কবিকে কখনো অভাবে দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতে হয় নাই, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হাশ্বেই চিরকাল তাকাইয়া আসিয়াছেন। তথাপি কবি তাঁহার অসাধাবণ সহমর্মিতার বশে হতভাগাদের প্রতি অম্লকম্পা অম্লভব করিয়াছেন।

কিন্তু কবি তো জানেন যে ‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?’ এবং ‘শেষের মধ্যেই অশেষ আছে।’ আমরা যাহাকে শেষ বলি, যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা তো অসমাপ্ত অবস্থানের একদেশের অসম্যক মর্শন। তাই তিনি শেষ কবিতায় সমস্ত কিছুকে ‘শেষ প্রতিষ্ঠা’ দিয়াছেন—মানুষের কাছে যাগ আসা-যাওয়া তাহা আধখানা অবস্থা প্রকাশ করে। সম্পূর্ণতার মধ্যে তো কেহ আসেও না, যারও না। সব-কিছুই সেখানে ‘আছে’ হইয়া আছে। তাঁহা কবি বলিয়াছেন—

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ

যে সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হ’য়ে রয়েছে সমান।

প্রথম কবিতাটির নাম পলাতকা। প্রকৃতির ডাকে পোষা হরিণ নিশ্চিৎ আশ্রয় ও অবতরণস্থল খাণ্ড-পানীয় ছাড়িয়া অনিশ্চিতের ও নিকৃদ্দেশের সন্ধানে প্রতিপালকের বাড়ী ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। এই কাহিনীটির মধ্যে সমস্ত বইটির তত্ত্ব নিহিত আছে—হরিণ যেন বলিয়া গেল—

বিষজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আশ্রয়পর।

মুক্তি

এই গল্প-কবিতাটি প্রথমে ১৩২৫ সালের সবুজ পত্রের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রকে সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে হইতে দূরে সরাইয়া কেবলমাত্র গৃহ-কর্মের ক্ষেত্রে আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রতি নির্ভর ব্যবহার করার অভিপ্রায় এই কবিতাটি।

অন্তঃপুরিকা মরণান্তক রোগে আক্রান্ত হইয়া বলিতেছে—এই বিশ্বজগৎ তাহার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করিয়া বাইশ বছর ধরিয়া এই নিরানন্দ গৃহকোণের নাগপাশ ছেদন করিতে বারংবার ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু অন্তঃপুরের অন্ধকার কারাগারে ও রান্নাঘরের ধূম্রবর্ণ বন্দীশালায় সেই বাণী পৌঁছিতে পারে নাই। আজ আসন্ন মৃত্যুকে শিয়রে করিয়া জানালার ফাঁকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মুখোমুখী করিয়া বসিয়াছি। তাই আজ তাহার বাণী আমার প্রাণে প্রবেশ করিতে অবকাশ পাইয়াছে, আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আমি সামান্য নই,—আমি নারী, আমি মহীয়সী, আমি ভূমার অংশ এবং অল্পে স্তম্ভ নাই। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যসম্ভার, সে তো আমারই জন্ত এত কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াছে। আমি যদি তাহার দিকে না চাহিতাম, তাহা হইলে সে তো থাকিয়াও নাই, আমার কাছে তো সে নাস্তি হইয়া যাইত।

মরণ আমার অনন্ত সম্ভাবনার ভিখারী—সে আমার সমস্তই গ্রহণ করিবে, আমার সকল সম্ভাবনা তাহার কাছে সমাদৃত হইবে। অবশেষে মরণের মধ্যে আমি যে স্বাধীনতার ও মুক্তির স্বাদ পাইব তাহা তো জীবনে আমি কোনো দিন পাই নাই। মরণ তো কেবল আমার প্রভু নয়, সে আমার স্বামীও ছিল ; সে যে আমার কাছে আমার মধুর্য আমার স্বামীর মতন হুকুম করিয়া আদায় করে না ; সে ভিক্ষা করে, প্রার্থনা করে।

কাঁকি

ঋতুরবাড়ীতে গুরুজনের কাছে লজ্জায় বিহ্বর সঙ্গে তাহার স্বামীর মিলন ছিল বাধাগ্রস্ত, ছাড়াছাড়া। সে যখন রোগে পড়িয়া হাওয়া-বদলের জন্ত প্রথম ঋতুরবাড়ী ছাড়িল, তখন সকল বাধা অপসৃত হওয়াতে তাহাদের মিলন হইল অব্যাহত। সেই আনন্দে তাহার জীবনের প্রতিমূহূর্ত হইয়া উঠিল পরিপূর্ণ—বিহ্বর মনে হইতে লাগিল, তাহাদের বিবাহের পরে এই যেন তাহাদের প্রথম মিলনের আনন্দযাত্রা—হানিমুন। সে মরিবার সময়ে স্বামীকে বলিয়া গেল—

এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি,

শেষ ছুটি মাস অদৃষ্টকাল মাখায় রবে মম

সেইসঙ্গেই নারায়ণীর সিঁধের পরে নিত্য-সিঁধুর সম।

এ দুটি মাস হুমায়ন দিলে শুনে,—

বিদায় নিলেম সেই কথাটি মরণ করে।

কিন্তু বিহুর স্বামী তো বিহুকে এক জারগার ফাঁকি দিরাছিল। বিহু রেলের কুলির বৌ রুক্মিণীকে পঁচিশ টাকা দিতে অহুরোধ করিয়াছিল। সে অহুরোধ তো রক্ষা করা হয় নাই! অথচ বিহু জানিরা গেল যে, তাহার স্বামী তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য কোনো ক্রটি কোথাও রাখে নাই। সেইজন্য বিহুব স্বামীর মনে হইতে লাগিল যে, সে তাহার জীব পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও প্রেমের প্রতিদান সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। এবং সেই রুক্মিণীকে আর কোথাও খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। প্রতিবিধান করিবার সুযোগ চিরতরেই হাবাইয়া গেল। তাই বিহুর স্বামী আক্ষেপ করিয়া বলিল—

রয়ে গেলাম দ্বারী,

মিখা আমার হলে চিরদ্বারী।

নিষ্কৃতি

এই কবিতা-কাহিনীটি ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বাহিব হইয়াছিল। তখন ইহার যে নাম ছিল তাহাতে এই কবিতার ভাবটি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম ছিল—‘যেনাস্তাঃ পিতরো যাতাঃ।’ এই মেরেটির পিতৃপিতামহ যে পথে গিয়াছেন—বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করিতে তাহারা যেমন ষিধা করে নাই—সেও তেমনি তাহার পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল—বিধবা হইয়া বৈধবোর তপস্তায় সেই কেবল গুরু হইয়া সমস্ত প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে, আর পুরুষেরা যথেষ্ট্যাব করিবে, এই বি-সম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, সেও তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুলিন ডাক্তারকে বিবাহ করিয়াছিল। এই কবিতাটির মধ্যে করুণ ও হাস্যরস গলাগলি করিয়া চলিয়াছে বলিয়া এটি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

হারিয়ে যাওয়া

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে লভ্য হইতেছে নিকা পদার্থ। তাহাকে বৈদিক ধর্মেরা বলিয়াছেন ওকার। বিশ্বপ্রকৃতি সেই লভ্যকে আশুলাইয়া চলিয়াছেন, যেন

তাহা কিছুতে আচ্ছন্ন না হয়। সেই সত্য যখন আচ্ছন্ন হয় তখন বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বই লোপ পাইতে বসে। সত্য অব্যাহত না থাকিলে লোকের জীবন-যাত্রা অচল হয়, সমাজ-ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়, সকলের পীড়া উপস্থিত হয়। তাই উপনিষদের ঋষিরা এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

হিরণ্যমৈব পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখং ।

তৎ স্বং পুংস্ অপাবুং সত্যধর্মায় বৃষ্টয়ে ॥ —ঈশোপনিষৎ : ৫

মাহুগুও নিজের খেয়ালটিকে প্রাণীপের মতো জ্বালাইয়া সমস্ত ঝড়-ঝাপটা চইতে বাঁচাইয়া চলিতে চায় :—কিন্তু সেই খেয়াল সম্পন্ন করিতে না পারিলে, সে মনে করে তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি যশোলিপ্সু সে যদি যশের একটু হানি দেখে, তবে সে মনে করে সর্বনাশ। তেমনি ধন-লিপ্সু, রাজ্যলিপ্সু, এমন কি নিজের প্রিয়জনের প্রতি অধিক মমতাসম্পন্ন লোক, নিজের আসক্তির বস্তুর একটু ক্ষতি সহ করিতে পারে না ; মনে করে সে ক্ষতিতে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। সে মনে রাখে না যে তাহার সেই ক্ষতিগ্রস্ত বস্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং আমাদের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা এই—“বামী যেমন দীপ-হাতে একটা অন্ধকার ঘুর্ণীসিঁড়ি বেয়ে চলছে, সমস্ত নক্ষত্রলোককে আমি সেই দীপ-হাতে ছোট মেয়েটির মতোই দেখছি। চলতে চলতে হঠাৎ যদি তার আলো নিবে যায়—তা হ’লে সে আপনাকে আব দেখতে পাবে না—অসীম অন্ধকারের মধ্যে একটা কান্না উঠবে—আমি হারিয়ে গিয়েছি।”

অর্থাৎ কবি বলিতে চাহিতেছেন যে, যে-আলোক বামীর কাছে তাহার পরিবেষ্টন সামগ্রীকে প্রকাশ করিতেছিল, তাহার নির্বাণ হওয়ার্তে সেই-সমস্ত পারিপার্শ্বিক সামগ্রী অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল, এবং যে পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা বামী আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল, সেই পারিপার্শ্বিকতার লোপ হওয়ার্তে বামীর মনে হইল সে নাই। তেমনি বিশ্বপ্রকৃতি মেয়েটিও অন্ধকার রাত্রির নীলাম্বরীর আঁচলের আড়ালে গ্রহনক্ষত্রের দীপশিখাগুলিকে আগ্নেয়াইয়া বাঁচাইয়া চলিতেছে, গ্রহনক্ষত্রগুলিই যেন বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব সুপ্রকাশ করিতেছে, যদি কোনো দিন কোনো ছবিপাকে সেই আলোক নির্বাণ পায়, তবে প্রকৃতিই হারাইয়া যাইবে।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনো বিকোভ, কোনো ছুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তখনই শিশুর সরল সব-ভোগা স্বভাবের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া সাস্থ্য দিতে চাহিয়াছেন—যেনেব সমস্ত গ্লানি ভুলিতে চাহিয়াছেন। শিশু যেমন স্বভাব-নির্মল, তাহার গায়েব ধূলা-বালি যেমন তাহার মনে কোনো মালিঙ্গ সঞ্চার করিতে পারে না, তাহার মনের সকল ক্ষোভ ছুঃখ শিশু যেমন অনায়াসে অতি সত্ত্বর ভুলিয়া স্নহ হইয়া উঠিতে পারে, সে যেন হাঁসের মতন জলে থাকিয়াও গায়ে জলের লেশ লাগিতে দেয় না, কবিও তেমনি সমস্ত বিকোভের ছুঃখের মধ্যে থাকিয়াও তুঃখাতীত ক্ষোভাতীত নিমুক্ত অনাবিল হইয়া বাইতে চাহেন। এইজন্ত কবি আয়ৌবন বাবংবার এই শিশুলীলার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া শিশু হইয়া নির্মল আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। এই ভাব হইতেই কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার মহিলা কাব্যে মাতাকে সোধোন করিয়া পুনরায় শিশু হইবার প্রাণনা জানাইয়াছিলেন—

"তুমি গড়েছিলে বাহা

আর আমি নই তাহা,

তু জননী করে পুন বালক আমার।"

এই শিশু ভোলানাথ বইখানি রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে স্বয়ং কবি বলিয়াছেন—

"আমেরিকার বস্তুজ্ঞাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। প্রবীণের কেক্সার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি... আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্তে বস্তুজ্ঞাস সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সঁতার কাটলুম, মনটাকে প্রিয় কল্পনার জন্তে, নির্মল কল্পনার জন্তে, মুক্ত করবার জন্তে।"—পশ্চিম-বাঙ্গার ডায়ারী।

ভোলানাথ সেই, যে কিছু সঞ্চয় করে না, বাহার কিছুতে মমতা নাই, যে সব-কিছু ধ্বংস করে, যে সব-কিছু ভুলিয়া যায়।

আমাদের দেশে বিখ্যাতকে বলা হইয়াছে—ভোলানাথ, ভোলা মহেশ্বর। শিব ভোলানাথ, তাঁহার খেলনা চক্রে স্বর্ষ জীবন মরণ কাঁটিত। শিশুর খেলনার মতন তাঁহার নিত্য নূতন উদ্ভাবন ও নিত্য নূতন ধারণা।

সৃষ্টি যদি ধরসে হইতে ধরসান্তরে না যায়, তবে তো বস্তুর মুক্তি হয় না, সৃষ্টির গতি থাকে না, নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। নতুন সৃষ্টি না হইলে খেলার ধারা রক্ষা হয় না। খেলনার শৃঙ্খল ভাঙিয়াই ভোলানাথের খেলা চলিয়াছে। বিশ্বের ভোলানাথ, কারণ তিনি কিছুই চিরন্তন করিয়া রাখেন না।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ভাঙিতে ভাঙিতে চলেন নতুন সৃষ্টি করিয়া; তাই তাঁহার সৃষ্টি বন্ধন হয় না। কিন্তু বয়স্ক মানুষ নিজেদের সৃষ্টিকে সক্ষম করে, তাই তাহাদের বন্ধন করিয়া তুলে।

শিশু ভোলানাথ—ভোলানাথ শিবেরই চেলা। সে বাহিরে বিস্তরীণ, কিন্তু অন্তরে সে অমিতবিস্ত; চিত্ত তাহার বিস্তরীণ, অন্তরে তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য। তাই সে এক খেলার অভাব নতুন খেলা দিয়া পূরণ করিয়া লইতে পারে। শিশুর কোনো লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই বলিয়া সে পথেই আনন্দ পায়; সে বলিতে পারে 'আমার পথ চলাতেই আনন্দ।' শিশু বর্তমানে আবদ্ধ; তাহার অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই। শিশুর নতুন সৃষ্টিতে আনন্দ; কারণ তাহার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিছাড়া উদ্দেশ্য নাই। অত্ৰ লোকে পথকে লক্ষ্যের উপলক্ষ্য মনে করিয়া দ্রুত পায়। পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির লীলার শূন্য আকাশকে পূর্ণ করেন, শিশুও তেমনি পথকে মূক্তির আনন্দে পূর্ণ করে। অহেতুক লীলার শিশু ভোলানাথের সঙ্গে ভোলা মহেশ্বরের যোগ আছে।

"সৃষ্টির মূলে এই লীলা—নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি, তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে পৌছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতে আপনি পূর্ণাপ্ত, কারো কাছে তার জবাবদিহি নেই।"

"ছোট ছেলে ধুলোমাটি কাঠিকুটো নিয়ে সারাবেলা ব'সে ব'সে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈলিও হচ্ছে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবন-যাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈলিও স্বীকার ক'রে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াবার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে 'হোক'। সেই বাগীকে বহন ক'রে ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই ব'লে শুটে—'এই দেখ হায়েছে'। এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কর্তব্য। সামনে যখন তার একটা চিবি, তখন কর্তব্য চলছে—এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেজা!" তার ঐ ধূলায় জুপের ইসারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কোমল সত্য মনে স্পষ্ট অনুভব করছে। এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আশঙ্কা নয়, কেননা সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না; একটি রূপ-বিশেষকে ছিন্ন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য ক'রে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা, তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।"—পশ্চিমবঙ্গের ভারতী।

আমাদের শাশ্ত্রেও বিবেচকের সৃষ্টিকে শিশুর খেলার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

“বালকে যেমন খেলার ছলে ভাঙে-গড়ে, কোনো উদ্দেশ্য তাহার খেলার পিছনে থাকে না, সেইরূপ সেই বিবেচকরাও এই বিষটাকে লইয়া ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, নিজের কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য লইয়া কিছু করিতেছেন না। কারণ, তিনি তো নিতাপূর্ণ আশুকাষ।”—
বিকুপুৰাণ ১২।১৮।

ক্রীড়তো বালকস্তৈব চেষ্টাস্ তস্ত নিশাময়—গরুড়পুৰাণ ১।৪।৫।

কবি তাঁহার পূর্ববী কাব্যেও বিখনাথকে শিশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন—

এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,—

নিজের খেলনা-চুণ

ভাসাইছে অসম্পূর্ণ

খেলার প্রবাহে

—পূর্ববী, পঞ্চদশনি।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে যে জানে ছুটি ব'লে,

ঘর ছেড়ে আসি তাই চ'লে।

নিবেশ বা অনুরতি মোর মাঝে না ঘের পাহারা,

আবৃত্তকে নাহি রচে বিবিধের বস্ত্রময় কারা,

বিখ্যাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে নৃত্য ঘেঘ ভ'রে,

শিশু বোঝে মোরে।

—পূর্ববী, পঞ্চ।

রবীন্দ্রনাথ শিশুকে ভালোবাসিয়াছেন। সেই ভালোবাসার ফল হইতেছে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সঙ্গে খেলা করিবার অন্ত নানা নাটক গান প্রভৃতি রচনা। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে তাঁহার অতি নিকট প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—যেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন ভিক্টর হাগো। কবি শিশুকে শিশুর নিজের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কবি যেন বয়ঃ শিশু হইয়া গিয়াছেন; আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসনের স্তায় দার্শনিক-কবির দৃষ্টিতেও দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুর ও শৈশবের অজুহাদী কবি।

শিশু, জ্ঞেয়ানাত্মক বই শিশু বইখানিরই জের বা তাহার পরিপূরক। শিশুর মন বৃদ্ধিতে, হইলে ও তাহার মন পাইতে হইলে, শিশু না হইলে চলে না। কবির অন্তরে যে চির-শিশু রহিয়াছে তাহারই প্রাণের কথা কৌতুকে রসে রসে মাধুর্যে অপূর্ণ অক্ষর ভানে। হুইটম্যান উল্লেখ্য এই বইখানি পুস্তকের বাণিতে।

যে বিচিত্র জগৎশক্তি শিশুর মধ্যে আছে অস্ফুট ভাবে, তাহাকেই কবি বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই হুই বইয়ের ভিতরে। শিশুর মনস্তত্ত্ব সুখ দুঃখ এমন প্রাণ দিয়া অহুভব ও প্রকাশ করিতে পৃথিবীর আর কোনো কবি পারেন নাই।

মুক্তধারা

এই নাটকখানি ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।
এক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয় ঐ মাসেই। বইখানি লেখার তারিখ
হইতেছে ১৩২৮ সালের পৌষ-সংক্রান্তি। লেখা হইয়াছিল শান্তিনিকেতনে।

এই বইখানির বিস্তৃত সমালোচনা বাস্তব হইয়াছিল ১৩২৯ সালের
আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে, সমালোচনা লিখিয়াছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

উত্তরকূটের মহারাজা যদুরাজ-বিভূতিকে দিয়া শিবতরাই বাজার মুক্তধারা
যন্ত্র ধারা রুদ্ধ করিয়াছেন। শিবতরাইয়ের প্রজাদের অন্নচলাচলেব পথ বন্ধ
করিয়া তাহাদিগকে বশ মানাইবার এত কৌশল। যুবরাজ অভিজিৎ ঠিক
রাজার পুত্র নন। রাজা মুক্তধারাব খবগাতলায় তাঁহাকে কুড়াইয়া পুত্রবৎ
পালন করিয়াছেন। তাঁহার শরীরে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে জ্যোতিষীবা
বলিয়াছে। যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা শিবতরাই শাসন করিবার ভার দিয়া
পাঠাইলেন। অভিজিৎ সেখানে গিয়াই প্রজাদের সমস্ত অস্ত্রবিধা মোচন
করিবার প্রযত্নে নিজেই নিযুক্ত করিলেন। তিনি নন্দীসঙ্গের গড় ভাঙিয়া
দিলেন। উত্তরকূটের স্বার্থে আঘাত লাগিল, উত্তরকূটের অধিবাসীবা বিবুদ্ধ
হইয়া উঠিল। কাজেই অভিজিৎকে শিবতরাই ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে
হইল। কিন্তু যুবরাজ অভিজিৎ গৌরীশিখরেব দিকে চাভিয়া পায়ই
ভাবিতেন—‘যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি, ঐ দূরগম পাহাড়ের উপর দিবে
সেই ভারী কালের পথ দেখিতে পাচ্ছি—দরকে নিকট করবার পথ।’ তিনি
প্রায়ই বলেন—‘আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্তে, এই খবর আমি
কাছে এসে পৌঁছেছে।’ কারণ, তিনি জানিয়াছিলেন যে কোন ঘরছাড়া মা
তাঁহাকে পথের ধারে মুক্তধারার পাশে জন্ম দিয়া তাঁহাকে নিখবাসী করিবা
দিয়াছেন, তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ জাতির লোক নহেন।

অভিজিৎ দেখিলেন যে যদুরাজ-বিভূতি ষাঁধ ষাঁধিয়া মুক্তধারা বন্ধ
করিয়াছেন, শিবতরাইয়ে হুজিৎ দেখা দিয়াছে। ইহাতে উত্তরকূটে
অধিবাসীদের আনন্দের উৎসব হইতেছে। কিন্তু এই ষাঁধ ষাঁধিবার জন্ত কত
মজুরকে জোর করিয়া ধরিয়া কাজে লাগানো হইয়াছিল। তাহাদের অনেকে

ফিরে নাই। এই উৎসবের মধ্যে সেই-সব সম্ভানহারা যারের কান্না শোনা যাইতেছে। অথবা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—সুমন, আমার সুমন...। পাগল্য বটুক সকলকে সাবধান করিয়া হাঁকিতেছে—সাবধান বাবা, সাবধান, যেও না ও পথে... বলি দেবে, নববলি...।

অভিজিৎ মনে কবিত্তে লাগিলেন—রাজ্যলোভে স্বার্থলোলুপতার মানুষ মানুষকে দলন করিয়া দানব হইয়া উঠে, 'হঠাৎ যেন চমক ভেঙ্গে বৃষ্টিতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমাব জীবনশ্রোতেব বাঁধ।' তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন সেট-সব বাধা দূর করিয়া দিবার জন্ত।

যুবরাজ রাজ্যজ্ঞার বন্দী হইলেন। বন্দীশালায় আগুন লাগিল। খুড়া-মহারাজ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া নিজেব রাজ্যে মোহনগড়ে লইয় যাইতে চাহিলেন। কিন্তু যুবরাজ সেই স্নেহের বন্ধনও অস্বীকার করিলেন।

যুবরাজ কারাগারে নাই শুনিয়া উত্তরকূটবাসীরা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। হঠাৎ অমাবস্তা বাগ্নির অন্ধকারে তাহাবা শুনিলা বেবে মুক্তধারাব বাঁধ ভাঙাব শব্দ। রুদ্ধ জ্বালাচ্ছাস গর্জন কবিয়া ছুটিয়াছে।

কুমার সঞ্জয় আঁসিয়া সংবাদ দিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধাবাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যম্বাজ্ঞ-বিভূতির যন্ত্রকে তিনি আঘাত কবিয়া ভয় করিয়াছেন বলিয়া যন্ত্রও তাঁহাকে প্রত্যাঘাত করিয়াছে। যুবরাজ শ্রোতে পড়িয়া গিয়াছেন এবং মুক্তধারা যুবরাজের আতত দেহকে কোলে তুলিয়া নদে দূরান্তরে কোথায় লইয়া গিয়াছে।

এই অভিজিৎ হইতেছেন সকল স্বাৰ্গমুক্ত স্বর্গোৰ্ণতামুক্ত মানবাত্মার প্রতিনিধি—যে মানবাত্মা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দরের আশ্রানে চলিতে চায়। দেখানে স্বকৃত বা পরকৃত বন্ধন, তাহাকে আঘাত করিয়া মুক্ত করাই হইতেছে তাহার জীবনের সাধনা ও সার্থকতা। লোভেব দ্বারা কল্যাণ এখন বন্ধন লাভ করে, তখনই পাপ প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই পাপক্ষালন কবিত্তে মহাপাণকে বলি দিতে হয়। দেখানে পাপ সেখানে অশান্তি, সেখানে অবিশ্বাস, সেখানে উৎপীড়ন। একের পাপে অপার পিড়া ভোগ করে, বাজাব স্বার্থের জন্ত অস্বাব ছেলে স্তম্ভন হবে, বটুক হুটি নাতি ছাবাইয়া পাগল হইয়া পথে পথে রুদ্ধকে জাগাইয়া দিবে এবং পিতাব লোভের শাস্তি ওহণ কবেন পুত্র অভিজিৎ। যিনি সকল-কিছুকে ভয় করিয়া মুক্ত তিনিই অভিজিৎ। জগতে তো এইরূপই যুগে যুগে হইয়াছে—ভগতের হুণ্ড পাপ একজন মহাপ্রাণকে

ব্যাকুল করিয়া তোলে—ইহারই জন্ত বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসী, বীণথুঠ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন, মহম্মদ মরুভূমিতে পলাতক হইলেন। যে ক্রমের আত্মান শুনিয়াছে, সে হইয়াছে অভি—ভৈরব তাহাকে পথ দেখাইয়া আত্মদানের দিকে লইয়া চলেন।

মুক্তধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবালোর বাণী নিহিত আছে—সকল বাধা ও গণ্ডী ভাঙিয়া মুক্তধারায় নিজেকে ভালাইয়া দিতে হইবে, তবেই মহুগ্যত্বের সম্মান সংরক্ষিত হইবে।

এই নাটকের খুড়ামহারাজের মধ্যে বৌঠাকুরাণীর হাট উপস্থাসের অথবা ‘প্রায়শ্চিত্ত’ বা ‘পরিত্রাণ’ নাটকের রাজা বসন্ত রায়ের একটু আদল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও মধ্যে সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছেন—বিনি সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে রাজাকেও ভয় করেন না, এবং অন্নান বদনে সমস্ত শাস্তি অস্ত্রার হইলেও অপ্রতিবাদে বহন করেন। ইনি ভায় ও সত্যের এবং সহ ও ক্ষমার আধার।

এই নাটকে এই রকম মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ছাড়া কবিত্ব আছে প্রচুর—অভিজিতির কথায়, ধনঞ্জয়ের গানে, ভৈরবগঙ্গীদের গানে। এই নাটকে পরাধীন জাতির উপর বিজেতাদের যে নির্দয় ব্যবহারের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা সবেও বধন ফুলের গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদের বিজেতার জয়গান মুখস্থ করাইতেছে দেখি, তখন সমস্ত বিজিত জাতির দুর্গতির লজ্জা ও মনস্তাপ যেন তাহা পাইয়াছে মনে হয়। এবং এই-সমস্তের প্রতিবাদ হইতেছেন সুবরাজ অভিজিৎ। অভিজিৎ যেন একটি মানুষ নহেন, তিনি যেন মূর্তিমান মহামনের মনস্তত্ত্ব।

চিহ্ন—মুক্তধারা—অবনীনাথ রায়, বিচিত্রা ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ।

প্রবাহিনী

প্রবাহিনী পুস্তকে প্রায় সমস্তই গান। নানা সময়ের খণ্ড রচনা একত্র করিয়া বই প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালে। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, এ পর্যন্ত বোধ হয় তিনি আড়াই হাজার গান রচনা করিয়াছেন। সেই-সমস্ত গানের পরিচয় দেওয়া দুঃস্ব কৰ্ম। অতএব এই বইয়ের মাধ্যমের সন্ধানের ভার পাঠকদের উপর দিয়াই আমি নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলাম। প্রবাহিনী বিচিত্র রসের ও ভাবের লিরিক ও গানের প্রবাহিনী।

চিরস্তন

এই গানটি “চির-আমি” শিরোনামে ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অমর কবি বলিতেছেন যে যখন তিনি এই রবীন্দ্রনাথ নামক বিশেষ ব্যক্তি-রূপে এই জগতে বিদ্যমান থাকিবেন না, তখনও তিনি এখানে সকল শোভা মাধুর্য প্রেম ও লীলার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন ভাব-রূপে। যখন বিশ্ববাসী তাঁহার নামও ভুলিয়া যাইবে, যখন তাঁহার তানপুরার উপর অবহেলার ও বিস্মৃতির ধূলা জমিবে, কেহ আর তাঁহার কাব্য আলোচনা করিবে না, ফুলের বাগান কাঁটার ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, তখনও তিনি যাহা আজ দিয়া গেলেন তাহারই প্রভাব সকলের অজ্ঞাতসারে কাজ করিতে থাকিবে। তিনি বিশ্ববাসীকে যে ভাব-সম্পদ দিয়া যাইতেছেন, যে ভাষা ও ছন্দ দিতেছেন, যে প্রকাশ-ভঙ্গিমা শিখাইয়া যাইতেছেন, তাহা তো তাহাদের কাছে থাকিয়াই গেল। যদিও বা তাহার অমর কবিকে ভুলে তথাপি তাঁহার দানের ফল তো তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিজেদের অজ্ঞাতসারেও ভোগ করিতে থাকিবে। অতএব কবি চিরকাল থাকিবেন, তিনি চিরস্তন, তিনি অমর।

পূর্ববর্তী

১৯২২ বা ১৯২৮ সালে শিশু ভোলানাথ প্রকাশ করার পরে কবি ১৩৩০ সাল পর্যন্ত অনেক দিন কোনো কবিতা লিখেন নাই; কেবল গান বা নাটক লিখিতেছিলেন। আমরা মনে করিতেছিলাম কবির কবিত্বের উৎস বৃষ্টি শুক হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে রসের অলকনন্দা-ধারা বৃষ্টি আর বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিতে প্রবাহিত হইবে না।

১৩৩০ সালের মাঘ মাসের শেষের দিকে এক দিন কবির এক চিঠি পাইলাম—“চারু, খাতায় কতকগুলো কবিতা জমেছে। লুঠেরারা নজর দিতে আরম্ভ করেছে। লুঠ হ'য়ে যাবার আগে তুমি যদি একদিন আস তা হ'লে তোমাকে শোনাতে পারি।”

আমি উৎফুল্ল হইয়া কবি-সম্মুখনে যাত্রা করিলাম। প্রাতঃকালঃ কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তিন-তলায় কবি ছিলেন। আমার সেখানেই ডাক পড়িল। কবি একখানি খাতা হইতে কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—
যখন শুনিলাম—

‘যৌবন-বেদনা-রসে উজ্জল আমার দিনগুলি।’

‘মাঘের বুকে সকোতুকে কে আজি এলো তাহা।’

বৃষ্টিতে পারো তুমি ?’

‘ছুরার-নাহিরে যেমন চাহি রে

মনে হলো যেন চিনি,—

কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা।

ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।’

তখন আমার আনন্দ ও বিশ্বস্তের অবধি রহিল না। আমি কবিকে বলিলাম—
এই-সব কবিতা যেন আপনার যৌবনের কবিতার মতন হয়েছে। সেট
সোনার তরী, চিত্রার ঘুগের কবিতার কথা মনে পড়ছে।

ইহাতে কবি সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া রক্তরা স্বরে বলিলেন—তবে যে বড়
তোমরা বলো যে আমি আর কবিতা লিখিতে পারিনে।

ইহার পরে কবি আমাকে বলিলেন—নাও, বেছে নাও, এর মধ্যে তুমি
কোনটা বেবে? বেশি শোভ করুলে চলবে না, অনেক দাবী যেটাতে হবে
আমাকে। তুমি একটা বেছে নাও—একটা।

আমি উপরের তিনটি কবিতাই পছন্দ করিলাম সব চেয়ে। তখন কবি আবার হাসিয়া বলিলেন—এহ বাহু, আগে कह আর।

আমি তখন বলিলাম—ইহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া লওয়া কঠিন। তবে প্রথম দুটির মধ্যে যেটি হয় আপনি দিন—ওদেব মধ্যে তারতম্য করা আমার পক্ষে কঠিন।

তখন কবি বলিলেন—তুমি অত্যন্ত চালাক। তবে তুমি ছটোই নাও। অন্তের ভাগে না হয় কিছু কম পড়বে।

আমি সেই কবিতা দুটি লইয়া আসিলাম। তখন প্রবাসীর ফাস্তুন মাসের সংখ্যা ছাপা হইয়া গিয়াছে, কাগজ বাতির হইবে। আমি ১৩১০ সালের ফাস্তুন মাসে প্রবাসীর ক্রোড়পত্র করিয়া আলাদা ছাপিয়া প্রথম উল্লিখিত কবিতাটি প্রকাশ করিলাম। পরের মাসে চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে ‘মাঘের বুকে সকোতুকে’ কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ইহার পরে কবি চীন জাপান দক্ষিণ-আমেবিকা ইউরোপ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। কবিতাগুলি কোনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহাদের টানে অনেক অল্প কবিতাও লেখা হইতে লাগিল। পরিশেষে দেশে ফিরিয়া ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে পুস্তক প্রকাশ করিলেন।

ঐ কবি মনে করিয়াছিলেন বঙ্গভাবতীকে এই তাঁহার শেষ অর্ঘ্য নিবেদন—তাঁহার জীবনের বিদায়ের পূর্বক্ষেপে পূর্ববীর তান। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কবিতাতে এই বিলাস-রাগিনী বাজিয়াছে—পূর্ববী, যাত্রা, পদধ্বনি, শেষ, অবসান, যত্নের আচ্ছাদন, সমাপন, শেষ বসন্ত, বৈতরণী, কঙ্কাল, ইত্যাদি। এই বইয়ের একটি বিভাগের নাম পূর্ববী, অল্প একটির নাম পথিক।

(কিন্তু কবি জীবনসন্ধ্যায় সাবা জীবনের লাভ-লোকসান স্মরণ করিয়া দেখিয়াছেন। সেই স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছে কবির কৈশোর এবং যৌবন।) পটিশে বৈশাখ, তপোভঙ্গ, আগমনী, লীলাসজ্জিনী, কৃতজ্ঞ, ভাবী কাল, কিশোর প্রেম, প্রভাতী, তৃতীয়া, বিরহিনী, বদল প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের আনন্দ ফুটিয়াছে।

(কবি রবীন্দ্রনাথ চিরযুবা। তিনি পূর্ববীর করুণ সুর ধরিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, তাঁর মন তো আনন্দ-নিকেতন—সেই পূর্ববীর সুরের সঙ্গে বিভাসের মিশ্রণ ঘটিয়া গিয়াছে।) কবি ফাস্তুন নাটকে বলিয়াছিলেন—

“মোদের পাকবে না চুল গো!” তাহার আগে কনিকাতে যদিও তিনি বলিয়াছিলেন—

পাড়ার বত ছেলে এবং বুড়ো

নবাব আমি একতরফী যে।—

তথাপি তাঁহার মনের বরসটা একটু বেশি যৌবন-বেঁধা। তাই যৌবনের বিজয়-ঘোষণা কবির বুদ্ধবরসের রচনাতেও আমরা দেখিতে পাই—বলাকা কাব্যে তিনি যৌবন ও নবীনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু এই পূর্ববর্তে কবি যেন যৌবনের সীমা পার হইয়া আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া গত যৌবনের স্ততিবাদ করিতেছেন। তাই ইহার কবিতায় যৌবনোন্মাদার মধ্যে একটু করুণ স্রব মিশিয়া রহিয়াছে। কবি জীবন-সারাকে পূর্ববীর স্রব ধরিয়া বধন বলিলেন—

বালে পূর্ববীর হ্রস্বে রবির

শেষ রাসিনীর বীণ।—নীলা-সন্নিধী।

এবং তিনি ক্রমে বৈতরণী-তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন সেই বৈতরণী-নদীর তরঙ্গ-ভঙ্কের চাক্ষুষ নিজের চিত্তে অল্পভব করিয়া কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমগ্ন,

ভুলো খেলার সাধী ?

হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্ত এ প্রাঙ্গণ

রক্তন শিখার বাতি ? —খেলা।

কবি তখন মনে প্রাণে অল্পভব করিতে লাগিলেন—

যৌবন-বেষণা-রসে উজ্জ্বল আমার বিনতলি।

—তপোভদ্র—

কবি চিরকালই অনাসক্ত অনন্তগথযাত্রী পথিক। তিনি আঁকশোর বে-সব রচনা করিয়াছেন তাহাতে কেবল এই কথাই বলিয়াছেন যে নীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। এই জীবন-সারাকে বধন কবি জীবন-সীমার একেবারে প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন মনে করিতেছে, তখন তাঁহার মনে সবত ছাড়িয়া অনন্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার প্রতীক এই বল হইয়া উঠিয়াছে,—তখন কবি অল্পভব করিতেছেন—

পায়ের খাড়া পাঠ্যলো ভরী হাজার পাল তুলে

আজি আমার প্রাণের উপকূলে। —অকরাদ।

তাহার সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে—

ভাকিছেন সর্বহারা নিগনের প্রলয়-তিমিরে। —সৃষ্টিকর্তা।

সর্বহারার উপকূলে আসিয়া কবির মন বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের কবি তো আগেই জোর করিয়া বলিয়া আসিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। —মুক্তি।

কবি এক দিকে অনাসক্ত সন্ন্যাসী, আবার অল্প দিকে সর্বাভূতির আনন্দ-পিন্নাসী—তাই তিনি তাহার জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন যে—

মুক্ত করো তে সগার সঙ্গে, মুক্ত করো তে বন্ধ।

একদিকে তিনি সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন; আবার অল্পদিকে জীবনের সকল অমৃতভবের আনন্দ সম্ভোগ করিতেও তাঁহার কম আগ্রহ নহে—রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জীবনের বিচিত্র রস ও আনন্দের আবাদনে সর্বদাই উন্মূখ। কবির কাছে এই জীবনও মিথ্যা নহে, আবার এই জীবনই সর্বস্ব নহে। তিনি মানুষের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রেম সম্ভোগ করিতে চাহেন; বিশ্বপ্রকৃতির শোভার মধ্যে ডুবিয়া তাহার সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে চাহেন। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। তাই কবি জীবনের প্রান্তে উপনীত হইয়া আবার নিজের জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। স্থান ও কালের বাধা অতিক্রম করিয়া, কবিচিত্ত নিজের কৈশোর-স্মৃতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতীতের সৌন্দর্যে ও রসে ভরা দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা যখনই মনের মধ্যে জাগিয়াছে, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের সম্ভাবনাও কবিকে উদ্ভাবনা করিয়াছে। সেইজন্য পূরবীর কবিতা-গুলির মধ্যে শরতের মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মতন হাসি ও অশ্রু একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

তাই কবি বলিয়াছেন—

এই ভালো আঁখ এ সঙ্গমে কায়া-হাসির গলা ঘনুবার
ডেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, খট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়!

—পূরবী।

অঙ্গ-হাসির বৃগল ধারা

ছুটে আমার ডাইনে বামে ।

অচল গানের সাগর-মাঝে

চলল দানের দাড়া ধামে ।

—পূরবী প্রবাহিণী ।)

যে জীবনদেবতা কবির আশৈশবের দোসর চইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কবিকে এই বৃদ্ধ বয়সে আনিয়া উপনীত করিয়াছেন, তিনি কবিকে তাঁহার শৈশবের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে ডাক দিলেন—

‘দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে

কোন শিশুকাল হতে আমার গেলে ডেকে ।’ দোসর ।

কবির সেট “লীলাসঙ্গিনী” আজ তাঁহার দ্বারে “শেষ পূজারিণী”-রূপে আবির্ভূত। হইয়া কবির মনোহরণ করিতেছেন—কাবিকে আবার যৌবনে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন । “মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল” —কবি বলিয়া উঠিলেন ।

কবির এই দ্বিতীয় যৌবন প্রথম যৌবন অপেক্ষা মহত্তর ও মহিমময়, তাঁহার এই দ্বিজ্ঞত শরতের পরিণতি এবং বসন্তের প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দ্বারা মণ্ডিত ।’ গোটে যেমন শকুন্তলা নাটককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

“কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাকা পাইবে ।”

তেমনি আমরাও কবির এই পূরবী কাব্যে বসন্ত-মুকুল, গ্রীষ্মের ফল, ও মানস-রসায়ন সৌন্দর্যসম্ভার একত্র দেখিতে পাই । পূরবীর মধ্যে চিরন্তন চিন্তের তাকুণ্য ও রসাহুভূতি এবং ভাবুক বৃদ্ধ দার্শনিকের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাসম্ভূত প্রজ্ঞা একত্র সম্মিলিত চইয়াছে ; এই-সব কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞা ভাব-চাঞ্চল্যকে নিয়মিত করিয়াছে । অহুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে যে-সব কবিতার জন্ম হয়, সেই-সব কবিতাই কালের ভাঙারে স্থায়ী হয় । কবি বান্‌স্‌ কহঁক লিখিত Auld Lang Syne, Highland Mary প্রভৃতি কবিতাগুলি অহুভূতির দিক্ হইতে স্ফুস্কর হইলেও, শেলী বা ব্রাউনিং প্রভৃতির কবিতার দ্বারা গভীর চিন্তাধন নয় বলিয়া অকল্প নয় । অহুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে যে-সব কবিতার জন্ম হয়, সেগুলিকে বুঝিতে হইলে অহুভূতি ও প্রজ্ঞা দিরাই বুঝিতে হয় । এই সম্পদ খুব বেশী লোকের থাকে না ।

কাজেই এইরকম কবিতার বই দুই-দশ-জন রসিক ভাবুক প্রাক্ত ছাড়া সাধারণের শ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে না—সাধারণের কাছে এই রকম কবিতা কঠিন ওর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় ; তাহাতে রসের অল্পতা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে। গভীর বিষয় বৃত্তিতে হইলে সময় ও সাধনার আবশ্যক করে।

কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বকে অজিতকুমার চক্রবর্তী এক কথায় বলিয়াছেন—‘সবায়ুভূতি’। কাজী আব্দুল ওহুদ বলিয়াছেন দুই কথায়—‘অতি-তীক্ষ্ণ অল্পভূতি আর সন্ধানপরতা। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—তঁাহার গানের মাত্র একটি পালা, সেটি হইতেছে—সৌম্যর মধ্যে অসৌম্যের, অংশের মধ্যে সম্পূর্ণের অনুসন্ধান ও অনুভব। ইহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আর একটি বিশেষত্ব আমি নির্দেশ করিতে চাই, তাহা তঁাহার মনের এক ছনিবার গতিবেগ—‘হেথা নয়, হেথা নয়, অত্ৰ কোনো খানে!’ এই চলার বেগে কবি যেন মহোদগের ত্যায় জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে খোলস বদল করিয়া চলিয়াছেন ; বিচিত্র ধরণের বা স্টাইলের কবিতা তিনি পরে পবে লিখিয়া আসিয়াছেন। একখানি বইয়ের বন্ধনে কতকগুলি কবিতা আবদ্ধ হইলেই, কবিব নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা সেই গভী উত্তীর্ণ হইয়া, সেই মাড়ানো পথ ছাড়িয়া আবার নূতন পথে নূতন রূপেব সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবন বিশ্বমানবেব কাছে সংস্কার-মুক্তির এক অমূল্য উপহার। এইজন্য তিনি নৈবেদ্য হইতে প্রবাহিনী পর্য্যন্ত প্রবাহিত অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যেও গভীবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সেই একের আরাধনার একতারা বাজাইতে বাজাইতে কবিচিত্র থাকিয়া থাকিয়া বিচিত্রতার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে ; সে একতারা ফেলিয়া নানান-তারা বীণাধর তুলিয়া লইয়াছে। কারণ, কবি অনুভব করিয়াছেন—যিনি এক, তিনিই আবার রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব—অরূপ, তিনিই বহুরূপ ও অপরূপ।)

কবির এই যে চলা তাহা সব কিছুকে ডিঙাইয়া উড়িয়া চলা নহে,—ইহা পা দিয়া পঞ্চ মাড়াইয়া মাড়াইয়া মাটিকে স্পর্শ করিয়া অনুভব করিয়া চলা—কিন্তু ছুটিয়া চলা। ‘যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা’, তেমন কবি তঁাহার জীবনপথের প্রত্যেক বন্ধকে একবার অবলম্বন করিয়া পরকণ্ঠেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। কবির এ চলা যেন রস-সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া সাঁতার কাটিয়া চলা। ঘাহার কিছু নাই সে ত্যাগ করিবে কি ?—‘শূন্য বড়া উপুড় করাকে তো ত্যাগ বলে না। স্বর্ণগার স্বর্ণপটাই

হচ্ছে নিরন্তর ভাগ, সেটা সম্ভব হয়েছে নিরন্তর গ্রহণে।” তাই কবি বলিয়াছেন—

আমি যে সব নিতে চাই রে,
আপনাকে তাই মেলবে যে বাইরে।

এই পুস্তকের কবিতাগুলি যেমন পূরবী ও বিভাস রাগিনীর মিশ্রণে এবং গভীর ভাব ও লীলার মিশ্রণে অপূর্ব সুন্দর হইয়াছে, তেমনি ইহার কবিতার ভাবানুযায়ী নব নব ছন্দ এবং কুশলী কবির শব্দযোজনায় নিপুণতায় ইহা অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে।

স্রষ্টব্য—পূরবী সমালোচনা—নীহাররঞ্জন রায়, প্রবাসী, ১৩৩২ চৈত্র, ৭২৭ পৃষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নূতন সাড়া—ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য, ভারতী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫ পৃষ্ঠা। পূরবীর দুইটি কবিতা—অমৃতলাল গুপ্ত, দীপিকা, ১৩৩১ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ৩ পৃষ্ঠা। রবীন্দ্র-প্রতিভার উৎস—নীহাররঞ্জন রায়, ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ কার্তিক।

তপোভঙ্গ

এই কবিতাটি চিরযুবা কবির সদানন্দ প্রাণশক্তির উচ্ছল প্রকাশ। মহাকাব্য সন্ন্যাসী, সর্বরিক্ত ভোলানাথ। কিন্তু সেই কালের অধীশ্বর তে সকল কালের সংবাদ জানেন, তিনি কি কবির যৌবন-কালের খবরটি ভুলিয়া বসিয়া আছেন? বসন্তের অবসানে কিংগুক-মঞ্জরী করিয়া গিয়াছে, তাহারই সঙ্গে ‘শূন্তের অকূলে তা’রা অঘরে গেল কি সব ভাসি?’ হাওয়ার খেলার মেঘের মতন সেই যৌবন-স্মৃতি কি—‘গেল বিস্মৃতির ঘাটে?’ কিন্তু ভোলানাথ কি ভুলিয়াছেন যে একদিন কবির সেই যৌবন-দিনগুলি তাঁহার রক্ত-রূপকে কী শোভায় সৌন্দর্যে সাজাইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভরিয়া দিয়াছিল? সেদিন তো সন্ন্যাসীর সব তপস্বী ভুলাইয়া দিয়া কবি তাঁহাকে আনন্দময় করিয়া ভুলিয়াছিলেন; এবং সেই ক্ষেপার আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে কবি কত ছন্দ কত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—সর্বহারাকে তিনি নিত্য-নৃতনের লীলার মগ করিয়া মত্ত করিয়া ভুলিয়াছিলেন। সেদিনকার আনন্দ-রসের পানপাত্র কি মহাকালের তাণ্ডকে আজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেছে?

কবি অজান্তে করিতেছেন যে, সেই পুথাপাত্র নিঃস্ব হইয়া রিক্ত হইয়া যার নাই, তাহা সন্ন্যাসীর জটায় অন্তরালে গোপন করা আছে যাত্র। কালের

রাখাল মহাকাল তাঁহার শিঙা বাজাইয়া সমস্ত আনন্দকে তাঁহার মধ্যে সংহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, আবার অবকাশ পাইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়াই।

বিজ্ঞোহী নশীন বীর, স্তবিরের শাসন বাশন,
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রুচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাবন।

কবি তো সন্ন্যাসীর তপস্বীকে অধিক দিন সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার কাজই যে রিক্তকে সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া তোলা, বিনাশেব মধ্যে সৃষ্টির আবাহন করা হৃৎপিণ্ডকে সুখে আনন্দে বিহ্বল করিয়া তোলা। তাই কবি বলিতেছেন—

তপোভঙ্গ হৃত আমি মহেশ্বরের, হে কত সন্ন্যাসী
অঙ্গের চক্রাণ্ড আমি। আমি কবি হুগে হুগে আসি
তব তপোবনে।

দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্ভাসের উত্তরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
বাখার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কোঁতুলন-কোলাহল আমি'
মোর গান হানি'।

কবি মহাকালকে তাঁহার বার্থক্যের আর সন্ন্যাসের ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া নব-বরবেশে সাজাইয়া দিতেছেন, কবির ইচ্ছাজালে রুপের

অস্থি-মালা গেছে খুলে
মাধবী বল্লরী-মুগে;
ভালে মাথা পুষ্পরেণু, চিতাভঙ্গ কোথা গেছে মুহি'।

কবি সন্ন্যাসীর সব চালাকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন—তিনি যে এতদিন সন্ন্যাসের ডান করিয়াছিলেন, সে কেবল প্রিয়াব মনে বিরহ জাগাইয়া মিলনকে নিবিড় ও মধুর করিয়া তুলিবার অস্ত্র। সেই মিলন তো কবি ষটাইয়া দিলেন—সন্ন্যাসীকে স্তম্ভের সাজাইয়া। তাহাতে স্তম্ভী হইয়া—

কোঁজুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে,
সে হাস্যে হস্তিল বাণী স্তম্ভের জয়জয়ি-পানে
কবির পরাণে।

বৃদ্ধ কবি এইরূপে নিত্য-নূতনের চিরযৌবনের অধিকার মহাকালের দরবারে কার্য্যে করিয়া লইলেন—ভাষাতে দেবী উমার সমর্থন আছে, মহাকালেরও যে বিশেষ কোনো আপত্তি আছে তেমন ভাব তো তিনি দেখান নাই।

উদ্ধৃতি—Western Influence on Bengali Literature—Piyajanan Sen, P ৪৬২

ভাঙা মন্দির

মন্দির পবিতাক্ত ও জীর্ণ ভয় হইয়া পড়িয়া আছে। সেখানে মায় পূজা'র তীর্থযাত্রী কেহ আসে না। নাই বা আসিল মানুষ—বিশেষভাবে বন্দনা ও পূজা এখনো করিতেছে বিশ্বপ্রকৃতি—বনফুল ফুটিয়া দেবতার জখা বন্দনা করিতেছে, বাতাসের নিঃশ্বনে তাঁহার বন্দনা সমীবিত হইতেছে, পশুপক্ষী মজ্জন গাহিতেছে। দেব-বিগত চূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তো সীমাব বানধন কাটাটখ ভবনস্বন্দব এই মন্দিরে আবির্ভূত হইরাছেন

আগমনী

মাঘ মাস। দারুণ শীত। সব শুষ্ক, পুষ্প ঝরিয়া গিয়াছে। সেই শীতের জড়তার মাঝে অকস্মাৎ কোথা হইতে বসন্তের পাগল ছাওয়া বহিয়া গেল, আব অমনি গাছে গাছে নবীন কিশলয় উদগত হইল, ফুল মঞ্জরিত হইয়া উঠিল, দোয়েল শামা কোকিল কপোত মুহুমুহ ডাকিয়া নবীনতার আনন্দের আগমন-বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। কবি ইহা দেখিয়া নিজের জরাজীর্ণ বান্ধক্য ভুলিয়া যৌবনের আনন্দে উল্লাস অম্ভব করিতেছেন। তাঁহার স্নেহমলে 'সেই শোভা সুখা ও মধুসুখ'। কত অব্যক্ত ভাবমগ্নরী তাঁহার চিন্তকাননে ফুটিয়া ফুটিয়া সৌরভে শোভার তরিয়া উঠিয়াছে—কবি অম্ভব করিতেছেন—

বসন্ত তলে সখীস এলো, বসন্ত তলে তোরা।

আজ যখন বিদায়বেলায় পূৰবী-রাগিনীৰ গেকুয়া শুব গাহিতে গাহিতে—
ববি পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, তখন এই নব-বসন্তেৰ শুভাগমনে
তাঁহাৰ চিত্তাকাশ বিচিত্র-বৰ্ণ-সুসমায় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। এব—

বিদায় নিরে শাবাৰ আগে

পড়ুক টান ভিতৰ বাগে

সঁহাৰে পাস ছুটি।

‘প্ৰমের ডোবে বাঁধক গায়ে, বীধন থাক টুটি’।

লীলাসঙ্গিনী

যে বিশ্ব-রূপ, যে ভুবন-সুন্দর, যে অখিলরসাত্মমূর্তি কবিকে আবাল্য
কাজ ভূলাইয়া বিশ্বশোভায় মাতাইয়া তুলিয়া খেলা কবিয়াছেন, যে জীবনদেবতা
কবিকে বিচিত্র আনন্দজ্যোতিৰ ভিতৰ দিয়া এতদৰে দীঘল-বানৰ পান্থ লইয়া
আসিয়াছেন, তিনিই আজ অকস্মাৎ কবিকে বন্ধবয়স নাম স্নেহযসস্তাবেৰ
ভিতৰ দিয়া স্পৰ্শ কৰিয়া ‘কাজেৰ কক্ষ-কোণে’ আসিয়া খেলাৰ সঁহাৰ দিতে
ডাকিতেছেন। সেই নিবপমা প্ৰথম লীলাসঙ্গিনী তাঁহাৰ খেলাৰ সত্ৰচৰ
কবিকে ছাড়িয়া তো বিশ্বলীলা জমাটতে পাবিহেঁচেন না। কাজ কৰিবাব
যোগ্য কেজো লোক তো জগতে ঢেব আছে, কিন্তু স্নানবেৰ সঁহাৰ খেলা
কৰিবাব লোক তো কবি ছাড়া আর কেহ নাই। তাহ কবি সেই ‘চিনি চিনি
কবি চিনিতে না পাবি’ গোছেৰ লীলাসঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা কৰিহেঁচেন—

নিহে যাবে ‘মানে নীলাসবের সঁহা

বধ-ছাড়া যত দিশ হাবাবেব মনে,

অযাত্রা-পথে যাত্রী বাহারা চল

নিবল আবেজনে।

কাজ ভোলাবাবে ‘কোণে বাবে বাবে

কাজেৰ কক্ষ কোণে।

কবিকে আবার মানস-প্ৰতিমাগুলাকে কল্পনা পটে নেশাব বৰা ব’ কৰিয়া
তুলিতে হইবে রসের তুলি ব্লাহিয়া। কিন্তু সেই মোহিনী নিষ্ঠুৰা বাব বাৰ
‘কবিকে অসময়েই ডাক দেন, তিনি ‘আবাব আছবান’ কৰিয়াছেন, কিন্তু—

কেখো বা কি হার, বেলা চলে যায়—

সারা হ'লে এলো দিন।

বাঞ্ছ পূর্বীর হৃদে রবির

শেষ রাশ্মির বীণ।

কবি এবার শেষ খেলা খেলিয়া লইবেন মৃত্যুর অজ্ঞাততার মধ্যে। পৃথিবীতে পাখিব শোভার মধ্যে যাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছিল, সেই লীলাসজ্জিনীর সহিতই লোকলোকান্তরে অল্প কোন অচেনা স্থানে পুনঃপরিচয় হইবে। কবির তো 'নিশীথ-অন্ধকারে অমাবস্তার পারে' যাইতে ভয় বা বিধা নাই, তাঁহার লীলাসজ্জিনী গোপন-রঙ্গিনী রস-তরঙ্গিনী যে তাঁহার আজীবনের চেনা, এবং তিনি যে কবির প্রিয়, প্রিয়তমা নিরুপমা।

লীলাসজ্জিনী জীবনদেবতার অমুভূতিকে জীবনে ফিরিয়া পাওয়ার কথা পূর্বীর অনেক কবিতাতেই আছে। যিনি নানা অবকাশে ও নানা উপলক্ষ্যে জীবন স্পর্শ করিয়া কবিচিত্ত সৌন্দর্যে ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া তোলেন, তাঁহাকে কবি অনেক দিন যেন হারাইয়া ভুলিয়া ছিলেন। আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই হারানিধি আপনি তাঁহার জীবন-নিকুঞ্জের দ্বারে আসিয়া কবির দৃষ্টিপথে পড়িবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিতে পাওয়ার আনন্দে কবিচিত্ত উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বেঠিক পথের পথিক

যিনি অনন্ত-রসময় তিনি তো অচিন্ত্যতর, তিনি তো কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তাই তিনি বেঠিক পথের পথিক, তিনি অচিন। কিন্তু তিনি তো অবাঞ্ছননোগোচরঃ নহেন, তাঁহার সত্তা তো আমরা নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া, ভাবনা-মননের মধ্য দিয়া, রসান্বাদনের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি। সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার মতন বচন আমরা পাই না, সেই অ-ধরকে ধরিয়া রাখিবার মতন কোনো বন্ধন আমাদের আরম্ভে নাই; তথাপি তাঁহাকে চিনি না এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না, আবার তিনি এমন কথাও বলা যায় না। বেধানে বসে কিছু স্থান আছে, আনন্দ আছে, হৃদে আছে, প্রিয় আছে, মিলন আছে, বিরহ আছে, সকলের ভিতর দিয়া তো তাঁহারই স্পর্শ আমরা পাইয়া থাকি। তাই কবি বলিতেছেন যে—

আহ্বান

রবীন্দ্রনাথ কবি ও কর্মী একাধারে। তাই তাঁহার স্বপ্নলোক কল্পনো তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, জীবনের উদ্যম বাত-প্রতিবাদ, বিভিন্নস্থল বার্ষের প্রবল ও উন্নত সংঘাত করির মনকে আকুল উত্তলা করিয়া তুলে। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে কবিত্ত্ব-রূপে পাই। স্ফামানবের ডাকে রবীন্দ্রনাথ কবি-কল্পলোক ছাড়িয়া বাস্তব জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে নামিয়া আসেন; ব্যথিত মানবের বেদনায় বাথা অন্তস্তব করেন; এবং বিশ্বের কল্যাণ-বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁহার অন্তরের মানবতা কবি-জীবের উপরে প্রভাব বিস্তার করে; বিশ্ব-প্রেমিকের কাছে আর্টিস্ট পদাভব স্বীকার করেন। কবির জীবনে বারংবার এইরূপ ঘটতে দেখা গিয়াছে,—স্বদেশী-প্রচেষ্টার যোগদান, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভারতী-স্থাপন, মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সময়ে দেশের জন্ত ব্যস্ততা, ইত্যাদি। কিন্তু লোকহিতকর কর্মসমূহের অপেক্ষা আর্টের স্থান অনেক উচ্চে; হিত-সাধন সাময়িক, আর্ট চিরন্তন—যে অভাব বা দুর্গতি মানুষের উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিতে পারিলেই হিতসাধকের কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু আর্ট হইতেছে A thing of beauty is a joy for ever (Keats); সেই অজ্ঞ এই-সকল কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বারংবার এক কিরিয়া যাওয়ার ডাক শুনিতে পাইরাছেন, তাহা সেই চিরন্তনেরই ডাক। তাই কবি যেমন বাণী বাজাইতে বাজাইতে বলিয়া উঠেন ‘এবার কিরাও য়োরে!’ অথবা বলিয়া উঠেন ‘আবার আহ্বান!’ ‘তোমার শব্দ ধূলার প’ড়ে কেমন ক’রে সইব।’, তেমনি আবার অল্প দিকের ডাকেও বলিয়া উঠেন—‘সময় হয়েছে নিকট, এখন বাধন ছিকিতে হবে।’ যে বাণী বিশ্বজনকে শুনাইবার জন্ত তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইরাছেন সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাণীর প্রচারই তাঁহার কাজ, তাঁহার মিশন; অল্প সমস্তই শুধু কণিকের, চিরন্তনের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে কবি বাহার আহ্বান শুনিরাছেন তাহা তাঁহার চিরন্তন-শক্তিরই নব-রূপ!

আহ্বান কবিতাটির মধ্যে একটি বিবাদের ভাব আছে, বাহার কল ব্যতির চাকল্য বা আকুলতার (unrest) মধ্যে। এই চাকল্য হইতেছে একাত্মের ব্যাধি; কবির মন এক এক পর্বীর হইতে অপর পর্বীরে উল্লী

হইয়া নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে; এখন কবির মনে আর-একটা নূতন-স্বজনকারী যুগ আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু কবিচিত্ত নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না; সেই চাকলা শুধু ঘুরাঁরই সৃষ্টি করিতেছে, তাঁহার মনের সমস্ত ভাব-সম্ভার কেবল কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কোনো বিশেষ আকার ধারণ করিতেছে না। কবি যখন চিত্তের ভাবৈবশ্ব-নীহারিকাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন, তখন তাঁহার এই ব্যাকুলতা শান্ত হইয়া যাইবে; এক সাহিত্য-সৌরভগতে এক নূতন জ্যোতিরকের আবির্ভাব হইবে, যাহার ভাস্বর জ্যোতি দেখিয়া বিশ্বমানব মুগ্ধ হইবে, কত পথিক প্রাণ-পথের নির্দেশ পাইবে। এই সৃষ্টির ব্যথা ও আকুলতা প্রত্যেক নূতন ভাবসৃষ্টির পূর্বে কবি-চিত্তকে বিমথিত করিয়াছে—তুলনীয়: জীবনদেবতা ভাবের ও নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি ভাবের কবিতাবলী। কবি ব্যথিত স্বরে বলিয়াছেন—
‘যখন তুমি বাঁধ ছিলে তার সে কী বিষম ব্যথা।’ সম্ভানের জন্মের পূর্বে মায়ের মনে যেমন একটা চকলতা ব্যাকুলতা কষ্টকর অস্থিত জন্মে, এও তেমনি,—কবিতাগুলি কবির মানস-সন্তান বৈ তো আর কিছু নয়! তুলনীয় ও দ্রষ্টব্য—অশেষ।

কবির বিনি জীবনদেবতা, অন্তর্ধামিনী, প্রতিভা, লীলাসঙ্গিনী, দোসর—
তিনি যেমন কবিকে ডাক দিয়া বাঁধা গভী হইতে বাহিরে লইয়া যান, কবিও তেমনি তাঁহাকে খুঁজিয়া ফিরেন,—উভয়ের মিলনের আগ্রহে থাকিয়া থাকিয়া উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। সেই কবি-প্রতিভার দ্বারাই কবির পরিচয়; মাহুব রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ পরিচয় আছে; সেই কবির অল্পপ্রেরয়িত্রীর দ্বারাই কবি নিজেকে কবি বলিয়া জানেন এবং বিশ্বের কাছেও তাঁহার পরিচয় দেওয়া ঘটে। যাহা কিছু নূতন অল্পপ্রেরণা তাহাকেই কবি তাঁহার প্রণয়ান্ধকারিকা-রূপে দেখিতেছেন।

মাহুব রবীন্দ্রনাথ তো সাধারণ সমস্তের একজন মাত্র—তেমন ধনিপুত্র সুপুত্র তো আরো অনেক আছেন। সেই রূপে তাঁহার কোনো বিশেষ নাই। কিন্তু যেই সেই মাহুব রবীন্দ্রনাথকে কবিত্বশক্তি স্পর্শ করে, যেই তাঁহার কবিত্বশক্তির অল্পপ্রেরণা অপূর্ব সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে, অমনি তিনি সমস্ত সমস্ত জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক হইয়া যান—তিনি রাম ক্রাম ঘর বারি হারী জিহ্ব টান আধার; পদরু প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়া কবিত্বগীতে

স্থান লাভ করেন, এবং সেখানেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহিমামণ্ডিত হইয়া বসেন।

কবি নিজের কবিত্ব-শক্তির সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেই তাঁহার আত্মোপলব্ধি হয়, কবি অনুভব করেন,—‘আছি, আমি আছি!’ এবং সেই ‘আমি আছি’-বোধ জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া কবির জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত অমরত্বের আনন্দে মণ্ডিত করিয়া দেয়। কবিপ্রতিভা যেই কবিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে, অমনি অব্যক্ত ব্যক্তি সুপরিবাস্ত হইয়া উঠেন, অখ্যাত ব্যক্তির খ্যাতিতে জগৎ প্রাবিত হইয়া যায়।

নিখিলের সৃষ্টির দ্বারা আসিয়া যখন উষা তাহার উদ্বোধিনী বীণার আলোকরশ্মির হাজার তার বাজাইয়া তুলে, এবং আলোকের বর্ণে বর্ণে অমরাবতীর গান রচনা করে, তখন যেমন বিশ্বপ্রাণের মধ্যে প্রকাশব্যগ্রতা ও চাক্ষুষ জাগ্রৎ হইয়া উঠে, সামান্য ধূলাও তখন শ্রামল সরসতার ঢাকিয়া যায়, তেমনি এই কবি-প্রতিভাও ‘আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, দেবতার দূতী,’ তাহা স্বর্ণের আকৃতি মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া আনে, এবং বাহা ছিল নব্বর মরণধম্মী তাহাকে অমর কবিতা তুলে। রবীন্দ্রনাথ যদি হাজার হাজার জমিদারের মতন কেবল জমিদার-মাত্রই হইতেন, তবে অজ্ঞাত জমিদারদের নাম যেমন কেহ জানে না, মনে করিয়া বাখে নাই, তাঁহারও সেই দশা হইত; কিন্তু যেই তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভা কবি করিয়া তুলিল, অমনি তিনি অমর হইয়া গেলেন, মরণধম্মী মানব হইয়া গেলেন অমর কবি।

সেই কল্যাণী দেবদূতীর আলীদাদ নামিয়া আসিল,—

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটল অর্গল

বেদনার বেগে ;

মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতধন

নেচে ওঠে জেগে।

বাহা কিছু কবির মনে অনুভব জাগায় তাহাই তো তাঁহার বেদনা। সেই বেদনা হইতেই তো কবির সৃষ্টি। যিনি ছিলেন অখ্যাত অজ্ঞাত সামান্য একজন লোক, তিনি সেই অজ্ঞানার আবরণ উন্মোচন করিয়া দীর্ঘ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন কবি হইয়া—

হৃদয়ের তিমির-বন্ধ দীর্ঘ করে তেজস্বী তাপস।

সেই কবি ভেঁকশী, ভাঙ্গল, বীর ; ক্ষমতাস্বত্ব তিনি রচনা করেন, সৃষ্টির মতো তিনি বস্তুকে বশ করেন—কঠিন তাঁহার স্বপ্ননা।

কবির সেই অহুপ্রেরণা, প্রকৃতি, নীলবস্ত্রিনী, কোমল, রক্ত বার কবির জ্ঞান অভিমারিকা-বেগে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল ; আত্ম আকার করি তাহার স্রষ্টা প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাঁহার চিত্তপ্রাণ নির্যাপিত হইয়া ফিরাছে, তাঁহার ছন্দ-বীণা নীরব হইয়াছে, সেই অভিমারিকা আসিয়া এই বীণের মুখে শিখা জ্বালাইয়া তুলিবে, এই বীণার জ্বরে স্বাক্ষর তুলিবে। কবি চিরন্তনী কবিত্ব-শক্তির অস্ত্র ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবিতার সকল উপকরণ প্রস্তুত, সেই অভিমারিকা আসিলেই তাহাকে প্রকাশের সার্বকভা দান করিতে পারিবে।

নূতন ভাব ও নূতন সৃষ্টি-নৈপুণ্য-প্রকাশের বাধা ও বেদনা ব্যতীত বৃকে কইরা কবি বিনিময় অতঃপর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন,—কবে তাঁহার কাছে তাঁহার কাব্যলব্ধীর চরম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইবে—সর্বোত্তম অত্যুৎকৃষ্ট স্রষ্টার অপূর্ব কাব্য-সৃষ্টির আহ্বান—the best creative call in the poet's mind—কবে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কবি তো জানেন যে ‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?’ ‘শেষের মধ্যে শেষ আছে’, তাই তাঁহার শেষ গান চরম ও পরম সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া পূর্ণ তানে পাওয়া হয় নাই, তাঁহার মন One Word More বলিবার প্রতীক্ষার তাঁহার অহুপ্রেরণার দিকেই তাকাইয়া আছে—কোথায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অহুপ্রেরণা যাহা কবিকে শেষবারে পরিপূর্ণতা চরমোৎকর্ষ দান করিয়া যাইবে। কবির যে সমস্ত ক্ষণ নিফল বক্ষ্য অহুবর—uninspired moments—তাঁহারই প্রাপ্তে কোথায় সেই অভিমারিকা বিলম্ব করিতেছে ?

অপ্রকাশের অন্ধকার কালো ঢাকের মধ্যে মহেশ্বরের বস্তু হইতে বিদ্যাতের আলো প্রকাশিত হইয়া উঠুক। কবির চিত্ত কবিত্ব-স্বাধা বর্ণের অস্ত্র কাড়াল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রকাশের বাগ্মতা সঞ্চারিত হোক। কবির যে দান-শক্তি অপ্রকাশের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাকে মুক্তি দান করুক সেই অভিমারিকা। কবি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার যাহা দিবার তাহা দান করিয়া স্রষ্টা হইতে পারিলে পরিজ্ঞান পাইয়া যাইবেন। নূতন স্রষ্টাশক্তি কবিকে সার্বক করিয়া তুলুক।

কবির জীবন-সারাহে কবিকে দিয়া স্রষ্টার স্রষ্টা কইরাই কবি-প্রতিভা

যদি বিদায় লয়, তাহাতে কবির ক্রোধানো ক্রতি রাই, অথতেরও কোনো ক্রতি নাই। তখন আর দিবার কিছু থাকিবে না বলিয়া বিদায় মতন স্তব্ধে ধারণ করিয়া বিরর-শব্দে অগভীর ক্রমে শূণ্যতার মধ্যে দেখা দিবে। জীবনের শেষ মুহূর্তে যাহা কবির করা হইবে তাহা কবির শেষ লাজ, এবং কবির জীবন-গরমায়ু অস্ত্রের। হীৰ্ষভর হইলে কবির হয়তো আরো অনেক কিছু নূতন ও উত্তম সৃষ্টি করিতে পারিতেন ; কিন্তু জীবন শেষ হইয়া যাওয়াতে তাহা পারিলেন না বলিয়া যাহা তাঁহার সর্বশেষ ক্রতি হইল, সেই সমস্তই শেষ চরিতার্থতার আনন্দময় হইয়া উঠিবে—জীবনদেবতার অরূপ-সুন্দর আবির্ভাবে কবির চুঃখ-সুখ স্বচ্ছ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

কবি তো জীবন-পথের পাছ। তিনি তাঁহার যাত্রা-সহচরী লীলাসজ্জিনী দোসরকে সন্ধান করিতেছেন জীবন-পথের প্রান্তে উপনীত হইয়া। কিন্তু সেই যাত্রা-সহচরীর স্বরূপ কোন্ সিদ্ধপারে যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার তো কোনো উদ্দেশ্য কবি পাইতেছেন না—তিনি তাঁহার শেষজীবনে মনের মধ্যে কবিত্বের অশ্রুপেরণা অহুভব করিতেছেন না।

কবি তাঁহার অস্তরের গহন-বাসিনী নব-মানসীকে শেষ-পূজারিণী নামে অভিহিত করিতেছেন—সেই যে কবি-প্রতিভার অশ্রুপেরণা তাহা তো নূতন নূতন কবিতা গান সৃষ্টি করিয়া কবিকে সম্মানিত সংবোধিত করে—সেই পূজারিণী কবির চিত্তকাননে গানের ফুল ফুটাইয়া, তাহাতে অর্থ্য রচনা করিয়া কবিকে পূজা করে—মাগুষ্য রবীন্দ্রনাথকে নহে, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরদিনেব কবিকে। যিনি ছিলেন কবির জীবনদেবতা, অস্ত্র্যামিনী, নিষ্টুরা স্বামিনী, তিনি এখন হইয়াছেন শেষ-পূজারিণী—তিনি এই শেষবার কবির চিত্তকাননের পুষ্প চয়ন করিয়া কবিকে শেষ পূজা করিয়া লইবেন, কবির এই শেষ অশ্রুপেরণায় কবিকে স্মরণ করিয়া লইবেন।

যেদিন কবি শেষ গান রচনা করিবেন তাহার পরে যদি আর একদিনও জীবিত থাকেন তবে সেই দিনেও তো কোনো নূতন সৃষ্টি করিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকিয়া বাইতেছে, এমন কি স্মরণের মুহূর্তেও তো কোনো নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। অতএব কবি যাহাকে শেষ রচনা বলিতেছেন তাহা বাস্তবিক শেষ নহে, অপেক্ষের মধ্যে এক স্থানে স্থগিত হইয়া থাকা মাত্র। সেই অন্ত কবি বলিতেছেন যে তাঁহার শেষ-পূজারিণীর—

অসমাপ্ত পরিচর, অসম্পূর্ণ বৈবেচকের খালি

নিতে হলো তুলে !

কিন্তু কবির প্রায়সী লীলাঙ্গিনী যাত্রা-সহচরী মরণের কূলে—ঠিক মরণ-মুহুর্তে—কবিকে দিয়া কিছু রচনা করাইয়া লইবার—কবিকে কবি বলিয়া বরণ করিয়া লইবার কোন আয়োজন কি করিয়া রাখেন নাই ? আর, মরণের পরে মরণোত্তর কালে অল্প কোনো লোকে কবি যখন পুনর্জন্ম লাভ করিবেন, তখন কি সেখানে সেই নব-জীবনে তিনি আবার নূতন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন ? পূর্ববীর রাগিনী কি প্রভাতী ভৈরবীতে পরিণত হইয়া সেই জন্মেব নীরবতার বক্ষে নব ছন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিবে ?

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, ২৪এ যে ১৮৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ চৌধুরীকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি তাঁহার কাব্যজীবনের একটা বিশ্লেষণ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে ‘শেষ পুজারিণী’র ভাবটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

“আজকাল যে-সকল কবিতা লিখি, তা ‘ছবি ও গান’ থেকে এত তফাৎ যে আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছি, আমি যেন আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চলে তাই ভাবি। অবশেষে একটা ভাবগা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেশে ভরই য়ে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলাম সেগুলো কিছুই হয় তো টিকবে না—আমার নিজের যেটা চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি যেখোঁছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপর মন থেকে এই আশ্ববিবাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি, তা হলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে পিঁবে পৌঁছব, সেখান থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না।”

—সবুজপত্র, ১৩২৪, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৪৭।

এই যে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া কবির শ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে যিনি কবিকে উত্তীর্ণ করিয়া আনেন, তিনিই কবির শেষ-পুজারিণী। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে কবি কবে কখন করিবেন তাহার তো নিশ্চয়তা নাই, তাহা নৃত্যুর মুহুর্তেও হইতে পারে। কাজেই সেই কবির অন্তর্মামী জীবন-বেবতা যিনি কবির লীলাঙ্গিনী ও মোসর, তিনিই কবির শেষ-পুজারিণী।

লিপি

এই কবিতাটির আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁহার যাত্রী পুস্তকে পশ্চিম-
যাত্রীর ডায়ারীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

"৩ অক্টোবর, ১৯২৪। হারনা মার্ক জাহাজ। এখনো সৃণ্ড গুঠেনি। আলোকের
অবতরণিকা পূর্ব আকাশে। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে ম'জে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ
ছন্দে গাঁথা এই কথাটা আপনি ভেঙ্গে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন

তৃপ্তিহীন

একই লিপি পড়ো বারের বার।

"বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার
আগেই তার ধূসোটা এসে পৌঁছেছে।

"সমুদ্রের দূর তীরে যে-ধরণী আপনার নানা রঙা আঁচলখানি বিভিন্নে দিবে পূর্বের দিকে মুখ
ক'রে একলা ব'সে আছে, ছবির মতো দেখতে পলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল
ব'সে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধ'রে সে একমনে পড়তে ব'সে
গেল ...।

"আমার কবিতার ধূসো বসছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর
দরকার নেই সেই গুণ যথেষ্ট। সে এত বড়, তাই সে এত মবল। সেই খানিতেই সব
আকাশ এমন সহজে ভ'রে গেছে।

"ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি।
স্বলোকের নাকী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে, কঠোর ভিতর দিয়ে, রূপে ক'প বিচিত্র হ'য়ে উঠল।
বনে বনে হলো গাছ, ফুলে ফুলে হলো গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হলো নিঃশ্বাসিত। সেই স্থলর, সেই
ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকঝিক, সেই কানার কাঁপনে ছলছল।

"এই চিঠি পড়োটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে
মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের স্রোত। এতেই দুই উঠল সৃষ্টির রঙ্গ, বিচলিত হলো স্বতু-
পর্দায়,.....বাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন মাটির আড়ালে চ'লে যায়; মনে
ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা কাক ক'রে দিয়ে একটি
অজুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা কোয়ার হয়েছিল
ব'লে সেদিন রব উঠল, সে তো মাটির তলার অন্ধকারে সঁচিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে পড়া বীজের
দয়জায় ব'সে ব'সে যা দিচ্ছিল। এখনি ক'রেই কত অদৃশ্য ইসারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে
আর-এক হৃদয়ের কীকে কীকে কোন্ চোব-কোঠার দিগে চোকে; সেখানে কার সঙ্গে কি
কাঞ্চাকানি করে জাদিয়ে; তার পরে কিছুদিন বাবে একটি নবীন বাগী পর্দার বাইরে এসে
বসে এসেছি।"

“... কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। মইলে তার এক প্রান্তে নির্ধারিত বাক্য রাসসিহিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিনী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ মর্ত্যের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মনাক্রান্তা হচ্ছেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ঝাঁকের ভিতর দিয়ে অনু-পরমাণু মিড়াই যে-অদৃশ্য চিহ্নি চালাচালি করে, সেই চিহ্নিই সৃষ্টির বাণী। ব্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে মনেই হোক, আর কাগজে পত্রেরেই হোক, যে-চিহ্নি চলে, সেও ঐ বিশ্ব-চিহ্নিই একটি বিশেষ রূপ।”

হে ধরণী, তুমি সমস্ত কিছু ধারণ করিবার অসুপ্রভাতের মর্মবাণীতে তব। একই লিপি প্রতিদিন পাঠ করো কত জ্বরে—আলোকই তো নানা রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ হইয়া উঠিতেছে।

বহু যুগ পূর্বে নীহারিকার অস্পষ্টতা হইতে তোমার উদ্ভব হইয়াছে, অমর জ্যোতির মূর্তি স্বয়ং তোমার চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল, তোমার বক্ষে তৃণরোমাঞ্চ হইল, পরম বিশ্বের পর্কতের স্রু-উচ্চ চূড়ায় প্রভাতের প্রথম আলোক-সম্পাত হইল এবং তুমি তাহাকে বরণ করিয়া লইলে। আলোকের ভাপে বায়ু সমীরিত হয়, বাতাসের প্রেরণায় সমুদ্র চঞ্চল হয় এবং বন মুগুর হইয়া সনসন্ শব্দ করিতে থাকে। একই আলোক বিশ্ব-চরাচরে জ্ঞানবৎ আনিয়া দেয়।

আলোকের সেই প্রথম দর্শনের বিষয় ধরণীর এখনো কাটে নাই—ধরণীর খুলি তৃণ-রূপ কর্তৃক তুলিয়া সেই আলোকেরই জয় ঘোষণা করে। সে বিষয় ‘পুষ্প পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে।’ আলোকই প্রাণের আকর্ষ। সেই প্রাণপ্রবাহে ক্রমাগত স্বজন ও প্রলয় খেলা করিয়া চলিয়াছে, রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ হইতেছে মৃত্যু ধ্বংস প্রলয়; সেই বিশ্বয় নৃতনের সঞ্চিত মিলনের স্বপ্নের মধ্যে এবং পরিচিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের চাঞ্চলের মধ্যে এক আলোকেরই জয়গান করিতেছে।

ধরণী ও সূর্যের মাঝখানে ‘আকাশ অনন্ত ব্যবধান’। এই ব্যবধান আছে বলিয়াই তো পরস্পরের মধ্যে এত মিলন-ব্যগ্রতা এত দেওয়া-নেওয়া। বিরহ দ্বাচ্ছ বলিয়াই তো লিপি লিখিতে হয়; মিলন থাকিলে তো পত্র-প্রেরণের আবশ্যকই থাকে না। নীল আকাশখানি যেন নীল কাগজ, এবং তাহাতে অগ্নির অঙ্করে তারকা বিয়া লেখা অমরাবতীর বার্তা। (তুলনীয় জ্ঞানদাস বখৌলীর কবিতা, উৎসর্গের চিহ্নি কবিতার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বিরহিনী ধরণী সেই লিপিখানি বক্ষে ধারণ করে এবং তাহাকে শ্রামলভায় ভূষিত করে—

আলোকই ধরণীর বক্ষে উদ্ভিদ হইয়া উদয় হয়। সেই আলোক-লিপির বাক্যগুলিই ধরণী পুষ্পদলে রাখিয়া দেয়, পুষ্পের বকের মধ্যে মধুবিন্দু করিয়া তুলে; পুষ্পের রেণুর মাঝে গন্ধে পরিণত করে। প্রেম ও কবিত্বের সঙ্গে গোপনতার ও মৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—রূপদর্শনমুখা তরুণীর চোখের গোপন অন্ধকারে তাহার প্রিয়ের রূপজীবিকে ধরণীই লুক্কায়িত করিয়া রাখে—আলোকই তো তাহার প্রিয়জনের রূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে। সেই আলোক-লিপির বাণীই সিদ্ধুর কল্লোলের কারণ, পল্লব-মর্মরের কারণ, এবং নিখারের নিরন্তর ক্ষরণের কারণ।

সেই বিরহিণী ধরণী আলোক-লিপির যে উত্তর সৃষ্টির প্রথম হইতে লিখিতেছে, তাহা আর আজ পর্যন্ত শেষ হইল না,—কত কত রকমের উদ্ভিদের উদ্ভব হইল, বিলয় হইল, কত কত জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হইল, যুগে যুগে নব নব সৃষ্টির আর অন্ত নাই। ধরণী আলোকের উত্তরে যাহা এক যুগে সৃষ্টি করে, তাহা অল্প যুগে ধ্বংস করিয়া আবার নূতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করে। যাহা তৈয়ারি করিতেছে তাহা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হইতেছে না মনে করিয়া ধরণী 'আত্মবিক্রোহের অসন্তোষে' পুনঃপুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস—ধ্বংস এবং সৃষ্টি করিতেছে।

আলোক-লিপির ফলে ধরণী-বক্ষে যত শোভা আনন্দ প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই কবি ও শিল্পীদের অন্তরে প্রবর্তনা জোগাইয়াছে—তাহারা যেন ধরণীর অন্তরের কথা অল্পমানে বুঝিয়া তাহার হইয়া আলোক-লিপির জবাব লিখিতে চাহিতেছে। যেন একটি অল্পশিক্ষিতা তরুণী তাহার প্রিয়তমের পত্র পাইয়া খুব ভালো করিয়া উত্তর লিখিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তাহার হাতের লেখা ধারাপ হইতেছে, বর্ণাঙ্কুরি ঘটিতেছে, কথা তেমন কবিত্বময় হইতেছে না, এবং সে নিজের অক্ষমতার অসন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ সেই লেখা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এবং সেই-সব ছেঁড়া-চিঠির টুকরা ধরণীর স্তরে স্তরে ফসিল হইয়া জমিয়া উঠিতেছে। সেই অক্ষম তরুণীর আগ্রহ দেখিয়া কবি ও শিল্পীরা দয়াদ্র হইয়া তরুণীর জবানী একখানি ভালো চিঠি লিখিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু তাহাও তাহাদের অথবা ধরণীর মনঃপূত হইতেছে না, কাজেই নব নব কবি ও শিল্পীর চেষ্টার আর বিরাম নাই। কবির চিত্ত যেন বাঁশী; নানা ভাবের প্রকাশ তাহার স্বর; ধরণীর অব্যক্ত আকৃতিই যেন কবি-চিত্তে স্বর

হইয়া বাজিতেছে। ধরণীর এই প্রিয়তমের লিপির উত্তর দিবার আকুতিই কবির কাব্য-প্রতিভাকে অল্পপ্রাণিত করিয়া তুলুক, কবিকে নূতন সৃষ্টির অল্প-প্রেরণা জোগাক। ধরণীর সকল ধাতুর সকল সৌন্দর্যসম্ভার কবির ছন্দের ঘোলায় চালিয়া বিরহিণী ধরণীর প্রিয়মিলন-দৌত্য যাত্রা করুক !

ধরণী বসুধা হইলেও মর্ত্য, অসম্পূর্ণ, নশ্বর; আর স্বর্গ শাশ্বত সম্পূর্ণ। যাহা অসম্পূর্ণ তাহার অন্তরে নিরন্তর ক্ষুধা জাগিয়া থাকে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার। সেই যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা আরো ভালো হইয়া উঠিবার, অনারন্তকে লাভ করিবার, গম্ভীকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া অজানা রাজ্যে প্রবেশ করিবার, লক্ষ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার, তাহাই কবির চিন্তে সংক্রামিত হইয়া কবির বাণীকে আলাময়ী করিয়া তুলুক।

বাতাস

এই কবিতাটি ১৩৩১ সালের চৈত্র-সংখ্যার বঙ্গবাণীতে ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাতাস গোলাপকে, পাখীকে, অরণ্যকে বলিতেছে আমি তোমাদের কাছে তাঁহারই বাণী বহন করিয়া আনি যাহাকে তোমরা সকলে না বুঝিয়া খুঁজিতেছ—যিনি জগৎপ্রাণ, যিনি অনন্ত, যিনি অজানা, আমি সেই সীমাহীনের বাণী; আমি তাঁহার পূর্ণতার স্রব, অজানার আভাস তোমাদের বুকের কাছে পৌছাইয়া দিই।

পদধ্বনি

কবিকে যেমন তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহার আশ্রয় বিশ্রাম ছাড়াইয়া সঙ্কাকালে ‘আবার আহ্বান’ করিয়াছিলেন, তাঁহার শব্দ ধ্বনি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কবিকে অসময়ে আশ্রয় বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবারও তেমনি কবি অস্বস্ত বোধ করিতেছেন যে, তাঁহার জীবনদেবতার পদধ্বনি তাঁহার মনের দ্বারে বাজিতেছে, এবং তাঁহাকে বিজাগ্রা করিতেছেন—

ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,

ছিঁড়ি মোর

শয্যার বন্ধন-মোহ, এ রাত্রি-বেলায়

মোর কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসমান-খেলায় ?

ক'ব পূর্বেও বলিয়াছেন—

তবে হবে হ'বে জয়,

হে ঘেণী করিনে ভয়,

হব আমি জয়ী।

—অশেষ।

ত্রেমনি এবারও বলিতেছেন—

ভয় নাই, ভয় নাই,

এ খেলা পেলেছি বাবংবার

জীবনে আমার।

দোসর

কবির যিনি দোসর শীলাসঙ্গিনী যাত্রা-সহচরী জীবনদেবতা, তিনি কবির একক জীবনের চিরসঙ্গী, তিনি কবির সহিত কত ভাষায় কত ছন্দে কথা ক'হেন, তিনি যে তা প্রবনতাস্ত্র হইয়া সকল বিশ্বশোভার অন্তর দিয়া কবিকে চাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন আজ জীবন-সাত্ত্বকে কবি সেই দোসরকে স্পষ্ট মিলনে নিকটে দেখিতে চাহিতেছেন। যিনি এক অদ্বিতায়, সেই একের সহিত একাকী কবির মিলন পূর্ণ হোক, কবির হৃদয়ের ভক্ত ও আত্মসমর্পণ তাঁহাব দোসর। নজের হাতে তুলিয়া লউন—

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাওনা কথা

সব্ব হলে একার সাথে মিলুক একা।

নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতেও বেলায়

অনেক দিনেও দুবেব ডাকা পূর্ণ করে কাছের খেলায়।

তোমার আমার নতুন পাল হোক না এবার

হাতে হাতে এবার দেবার।

কৃতজ্ঞ

এই কবিতাটির সঙ্গে বলাকার 'ছবি' কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। কবি যে প্রথম প্রিয়াকে একদিন ভালোবাসিয়া বিশ্বকে মধুর দেখিয়াছিলেন,

কত কবিতার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়াকে যদি ভুলিয়াই থাকেন, তবু তাঁহার জীবনে সেই প্রিয়ার আবির্ভাব তো বার্থ হয় নাই, বরং কবিকে সেই আবির্ভাবই কবি করিয়া ভুলিয়াছে। এই জ্ঞাত কবি ভুলিয়া-বাওয়া প্রেমসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

মৃত্যুর আহ্বান

১৯১২ সালে কবি যখন অসুস্থ শবীব লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে কবি আমাকে সাস্তুনা দিবার জ্ঞাত বলিয়াছিলেন—তোমাব এতে আপত্তি কি? জানো তো রবি পশ্চিমেই অন্ত যায়। আর আমাদের দেশের চিরকালের ব্যবস্থাই এই যে, মৃত্যুর সময়ে কাহাকেও ঘবে পুবিয়া বাধা হয় না; তাকে মুক্ত প্রাঙ্গণে আকাশের তলে বাহির কবিয়া বাধা হয়। যখন মানুষের জন্ম হয়, তখন সে আসে গৃহের কোলে গৃহের অতিথি হইয়া, আব যখন মৃত্যু আসে তখন সে অনন্তের যাত্রী। মৃত্যুর সময়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিলে, ঘরের বস্তুব মমতা যাত্রায় বিঘ্ন ঘটায়—এই আমার ঘর, আমার বিছানা, আমার বাকস, আমার আশ্রয়, আমার আমার, চারিদিকে কেবল আমার। তখন মনে হয় যেন মৃত্যু আমাকে আমার সমস্ত বন্ধন হইতে জোব কবিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাঠিতেছে, ইহাতে আমার পরাভব ঘটিতেছে মৃত্যুর কাছে, আর যখন মরণোন্মুখ ব্যক্তি বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহাব মনে হয় সে মৃত্যুকে আগ বাড়াইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিয়াছে; সেখানে তাহার জন্ম, মৃত্যুর পরাভব।

এই ভাবটি এই কবিতার মধ্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

মৃত্যু তোম হোক ঘরে নিশীথে নির্জনে।

কারণ,—

মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

দান

এই কবিতাটির সহিত খেয়ার শুভক্ষণ ও ত্যাগ কবিতার ভাব-সাদৃশ্য আছে। কাহাকেও কিছু দান করিতে হইলে কর্মফলের কোনো আশা না রাখিয়াই দান করা উচিত। ভগবানকেও আমাদের ভক্তি নিবেদন করিতে হইবে মনের মধ্যে বণিকবৃত্তি পোষণ করিয়া নহে, কোনো লাভের প্রত্যাশা রাখিয়া নহে। অহৈতুকী ভক্তি দান করিতে হইবে এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন কি না তাহার জ্ঞাত কোনো ভাবনা রাখিলে চলিবে না। প্রিয়জনকে দিবার মতন মূল্যবান সামগ্রী জগতে কি বা আছে; কাজেই কেবল গ্রহণ করার মূল্যই দানকে মূল্যবান করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বরের খুদ খাইয়াছিলেন, দ্রৌপদীর শাক-কণিকা খাইয়াছিলেন, সুদামার পুদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই সেই সমাদরে ঐ সামান্য বস্তু মহামূল্য হইয়া উঠিয়াছিল যাহারা তাহা দিয়াছিল তাহাদের নিকটে।

তুলনীয়—

বঁধুর কাছে আমার বেলায়
গানটি শুধু নিলেন গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান।

কৈতমংলা, ৬১ নম্বর।—পীতবিত্তন, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

প্রভাত

এই কবিতাটিতে মনোহর কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভাতের স্বর্ণসুধা-চালা বৃকে কবি অবকাশ যাপন করিতেছেন; তাঁহার চারিদিকে পুষ্পের ফোয়ারা, তৃণের লহরী, সৌরভের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, এবং সেই জন্ম-মৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ কবির বক্ষস্থল স্পন্দিত করিতেছে—বিশ্বনিখিলের সম্মিলিত আনন্দস্বর যেন কবি নিজের প্রাণের মধ্যে শুনিতেছেন, এবং

এই স্বচ্ছ উষার গগন
বাজায় অদৃশ্য শব্দ শব্দহীন সুর।
আমার মরন মনে ঢেলে দেয় অনীল অধর।

কবির সেই চিরপ্রিয় সুদূরের অশ্রুভব তাঁহার নয়নে মনে তিনি প্রভাত-আলোকে
পাইতেছেন।

অস্তুহিতা

এই কবিতাটির সঙ্গে খেয়াল আগমন কবিতার নিকট ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে।
কবি বার বার বলিয়াছেন—

হৃদয়-দুয়ার বন্ধ দেখিয়া কিরিয়া যোগো না প্রভু।

তবু তো অনেক সময়ে তাঁহার জীবনদেবতা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।
সারারাত্রি সেই অভিসারিকা বন্ধ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিয়া চলিয়া
গিয়াছেন :

ভোরের তারা পূব-গগনে যখন হলো গহ

বিদায়-রাতির একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো

যখন সেই অভিসারিকা অস্তুহিতা হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন কবি অসময়ে
সঙ্কল্প করিতেছেন—

আজি হতে মোর ঘরের ত্যহার

রাখিব খুলে রাখিব

প্রদীপপানি রঙের আশা

বাতির জানিতোহে ।

তুলনীয়—

Three wives sat up in the lighthouse tower,
And they trimmed the lamps as the sun went down.

—Kingsley, *Three Fishers*.

প্রভাতী

চপল ভ্রমর কবির কাব্য-শতদলের মধুপ, দরদী সমঝদার। শ্রুতার সৃষ্টি
তখনই সার্থক হয়, যখন তিনি একজন রসজ্ঞ মরমী সমঝদার পান। কবি ও
শিল্পী চাহেন রসজ্ঞের রসাসুভব ও সমাদর।

কবির কাব্য-শতদল ভ্রমরকে আহ্বান করিতেছে, প্রভাত নীত্রেই সন্ধ্যার
অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে, তাহার আগে সময় থাকিতে থাকিতে শতদলের
•মর্যকোবের মধুসন্ধর সার্থক করিতে হইবে

শতদল প্রস্তুত হইবার আগে তাহাকে কিছুদিন কোরক অবস্থায় অপেক্ষাশের হুঃস্থ করিতে হয়। আজ তাহার সেই গোপনে কাঁদার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিখিল ভুবন প্রকাশের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছে।

গগন যেন একটি নীল পদ্ম, শতদল পদ্ম; তাহার আত্মানে সোনার ভ্রমর সূর্য তাহার বৃকে আসিয়া জুটিয়াছে। গগনের মতন কবির চিত্ত-শতদলও প্রভাত-আলোকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেও তার রূপ রস গন্ধ লইয়া রসজ্ঞ সমঝদারের প্রতীক্ষায় আছে।

চিত্তে কোনো ভাব সঞ্চিত হইলে, তাহা প্রকাশের জন্য ব্যগ্রতা জন্মে। কবির চিত্ত আগ্রহ হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যের মর্মজ্ঞকে ডাকিয়া বলিতে-ছেন—তুমি এস, এবং আসিয়া সেই ভাব-সম্পদের রসাস্বাদ করো, তুমি না আসিলে আমার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবে।

অমুকুল অরুণণ মাহেন্দ্রকণ আসিয়াছে, তুমি এখন কুণণ হইয়া দূরে থাকিয়ো না। আমার মন বিলাইয়া দিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আছি, আমার মনের সমস্ত মাধুরী আমি উজাড় করিয়া তোমাকে বিলাইয়া দিব, তুমি আসিয়া গ্রহণ করিলেই হয়।

তুলনীয়—চিত্রা।

এই কবিতাটির ছন্দের মধ্যে কবি-চিত্তের আনন্দ-আহ্বান যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয়া ও বিরহিণী

কবি তাঁহার পৌজীকে সম্বোধন করিয়া এই দুটোটি স্নেহসিক্ত রঙ্গভরা কবিতা লিখিয়াছেন।

কঙ্কাল

কবি একটা পশুর কঙ্কাল দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, পশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব সুরাইয়া যায়। কিন্তু মানুষের, বিশেষ করিয়া কবির, জীবন তো মৃত্যুর দ্বারা নিঃশেষ হয় না—তিনি যাহা ভাবেন, জানেন, অনুভব করেন; তাহা তো কেবলমাত্র নশ্বর দেহের সঙ্গেই বেনষ্ট হইবার সামগ্রী নহে—তাহা তো হৃদয় চিরন্তন সামগ্রী, তাহা অপাখিব—

বা পেয়েছি, বা করেছি দান,
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?
আমার মনের নৃত্য কত বার জীবন-মৃত্যুরে
লজিয়া চলিয়া গেছে চির-স্বপ্নের স্বপ্ন-পুরে ।
কবি যে রূপের পয়ে অরূপ মধু পান করিয়া অমর হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার
দৃঢ় ধারণা—

নতি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ ।
বিধাতা যে কবিকে এত মানসিক ঐশ্বর্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তো কেবল
দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যাইবাব ভয় নহে

অন্ধকার

আর কোনো কবি অন্ধকারেব ঐশ্ব্যের এমন সন্ধান পাইয়াছেন কি ন
সন্দেহ । কবি তাঁহার নব-গীতিকা পুস্তকেব একটি গানে বলিয়াছেন—

অন্ধকারের বৃকের কাছে
নিভা আলোর আসন আছে,
সেখায় তোমার চমকখানি পালে ।

গীতালিতে বলিয়াছেন—

অন্ধকারের ডুসে ধ'তে প্রসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো ।

ইহার সহিত তুলনীয় গীতালি পুস্তকের সাদ্রাশেষ কবিতা এবং ফাল্গুনী
নাটক । ফাল্গুনীর অন্তরের কথা ইটতেছে এই—শীত ও বসন্ত যেন অন্ধকার
ও আলো,—শীতের শীর্ণতার মধ্যে বসন্তেব ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য লুকাইয়া থাকে ।
অন্ধকারও তেমনি আলোকের সৃষ্টির বাধায় চঞ্চল । অন্ধকার যেন গভিণী,
আলোকসন্ধানকে প্রসব করিবার বাধায় সে কল্পিত হইতেছে ।

সৃষ্টির পূর্ববর্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ প্রচ্ছন্ন
ছিল, এমন কথা বেদ ও বাইবেল উভয়েই বলেন ।

ন রাত্রা অন্ধ আসীৎ প্রকটতঃ ।

তম আসীৎ তমসা পূর্ণং অন্ধেৎ প্রকটতঃ । —দণ্ডবেদ, ১০.১২০

প্রথমে রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।

...and darkness was upon the face of the deep . And God said Let there be light, and there was light. —Bible, Genesis, I. 2. 3.

And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not. —Bible, St. John, I. 5.

অন্ধকার হইতেই দিন তাহার শক্তির উৎস সংগ্রহ করিয়া প্রভাতের আলোকে নূতন বেশে দেখা দেয় ; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই চিরন্তন রহস্য চলিয়া আসিতেছে। “আঁধারের আলোক-ভাণ্ডার” দিনেব খাণ্ড জোগাইতে কখনো পরাশ্রয় হয় না ; কারণ, একের অভাবে অচাটি অসম্পূর্ণ—ইহারা পরস্পর পবস্পরের পরিপূরক। তুলনীয়—

.....শুনিলাম নক্ষত্রের রক্তে রক্তে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; ঘেঁষিলাম শূন্য-মাঝে
আঁধারের আলোক-বাগ্নিগা। —পূরবী, সমুদ্র।

প্রকৃতির এই অন্ধকারের লীলাব সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। অন্ধকার যেমন দিনকে প্রাণ-শক্তিতে সজীবিত করে, তেমনি কবিকেও প্রাণ-শক্তিতে উদ্ভুদ্ধ করিয়া তুলে। তুলনীয়—কল্পনায় বাহি।

কবি অন্ধকারকে বলিতেছেন নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার। কবি শৈলীও অন্ধকারকে সুন্দর ভীষণ দেখিয়াছেন—

Thou wovest dreams of joy and fear
Which make thee terrible and dear.
—Shelley, *To Night*.

উদয়াচলের পশ্চাতে এবং অস্তাচলের পশ্চাতে অন্ধকারের অবিচ্ছিন্ন আসন বিছানো রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে প্রভাতালোকের জন্ম হয়, যেন গুহ্র শব্দের মঙ্গলধ্বনি জগৎকে জাগ্রৎ করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই আলোক মাহুঘের জন্ম মাত্র চক্ষু প্রতিভাও হয় এবং তাহার সমস্ত চিন্তা ভাবনা কামনার উপর প্রভা বিস্তার করিয়া তাহার কর্মষণা জাগ্রৎ করে।

প্রকাশের পূর্ববর্তী ধ্যানের নিশ্চক্ৰতা কবির চিত্তকে অশেষের পথে তীর্থযাত্রা করাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

কবি সুদীর্ঘ জীবনের অবসানে ক্লান্তি অপনোদনের জন্ত সেই অন্ধকারের দ্বারে আসিয়া বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছেন, নব উত্তমে আবার কর্মে সৃষ্টিতে

ঐবৃত্ত হইতে পারিবেন বলিয়া,—যেমন করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত রবি অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তরুণ অরুণ রূপে প্রভাতে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

দিনের আলোকের আন্মোদনে চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; তখন জীবনের উদ্দেশ্যের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। এখন অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বিশেষ গূঢ়তার মধ্যে অবগাহন করিয়া, আলোকের প্রকাশ-সম্ভাবনার স্রাব নিজের সমস্ত সৃষ্টি-সম্ভাবনা কবি জানিয়া লইতে চাহিতেছেন—তিনিও পুনর্বার তারুণ্য লাভ করিয়া নির্মলা প্রশান্তি লাভ করিবেন।

কবি জীবনে অনেক ধ্যান্তি প্রশংসা পাইয়াছেন; সে-সকল তাঁহার জীবন-শেষে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অসীম অন্ধকার অনন্তের যোগা উপহার নহে।

দিনের আলোকে কাজের ভিড়ে ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যার মাঝে ভেদ রেখা টানা যায় না। বেলা-শেষে কার্য-অন্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন মৌন মুহূর্ত্তগুলিতে যখন সকল কাজের স্বরূপ জানা যায়, তখন কবি দেখেন যে, দিবসের চাঞ্চল্যের মধ্যে যাহাকে ঝাঁটি বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা মেকি মাত্র। কিন্তু তাহাতেও কবি ক্ষুণ্ণ নহেন; কবি অনায়াসে বলিতেছেন—‘সে বোঝা ফেলিয়া দাব পিছে।’ যশ মান গর্ব ইত্যাদি বহু মিথ্যা সত্যের ছন্নবেশে কবিকে ভুলাইবার ক্ষমতা আসে; কিন্তু অন্ধকারের কষ্টিপাথরে—অনন্ত কালের পরীক্ষায় তাহাদের স্বরূপ ধরা পড়িয়া যায়; তাহারা যে চিরন্তন নহে, তাহারা যে অল্পপ্রাণ, তাহা ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু সেই-সব মেকি জিনিস ছাড়াও কবির এমন কিছু সঞ্চয় আছে যাহা চিরন্তন সত্য অগ্নান অমূল্য—তাঁহার যাত্রা-সহচরী কবি-প্রতিভা, অকারণে কেবল ভালোবাসার টানে তাঁহার হাতে যে ভালোবাসার দান দিয়াছিল, তাহা তো এই জীবনান্ত-কাল পর্যন্ত অগ্নান বিরাজে—সেই কবিত্ব-শক্তি মাধবী-মঞ্জরীর মতো তাঁহার চিত্ত-কুঞ্জে আজও অগ্নান বিরাজে—তাহা অতি পুরাতন হইলেও, তাহা যেন সজোজাত তাজা রহিয়াছে,—প্রভাতের শিশিরসিক্ত সরসতা যেন এখনো তাহার গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। কবির ইহজন্মের সেই অকারণে পাওয়া সুন্দর দান চিরন্তন অন্ধকারের খালায় তিনি রাখিয়া যাইবেন, এবং তাহা সমস্ত অক্ষয় নক্ষত্রলোকের মাঝে নক্ষত্রের স্রাবই অক্ষয় উজ্জ্বল হইয়া দীপ্যমান থাকিবে।

অন্ধকার পরিবর্তন-রহিত একটানা, তাই সে নিত্য নবীন। অন্ধকারের স্রাব ধ্যানগততা হইতে কবির স্রবের গানের কল্পনার কবিদের ফুল আলোকে

প্রকাশের জ্ঞাত কবে কোন দিন যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহার তো কোনো নির্ণয় নাই। কবি একদিন জীবনের মধ্যে সচেতন হইয়া দেখিলেন যে, তিনি কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া কবি হইয়া গিয়াছেন। সেই প্রাণের কবিত্বকে এবং সত্যকে কবি কখনও প্রকাশের মোহে, প্রশংসার লোভে হান হইতে দেন নাই; তিনি সেই অগ্নান উপহার আনিয়া চিরস্থানকে সম্প্রদান করিতেছেন।

কবি বলিতেছেন যে অন্ধকারই হইল সমস্ত সৃষ্টির ভাণ্ডার, সকল বস্তুর চরম পরিণতি তাহারই মধ্যে—কবির কবিত্ব-শক্তিরও জন্ম মৌনতার ধ্যানের অন্ধকারে। তুলনীয়—“কল্পনায়” ‘রাত্রি’ কবিতা। কবির কবিত্বের মধ্যে যে কতখানি অন্ধকার ধ্যান-সুকৃত্যের প্রভাব ও আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তো কবি এত দিন প্রকাশের আগ্রহে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু কবি আজ উপলব্ধি করিতেছেন যে—অন্ধকার অবসান নহে, তাহা একটা নূতন আরম্ভের সূচনা, এবং সমস্ত আরম্ভের চরম আধার। কবির প্রাণের খাণ্ড ও রস জোগায় অন্ধকার তাহার মৌনতার ডুবাইয়া এবং একাগ্রতা জাগ্রত করিয়া। সেই জ্ঞাত অন্ধকারের সঙ্গে কবির প্রাণের সম্বন্ধ অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ—কবিত্বের সঙ্গে মৌনতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; কবিত্ব দিনের আলো কালের ভিড় সহিতে পারে না।

বসন্তের দান

কবির যে-সমস্ত পুরাতন রচনা পূর্বের কোনো বইয়ে স্থান পায় নাই, তাহা এই পুস্তকের পরিশেষে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই পরিশিষ্ট বিভাগের নাম রাখা হইয়াছে ‘সঞ্চিতা’।

বসন্তের দান কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কবি প্রিয়নাথ সেনকে সঙ্গোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ সেন “প্রদীপ” পত্রে একটি সনেট লিখিয়াছিলেন তাহার প্রথম লাইন ছিল—

“অচির বসন্ত হায়, এল, গেল চ’লে।”

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম লাইনটি দিয়া নিজের সনেট আরম্ভ করিয়া কবি-বন্ধুকে প্রণয় করিয়াছেন—

“এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয়?”

শিবাজী উৎসব

১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সখারাম গনেশ দেউস্কর নামক মহারাষ্ট্রী-বাঙালীর উদ্বোধনে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব-উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ “শিবাজী-উৎসব” কবিতা রচনা করেন এবং তাহা “শিবাজীর দীক্ষা” নামক পুস্তিকায় ও “বঙ্গদর্শনে” ছাপা হয়। এই কবিতায় দেশের বীরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে।

নমস্কার

“নমস্কার” কবিতাটি অরবিন্দ ঘোষকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। দেশের হৃদয়ে প্রেস আইনের কঠোর শাস্তির ভয়ে বখন দেশে অপর সকল লোকের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, তখন অরবিন্দ ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নিভীকভাবে দেশের অভাব অভিযোগ মর্মবেদনা ও ছায়ামস্ত দাবী প্রচার করেন এবং প্রবল রাজপুরুষের সকল প্রকার অত্যাচার তীব্র প্রতিবাদ করেন ইহাতে অরবিন্দকে অভিযুক্ত হইতে হয়। অরবিন্দের সেই নিভীক তেজস্বিতার মুদ্র হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার

বাণী-মূর্তি তুমি।

এই কবিতাটি ৭ই ভাদ্র ১৩১৪, ২৪ আগস্ট ১৯০৭ তারিখে রচিত হয় ও ১৩১৪ ভাদ্র মাসে “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হয়।

নটীর পূজা

ইহা নাটিকা। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসের “মাসিক-বঙ্গমতী” পত্রিকায় সম্পূর্ণ একেবারে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

মগধের মহারাজ অজাতশত্রুর সময়ের বৌদ্ধকাহিনী—কিছু কাল্পনিক, কিছু ঐতিহাসিক। মহারাজ বিশ্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। মহারাজী লোকেশ্বরীও সেই ধর্মের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম মহারাজ বিশ্বিসারকে নির্লোভ ক্ষমাশীল বিষয়-বাসনায় উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। তাই যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু পিতার রাজ্যের প্রতি লোলুপ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় পুত্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া, রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া অগ্ন্যত্র রাজ্যের একান্তে বাস করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজী লোকেশ্বরীর পুত্র চিত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইয়া রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, পিতা-মাতার প্রদত্ত নাম পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া কুশললীল নাম গ্ৰহণ করিয়াছেন। মহারাজী লোকেশ্বরী রাজকুলবধু; তাঁহার যে দেবতার ভক্তি তাহা ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত। পতিপুত্রের বঞ্চিতা হইয়া বুদ্ধদেবের ধর্মের উপর বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন বাহিরে; কিন্তু মন হইতে বুদ্ধদেবের প্রভাব কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি বলিলেন—ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক; বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধু, তাকে কেউ পরাস্ত কর্তে পারবে না। লোকেশ্বরী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হইয়া উঠিলেন।

অজাতশত্রু রাজা হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্ত বুদ্ধদেবের প্রতিস্পন্দী দেবদত্তকে গুরু স্বীকার করিয়া দেবদত্তের কাছে দীক্ষা লইয়াছেন এবং মহারাজ বিশ্বিসার রাজ্যোচ্চানের অশোকতরুতলে যে বৈদিকায় প্রভু বুদ্ধকে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, দেবদত্তের পরোচনায় সেই আসন ভগ্ন করিয়াছেন। মহারাজী লোকেশ্বরীও পরমকারুণিক বুদ্ধদেবের নামের বদলে মন্য গ্রহণ করিয়াছেন নমো বজ্রকোণ্ডাকিণ্ঠে, নমঃ ত্রীবজ্র-মহাকালায়, নমঃ শিনাকহস্তায়। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া

ভাসিয়া উঠে—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সত্যায় মহত্তমায়। মহাবাক্ষ
অজ্ঞাতশত্রু কিন্তু বৌদ্ধ ও দেবদত্তের শিষ্যদের উভয় দলকেই সন্তুষ্ট রাখিবার
অসাধ্য-সাধনে ব্যস্ত—“উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সম্মুখ
সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হ’য়ে যায়, অমনি উনি দেবদত্ত
শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আবেগ বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে ঢুই দিব
থেকেই নিবাপদ কব্বে চান।” যেমন চাছেন আমাদের দেশের বর্তমান
গভর্নমেন্ট হিন্দু-মুসলমান উভয় দলকে হাতে রাখিয়া নিজের কার্যক্রম
কবিতো। কিন্তু মহাবাক্ষী লোকেশ্বরী অজ্ঞাতশত্রুর এই দ্বিধাভাব। মিথ্যাচার
সহ করিতে পাবেন না; তিনি বলেন—“আমার ভাগ্য একেবারে নিবাপদ
আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় কববার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।”
ইহা তো প্রভু বুদ্ধদেবেরই মহাধর্মের মূল কথা, লোকেশ্বরীর জীবনে বুদ্ধদেব
শিক্ষার বিজয়ের পরিচায়ক, যাহাব কোথাও কিছু আসক্তি নাই সেহ
সত্যকে স্বীকার কবিতো পাবে।

রাজবাড়ীর মধ্যে যখন এইরূপ দুই বিবদ্ধ ভাবের চন্দ্র চলিতেছে, তখন
সেখানে আছে এমন একজন যাহাব বুদ্ধদেবের প্রতি অবিচলিত ভক্তি—স
রাজবাড়ীর নটী শ্রীমতী। শ্রীমতীর অবিচলিত নিষ্ঠা দেখিয়া রাজাব শঃ
পরিচয় কহে বা তাহাকে বিদ্রূপ করে, কহে বা তাহাকে ভয় করে, কহে বা
তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। আর শ্রীমতীর পার্শ্বে আসিয়া নটীরাছে, ১ ম
বাঁলকা মালতী—যাহার ভাই ও প্রেমাম্পদ বাগদত্ত স্বামী ভ্রম্য ১৩য়
তাহাকে এতদিনে নিঃস্ব অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছে। সে তথাপি বুদ্ধদেবের
প্রতি ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধা হৃদয়ে লভয়া শ্রীমতীর কাছে আসিয়াছে
জীবনে সান্তনা পাইবার আশায়, এবং বা হবে সে দেখা দিতেছে যে সে শ্রীমতীর
কাছে নাচ শিখিতে আসিয়াছে, “সঙ্গী উৎপলপর্ণাব কাছে তো সে শ্রীমতীর
চরিত্রমাহাত্ম্য শুনিয়াছে।

শ্রীমতীর বর্মানিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে সব চেষ্টায় উপহাস করে বাজমহিষ
রত্নাবলী। সে বিদ্রূপ কবিয়া বলিল—“অপেক্ষা করাছ উদ্ধারের মর্শ্বন
মনকে নির্মল ক’রে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু ক’রে
এগোচ্ছি।” ইহা শুনিয়া মহারাক্ষী লোকেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন—“এই নটীর
শিষ্যা। শেষকালে তাই ঘটবে, সেই ধর্মই এসেছে। পরিতাপ আসবে
পরিজ্ঞানের উপদেশ নিয়ে।” বাস্তবিক ভাবে সেই ধর্মই আসিয়াছে,—যাহার

পতিতা তাহারা প্রভু বৃদ্ধের পুণ্য প্রভাবে পবিত্রাণ পাইয়া ধন্য হইয়াছে, তাহাবাই তো ভালো করিয়া দিতে পারিবে পাবনাগের উপদেশ। বৃদ্ধদেবের পুণ্য-প্রভাবে পতিতা অসুখপালী ও নষ্টা শ্রীমতী গাঙ্গ সাধনা হইয়াছেন, নাপিত উপালি, গোয়ালী সুনন্দ, পুঙ্গু সুনীত আজ সাধু হবার হইয়াছেন।

মহারাজ অশ্বত্থক রাজবাড়ীতে বৃদ্ধপূজা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ভিক্টোরী উৎপলপনা শ্রীমতীর উপর ভার দিয়া গেলেন সেই পূজা করিবার, এবং তিনি নিজের গেলেন নগরে পূজা করিতে। দেবনন্দের প্রাণ্যবা উৎপলপনাকে হত্যা করিল। শ্রীমতা বাজাধিপতির বাসিন্দাদের নিষেধ না মানিয়া যে অশোকতরু-মূলে প্রতি বৃদ্ধ একদিন বাসিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে পূজা করিবার জগু প্রস্থত হইল। রাজমহিমা বজ্রাবলী নটকে এবং দ্বাদশবৎসর একসঙ্গে যশমান করিবার জগু বাজাধিপতি রাজা অনাভ্যন্তরীণ নটকে প্রদান করিবার সম্মুখে, তা কবিত্ত হইবে। শ্রীমতী রাজত্বের সম্মুখ হইবে।

[illegible]

কাজেই রত্নাবলীর খুব গাভাতাড়ি—“এনি ত্রিমতীকে পূজাবেনাৰ সঙ্গধে
নাচাইয়া বুদ্ধদেবের অপমান কবিয়া ছাড়িবেন—“ও যথানে পূজাবিলী হ'য়ে
পূজা কবতে যাচ্ছিল, যেখানেই ওকে নটী হ'বে নাচ'তে হবে।”

শ্রীমতী নটীর বেশ ও প্রচুব অলঙ্কার পরিধান কবিতা নাচিতে আসিল।
বক্সীরা ও কিস্করীরা পর্যন্ত তাকে দ্বিধা দিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমতী
শাশ্বত সমাহিত হইয়া আসিয়া নৃত্য আরম্ভ কবিল নটীর সেই নৃত্য হইয়া

উঠিল নতি, এবং তাহার গান হইয়া উঠিল বন্দনা। নটী নৃত্য করিতে করিতে তাহার সমস্ত বসন ভূষণ খুলিয়া খুলিয়া বেদীমূলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল— তাহার নটাবেশের নীচে হইতে বাহির হইল ভিক্ষুণীর কাষায়বস্ত্র। রক্ষিণীরা তাহাকে এই পূজা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনেক অহুরোধ করিল। কিন্তু রত্নাবলী রক্ষিণীদিগকে উৎসনা করিয়া বলিল—“রাজার আদেশ পালন করো।” রক্ষিণী শ্রীমতীকে অগ্ন্যবাত করিল। শ্রীমতী আহত হইয়া পড়িয়া গেল। রক্ষিণীরা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারানী লোকেধরী শ্রীমতীকে কোলে লইয়া বসিলেন এবং শ্রীমতীর ভিক্ষুণীর বস্ত্র মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন—“নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।”

এ দিকে মহারাজ অজ্ঞাতশত্রু অহুতপুচিতে বৃদ্ধদেবের করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত ভগবানের পূজা লইয়া কানন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তিনি শ্রীমতীর হত্যার সংবাদ শুনিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, তিনি ফিরিয়া গেলেন। নটী প্রাণ দিয়া, মান দিয়া ভগবান বৃদ্ধদেবের পূজা সমাধা করিয়া গেল। নটীর পূজা জয়যুক্ত হইল।

ঋতু-উৎসব ও ঋতু-রঙ্গ

ঋতু-উৎসব প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ঋতু-রঙ্গ প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের মাসিক-বসুমতী পত্রিকায়। দুইখানিই ষড়ঋতুর সৌন্দর্যের বন্দনা। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পূজারী কবি ঋতু-পর্যায়ের মনের মধ্যে যে আনন্দ হিল্লোল অনুভব করেন তাহারই উল্লাস এই দুইখানি বই।

ঋতু-উৎসবের মধ্যে আছে—১। শেষ-বর্ষণ, ২। শারদোৎসব, ৩। বসন্ত, ৪। সুন্দর, ৫। ফাল্গুনী। বর্ষার শেষ হইতে বসন্তের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যে সৌন্দর্যের ও আনন্দের প্রাবন বহিয়া যায়, তাহারই পাচটি তরঙ্গ এই পুস্তকে ধরা পড়িয়াছে ঐশ্বর্যজালিক কবির মায়ায়।

কবির অনেক ঋতু-উৎসব-সদৃশ্য পুস্তকের মধ্যে একজন রাজা থাকেন এবং একজন কবি থাকেন। রাজা হইতেছেন বৈয়্যিক, আর কবি হইতেছেন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর উপাসক। কবির আনন্দের ছোঁয়াতে রাজা বিষয়কর্ম ভুলিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যপূজায় মাতেন, এমন কি অর্থসচিব পর্যন্ত টাকার খলির ভার ভুলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। ঋতু-উৎসবগুলির অন্তরের কথাই এই। প্রকৃতির সন্তিত মানব-মনের মিলনেই বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা লাভ করে।

দ্রষ্টব্য—শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা, ১৩৩৬ আশ্বিন। এই পুস্তকে শারদোৎসব-বাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রক্তকরবী

নাটক। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীর অতিরিক্তাংশ-রূপে সমগ্র ছাপা হয়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে।

কবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে যে, তাঁহার কবিতা ও নাটক অস্পষ্টতার দোষে দূষিত। সেই অভিযোগ এই নাটকখানির বিরুদ্ধে যত বিঘোষিত হইয়াছিল, এমন আর অন্য কোন নাটকের এবং ‘সোনার তরী’ ছাড়া অন্য কোন কবিতার বিরুদ্ধে হয় নাই বোধ হয়। কোনো কবির কোনো কাব্য বুঝিতে না পারিলে তাঁহাকে অপরাধী করার পূর্বে নিজের বোধশক্তিটাকে একবার যাচাই করিয়া লওয়া ভালো। বেদান্তদর্শন বা কান্ট-হেগেলের দর্শন অথবা বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মতবাদ সাধারণ লোকের জ্ঞাত যেমন নয়, কোনো কোনো কবির কাব্যও তেমনি সাধারণের সহজবোধ্য হইতে নাও পারে। এই জ্ঞাত দোষারোপকারীদের মনে রাখা উচিত—রসের সন্ধান না পাইয়া খেজুর-গাছের গলায় কলসীটাকে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিলে নিরর্থক বলিয়া মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়; কিন্তু কলসীটাই তো শেষ অর্থ নয়, তাহার অন্তরে যে রস সঞ্চিত আছে সেইটারই অর্থ যা-কিছু। রস না দেখিয়া লোকে কলসীর মানে খুঁজিয়া পায় না। এই নাটকেরও রসটুকুর সন্ধান পাইলে আর কোনো গোলমাল থাকে না। সেই রস হইতেছে নন্দিনী—তাহার নামেই আছে তাহার আসল পরিচয়।

এই নাটক লইয়া হৈচৈ হইয়াছিল বলিয়া বড় মনস্বী ব্যক্তি ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং যখন কবিকেই নিজের কাব্য ব্যাখ্যা করিতে একাধিকবার আসরে নামিতে হইয়াছে। কবি রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—

পরজন্ম সত্য হ'লে কি ঘটে মোর সেটা জানি,

আবার মোরে টানবে ধরে বাংলা দেশের এ রাজধানী।

আমার হয়তো কর্তৃত্ব হবে আমার লেখা সমালোচন।

আমার লেখার হবে আমি দ্বিতীয় এক ধূতলোচন। —কণিকা, কর্ণকল।

কিন্তু কবিকে আর পরজন্মের জ্ঞাত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় নাই; তাঁহাকে ইহজন্মেই সেই হৃত্যোগ ভুগিয়া লইতে হইয়াছে।

এই নাটকের বহু সমালোচনা বিচক্ষণ লোকে করিয়াছেন; সেই জন্ত আমি ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিয়া নিরন্ত হইব।

রাজা প্রজাদের শোষণ করিতেছে, তাহার লোভের খোরাক জোগাইবার জন্ত ধনির কুলীরা সোনা তুলিতেছে। কুলীরা মানুষ হইয়াও কাহারও সঙ্গে যেন তাহাদের মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নাই, তাহারা কেবল সোনা তুলিবার যন্ত্র-স্বরূপ, তাহাদের পরিচয় ৪৭ক, ১৬৯ফ মাত্র। ইহার দ্বারা জীবন পীড়িত হইতেছে, যন্ত্রবদ্ধতা (organisation) ও লোভে মনুষ্যত্ব ব্যথিত হইতেছে। জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতেছে প্রেম, এবং সুন্দর হইতেছে তাহার উপযুক্ত আবেষ্টন। পাথরে বাঁধা পাকা রাস্তার ভিতর দিয়াও ঘাস গজাইয়া উঠে—এইরূপে জীবন নিরন্তর জড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্রীলোকই হইতেছে জীবন, ত্রী, প্রেম, কল্যাণ, লক্ষ্মী। যে প্রয়োজন ধন-মান যশ-ক্ষমতার জন্ত নোহুপ, সে জীবন ত্রী প্রেম কল্যাণকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু নন্দিনী—সেই জীবন-ত্রী প্রেম-কল্যাণময়ী-লক্ষ্মী—লোভকে লোভ ভোলায়, পণ্ডিতকে তাহার পাতিতা ভোলায়। যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা যান্ত্রিকতাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারাই প্রয়োজনের আবর্জনা, যান্ত্রিক যন্ত্রণা জয় করিতে হয়। যে নারী সম্পূর্ণতার আদর্শকে পরিবর্তিত করিতেছে, সে সকলের মধ্যকার স্তম্ভ প্রাণকে জাগ্রত করে, প্রকাশ করে।

উৎসাহী যেমন চিরন্তনী নারী, নারীত্ব,—নন্দিনী তেমনি আনন্দ-লহরীর প্রতিমূর্তি, সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। সে কিশোরকে মুগ্ধ করে, পণ্ডিতকে হুলায়, সকলকে চঞ্চল করে। রাজা যেমন করিয়া সোনা সংগ্রহ করিয়াছে, শক্তি লাভ করিয়াছে, তেমনি করিয়া সে নন্দিনীকেও পাইতে চায়—সে জানে কেবল মাত্র কাড়িয়া লওয়ার পাওয়া, হাতে স্পর্শ-দ্বারা অসুভবনীয়, tangible—কিছু পাওয়া। কিন্তু নন্দিনীকে সে কিছুতেই তেমন করিয়া পাইতেছে না। ইহাতে রাজার মনের ভিত্তেও নাড়া লাগিয়াছে। মোড়লকেও নন্দিনী বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু মোড়লের প্রেম উৎপথগামী (perverse)—সে বাহাকে ভালোবাসে তাহার বিরুদ্ধতা করে, সেই বিরোধিতার মধ্য দিয়াই তাহার ভালো-লাগা প্রকাশ পায়। নন্দিনী কেনারামকেও প্রেম দিয়া কিনিয়াছে—কেনারামও বিচলিত হইয়াছে। যে নন্দিনী রাজার দরজায় থাকা লাগাইতেছে, সেই সকলের হৃদয়ের দ্বারে থাকা দিতেছে। অবশেষে জীবন হইতেছে জরী মৃত্যুর মধ্যে নিজের চরম ও পরম বলিদানের দ্বারা।

জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও প্রকাশ হইতেছে প্রেম, জীবনের শ্রেষ্ঠ অমৃতস্বাদী হইতেছে প্রেম—জীবনের সঙ্গে প্রেমের পরিপূর্ণ সঙ্গতি। হিংসায় ও লোভে প্রেম ও জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সঙ্গতি নষ্ট হয়,—রক্তন ও নন্দিনীও মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। জীবন তাই নিরন্তর প্রেমকে সন্ধান করিয়া ফিবে এবং যত চায় প্রেমকে বিনাশ করিতে।

বিসর্জন নাটকে যেমন দেখানো হইয়াছে প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইতে, (প্রেমরূপিনী অপর্ণা যেমন জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্ররোচনা দিয়া ডাক দিয়াছিল), তেমনি নন্দিনীও জালের পিছনে আবছায়া রাজাকে ডাক দিয়া বলিয়াছিল—বাহিবে চলিয়া আইস বন্ধুতাব মধ্য হইতে।

রক্তকরবীর আরম্ভ লোককে আনন্দে ভুলাইয়া। যেমন কোন গাছের বন্ধ অবস্থায় থাকে, তবে যেদিকে ঠাক পায় সেদিকে আলোকের জ্যোতির্ভাষা পড়ে, তেমনি লোকেরা নিজেদের নানা বন্ধ অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, নন্দিনীকে দেখিয়াই সকলে বাঁচিবার জ্যোতির্ভাষা দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। নন্দিনী যে ক্রমাগত ডাকিতেছে—এস; এস আমার দিকে, আমি তোমাদের মুক্তি দিব। এই যে ডাক, ইহা তো প্রাণের ও প্রেমের ডাক। কারণেই ভাবিল কি না তাহা বড় লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য এই যে জীবন ও শ্রী অপবকে চাপ দিয়াছে বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে।

চতুরঙ্গের দামিনীও ক্রমাগত এই কথা বলিয়াছে—সেও এই বন্ধ প্রাণের ও প্রেমের প্রতিমূর্তি। গুরুর কাছে সবাই লুটাইতেছে, কিন্তু সে গুরুকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করিতেছে দামিনী। (concrete পাণ ও শ্রী তাহা বদাবী লইয়া শচীশ বা বিদ্রীকে চাতিতেছে। বাদ্য দিতে দিতে এতদিন বাধা ভাঙিয়া গেল।

কবির কথা সন্ন্যাসীর কথার একেবারে উল্টা। সন্ন্যাসী বলেন—কামিনী কাক্ষন ত্যাগ করো। আর কবি বলেন—কামিনী না হইলে তোমাদের ভাবময়তা (abstraction)—রূপ-মোহের তম হইতে কে বাঁচাইবে? কাক্ষন ত্যাগ্য, কারণ তাহা মানুষের সৃষ্টি, তাহা বন্ধন; কিন্তু কামিনী অত্যাগ্য, কারণ সে ভগবানের সৃষ্টি, সে কেবল ভাব হইতে, অবাস্তবতা হইতে মুক্তি দেয়। কাক্ষন মানুষের নিজের হাতের গড়া শিকল; কিন্তু কামিনী—ভগবানের দেওয়া মুক্তির দূতী—প্রাণে প্রেমের রসে বিচিত্র।

রক্তকরবী রূপক-নাট্য বা সমভাসুলক নাট্য নহে, ইহা গীতিনাট্য—
Dramatic Lyric। ইহাতে সামাজিক সমস্যার উপরে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর
অধিষ্ঠান হইয়াছে—যেমন পটের উপরে চিত্র তাহাতে চিত্রটাই প্রধান হয়,
পট নয়।

দ্রষ্টব্য—বাঁয়ী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৭-৩১ পৃষ্ঠা। রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী,
১৩৩২ বৈশাখ, ২২ পৃষ্ঠা। রক্তকরবীর মমকথা—ভোলানাথ সেনগুপ্ত। রক্তকরবীর তিনজন
—অন্নদাশঙ্কর রায়, বিচিত্রা, ১৩৩৪ ভাদ্র, ৩৪৯ পৃষ্ঠা। রক্তকরবী—নবেন্দু বসু, বিচিত্রা, ১৩৩৫
শ্রাব্দ, ১১১ পৃষ্ঠা। রক্তকরবী—মানসী ও মমবাণী, ১৩৩১ চৈত্র, ১৯৭ পৃষ্ঠা। রক্তকরবী—
শিশিরকুমার মৈত্র, উত্তরা, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ, ১৭১ পৃষ্ঠা। রক্তকরবী—ক্ষেত্রলাল দাস,
ভারতবর্ষ, ১৩৩৩ আষাঢ়, ভাদ্র, ১৩১৫ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ।

Red Oleanders—Jaygopal Banerjee, Calcutta Review, 1925 October,
November ; 1920 February.

লেখন

বই লেখা সমাপ্ত হয় ২৫এ কার্তিক, ১৩৩৩ সালে—৭ই নভেম্বর ১৯২৬। বইখানি মাত্র ৩৩ পৃষ্ঠার। সমস্ত কবিতা কবির নিজের হাতের লেখায় অস্ট্রিয়ার বৃডাপেন্স্ট ছাপা। ইহাতে কবি নিজের হাতে লেখা ছোট ছোট কতকগুলি কবিতা আছে; এই কবিতাগুলি কণিকা জাতীয়। এই লেখন-গুলির রচনা আরম্ভ হয় চীনে জাপানে—পাখায়, কাগজে, রুমালে কবিকে কিছু লিখিয়া দিবার জ্ঞাত লোকের অগ্রবোধ হইতে ইহাদেব উৎপত্তি। তাহার পরে দেশে ফিরিয়াও লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের খাতায় কবিকে এই বকম লেখা অনেক লিখিতে হইয়াছে। এমনি কবিতা অনেক টুকরা লেখা জমিয়া উঠে। এই কবিতাগুলির মনো কণিকার কবিতার চেয়ে কবিত্ব আছে বেশি এবং তত্ত্ব আছে কম। এই কবিতাগুলির কবিত্ব ৩ তত্ত্ব ছাড়াও মূল্য হইতেছে, কবির নিজের হাতের লেখায় তাঁতার ব্যক্তিগত পরিচয়। ছাপার অক্ষরে কবিতার যে ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হইয়া যায়, কবির হাতেব লেখায় ছাপা হওয়াতে সেই সংস্রবটি রক্ষিত হইয়াছে—কবির স্বেচ্ছামনস্কতার যে-সব ভুলত্রুটি ষটীতে অথবা মতি পরিবর্তনে পদ-পরিবর্তন কবিতাতে যে-সব কাটাকুট কবি করিয়াছেন সেই-সমস্ত সূক্ষ্ম ছাপা হওয়াতে ইহার মধ্যে কবি-মনের পরিচয় অধিক পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ইংবেজী অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের হস্তাক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এই বই বিদেশে ছাপা হওয়াতে এদেশে চর্চিত হইয়াছে। কতকগুলি কবিতা কলিকাতার বই প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসের বিচিত্রা পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। অতএব এদেশে এই বইয়ের প্রকাশের তারিখ উহার পরে।

এই বইয়ের উৎপত্তি এবং বিষয়বস্তুর পরিচয় কবি স্বয়ং দিয়াছেন ১৩৩৭ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসী পত্রের ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায়। কবি লিখিয়াছেন—

“যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলাম, প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষর লিপির দাবী মেটাতে হ’ত কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে।……রু চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহ্যিক-বজ্রিত রূপ প্রকাশ পেত, তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক মন্থর আরো বেশি আশ্রয় পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়

বড় কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস ব'লেই কবিতার আয়তন কম হ'লেই তাকে কবিতা ব'লে উপলব্ধি কর্তে আমাদের বাধে।.....জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা নেই। ছোটের মধ্যে বড়কে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত্ আর্টিস্ট—সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাশে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই কর্তে পারে না।.....এই-রকম ছোট ছোট লেখার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধ-নিরপেক্ষ হ'য়েও পাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্তে বিনয় ক'রে বলেছি—

আমার লিগন ফুটে পথ ধারে

ক্ষণিক কালের ফুলে,

চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে

চকিতে চলিতে তুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দ্বায় নয়, চলতে চলতে দেখারই দ্বায়। যে স্মি নিসটা বহরে বড় নয়' তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি শ্রেষ্ঠতম তবে সেটো কল দেখে গুণি হ'লেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়া-ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও মনে পড়ে।

ছোট লেখাকে যারা সাহিত্য-হিসাবে তদারক করেন তারা কবির স্বাক্ষর-হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেনও পারেন।.....ইংরেজি বাংলা এই ছুটুকো লেখাগুলি লিখিবদ্ধ করতে বসকুম।.....

কবি এই ক্ষুদ্র কবিতাকণিকাগুলির নাম দিয়াছেন কবিতিকা।

এই রকম কবিতায় ছোটের মধ্যে একটি ভাব সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে এবং কবি নিজের মনকে সংযত করিয়া তাতাকে বড় করিবার চেষ্টা করিয়া ছোট করেন না বলিয়াই ইহারা প্রশংসার যোগ্য। ইহারা অল্পক কবি-মনের সংযমের ও আটটিক বৃদ্ধির পরিচায়ক। এই রকম অনেক লেখাই একেবারে নিরাভরণ বলিয়াই ইহার ভিতরকার সৌন্দর্য ও রস সুপরিষ্কট হইয়া প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায়। কবির নিজের কথাতোই ইহাদের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়—

কন্দকলি কুন্ত বসি' নাই দুঃখ, নাই তার লাজ

পূর্ণতা অণুরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।

বসন্তের বাগ্মণানি আবরণে পড়িয়াছে বাধা,

সুন্দর হ'সিয়া বসে পকাশের সুন্দর এ বাধা।

মহুয়া

১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিধ পুস্তকের পাঠ-পরিচয় লিখিয়া বলিয়াছেন—

“মহুয়ার অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ঐচ্ছাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্ৰহ করিয়া বিবাহ-উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; সেই-সব কবিতাই এখন মহুয়া নামে বাহির হইতেছে। ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ‘শেখের কবিতা’ নামে উপলক্ষ্যের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সম্বন্ধে ছাপা হইল।”

এই কবিতাগুলির রচনা-সম্বন্ধে কবি স্বয়ং প্রশান্তবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই পুস্তকের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

“লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানতঃ প্রজ্ঞাপতির উদ্দেশ্যে—আর তাঁরই দালালী করেন যে ‘সেখতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব ‘মহুয়া’র কবিতাকে ষ্টিক আমার হালের কবিতা ব’লে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কাল-বিশেষের নয়, এটা আকস্মিক।.....

“আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাঠ। একটি হচ্ছে নিছক শীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিরেছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল। মহুয়ার ‘মারা’ নামক কবিতার প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক’রে রচনা করে নিজের ভিতরকার বর্ণের রঙে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এখনি ক’রে অন্তরের বাহিরের মিলনে চিত্তের নিকৃৎ-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নিমিত্ত হ’তে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সম্ভার নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের বানা ছন্দ, মানা ব্যঙ্গনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের এই মার্যালোকের কাব্য; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আরোহণ, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নৃতনের বাস্তবিক স্পর্শ নিশ্চয়ই আছে—নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না।

এই বইয়ের প্রথমে ও সব শেষে যে গুটিকয়েক কবিতা আছে, সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়—সম্মুখি স্বতঃ-উৎসব পর্যায়ের—মাল-পূর্ণিমায় অ'ধুতির স্রষ্টেই এদের রচনা হয়েছিল। কিন্তু নববঙ্গের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা। ব'টো নকীবের কাজে এদের এই প্র'স্তুত্ব আহ্বান করা হয়েছে।

কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সঙ্গতি আছে—মহুয়া বসন্তেরই অঙ্গুর অব ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উদ্ভাষনা।'

বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমন-সম্বন্ধে ৫টি কবিতা, আর বইয়ের শেষে 'বদায়-সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩১-১৩৩৪ সালের লেখা। ঐ সময়ের আর একটি মাত্র কবিতা 'সাগরিকা' এই বইয়ে স্থান পাইয়াছে। 'সুভাষোনা কবে কোন গান' কবিতাটি ১৩৩৫ সালের ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে লেখা।

চার-একটি কথা উল্লেখযোগ্য—এই পুস্তকের নাম-পত্রখানি কবির স্বহস্ত-অঙ্কিত

বৌদ্ধনাথের কাব্যে নবনারীর বৌবনাবেগে যৌন আকর্ষণের এবং 'মগ্ন'তাব কবিতা বেশি নাই, দাঙ্গা আছে তাহাতেও কবির প্রকৃতিগত স'ম ও মেহাতিরিক্ত মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সংমিশ্রিত হইয়া কবিতা গুলিকে কামনার রাজ্যের বাহিরে নতয়া গিয়াছে। এই মহুয়াব মধ্যে কতকগুলি কবিতা ঐরূপ ধর্মাক্রান্ত হইলেও, হতাতে গমন করেকটি কবিতা আছে, যাহাব মধ্যে নর-নারীর মানবীয় ভাব সুপরিষ্কার হইয়াছে, অথচ কোথাও কবির আচ'র্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফলিকাব মধ্যে যদিও কবি বাঁলয়াছিলেন—

৩ নিরুপমা

আজিকে ৯৮ ৫০ ফুট হতে পারে,

কান্ড ক্ষম।—

চাবনধ

২৭৭ কবির আচারেব ফুটি কোথাও ঘটে নাই—তাহার স্ততি মন প্রণয়ের কবিতাঃও কামনাবেগে কলুবত হইতে দেয় নাই। ইহাব মধ্যে প্রণয়েব একটা সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং রমণী কবির সৃষ্টিতে আর অবলা নহে, সে সবলা হইয়া পুর্বেব সতর্কিমণী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এই নরনারীর প্রণয় লীলাব মধ্যে কোথাও দৌনাত্ম্যর কাতরতা প্রকাশ পায় নাই, কোথাও হীন ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায় নাই।

উজ্জীবন

যিনি সন্ন্যাসী তিনি মনোভবকে ভস্ম করিয়া তাহাকে অপমানিত করেন।
কবি তাহার মোহন মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই অতনুকে উজ্জীবিত করিতেছেন।
মনসিজ হইতেছে সৃষ্টির প্রেরণা—নর-নারীর প্রেমের মূল। যাহা সৃষ্টিকর্তার
অনুশাসনে আবির্ভূত হয়, তাহাকে বিনাশ করিতে চাওয়াতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির
উদ্দেশ্যই পণ্ড করা হয়। সেই জ্ঞাত কবি অতনুকে ভস্ম-অপমানের শয্যা ছাড়িয়া
উজ্জীবিত হইতে আহ্বান করিতেছেন—কিন্তু তাহার মধো যাহা স্থূল ও ত্রীহীন
তাহাকে সেই ভস্মের অবশেষের মধো পরিহার করিয়া আসিতে অন্তরোধ
করিতেছেন। বীরের তনুতে এই অতনু যদি তনু লাভ করিতে পারে, তাহা
হইলে—

দ্রুমধে স্থখে বেধনায় বজুর যে-পথ,

সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

ইহাই হইতেছে সমগ্র কাব্যের অন্তরের বাণী। এই জ্ঞানই বীর প্রেমিক
তাহার প্রেমিকাকে বলিতেছে—

আমরা দুজন্য স্বর্গ খেলনা

গড়িব না ধরণীতে,

* * *

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে

ভিক্ষা না যেন যাচি।

কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়

তুমি আছ, আমি আছি। —নির্ভয়।

এবং সবলা নারীকে দিয়াও কবি বলাইরাছেন নূতনতর বাণী—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—

আমাদের প্রেমের বীর্ষে করো অশঙ্কিনী!

বীর-হস্তে বরমালা লব একদিন।

* * *

বিনম্র ধীনতা

সম্মানের যোগ্য নচে তায়,—

কেলে বেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার। --সবলা।

বীর প্রেমিক কামনা করেন এই রকম দয়িতা যাহাকে তিনি বলিতে পারিবেন—

সেবা-কক্ষে করি না আহ্বান।

শুনাও তাহারি জয়গান

যে বীর্ষ বাহিরে বার্ষ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাস্তিত,

চাটপুঙ্ক জনতার যে তপস্বী নির্মল লাহিত। --প্রতীক্ষা।

দম্পতীর জীবন কেবল সুখযাত্রা নহে, তাহাতে পদে পদে বিপদ বিঘ্ন আছে এবং তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া জয়ী হইয়া চলাই দাম্পত্য জীবনের চরম কথা। পরস্পরের সাহায্যে সকল সংঘাত হইতে পরস্পরকে বাঁচাইয়া অদৃষ্টের উপর জয়ী হইতে হইবে, নৃত্যের ভিতর হইতে অনৃত আহরণ করিয়া লইতে হইবে, এই শিক্ষা কবি প্রত্যেক কবিতাতেই দিয়াছেন। দম্পতীর বাসর-ঘর অক্ষয়; মাণ্য-বদনের হার ছিন্ন হইলেও বাসর-ঘরের ক্ষয় নাই, তাহা নব নব দম্পতীর আনন্দ-মিগনের মধ্যে নিত্য বর্তমান। সেই জন্ত কবি বাসর-ঘরকে সন্মোহন করিয়া বলিয়াছেন—

হে বাসর ঘর,

বিশেষ প্রেম দুঃখহীন, দুঃখিত অমর : --বাসর ঘর

পথের বাঁধন ও বিদায়

এই দুইটি কবিতা 'শেখের কবিতা' উপন্যাসের, মহয়া হইতে গৃহীত। মহয়ার কবিতাগুলি বিবাহ-ব্যাপার সঠিয়া লেখা, মর-নারীর প্রেমের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ। শেখের কবিতাও তাহাই। অমিত ও লাবণ্য অকস্মাৎ পরিচিত হইয়া দেখিল—উভয়েরই উভয়কে ভালো লাগে। কিন্তু সেই ভালো-লাগা তাহাদের পূর্ব প্রণয়িনী ও প্রণয়ীর দাবীর কাছে পরাজিত হইয়া তাহাদের আর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিল না। এই যে জীবন-পথে চলিতে চলিতে এক-একজনকে ভালো লাগে, আবার তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় তাহাও জীবনের পাথেয় হইয়া থাকে; এই ক্ষণ-পরিচয়ও জীবনকে গঠন করে, শোভা সৌন্দর্য দান করে, মহিমান্বিত করে। এই দৈনিক প্রেমের স্মৃতিকণাগুলি মহামূল্য রত্নকণিকারই তুল্য সমাদরে মনোভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত

হইয়া থাকে ; এমন কি স্থিতিতে না থাকিলেও তাহা মঘচেতনার অবগাহন করিয়া জীবনের জন্ত অমৃত আহরণ করিতে থাকে । মানুষ মাঝেই জীবনে একবার একজনকে ভালোবাসে, আবার সেই ভালোবাসা হ্রাস হইয়া আসে, সে আবার অপরের প্রতি অহুরক্ত হয় । কিন্তু সেই যে পূর্ব অহুরাগের মাধুর্য, জীবনের যে-কয়টি মুহূর্তকে সেই প্রেমের অমৃত-স্পর্শ মহিমান্বিত করিয়াছিল, তাহা তো চিরন্তন, তাহা সারা জীবনের সম্পদ । এই কথাই এই দুইটি কবিতার বলা হইয়াছে ।

তুলনীয়—শাজাহান (বলাকা), অনবসর (ক্ষণিকা) ।

নান্দী

নান্দী পর্যায়ের কবিতাগুলিতে নারীর চরিত্রের বিবিধ দিক ও বিচিত্রতা চিত্রিত হইয়াছে ।

সাগরিকা

এই কবিতাটি যবদ্বীপকে সম্বোধন করিয়া লেখা : একটি বিশেষ স্থানকে সুন্দরী রমণী কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি এমন মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ আর কোনো কবি কোথাও করিয়াছেন কি না জানি না ; এবং যবদ্বীপের সহিত ভারতের যে যোগ কালে কালে নানা রূপে ঘটিয়াছিল তাহার ইতিবৃত্তকে এমন সরস করিয়া প্রকাশ করাও অতুলনীয় ।

দ্বীপ সাগর-জলে স্নান করিয়া উঠিয়াছে, তাহার তট-রেখা উপবিষ্টা রমণীর পীতবাসের প্রান্তের মতো গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে ।

সেই দেশে ভারতের রাজারা প্রথমে দিগ্বিজয়ী বেশে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন । কিন্তু সেই রাজারা তাহাকে পদানত করেন নাই ; সেই দেশের যে ক্বাট্ট তাহার সহিত ভারতের সংস্কৃতি মিলাইয়া তাঁহারা নব-সভ্যতা গড়িয়া তুলিলেন, সেখানে এক নব-পদ্ধতির নৃত্যহীন ও স্থাপত্য-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইল । মনের সংশয় দূর হইল,—ভরদ্বার ক্রন্দ ধ্বজটির প্রেমের পরিচয় পাওয়াতে পার্বতী যেমন তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রশন্ন হস্ত-ধারা নিজের

প্রেম প্রকাশ করেন, সেইরূপ এই বিজিত দেশ বিজ্ঞতার প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহার পরাক্রমের মানি দূর হইল।

তাহার পরে কালে কালে ভারত হইতে গুণী জ্ঞানী শিল্পী বণিক সেই দেশে গিয়াছেন এবং সেই দেশকে নব নব সম্পদ দান করিয়াছেন। কত অস্ত্রদেশযাত্রী নাবিকের তরী ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এই উপকূলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, এবং তাহারা এই দেশে ভারতের কর্ণধার নিদর্শন দেখিয়া ভারতের সহিত তাহার যোগের পরিচয় পাইয়াছিল। তাহারা দেখিল—যবদ্বীপের নৃত্য, প্রসাধন করিবার ধরণ, গীত বাগ, সাহিত্য, সমস্তই ভারতের দান। সেই দেশের ধর্ম, দেবতা,—তাঁহাও ভারতের, ভারতের শৈব-ধর্ম সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধূর্জটি পার্বতী এবং শিব-শিবানীর উল্লেখ করিয়া কবি সেই দেশের ধর্মমতের আভাস দিয়াছেন।

অবশেষে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রতিনিধি-রূপে বহু শত বৎসর পরে সে দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সে দেশকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন—আমি ভারতের প্রতিনিধি আসিয়াছি, কিন্তু আমি বিজয়ী রাজা নহি, আমি কোন বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞা বিতরণ করিতেও আসি নাই। আমি কবি, কেবল বীণা আনিয়াছি, তোমায় গান শুনাইয়া আমার স্রীতি নিবেদন করিব। তথাপি আমি সেই পূর্বাগত ভারতবাসীদেরই একজন প্রতিনিধি, আমি সেই পূর্বের যোগত্বকেই শুধু আর-একটি গ্রন্থকন করিয়া দূর করিয়া দিতে আসিয়াছি।

এই কবিতাটির সঙ্গে বাত্রী পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায় 'ত্রিবিজয়-লক্ষী' কবিতাটি পাঠ করিলে উভয়েরই অর্থ সুস্পষ্ট হইতে পারে।

বনবাণী

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাস।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঞ্টা। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে তাঁহার কথার ইঞ্জলের মোহন মন্ত্র পড়িয়া পুনঃসৃষ্টি করিয়াছেন—বে-প্রকৃতিকে আমরা নিত্য নিরন্তর দেখিতেছি, তাহার সহিত আমাদের নূতন নিবিড় পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন যাহুকর কবি—যেমন চেনা মেঘকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন কবি কালিদাস। মরমিয়া কবি তাঁহার অন্তর্গত স্মৃতি লইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের ও রসের মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নব নব মাধুর্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পরিচয়ের ধারা ঐতিহাসিক কাল-পর্যায়ের ক্রমে যদি অনুসরণ করি, তাহা হইতে দেখিতে পাই—প্রথমতঃ কবি প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতার বাহিরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পরে অন্তর্ভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতির ভাবরাজ্যের ও অন্তরঙ্গজগতের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা লাভ করেন। শেষে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয়ের মাঝে কবি বিশ্বপ্রকৃতির এক নবীনতর পরিচয় ও অর্থ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই যদিও প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ, তথাপি প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্রধানতঃ মানবের কবি। মানবীয় স্বপ্ন-ছাং ও সৌন্দর্য-ঐন্দ্রিয় যেমন ভাবে তাঁহার কাব্যে বাণী পাইয়াছে, প্রকৃতি সেইরূপ পাশ নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্বকতা ঘেন মানবকে পাইয়াই—মানবহীন প্রকৃতি যেন কবির কাছে মাধুর্যহীন ও বার্থ (ভুলনীয় : ‘পোড়োবাড়ী’ কবিতা ‘ছবি ও গান’ কাব্যে)।

মানবের অন্তর্ভূতির মাঝেই প্রকৃতি সার্বক। তাই কবি প্রকৃতির মাঝে মানবীয় অন্তর্ভূতির ব্যঙ্গনা দিয়া প্রকৃতিকে অনুভব করেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন—“জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অপূর নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ।”—পঞ্চভূত। তাই সৌন্দর্যবিলাসী কবি মানবকে প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন—তিনি মানবকে প্রকৃতির আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রকৃতিকে ব্যক্তিগত দান করিয়া দেখিয়াছেন। মানব-বন্ধু কবি প্রকৃতিকে মানবীয়ভাবে অনুপ্রাণিত

করিয়া বৃষ্টিতে চাহিয়াছেন।—শীতের রৌদ্র কবির কাছে বন্ধুর আলিঙ্গনের মতো, বর্ষার আকাশ স্নানরীর জলভরা চোখ স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং নির্ঝর কেশ এলাইয়া ছোটে ; কবির মানস-স্নানরী কখনো মানবী, কখনো প্রকৃতিময়ী—‘কখনো বা ভাবময়, কখনো মূর্তি’ এবং ‘সহস্রের স্তম্ভে রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার হে বসুধে !’—বসুন্ধরা।

কেবল মাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নব নব রসময় সম্বন্ধ-বন্ধনের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৃজনশক্তির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্গীয় কবিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি ছিল জড়েরই বৈচিত্র্য মাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যথেষ্ট প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই—প্রকৃতির সহিত কবি চিন্তের কোনো আত্মীয়তা দৃষ্ট হয় না—বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ইন্দ্রিয়ের জগৎ কি কি উপভোগ্য জোয়ার তাহারই তালিকা মাত্র পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে সৃষ্টি দেখিয়া শ্রষ্টাকে মনে পড়িয়াছে—কিন্তু এই পর্যন্ত। মাইকেলের প্রাণের উপর প্রকৃতি কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে দুই-একটা সনেট ছাড়া তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকৃতি-বর্ণনা নাই। হেমচন্দ্রকে ও নবীনচন্দ্রকে বিশ্বপ্রকৃতি ভাবনার গুহ্য ধরাইয়া দিয়াছে মাত্র—তাই পদ্মের মৃণাল দেখিয়া হেমচন্দ্রের মনে পড়িয়াছে রাজার ও রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা, পদ্মা দেখিয়া নবীনচন্দ্রের মনে হইয়াছে, রাজা রাজবরুণের কীৰ্ত্তি-অকীৰ্ত্তির কথা, মেঘনা দেখিয়া মনে হইয়াছে মানব-জীবনের বাধা-বিঘ্ন ও স্বপ্ন-অস্বপ্নের কথা,—প্রকৃতির সহিত ইহাদের কোনো আত্মীয়তা দৃষ্ট হয় না। বিহারীলালেই আমরা প্রথম মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরের আদান-প্রদানের পরিচয় পাই—

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যোৎস্নার আলোক আদি কুটেছে অধরে।
সাধা সাধা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা খেলা তুলি ;
একাকী জাগিয়া চাষ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে। —শরৎকাল।

বিহারীলালের শিষ্য রবীন্দ্রনাথই মানুষের সহিত যুগযুগান্ত-বিস্তৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটিকে নানা ভাবে পুনর্বন্ধন করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বহুমুখ প্রভাবে

রবীন্দ্রচিন্তা গঠিত ; আবার রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে মানসদৃষ্টিতে রাসমণ্ডিত করিয়া নূতন রূপে গড়িয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ এই পুনর্গঠনেরই ইতিহাস।

কবি সন্ধ্যা সন্ধ্যাতের 'ছদয়ের অরণ্য-স্বাধারে' ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্যময় জীবনটিকে খুঁজিতেছেন—মাঝে মাঝে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন ; তাই সন্ধ্যা-সন্ধ্যাতে নৈরাশ্র আছে, অতৃপ্তি আছে, সঙ্কোচ আছে, শিশিরোজ্জ্বল প্রভাতের 'সেই হাসিরাশির মাঝারে আমি কেন থাকিতে না পাই ?' বলিয়া খেদ আছে। এখন

গাছ পাতা সরোবর গিরি নদী নিরন্তর

সকলের সন্তিত কবির প্রণয় জন্মিতেছে। কিন্তু—

তব মনে জাগে এই ভয়,—

আবার হারাতে পাছে হয় !

কবির এখন—

বসন্তের কুসুমের মলা,

মেঘের ছেলেপেলা

সারাদিন দেখিতে ভালো লাগে। প্রথম প্রণয়ের 'আকুলতার একটু বেগ' আছে, তাই এই সঙ্গীতগুলির নাম হইয়াছে আরক্তিম সন্ধ্যার সঙ্গীত।

কবির মিলন-ব্যাকুলতা প্রকৃতির অন্তর স্পর্শ করিল, —সেই কবিকে হৃৎকানি দিয়া তাহার অন্তঃপুরে ডাকিয়া গইল। অমনি 'নিম্নবৈর স্বপ্নভঙ্গ' হইল, কবির রসপিপাসু 'চতুঃপুত্র' অশ্রুগৃহা হইতে বাহির হইল। তাই পুনঃ সন্ধ্যাতে দেখি প্রকৃতির অন্তঃপুরের দিকে কবির যাত্রা—প্রভাত উৎসবের মধ্যে মেঘ বায়ু তাঁহাকে পথ দেখাইতেছে,—মেঘকে কবি আকাশ-পারাবারে হইয়া যাইতে বলিতেছেন, বায়ুকে বলিতেছেন তাঁহাকে দিগ দিগন্তে ছড়াইয়া 'মৃৎ, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার আগ্রহে তিনি মরণকে পন্থা আহ্বান করিতেছেন—

অঃশ্রুত জীব আমি

কণামাত্র চাই ছেড়ে

যেতে চাই চরাচরমণ।

কবির 'সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ', আর কবির মনে হইল—

কে যেন মোরে ধেঁতেছে চুমা—

কোলেতে তারি পড়েছি লুট'।

কবি এখন জগৎ-কূলের কীট। মরণহীন অনন্ত-জীবন মহাদেশ তাঁহার আবাসস্থল।

ইহার পরে ছবি ও গান। প্রকৃতির অন্তঃপুরে কবি প্রবেশ করিয়াছেন—
যেখানে প্রকৃতির

অমিয়-মাধুরী মাপি' চেয়ে আছে দুটি আঁপি। —শ্বেতময়ী।

প্রকৃতির মধ্যে মমতার আশ্বাদ পাইয়া কবি সেই মমতা আরো নিবিড়-
ভাবে পাইতে চাহিতেছেন; তাই কবি শ্বেতময়ী পল্লীপ্রকৃতির অঙ্গনে আসিয়া-
ছেন, যেখানে

একটি মেয়ে একেলা

দাঁতের বেল।

নষ্ট দ্বিগুণে চলেছে—

চারিদিকে সোনার ধান ফোটে। —একাকিনী।

তাহার পরে কবি প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাদুর্য্য দেখিতে পাইলেন—

ওই আঁতোরার পাড়ে সকলে দাড়িয়ে আছে,

হর মোর আপনার দোক,

ওরাও হানারি মতো তার গ্রেছে আছে রত,—

জুঁই চাপা বকুল অশোক —শ্বেতময়ী।

প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাদুর্য্য উপলব্ধি করিয়া কবি মানব-প্রকৃতির প্রতিও
লুপ্ত হইলেন—'কড়ি ও কোমল' স্তরে তাঁহার চিত্তবীণা বাজিয়া উঠিল—

মরিছে চাচি ন আম সুন্দর ভুবনে,

ম'নবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবি বলিয়াছেন—'প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার
বুদ্ধি মন স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে;'—জীবনস্মৃতি। প্রকৃতির
সহিত কবির তন্মাত্রাগত বা ইন্দ্রিয়ান্তঃপ্রাণ-গত পরিচয়ের এইখানেই শেষ।

প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয় হওয়ার ফলে কবি দেখিলেন—প্রকৃতি
কেবল আদরই করে না, শাসনও করে, প্রয়োজন হইলে পীড়নও করে।
কবি তাই প্রকৃতিকে 'নিষ্ঠুরা' বলিয়াছেন বুলি অতি-পরিচয়-গত অভিযানে।
প্রকৃতির 'কঠিন নিয়ম'কে তিনি তিরস্কার করিয়াছেন—'আমরা কাঁদিয়া মরি,

এ কেমন রীতি ?' কবি প্রকৃতির মধ্যে দেখিতেছেন—‘পাশাপাশি একটাই দয়া আছে, দয়া নাই।’—‘মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা।’ ‘মানসী’তে কবি প্রকৃতিকে জননী জ্ঞান করিয়াছেন বলিয়াই অভিমানে নির্ভর্য বলিয়াছেন—‘জীবন-মধ্যাহ্ন’ ও ‘অহল্যা’ কবিতায় প্রকৃতির মাতৃ হুটিয়াছে।

সোনার তরীতে কবি প্রকৃতি-মাতার স্নেহের ব্যাথাটুকুও লক্ষ্য করিয়াছেন—সে তো নির্ভর্য নয়, সে ‘অক্ষমা’, সে ‘দরিদ্রা’—মানবের অনন্ত ক্ষুধা ও অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিতে না পারিয়া সে ব্যথিত।—সে মৃতবৎসা জননী—‘যেতে নাহি দিব’ বলিয়া সে সজ্ঞানকে বুকে আঁকড়িয়া ধরে, ‘তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ’লে যায়।’ কঠিন নিয়ম-ধারার জন্ত একদিন যাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন—কঠিন নিয়ম প্রকৃতির নহে, সে নিয়ম বিশ্বস্রষ্টার ; সেই নিয়মের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া মাও কাঁদিতেছে, ছেলেও কাঁদিতেছে। তাই প্রকৃতির প্রতি দরদে কবির মন ভরিয়া উঠিয়াছে—‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতায় যেমন জননীত্বের আকৃতি ফুটিয়াছে, তেমনি ‘বহুস্ফরার’ সম্মানের ব্যাকুলতা ফুটিয়াছে।

কবি ইহার পরে কিছুকাল বিশ্ব-প্রকৃতির দিক্ হইতে মানব-প্রকৃতির দিকে কিরিয়াছেন ; তাহার পরে পুনরায় প্রকৃতিব দিকে যখন ‘ফিরিলেন, তখন প্রকৃতিকে দেখিলেন আব-এক চোখে—তখন প্রকৃতিতে আব মানবিকতা নাই, মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা মুখ দুঃখ তখন আব প্রকৃতিতে কবি আবোপ করিলেন না, তখন প্রকৃতিতে কবি দেখিলেন ঐশিকতা—humanity হইতে divinity-তে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি তখন উপসংসৃত হইয়াছে, অতীন্দ্রিয়-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে—প্রকৃতির স্থূল যবনিকা তখন স্বচ্ছ সূক্ষ্ম লুতা-জালে পরিণত হইয়াছে। সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া কবি দেখিলেন লীলা-ময়কে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য এখন কবির কাছে সেই লীলাময়েরই লীলা মাত্র। নৈবেদ্যেই কবি প্রথমে প্রকৃতিব মণ্ডো ঐশিকতা-বোধ অনুভব করিলেন, ‘খেয়া’তে তাহা স্পষ্টতর হইল। ‘প্রশান্ত আনন্দ-ঘন আকাশের তলে’ ‘মৃদু সম’ শিরায় শিরায় আতপ্ত প্রেমাবেশ লইয়া কবি ঘুরিতেছেন সেই লীলাময়কে লক্ষ্য করিবার জন্ত। যে ‘অরূপ-রতন’ আশা করিয়া কবি ‘রূপসাগরে ডুব’ দিয়াছিলেন এখন তাহার সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহার পরে ক্রমে গীতাঞ্জলি, গীতিমালা ও গীতালিতে কবির রসের কাব্যর সবই বিশ্বনাথের সঙ্গে অপরোক্ষভাবে ; বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গিত সম্বন্ধ এখন গৌণ।

বিশ্বপ্রকৃতি কখনো ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে দেয়াসিনী, কখনো দয়িতের সহিত মিলনের দৃষ্টি, কখনো অন্তঃপুর-পথ-পরিচারিকা প্রতিহারিণী, কখনো 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো বিশ্বনাথের সহচরী বিশ্বপ্রকৃতি কবির চক্ষে উপেক্ষিতা। প্রকৃতি কখনো ইঙ্গিতে লীলাময়কে দেখিয়াছে, কখনো সে কবিকে আঘাত করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছে, কখনো কবির পূজার অঘাস্তার জোগাইয়াছে, পূজার ডালি ভরিয়া দিয়াছে, মালা গাথিয়া দিয়াছে, বিশ্বনাথকে বহন করিয়া কখনো বা কবির দ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছে, কখনো বা গোপন করিয়া রাখিয়া কবির সহিত লুকাচুরি খেলিয়াছে, কখনো ভগবানকে বরণ করিয়া কবি মনোমন্দিরে তুলিয়াছে।

নেবেস্তেব স্তরে কবি যেমন বিশ্বনাথকে প্রকৃতির অতীত 'মহাবা' পৃথু বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, পববর্তী স্তবে বিশ্বনাথকে তেমন বিশ্বাসীও দাপ দেখেন না। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বনাথকে অভিন্নাত্মক রূপে দেখিয়াছেন, এখন লীলাময়া প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে বিরাজমান লীলাময়ের মহাবাজত্ব ও প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছে।

আবার কবির নিজেও সঙ্গেও প্রকৃতির অভিন্নাত্মকতা করনা কথাও তাহার পক্ষে সত্য হইয়াছে। লীলাময়ের সঙ্গে শুধু নিজেই মরুৎ উপলব্ধি করেন না, কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেও লীলাময়ের সেই প্রকার সম্পর্ক চন্দ্রকম করিতে পারিয়াছেন। আরও উচ্চ স্তরে কবি কেবল নিজের সঙ্গেই ভগবানের বস সম্পর্কের কথা নয়, মহামানবের সহিতও ভগবানের এই সম্পর্ক যে সহজ ও চিরস্থায়ী তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার বসবোধের চরম সাধকতা এই বিশ্ববোধে কবি মহামানবের সহিত নিজেরও অভিন্নাত্মকতা চন্দ্রকম করিতেছেন।

কবির ব্যক্তিত্ব ক্রমে আয়ত হইতে আয়ততর হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বমানবের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। এই কবি প্রত্যাশা করেন—
তাঁহার পরধ্বনি প্রত্যেক মানবেরই শোনা সম্ভব, তাই কবি ভাবেন তাঁহার মনে যিনি বিরাজ করেন 'যে ছিল মোর মনে মনে, সেই তিনিই 'শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে সবার দিগ্ধি' এড়াইয়া অভিসারে আসেন

বলাকায় এই বিশ্ববোধের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বমানবের সংযোগে বিশ্ব-সংস্থিতির অঙ্কবে এক প্রবল গতিব যোগ হইয়াছে—কবি দেখিতেছেন এক বিরাট শোভাযাত্রা অনন্তকাল চলিয়াছে, তাহার

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—ভগবানের মন্দিরের দিকে নয়, ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গে সগৌরবে বহন করিয়া লইয়া।

কবি মনোলোকে বিশ্বপ্রকৃতিকে এইভাবে মানব-মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন।—এইটাই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বনবাণীতে কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির—উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের—আত্মীয়-আবো বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অল্প কাব্যে প্রকৃতির প্রতি কবির দরদ বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে। কিন্তু বনবাণীতে সেই দরদ ও পীড়ি একটি স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বইখানি লেখা-সম্বন্ধে কবি কাব্যে ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সক আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হ'ল জীব জগতের আঁধা ভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে, যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাদা গুঁঠো সেও এ গাছের মাথা—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু সুগন্ধ-গুণ্ডুর গুণ্ডুনিমে গুটে।

"এ গাছগুলো গিষবাউলের একতাবা, ও'র মজার মজার সরস হ'রের কাঁপন, যে ডালে ডালে পাতা পাতা একতাবা চন্দের নাচন। এদি নিশুরু হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি হ'লে অগুরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রে উপরের তপাল মূল্যের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আব গলীর তলে শাশুর শিবন স্বৈরত। মূল্যের লীলার লালসা নেই, তাপের নেই, জড়তা নেই, এক এ পবনশক্তির নিঃশেষ তাননে আন্দোলন। 'এতন্তেবানন্দন্ত মাতাংনি' দেখি ফুনে ফুনে পালান; তাতেই মুক্তির বাণী বিশ্ববাণী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

"বোষ্টনী একদিন স্নিগ্ধাঙ্গা বের'ল, 'কবে এমানেন মিলন হ'লে গাছতলায়' এগ'র' গাছের মধ্যে প্রাণের বিস্তৃত স্বর; সেই হুড়টি ঘড়ি ত'ল প'ল—এত পারি তা হ'লে শামারের মিলন সঙ্গীতে বদ-স্বর লাগে না। বৃক্ষের যে বোধিদেবের তপাল মুক্তির পথে ছিলেন তা বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদেবের বাণীও শুনি যেন,—দ্রুত মিশে আছে। আরণ্যক এত গুণ্ডে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—বৃক্ষ ইব শুদ্ধা দ্বিগি চিঠিভোক;। 'স্নেহছিলেন 'ঘড়ি' 'কব সর্ব প্রাণ একতাবা নিঃসৃত'। তাঁরা গাছে গাছে চির যোগে এই প্রহরটি পেয়েছিলেন, বন প্রাণ: প্রথম: প্রৈতি বৃক্ষ:—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিষে। সেই প্রৈতি, সেই বেগ ধামতে চায় না, স্নেহের স্বরূপ অহরহ করতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভলী, কত ভাষা, কত বেয়না। সেই প্রথম প্রাণ-প্রতির নবমবোধেবশালিনী সৃষ্টিব চির প্রমোদকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে বিদ্যুৎ ভাবে অসুখ্যব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

“এখানে—ভিয়েনা নগরে—ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কতদিন মনে করছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দ-রূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম প্রৈতির বন্ধ-বহীন প্রকাশ-রূপ দেখব সেই নাগ-কেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্মে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার ঘরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরলীর ধানমস্তের ধনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে প্রতি নিমন্তর রাতে তারার আলোয় তাদের ওকারের সঙ্গে আমার ধানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাজি প্রায় তিনটার সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অস্তুরে একটা অসহ্য চকলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্ধার বেগে পালিয়ে যাবার জন্মে। পালাব কোথায়! কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গত বেধনার বিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম, তখন মনে পড়ে গেল সেই সঙ্গীত তার সরল বিস্তৃত সুরে বাজছে আমার উত্তরাধ্বের গাছগুলির মধ্যে,—তাঁদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল স্বরূপ আমার অন্তরাত্মকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে যিচ্ছ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্য পাই। পরম স্নানের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই পরিচয়, আনন্দময় স্নগভীর বসন্তগতি হচ্ছে সেই স্নানের চরন ধান।”

বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি কবির প্রীতি এই বনবাণী-কাব্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—এই বিশ্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রী ও করুণা ইহার মধ্যে চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—১। বন-বাণী, ইহাতে আরম্ভ্যক তুলনাতা ও পশু-পক্ষীর সম্বন্ধে কবির মমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ২। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা—যিনি বিশ্বেশ্বর তিনি নাটের গুরু, তিনি নটরাজ, ঋতুতে ঋতুতে তাঁহার বিবিধ নৃত্যলীলা জগতে প্রদর্শিত হয়, ঋতুগুলিই যেন তাঁহার রঙ্গপীঠ। “নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অস্ত্র পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হ’তে থাকে। অস্তুরে বাহিরে মহাকালের এঁৎ বিরাট নৃত্যক্ষেত্রে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অথও লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। ‘নটরাজ’ পালা গানের এই মর্ম।” ৩। বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। ৪। নবীন—বসন্তের চিরনবীনতার আবির্ভাবে কবি-মনের আনন্দোৎসব। শান্তিনিকেতনে ঋতুতে ঋতুতে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত ছাত্রদের মনের সংযোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে এগুলি লেখা হইয়াছিল। নবীন হইতেছে বসন্ত ঋতুকে আবাহন।

এই সকল বিভাগেই কবি তাঁহার অনন্তরূপ ও অসীমকে উপলব্ধি এবং

বিশ্বসৌন্দর্যে নিমজ্জন-অনিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে করুণা ও বিশ্বমৈত্রীও প্রকাশ পাইয়াছে।

বনবাণীর সকল কবিতারই রচনার উপলক্ষ-সম্বন্ধে একটু করিয়া পরিচয় নিজেই দিয়া রাখিয়াছেন।

পরিশেষ

১৩৩৯ সালের তাদ্র মাসে প্রকাশিত। কবি অনেক দিন ইহাতে কেবলই মনে করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহার যাহা দিবার তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে; যে কাব্য তিনি দিতেছেন তাহা তাঁহার শেষ দান, তাঁহার পরমাণু অবসানের শেষ প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই কবি 'খেয়া' নাম দিলেন তাঁহার অনেক দিন আগের এক কাব্যের, পরে আর এক কাব্যের নাম দিলেন পুরবী, এবং তাহারও পরে যখন তাঁহাকে দিয়া তাঁহার 'বিচিত্রা' বানীবন্দনার আয়োজন করাইয়া ছাড়িলেন, তখন কবি সেই বিচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

তবুও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে ?

নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি' নিঃশ-করা দানে ? —বিচিত্রা।

এবং দিনের অবসানে সজ্জিত এই ডালির নাম কবি রাখিয়াছেন 'পরিশেষ'।

বিচিত্রা তাঁহাকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া—সুখ-ভাণ্ডের ভিতর দিয়া এখনও 'পূজার অর্থ্য বিরচন' করাইয়া ছাড়িয়াছেন।

তিনি বারংবার মনে করিতেছেন—

রবি-প্রদীপ্ত-পথে জন্মদিগের আবেষ্টন

হরে আসে সমাপন। —জয়ধ্বনি

যাত্রা শুয়ে আসে দারা, —আমুর পশ্চিম-পথ-শেষে

চন্দ্রের মৃত্যুর হৃদয় এসে। —বর্ষ-শেষে।

কিন্তু কবি তো মৃত্যুঞ্জয়—তাঁহার তো কোথাও সমাপ্তি নাই, তিনি যে মহাপথিক—তাই কবি নিজেকে সঙ্গোধন করিয়া বলিতেছেন—

এ মহাপথিক,

অবারিত্ত তব পথিক।

তোমার মন্দির নাই, নাই অর্ঘ্যদাম,

নাইকো চরম পরিণাম।

তীর্থ তব পথে পথে ;

চলিয়া তোমার সাথে মূর্ত্তি পাই চলার সম্পদে

চকলের মৃত্যু আর চকলের গানে,
চকলের সর্বভোলা বানে,
আবার আলোককে ।

কবি মৃত্যুঞ্জয় । রুদ্রের প্রবলতম আঘাত যে মৃত্যু তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়া
কবি সেই হৃদয় নির্দয়কে বলিতেছেন—

এই মাত্র ? আর কিছু নয় ?

ভেঙে গেল ভয় ।

যখন উদ্ভূত ছিল তোমার অশনি

তোমারে আমার চেয়ে বড় ব'লে নিয়েছিলু গনি' ।

যখন রুদ্রের চরমতম আঘাত বক্ষে আসিয়া বাজে, তখনও মানুষ তাহা সহ্য
করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, মানুষের সহশক্তি অসীম । অতএব সেই
সামান্য মানব ভগবানের অপেক্ষাও এক হিসাবে বড়, ভগবানের শেষ দণ্ড
মৃত্যুর অপেক্ষা তো নিশ্চয়ই বড় । তাই কবি সাহস করিয়া বলিতেছেন—

যত বড় হও

তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও ।

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়—এই শেষ কথা ব'লে

যাব আমি চ'লে —মৃত্যুঞ্জয় ।

আবার কবি তো প্রাণময়, তিনি প্রাণময়ের সাধক । যেখানে নবীনতা
যেখানে সৌন্দর্য প্রাচুর্য আনন্দ সেখানে তো কবির আসন পাতা থাকে ।
সেই চিরসুন্দর কবির চিরসাথী । উভয়ের চলার একই ছন্দ, উভয়ের চলা
একই সঙ্গে ।

চিনি নাহি চিনি চির-সঙ্গিনী

চলিলে আমার সঙ্গে ।

এবং কবি সেই চির সঙ্গিনীকে বলিতেছেন—

আমার নয়নে তব অঞ্জন

হুটেছে বিবচিত্র,

তোমার মস্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে

উদগাধা হুপবিদ্র ।

কিন্তু সেই

চেনা মুখখানি আর নাই জানি,
স্বাধারে হতেছে গুপ্ত।

কিন্তু কবির সহিত তাহার চির সঙ্গিনীর তো বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না, তাহা
হইতে তিনি চির সঙ্গিনী হইবেন কেমন করিয়া। তাই ভরসা লইয়া কবি
বলিতেছেন—

মরণ-সভায় তোমার আমার
পাব আলোকের জয়। —তুমি!

এই পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও আশা-আশ্বাসের সহিত কবি বলিয়াছেন—

এই গীতি-পথপ্রাপ্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দ্বিধাস্থে এসেছি আমি নিশীথের নশদের তীরে
আরতির সাক্ষ্যক্ষেপে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবানি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

ইহাই হইল পরিশেষ কাবের অন্তরের কথা। ইহা ব্যতীত নানা
উপলক্ষ্য লেখা—বিবাহ, নামকরণ, বঙ্গমাহর্গে বন্ধীদের সম্বোধন, ইত্যাদি—
কতকগুলি কবিতা আছে। কতকগুলি কথিকা জাতীয় কবিতা ও গাথা-জাতীয়
কবিতা আছে। তাহার কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা। পরিশেষের
পরিশিষ্টে ঐবিজয়, সিয়ান, বোরোবুড়র প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণ-উপলক্ষে লেখা
কবিতা আছে। ইহার দুই-তিনটি কবির ‘দায়ী’ নামক পুস্তকেও আছে।

পুনশ্চ

১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। ছন্দোবদ্ধ গল্পে লেখা কাব্য। গল্পে লেখা হইলেও ইহার রচনার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে, এবং কবিতার রস আছে। লিপিকার রচনার সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য এই যে লিপিকার সমস্ত কথাটি গল্পের আকারে ছাপা হইয়াছিল, আর ইহাতে ভাবানুযায়ী লাইনগুলিতে ভাঙিয়া সাজাইয়া কবিতার আকার দেওয়া হইয়াছে। এই বচনা-পদ্ধতিও কবির এক নব সৃষ্টি।

কবির জীবনদেবতা কবিকে দিয়া এক এক সময়ে এক এক নতন সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন। কবি যতবারই বলিতে চাভিয়াছেন যে, এই আমার শেষ সৃষ্টি, ততবারই তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহাকে দিয়া নূতন সৃষ্টি বদলাইয়া ছাভিয়াছেন। কবি যেবাবে পবিশেষ বলিয়া একেবাবে কাজে ইশ্বাস দেয় ঐতম কবিতা বসিতে চাহিলেন, সেবাবেও তাঁহার আবেদন না-মন্তব্য হইয়া গেল—কবিকে কাঁচিয়া গড়ুষ করিতে হইল—পুনশ্চ তাঁহাকে নবসৃষ্টিতে মগ্ন হইতে হইল।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা কবছে স্থির চ'য়ে,
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত নিরতী।
যে অন্তিমারিকা তারই ভয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হ'লো বুঝি।

সেও তো নেই স্থির হ'য়ে,
যে পরিপূর্ণ, সে যে বাজার বাণি, প্রতীকার বাণি,—
অর তার এগিরে চলে অন্ধকার পথে।

বাহিতের আস্থান আর অভিসারিকার চলা

পথে পথে মিলছে একই তালে।

তাই নবী চলেছে যাত্রার হৃদয়ে,

সমুদ্র তুলছে আস্থানের সুরে। —বিচ্ছেদ

এই তো কবি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের কথা ও তাঁহার কাব্যে
অন্তরের বার্তা।

দ্রষ্টব্য—প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিকা পুস্তকে, যেষদত্ত প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি,
যাত্রী প্রভৃতি পুস্তকে এই পূর্ণ-অপূর্ণের মিল-সাধনার কথা।

কালের যাত্রা

ইহা নাটক। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। ইহার মধ্যে ছইটি নাটক আছে—১। রথের রশি, ২। কবির দীক্ষা।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসী”তে কবির একটি নাটক বাতির হইয়াছিল—রথযাত্রা। তাহাকেই একটু বদল করিয়া ও বর্ধিত করিয়া লিখিত হইয়াছে রথের রশি।

মহাকালের রথ অচল হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের মন্তপাঠ, ক্ষত্রিয় রাজা সেনাপতি ও সৈন্যসামন্তদিগের বীরত্বের আশ্বাসন, শ্রেষ্ঠী ধনপতির ধনবল কিছুতেই সেই রথকে চালাইতে পারিল না। মেয়েরা কত মানত করিল, কত ভুক্তাক করিল, কত পূজা দিল, কত লোকে কত টানাটানি করিল, কিন্তু রথের চাকা বসিয়া যায় ছাড়া আব চলে না; রথের বশি কেহ চালাইতে পারে না। এতদিন এই বথ ব্রাহ্মণেরাই চালাইয়া আসিয়াছেন, “তখন যে ঐরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এর ধনপতির দ্বারে অচল হ’য়ে বাধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চলবে না।”—রথযাত্রা। তাই মন্ত্রী কোনো উপায় না দেখিয়া বসিতেছেন—“দেখ শ্রেষ্ঠ, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে স’সারটা সাতাহ চলছে মহাকালের রথচক্র বোরার দ্বারা সেইটেবই প্রমাণ হ’য়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা, তখন তাঁরা রশি ধরতে-না-ধরতে রথটা ঘূম-ভাং সিংহের মতো ধড়ফড় ক’বে ন’ড়ে উঠত। এবারে সে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বলো শত্রুই বলো সমস্ত অর্থহীন হ’য়ে পড়েছে...”

তখন শূদ্রের দল হৈ হৈ করিতে করিতে আসিয়া পড়িল—তাহারা রথের রশি টানিয়া মহাকালের রথ চালাইবে। এতদিন তাহারা মহাকালনাথের রথের চাকার তলায় পিষিয়া মরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এবার তাহারা আসিয়াছে মরিতে নয়—মরীয়া হইয়া রথ চালাইতে—তাঁরা তাহাদের দলপতি বলিতেছেন—

এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্তে মহাকাল আমাদের ডাক দেননি—তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।”—রথযাত্রা।

“আমরাই তো জোগাজ্জি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ; আমরাই বৃন্দ্বি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা!”—রথযাত্রা।

দলপতি তাহার শূদ্র সহচরদের ডাক দিয়া কলিল—“আয় রে তাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।”

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বলিল—“কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চলো। বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধ’রে। পোড়ো না ঘেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।”—রথের রশি।

মন্ত্রীর বড় ভয়, পাছে রথ বাঁধা পথ ছাড়িয়া কোনো নূতন পথে চলে এবং অবশেষে তাঁহারই মতন অভিজাত ধনীসম্প্রদায়ের কোনো বিপদ ঘটায়, যাহারা এতদিন শূদ্রদের দমাইয়া নীচে রাখিয়া মহাকালের প্রসাদ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

শূদ্রদের টানে রথ চলিল, মহাকালের জাত গেল ও তাঁহার গতি হইল, তাঁহার রথ “মানুছে না আমাদের বাপ-দাদার পথ।”

এমন সময়ে কবি আসিয়া উপস্থিত। সকলে কবির কাছে এই আশ্চর্য ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—“এ কী উন্টোপাণ্টা ব্যাপার, কবি? পুরুষের হাতে চল না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝলে কিছু!”

কবি।—ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—নীচের দিকে নামূল না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তারে ওরা মানে নি।…… পূজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি-করেছে মাটি। রথের দড়ি কি প’ড়ে থাকে বাইরে? সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা—দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।……এইবেলা থেকে বাঁধন-টাতে নাও মন—রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;…… আশ্চর্যের মতো বলো সবাই মিলে, যারা এতদিন ম’রে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে, যারা বুগে বুগে ছিল খাটো হ’য়ে, তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে।

এই শ্রেণীর কবিরাই কালে কালে লোকদের মহাকালের রথ চালাইবার উপায় নির্দেশ করিয়া দেন—তাঁহারা বলেন তাল রক্ষা করিয়া ছন্দ বাঁচাইয়া চলো, তাহা হইলেই মহাকালের রথ চলার কোনো বিঘ্ন হইবে না। সমাজ-ব্যবস্থায় একপেশে ঝোঁক হইলেই রথের চাকা মাটিতে বসিয়া যায়। ইহাই হইতেছে কবির শিক্ষা। সেই শিক্ষা গ্রহণ করিলেই—অন্ন মহাকাল-নাথের অন্ন!

কবির দীক্ষা নামক অংশে দুই জনের কথা আছে—তথাপি উঠাকে ঠিক নাটক বলা যায় না, উহার মধ্যে কোনো ঘটনা নাই, কোনো গতি নাই, আছে কেবল একটু তথ্য। কবি শিব-মন্দের উপাসক, তিনি লোককে শিব-মন্দের দীক্ষা দিয়া থাকেন। এই শিব-মন্দের হইতেছে ত্যাগের মন্ত্র—কারণ মহাদেব ভিক্ষুক। এই যে ত্যাগ তাহা শত্ৰু ঘড়াটাকে উপুড় করা নয়, “ত্যাগের রূপ দেখ ঐ ঋতুগায়, নিরত গ্রহণ করে, তাই নিরতই করে দান।।..... দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ব, মহৎ যিনি ঐশ্বর্য্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন ব’লে নয়, আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।.....কিছু তিনি চাননি কুকুর-বেরালের কাছে। অন্ন চাই ব’লে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে। বেরোলো মানুষ লাঙল কাঁধে। যে-মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন। বল্লেন চাই কাপড়—হাত পেতেই রইলেন। বেরোলো ফলের থেকে তুলো, তুলোর থেকে হুতো, হুতোর থেকে কাপড়। ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুঁপ অসীম তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের। নইলে দিন কাটত কুকুর-বেরালের মতো। তোমরা কি বলো সব চেয়ে সন্ন্যাসী ঐ কুকুর-বেরাল... মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষু দেবতার ভিক্ষা হবে যে অচল তাঁর ভিক্ষার ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী, যদি দান করতেন ষড়্‌ত সর্বনাশ।

“তবে কি যুরোপখণ্ডকে বলবে শিবের চেলা?”

“বলতে হয় বৈ কি। নইলে এত উন্নতি কেন? যেনেছে ওরা মহা ভিক্ষুর দাবী। তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ, দেনে প্রাণে, জ্ঞানে মানে।”

কবি এই দীক্ষা আমাদের দিতেছেন যে আমাদের অর্জন কবিতে হইবে ত্যাগ করিবার জ্ঞান, ত্যাগ করিতে হইবে কল্যাণের জ্ঞান সাবিত্রি নাগে সচেতন ভাবে, তমোভাবে ভুলিয়া গাজার দম লাগাইয়া যে সন্ন্যাস সে সন্ন্যাস নয়, মৃত্যু। “প্রাণের দনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈন্ত, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।” “মানুষের যিনি শিব তিনি বিষ পান করেন বিষকে কাটাবেন ব’লে। ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দাও রব উঠল তাঁর কর্ণে,—দে ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা। নিব’রিশীর স্রোত যখন হয় অলস তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রাধান। দূর্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আশ্রয় ওঠে অলস।

বিচিত্রিতা

১৩৪০ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত বলিয়া যদিও বইয়ে ছাপা হইয়াছে, কিন্তু বাজারে বাটরি হইয়াছে ভাদ্র মাসে।

স্বয়ং কবির এবং অপর নানা চিত্রকারের নানা বিষয়ের ও নানা স্টাইলের ছবি লইয়া ছবির একটি এল্বামের মতন করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ছবিকে কবি এক-একটি কবিতা লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছবির নামও বোধ হয় কবি দিয়াছেন, এবং তাঁহার ব্যাখ্যা যে ছবিকে ছাপাইয়া কবিতা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সামাজিক তত্ত্বে লিখিয়া রসালো ও অপূর্ব সূন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ছবিগুলি বিভিন্ন লোকের অঙ্কিত এবং তাহাদের বিষয়ও বিভিন্ন বলিয়া কবিতাগুলিতেও বিভিন্ন রসের সমাবেশ হইয়াছে। এই জন্ত এই পুস্তকের নাম ‘বিচিত্রিতা’ সুসঙ্গত হইয়াছে।

চণ্ডালিকা

ইহা নাটিকা। ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত। গণ্ডে ও গানে লেখা।
এই নাটিকার বিষয়-সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় পরিচয় দিয়াছেন—

“রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শাক্য ল-
কর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার
গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডের উদ্ধানে প্রবাস
যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে
আহার শেষ ক’রে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে
পেলেন এক চণ্ডালের কণ্ঠা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার
কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হলো।
তাকে পাবার অল্প কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে
মা তার বাহুবিন্ধ্য জান্ত। মা অভিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত ক’রে
সেখানে আগুন আল্ণ এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অংক
ফুল সেই-আগুনে ফেল্লে। আনন্দ এই বাহুর শক্তি রোধ করতে পারলেন
না। রাত্রে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ
করলে প্রকৃতি তাঁর জঘ বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন
পরিতাপ উপস্থিত হলো। পরিত্রাণের জন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে
কাদতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা
জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর
বলীকরণবিভা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।”

কবির লেখনীর বাহুতে এই আখ্যায়িকা তাঁহার নাটকে কিছু বদলাইয়া
গিয়াছে। এখানে অলৌকিকতা বিশেষ কিছু রাখা হয় নাই, বাহা আছে
তাহা রূপক বা symbol। চণ্ডালী প্রকৃতি আনন্দকে দেখিরা মুগ্ধ হইয়াছে।
সে তাহার মাকে বলিল—“আমি চাই তাঁকে। তিনি আচম্ভা এসে আমাকে
জানিয়ে গেলেন, আমার দেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এত বড় আশ্চর্য
কথা।” সে তাহার মাকে অগ্ররোধ করিল যত পড়িয়া সে টানিয়া আনন্দ

আনন্দকে তাহাদের বাড়ীর দ্বারে। প্রকৃতির মা মন্ত্র পড়িয়া তুচ্ছতাক কবিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতি কল্পনার দেখিতে লাগিল যিনি শুদ্ধচরিত্র অপাপবিক্ সাধু সন্ন্যাসী তিনি সেই মন্ত্রের মোহে কামার্ত হইয়া চণ্ডালের দ্বারে অভিসারে আসিতেছেন; তাহার চরিত্রের শুভ্রতা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহার গতি হইয়াছে কুচিত্ত, পদক্ষেপ লজ্জিত, বক্ষে হয় ভয়, চক্ষে বৃদ্ধা। যেমন কবিব 'উদ্ধার' নামক ছোট গল্পে গোঁরী বাতায়ন হইতে শুকদেবকে চোরের মতো পুষ্করিণীতটে শিষ্যবধূ কাছে অভিসারে আসিতে দেখিয়া বহুচকিতের দ্বায় দৃষ্টি অবনত করিয়াছিল, এই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিও তেমনি নিজের ধ্যাননেত্রে তাহার প্রিয়তমের পতনের ছবি দেখিয়া আতঁনাদ করিয়া উঠিল—“ওবে ও বাকুলী, কী কর্‌লি, কী কর্‌লি, তুই মল্লিনী কেন? কী দেখলাম। ওগো কোথায় সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই শ্রদ্ধ স্বপ্নেব আলো। কী ম্লান, কি ক্লান্ত, আশ্রপরাঙ্ঘের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এলো আমার চারে। মাথা হেঁট করে এলো। যাক, যাক, এসব যাক—ওরে তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান কবিসনে বীবেব—জয় হোক তাঁব জয় হোক।”

এমন সময়ে আনন্দ অসিদ্ধা সেউখানে উপস্থিত হইল। বুদ্ধবন্দন পাঠ কবিতো লাগিলেন। পুরুষের মা মনিয়া' গেল—অর্থাৎ পুরুষের মনের সেই পাপ মারজ্জয়ী মহাসন্ন্যাসী শুকদেবের পূণ্যপভাবে ম'বয়া' গেল—চণ্ডালিনীও পূণ্যপ্রভাবে পবিত্র হইয়া গেল। জয় হটল পুণ্যেব, জয় হটল সংযমেব, জয় হটল কবণাব, জয় হটল ক্ষমাব, জয় হইল স্নাত্ত্রানে পীতিব ও সাম্যবোধেব।

এইকপ একটি কঠিনী অবলম্বন করিয়া সত্ৰীচন্দ্র বায় ১৯১০ সালেব বঙ্গদর্শনে “চণ্ডালী” নামে একট দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন

তাসের দেশ

১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসের শেষে প্রকাশিত নাটিকা, রূপক। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ছোট গল্পের মধ্যে একটি গল্প আছে, তাহার নাম 'একটা আষাঢ়ে গল্প'। সেই গল্পটিকে অবলম্বন করিয়া এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে—পুরাতনের ইহা নূতন রূপ, গানে কথায় রসে তথ্যে একেবারে ভোল ফিরিয়া গিয়াছে।

রাজপুত্র লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, কারণ "ভীত করেছে ঐ লক্ষ্মী। সাহস আছে লক্ষ্মীছাড়ার। যার বিপদ নেই, তার ভরসা নেই।" তিনি কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতে চাহেন নবীনাব সন্ধানে, রূপকথার দেশের সন্ধানে। তিনি মায়ের কাছে বিদায় চাছিলেন। রাজমাতা বলিলেন—“আমি ভয় ক’রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব স্বেতচন্দনের তিলক, স্বেত উষ্ণীষে পরাব স্বেতকরবীর শুভ্র।”

রাজপুত্রের সঙ্গী হলো সদাগরের পুত্র। নবীনার বাণিজ্য-যাত্রায় তাহাদের তরী ভগ্ন হইল, তাহারা শেষে উপনীত হইল এক দ্বীপে। সেটা তাসের দেশ। সেখানকার লোকেরা সব কাগজের, পেটেপিঠে চেপ্টা, তাহারা চৌকা-চৌকা চলে চলে, সবই 'সেখানে নিয়মে বাঁধা, তাহারা উঠে বসে চলে ফিরে প্রথা ও দস্তুর অনুসারে, কেহ হাসে না, হাসা সেখানে নিয়ম নয় বলিয়াই। তাহাদের মধ্যে পদমর্যাদা ধরা-বাঁধা, সব থাক-বাঁধা, তাহারা চতুর্দশে বিভক্ত। কে যে কবে কেন ঐ রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে তাহার কোনো নির্ণয় নাই, তথাপি সেই মাকাতার আমলের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে কেহ সাহস করে না, বর্ণাশ্রম ধর্ম সেখানে কারেমৌ। সমাজে কাহার কি মূল্য ও কোথায় কাহার পরে কাচার স্থান তাহা স্থির করা আছে, তাহার প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহস করে না, প্রতিবাদ বা বদল যে করা যায় এমন কথাও কেহ ভাবে না, সেখানে সকলেরই 'গারে কৌটা কাটিয়া তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে—হরির চেয়ে তিরি বড়, তিরির চেয়ে চৌকা, এবং তাহার পরে পঞ্জা ছকা ক্রমে দহলা পর্যন্ত, তাহার উপরে গোলাম, বিবি, সাহেব; কিন্তু সকলের বড় হইল টেকা—তাহার মাত্র একটি কৌটা থালা হইলে কি হয়, তাহার পদমর্যাদা সকলের চেয়ে বেশি ইহা

সকলেই মানিয়া লইয়াছে, এমন কি নহলা দহলা পর্যন্ত এক দিনও আপত্তি উত্থাপন করে না যে, মাত্র একটি ফৌটার জোরে টেকা কেমন করিয়া তাহাদের অতগুলি ফৌটাকে পরাস্ত করিতেছে। কারণ, সেটা নিয়মের দেশ। এই সেধানকার মাকাতাব আশ্লেব নিয়ম, বাপ-পিতামহ মানিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কে যে সেই নিয়ম করিয়াছে, তাহা কেহ নাই বা জ্ঞানিল, এবং তাহাতে কোনো বিচার ও ত্রায়াসঙ্গতি নাই বা থাকিল। সেধানকার সকলেই সনাতনপন্থী। যাহার হাতের পাঁচ সেট তাহাদের ভাজিয়া যথারীতি বিতরণ করে; তাহাদের নিজেদের কোনো মতামত নাই।

এই তাসের দেশে এমন দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের একজন রাজপুত্র ও একজন সদাগরের পুত্র—একজনের দেশে বেশে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ানো বৃত্তি, একজনের বন্দবে বন্দবে অচেনা নবীনাকে সন্ধান করিয়া কেবাহ ব্যবসায়। তাহার ববের বাবা-বরাদ ছাডিয়া অনিশ্চেষ্টেব পক্ষ্যেত ধাবিত হইয়াছে, তাহারা বাবা ভাডিয়া সমস্ত কিছু নিজেরা খাটাই করিয়া দেখিয়া লহুতে, পিচাব করিতে শকলে ভাসিয়া বিস্মে বাহিব হইয়া পড়াছে তাহারা হানে, শাখা গান গার, তাহারা নিয়ম ভঙ্গ কবে। তাসের পক্ষ প্রথম চনকাহয় উঠিল, কলঙ্কাবি বাপারে ভয় পাইল, কিন্তু তাহাদের গায়ের তাওয়া লগিয়া তাসের দেশে বরদ উপস্থিত হইল, তাসের দেশে নিজেদের হুজুর একটা সবনেমে বস্ত্র দেখা দিল তাসের দেশের পবের কাপড়ের সম্পাদক চকন হইয়া তাসের দেশের কুষ্টি বক্ষা করিবার জন্য গুব প্রজন্মী ভাষায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ পূর্ণ করিতে লগিল। অবশেষে দেশের সকলে আহঁন অমাগ করিতে ছুটিল দেশে আর বাবাত্মলক আচন রাখা চলনা। বিদেশীরা তাসের দেশে আনিল মুক্তির গান, অশান্তির চঞ্চলতা, নিয়মের আবাসত।

তাসের দেশের মেয়েদের উমিলা নদী ঢাক দিয়া বলে তাহাদের কুকিও কলদাম বাতাসে উড়াওয়া নীচের টলতে, কুন অমুনয় করে তাহাদের অলকে ডালিয়া ভূয় হবাব জন্ম, পাখারা গান গাওয়া নিকুজ-কাননে পেমের পলোতন শুনায। সকল দিকে জাগিয়া উঠিল ইচ্ছা, চারদিকে শোনা গেল নিয়মের গণ্ডী ভাঙার ডাক। ভীক হইল সাহসী; সকলে স্বাধীন ইচ্ছায় প্রাণশক্তিতে প্রবল হইয়া সনাতনী জুলুম ও অত্যাচারের বিরোধী হইয়া উঠিল।

এই তাসের দেশ যে আমাদেরই সনাতনপন্থী দেশ তাহা না বলিয়া দিলেও কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। কত বার কত রাজপুত্র ও সঙ্গারের পুত্র আমাদের এই নির্জীব তাসের দেশে আসিয়া আমাদের কানে মন্ত্র দিরাছেন—“ভাঙতে হবে এখানে এই অলসতার বেড়া, এই নির্জীবের গপ্তী, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক’রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।” কিন্তু সেই অমৃতময়ী বাণী তো আমাদের রুদ্ধ প্রাণের দরজায় মাথা কুটিয়া অপমানিত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের কবি তাঁহার ত্বর্ককে এই বাণী পুনঃপুনঃ উদ্ঘোষিত করিতেছেন। আমাদের তাসের দেশে কি প্রাণের সাড়া জাগিবে না !

ত্রুটব্য—তাসের দেশ—কুপালনী, Visva-Bharati News. Oct. and Nov., 1988.

উপসংহার

চুপে ত্রুত উদ্‌যাপন করিলাম। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যতীর্থে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিলাম। তীর্থরাজের প্রসাদ ও সুরল আমার ভাগ্যে জুটিল কি না তাহা জানি না—তবে পরম শ্রদ্ধার সহিত গুরুপরিভ্রম স্বীকার করিয়া দীর্ঘ দশ বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায় এই চুপের তীর্থভ্রমণ যে সমাপ্ত করিতে পারিয়াছি ইহারই আনন্দ ও আশ্বাস আমার পুরস্কার। আর একটি কথাও মনে জাগিতেছে—এই তীর্থপথে যাহা পথিকৃৎ তাঁহাদিগকে সন্মান্যে ও কৃতিত্বচিন্তে প্রণতি জানাইয়া বলিতেছি যে, এই সুদূরগম তীর্থে আমি বতদূর পর্যটন করিয়াছি, কেহই এতদূর পরিভ্রমণ করিবার আশ্বাস স্বীকার করেন নাই। আমি এই পথের শেষ পর্যন্ত একবার দেখিগা আসিলাম এবং এমন অনেক নূতন তীর্থ আবিষ্কার করিলাম, যাহা আমার পূর্বে অজ্ঞ কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর উৎস-মুখ হইতে উৎসারিত অসংখ্য কবিতা ও গান অপূর্ব ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া আমাদিগকে ও বিশ্ববাসীকে নব নব আনন্দরস পরিবেশন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কবিতার আলোচনা আমি এই রবিরশ্মির আলোকে আনিয়া ধরিয়াছি। আমার মন-প্রিজ্জ যে সকল রশ্মির যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছে তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কাব্য-বিশ্লেষণ ঠিক নির্দিষ্ট বিজ্ঞান নহে, তাহার সম্বন্ধে কেহই শেষ কথা বলিতে পারে না। মানুষের মনের গঠন-অনুসারে একটি কবিতারই বহু অর্থ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ইহার উদাহরণ কবি নিজেই দিয়াছেন তাঁহার ‘পঞ্চভূত’ পুস্তকে কাব্যের তাৎপর্য নামক আলোচনায়।

কবি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—

কবি আপনার গানে যত কথা কহে,

নানা জনে লগ তার নানা অর্থ টানি’;

তোমা পানে যায় তার শেষ অর্থখানি।

...গীতাঞ্জলি।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ ঝুক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বুঝা বারবার,
দেখে তুমি হাসো বুঝিঃ — চিত্রা, অন্তরীক্ষী !

কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে —
'বা গাছিছ তার অর্থ রয়েছে কিছু কি ?'
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, 'অর্থ কী জানি !'
তারি হেসে যায়, তুমি হাসো ব'দে :

ল'য়ে নাম ল'য়ে জাতি বিধানের মতামতি,
ও সকল আনিসনে কানে ।
আইনের লোহ ঝাঁচে কবিতা কভু না বাচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে ।
হাসিমুখে রেহভরে মৌলিগাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অমুরাগে ।
কে বোঝে, কে নাই বোঝে, ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে ।

—বিসঙ্গম নাটকের উৎসর্গ।

আমার এ সব জিমিস বাঁশির মতো—বৃষ্ণবার জন্তে নয়, বাজ্ণবার জন্তে ।
—কান্তনৌ ।

রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক কবি। বিশ্বপ্রকৃতি মহামানব যুগধর্ম ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যে যতপ্রকারের রূপবৈচিত্র্য আছে তাহার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে সঙ্গ, সে সঙ্গ কবির নয়। কবি তাহাদের সঙ্গে সব নব রস-সঙ্গ সৃষ্টি করেন। করি সাধক দ্রষ্টা যুগে যুগে স্রষ্টার সঙ্গে যে গভীর রস-সঙ্গ সৃষ্টি করেন, লোকে তাহাকেই রস-ধর্ম বলিয়া মানিয়া লয়। সাধক কবিরা যে ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ রস-সঙ্গের কথা বলিয়াছেন, তাহাই মহামানবের জীবনধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। রসময়ের সহিত এই রস-সঙ্গ-বন্ধনের নামই মিস্টিসিজ্‌ম্। কিন্তু তন্ত্র প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যখনই প্রেমে আত্মহারা হইতে চাহিয়াছেন, তখনই শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বিচারের বল্লার দ্বারা সেই আবেগকে শাসন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজ্‌ম্‌কে সেইজন্য সম্যকদর্শন বলা যাইতে পারে।

তিনি গাহা দেখেন বা অনুভব করেন, তাহা ঠিক বিচার করিয়া প্রকাশ করেন না, অতীন্দ্রিয় একটি অনুভবকে প্রকাশ করেন। তাঁহার দ্বারাই সত্যের ও সৌন্দর্যের গভীর রূপ প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু সেই অনুভবের অন্তরালে কবির মনোচেতনার মধ্যে একটি বিচারবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র ভাব-বিলাসিতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই জন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য বোধো-অবোধের সীমানায় দাঁড়াইয়া পাঠককে ও সমালোচককে বোঝা-না-বোঝার দোটানায় ফেলিয়া রঙ্গ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাখ্যা বহু লোকে বহু বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকলের উজ্জ্বল দার সংগ্রহ করিয়াছি, এবং অনেক স্থলে কবির নিজের অভিমতের দ্বারা যাচাই করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত আমার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি অবশেষে এই বলিয়া সঙ্গদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইতে চাই—

বুকেছি কি বুদ্ধি নাই যা সে তর্কে কাজ নাই,

ভালো শ্রমের বেগেছে যে রহিল সেই কথাই । - প্রবাহিণী ।

পরিশিষ্ট

[টীকা-টপ্পনী ও সমালোচনা-সংগ্রহ]

উৎসর্গ—হিমাদ্রি

কী জানি কি বাণী—অজ্ঞাত কোন বার্তা, মেসেজ্ । তুলনীয়—তপোমূর্তি
কবিতার ৫-৭ লাইন ।

হৃঃসাধ্য.....শেষপ্রান্তে—হৃঃসাধ্য তোমার উচ্ছ্বাস আপনার সাধের শেষ
সীমায়, যতদূর গলা চড়াইতে পারা যায় তত দূরে ।

অমিতাপ-বেগে—ভূগর্ভের তাপের বেগে । টেনিসন প্রভৃতি কবিরাও এমনই
বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন ।

নিক্রম্বেশ চেষ্টা—অনির্দিষ্ট সাধনা—কী চাই তাহার ধারণা অস্পষ্ট, অথচ চেষ্টা
চলিয়াছে ক্রমাগত ।

পেয়েছ আপন সীমা—তুমি তোমার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া
গিয়াছ ।

সীমা-বিহীনের—আকাশের ।

খেয়া—শেষ খেয়া

শেষ খেয়া—ভগবানের অস্তিম কৃপা । কর্মক্লাস্ত জীবনের শেষ দিনের চিন্তায়
কবি ভগবানের নিকটে ঈহার করুণা প্রার্থনা করিতেছেন ।

দিনের শেষে—জীবনের গণা দিন যখন ফুরাইয়া আসিয়াছে ।

ঘুমের দেশ—পরলোক, সেখানে সর্ব সংস্রোত বিরত হইয়া পরমা শান্তি
বিরাজ করে ।

ঘোমটা-পর্য—অস্পষ্ট, দৃশ্য-অদৃশ্য ।

কাজ-ভান্ডারো গান—মধুর সঙ্গীত যাহার মোহিনী শক্তিতে অগতের সকল কাজ
ভুলাইয়া দেয়; পরলোকের চিন্তা তেমনি সর্ববিশ্বরঙ্গী । মানব-
জীবন কর্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ, মৃত্যু সেই শৃঙ্খল মোচন করে ।

চুকিয়ে সুখ—মৃত্যু তো সুখ-হুঃখ দুইয়েরই বিরতি।

ফেরার পথে কিবেও নাহি চায়—যাহারা যাইতেছে তাহারা যাইতেছেই, আর

ফিরিয়া আসে না, অন্তত এই আকারে আর ফিরে না।

ঘর-ছাড়া—এই প্রবাসভূমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত।

সাঁঝের বেলা—জীবন-সাম্রাজ্যে।

তরী—আমার সহচর সঙ্গী সকলে একে একে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন।

কেমন ক'রে চিন্বে ইত্যাদি—কোন সাধনার ফলে তাঁহারা এমন স্বচ্ছল-গতি লাভ করিয়াছেন, তাহাও তো আমার চিন্তার অগোচর।

ছায়ায় যেন ছায়ায় মতো—আমার পূর্বেজ সাধকদিগের সাধন তত্ত্ব আমি অল্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি।

এমন নেয়ে—তাঁহাদের মধ্যে কাহার সাধন প্রণালী আমার অবলম্বনীয় তাহাই আমি জানিতে চাই।

বরেও নহে পারেও নহে—যে ব্যক্তি সাংসারিকতায় বৈষয়িকতায় আসক্তও নহে, আবার একেবারে অনাসক্তও হইতে পারে নাই।

ফুলের বাহার নাইকো বাহার ইত্যাদি—বাহার ইহজীবনে আশা নাই, পরজীবনেরও কোনো সন্দেহ নাই।

অশ্রু বাহার ফেলতে হাসি পায়—জীবনের বিকলতায় বাহার বিলাপ করিতেও লজ্জা বোধ হয়, কারণ সে তো নিজের অবহেলাতেই সমস্ত নষ্ট পণ্ড করিয়া বসিয়াছে।

দিনের আলো—ইহকাল, ইহকালের আশা ও উৎসাহ।

সাঁঝের আলো—পরকাল, পরকালের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।

বাটের কিনারায়—জীবনের শেষ প্রান্তে।

বলাকা কাব্যের নামকরণ

বলাকা কাব্যখানি ৪৬-টি পৃথক্ পৃথক্ কবিতার সংকলন। ইহাদের মধ্যে কবি মাত্র ৮-টি কবিতার নাম দিয়াছেন, আর বাকীগুলির কোনো নাম দেন নাই। বলাকা নামটি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বলাকা-পংক্তি যখন আকাশে তোরণহীন লম্বিত মালার জায় ছলিতে ছলিতে মানস-সরোবরের দিকে উড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মূর্তি

আমাদের দৃষ্টিতে তেমন স্থম্পটভাবে প্রতিভাত হয় না, যেমন প্রতিভাত হয় তাহাদের সম্মিলিত 'মালিকাবদ্ধ সমগ্র পংক্তির গতিচ্ছন্দ ও গতিভঙ্গিমা। বলাকার কবিতাগুলির প্রত্যেকেরই এক-একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য তো আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাহাদের সম্মিলিত সমষ্টিফল হইয়া একটি স্বতন্ত্র বিশেষ তাৎপর্য পার্শ্বদৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বলাকার অধিকাংশ কবিতার মধ্য দিয়া এই সমুহাশ্রয় তাৎপর্যের এক-একটি বিশেষ প্রকার ও বিশেষ ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় কবি সেইজন্মই কবিতাগুলির নাম দিতে দিতে সজাগ হইয়া নাম দেওয়া বন্ধ করিয়া প্রকৃত ভঙ্গ করিয়াছিলেন। নামের মধ্যে যাত্রা বাঁধা পড়ে, তাহাব স্বতন্ত্রতা নামের আবরণের মধ্যেই সৌম্যবদ্ধ হইয়া যায়। যেখানে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া একটি চঞ্চল নৃত্যশিল্পের পাদবিক্ষেপ সূচিত হয়, সেখানে এই পাদবিক্ষেপকে সমস্ত নৃত্যের মধ্যে এক এক কাঁচিয়া দেখিলে তাহার সমগ্রতার তাৎপর্য বুঝা যায় না।

দোস্তলামান মালার ছায় বলাকা-পংক্তি যখন আকাশপথে উড়িয়া যান, তখন প্রত্যেকটি বক বা হংসের যে স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্র পর্বতবন ঘটে, তাহা আমাদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না। এই স্থান-সন্নিবেশের বিচিত্রের কলে বলাকা-মালাটি যে বিচিত্রভাবে বিচিত্র কপে আমাদের মন হরণ করে, সেই বর্ণনাই সমগ্র বলাকার বর্ণনা। আকাশে ঘনরুমসমূহের মেঘ উঠিয়াছে, ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, বলাকার মালাটি মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। বলাকার এই ভ্রম বিপদের মধ্যে, মেঘগজনের মধ্যে, বৈদ্যুত বলকের মধ্যে কোনো ভয় নাই; তাহাদের মালা যেমন এক একবার ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহা বা তাহা গাঁথিয়া তুলিতেছে। মেঘের সম্মুখে আসিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা বেন নতন জীবনের সন্ধান পায়। তাহারা মানস-সরোবরের বাত্মী, বিপদের মধ্যে যাত্রা করিয়া চলা তাহাদের অনিবার্য। তাই তাহারা বিপদ অগ্রাহ করিয়া, বিপদ অতিক্রম করিয়া নন্দ অজানা মানস-সরোবরের দিকে যাত্রা করে; তাই বলাকা কথাটি উচ্চারণ করিলেই আমাদের মনে সর্ববিপজ্জয়ী একটা অজানার উদ্দেশে অসুস্থীন অকারণ অব্যবণ চলা ও গতিচ্ছন্দের কথা মনে পড়ে। বলাকা বইখানিতেও এমনি একটি গতিচ্ছন্দের লীলাভঙ্গী চিত্রিত করিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার চিরনবীন অন্তরাখ্যাত্তে যে গতিধর্ম অহুত্ব করেন, সেই গতিধর্ম নিজের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বাহিরের জগতের ও নিজেব

সঙ্গে বাহিরের দৃশ্যে তাহার কি ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাও প্রধানতঃ এই কাব্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বিশ্বময় এই অকারণ অবারণ চলার গীলাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গগন রাত্ৰিকালে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া মানুষ অজানা সাগরে পাড়ি দেয়, তাহার জীবনীশক্তির প্রবাহ তাকে কোন্ সুদূর জগৎ হইতে জগতান্তরে, এক দেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যায়। সেই অন্ধকার রজনীতে রজনীগন্ধার গন্ধের ভাষা অনন্তের একটি সুগন্ধ মানবের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া রাখে। 'যদি এই অনন্তের অভিমুখে যাত্রা, এই গতি, এই অকারণ অবারণ চলা মুহূর্তের জল্য বন্ধ হইত, তবে বিশ্ব নূত জড়পুঞ্জের সমাবেশে মহাকলুবতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু গতিশক্তির নিত্যমন্দাকিনী মৃত্যুস্রোতে বিশ্বের জীবনকে নিরন্তর শুচি করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে স্থান দিয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুকে আমরা পাই না, চিরনবীনতার মধ্যে অনন্তের মধ্যে মৃত্যুর যথার্থ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন বলাকা বলিলেই একটি গতিশক্তির কথা মনে পড়ে, তেমনি এই কাব্যখানির মধ্যেও কবি বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি গতিশক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। এষ্ট ছন্দ বিশ্বেকে ক্রমাগত "তথা নয়, তথা নয়, অল্প কোনো-খানে" এই বাণী দিয়া অবিরাম চুটিয়া চলিয়াছে। বলাকার মতোই এই কাব্যের কবিতাগুলি এক অজানা বাজার বারী। এইজন্যই কবি এই কাব্যখানির নাম দিয়াছেন 'বলাকা'।

ক। রবীন্দ্রকাব্য-পরিচ্রমণ

গুপ্তীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে যখন রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও তাঁহার নিন্দা করা ছিল একটা ক্যাসান। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি স্মৃষ্টি স্থলনিত ভাষার মোহ বিস্তার করিয়া পাঠকের ও শ্রোতার মনোহত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা পাখীর মধুর কাকলীর মতনই অর্থহীন। এই অভিযোগের উত্তর কবি নিজেই তাঁহার পঞ্চভূত নামক পুস্তকে "কাব্যের তাৎপর্য" ও "প্রাঙ্গলতা" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে দিয়াছেন—“লেখার দোষ থাকেও যেমন আশ্চর্য নহে,

তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্বতাও নিতান্ত অসম্ভব বলিতে পারি না।” “সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ কাজ নহে—তাহার জন্তও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায়—তাহা দর্শন নহে, এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ-বাক্য, এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।”

ইহার পরে কবি খেই ইউরোপের সাহিত্য-রসিক সমাজের বিচারে অগ্রগণ্য কবি বলিয়া বিবেচিত হইলেন, নোবেল-পুরস্কার লাভ করিলেন, অম্মি হাওয়া বদলাইয়া গেল, কবির সুখ্যাতি করা, তাঁহাকে বিশ্বকবি বলিয়া বরণ করা ও বড়াই করা ফ্যাসান হইয়া উঠিল।

এই ছুই অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া রবীন্দ্রকাব্যের প্রকৃত নিরিখ নির্ণয় করার সময় আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কিরূপ নবনব-উন্মেষশালিনী, তিনি যে কী সম্পদ আমাদের সাহিত্যে দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার দানে আমাদের ভাষা ও জীবন যে কী অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক পরিচয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-নির্ঝরিনী তাঁহার বাল্যকালেই সমস্ত সঙ্গীত গতাহুগতিক পথ ছাড়িয়া শতমুখে অনন্তের অভিমুখে অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। তিনি একাই সাহিত্যের সাত-মহলা ভবনের শত কক্ষের দ্বার সোনার চাবি দিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা, যেদিকেই তিনি তাঁহার প্রভাসের প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিকটিই সমৃদ্ধভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনটি এদেশে আর কাহারও দ্বারা হয় নাই, আর অল্প দেশেও একাধারে এত বিচিত্র শক্তির পরিচয় কোনো কবি বা লেখক দিয়াছেন কি না তাহা আমার জানা নাই।

কবি কবিতাকে নুব নব রূপ দান করিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি নব নব ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার বাগ্-বৈভবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় কবি-মানসের যে একটি অভিনব রূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীত বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরাশি, অপর দিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য্য একত্র সমাহৃত করিয়া নিজের প্রতিভার অপূর্ণ ছাঁচে ফেলিয়া যে ললিত-ললামশালিনী তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, তাই তিনি কবি-সার্বভৌম বা কবি-সম্রাট নামে সম্মানিত হইতেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে তাঁহার কাব্য-সাধনার একটি মাত্র ধারা বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছেন—“আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া বাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।” বাস্তবিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই একটি বিষয়ই কবির সমস্ত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু রূপদগ্ধ ছন্দের বাহ্যিক সুললিত প্রকাশ-ভঙ্গিমার ওস্তাদ কবি একই জিনিস বার বার এমনই নূতন ঢঙে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যে, কবির প্রভাষণ আমরা ধরিতেই পারি না, এবং একই ভাবের বহু বিচিত্রতার কৌশলে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরম্য হইয়া থাকি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে “জীবের মধ্যে অনন্তকে অল্পভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অল্পভব করার নাম সৌন্দর্য্যসন্তোষ।” এই দুই প্রকারের অল্পভবই যে তিনি পূর্ণ মাত্রায় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার রচিত সাহিত্য, এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পূর্ণ জীবন। জীবনের লক্ষণ হইতেছে নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তন। যাহা জড়ধর্মী তাহারই পরিবর্তন থাকে না। তাই ফরাসী দার্শনিক জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—পরিবর্তন, পরিবর্তন, ক্রমাগতই নিরন্তর পরিবর্তনই জীবন এবং তাহাই সত্য। কবির প্রতিভা-নির্ঝরিতরী যেদিন স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত তিনি ‘অকারণ অবারণ চলার’ আবেগে নিজে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত বদ্ধ গুণ ও সকল প্রকারের গণ্ডির প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্তের অভিসারে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানব-সমাজকে চলিতে আহ্বান করিতেছেন—

আগে চল আগে চল ভাই।

প’ড়ে থাক গিছে,

ম’রে ঝাঁক মিছে,

বেঁচে ম’রে কিবা কল ভাই!

বৈদিক যুগে ইতরার পুত্র মহীদাস যেমন তূর্যকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—
চরৈবেতি, চরৈবেতি,—চলো, চলো,—তেমনি রবীন্দ্রনাথও আমাদের
সকলকে ক্রমাগত সীমা অতিক্রম করিয়া সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া স্রুত্বের
পিয়ানী হইয়া অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন।—

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন-রাত্রে চেয়ে থাকি কিছু নয়।

তাই তিনি পাঞ্জি-পুঁথি বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া “মাতাল হ’য়ে পাতাল পানে
ধাওয়া” করিতে বলিতেছেন। কবি নিজেকে যাত্রী বলিয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখতে আমার ধরে।

—গীতাঞ্জলি, ১১৬ নম্বর

কবি পথিক—

পথের নেশা আমার লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

কবির যাত্রা “নিরুদ্দেশ যাত্রা”, মনোহরণ কালোর বাণী তাহাকে ঘর ছাড়াইয়া
উদাসী করিতে চায়—জাপান-যাত্রী, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা। নির্ঝর ও নদী তাঁহার
গতি-উন্মুখ চিত্রের প্রতীক, বলাকা তাঁহার সহধর্মী, সেই বলাকার পক্ষপন্থির
মধ্যে কবি এই বাণী ধনিত গুনিয়াছেন—“হেথা নয়, হেথা নয়, অগ
কোনোখানে।”

কবি রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী বলিয়া তিনি যেমন অনন্তের স্রুত্বের পিয়ানী,
তিনি এই চিরজনমের ভিটাতে এ সাত-মহলা ভবনে বহুজন্মের বৃকে প্রবাসী
হইয়া থাকিতে চাহেন না, কবি অনন্তের অন্তরে অন্বেষণ করেন যে—“সব
ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।”

কবির আকাঙ্ক্ষা—“ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।”
—প্রবাসী, উৎসর্গ। জগতে ছোট তুচ্ছ বলিয়া কিছু নাই। সীমাকে
লইয়াই অসীম, সীমাকে ছাড়িয়া দিলে অসীম শূন্যতা। তাই তিনি কবি-সাধক
লাজর ছায় দেখিয়াছেন যে—

ধূপ আঁপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধ,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে ক্ষুড়ে।

হুয় আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দ,

ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় হুরে।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,

রূপ পেতে চায় 'ভাবের মাঝারে ছাড়া'।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,

সীমা চায় ত'হে অসীমের মাঝে তারা। —উৎসর্গ, আবর্তন

ছোটকে এবং তুচ্ছকেও কবি অসামান্য অসীম রহস্যময় বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সর্বস্বভূতি ও একাচ্ছতা এত প্রবল হইতে পারিয়াছে। তিনি 'বহুস্ররা'র সর্বদেশে সর্বজীবের জীবন-লীলা উপভোগ করিতে উৎসুক। কবি যে ঘর বাঁধিয়াছেন তাহা 'অবারিত'—

এরে কে বঁধেছে হাটের মান্দে,

আনাগোনার পথে? —গেলা, অবারিত

কবির 'পুরাতন ভূতা' জতিপ্রশাস্ত কুম্ভকান্ত, রাজা ও রাণী নাটকের ভূতা শঙ্কর, খোকাবাবুর প্রত্যাভূতন গল্পের ভূতা রাইচরণ, কবির নিজের ভূতা মোমিন মিক্সা (চৈতালি, কর্ম; ছিন্নপত্র ৩৩৮ পৃষ্ঠা; সাহিত্যতরু, প্রবাসী ১৩৪১ বৈশাখ, ১২ পৃষ্ঠা) পশ্চিমা মজুতের মধ্যে নেড়া-মাথা ভাটের 'দিদি' (চৈতালি), ছই বিবা জমির উজ্জ্বল মানিক উপেন, দেবতার গ্রাস হইতে রাখালকে রক্ষা করিতে প্রাঙ্গসী মৈত্রমহাশয়, একবন্দা অতিদীন্য তিথারিলী রমণীর শ্রেষ্ঠভিক্ষা, সকলেই কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাঁহার কাছে তুচ্ছ বা পর নহে। এইরূপে কবি তাঁহার গম্ভীর, পথগম্ভীর ও কবিতার মধ্যে কত নগণা মানব-জন্দের উপেক্ষিত সুখ-দুঃখ, তুচ্ছ মানবেরও মহত্ত্ব এবং মানব-চিত্তের বিচিত্রতা দেখাইয়াছেন,—তাঁহার সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেখানো সহজ কাজ নহে। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের মরমী দরদী কবি 'পলাতক' কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতায় তাঁহার নিপুল হৃদয় দৃষ্টির ও অসামান্য সুন্দর সৃষ্টির পরিচয় দিয়া আমাদের কাছে মুগ্ধ করিয়াছেন।

কবির হৃদয় দৃষ্টির আরও পরিচয় পাই কবিকার কবিতা-কণাগুলির মধ্যে। কবি দিব্য দৃষ্টি দিয়া সামান্তের মধ্যেও অপকূপের ও মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সামান্য ঘটনার মধ্যে যে কী গভীরতা নিহিত থাকে তাহা তিনি 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন;

কবির দার্শনিক মন আপাত-দৃষ্টির অন্তরালে মহৎ তত্ত্ব সহজেই আবিষ্কার করিতে পারে।

কবির জীবনের উদ্দেশ্য বা মিশন যে কি তাহা তিনি বহু প্রকারে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। শৈশব-রচনা ‘কবিকাহিনীর’ মধ্যে কাব্যের নায়ক ‘কবি’র চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রময় বিশ্ব-প্রেমই মাহুষের জীবনের কাম্য বস্তু। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের লেখা ‘নিষ্করের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন যে মহাসাগরের সহিত মিলিত হইতে পারাতেই জীবন-নদীর সার্থকতা। ‘স্রোত’ নামক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছি ভাই,
চলেছে যেথা রবি-শশী চলো রে সেথা গাই !

* * *

জগৎ পানে যাবিনে রে, আপন পানে যাবি ?
সে যে রে মহা মরুভূমি, কি জানি কি যে পারি।

* * *

জগৎ হ’য়ে রব আমি, একলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হ’লে একটু জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই,
বাতাস পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ’য়ে গাই !

* * *

মায়ের প্রাণে রেহ হ’য়ে শিশুর পানে ঘাই,
ভুখীর সাথে কাঁচি আমি ভুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই।
জগৎ-স্রোতে দিবানিদি ভাসিয়া চ’লে যাই।

‘প্রভাত-উৎসব’ নামক কবিতায়ও কবি বলিয়াছেন—

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাছিছে একি গান।

* * *

ধুলির ধূলি আমি, রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি তাই ব’লে জগৎ-চরাচরে।

কবি বিষমোহাগিনী লক্ষ্মীকে অথবা জীবনদেবতাকে আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন—

আমি তব মালকের হব মালিকর।

‘পুরস্কার’ কবিতায় তিনি কবির মিশনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অস্তর হ’তে আধরি’ বচন
অনন্দলোক করি বিরচন.
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

• • •

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মামুষ ফিরিছে কণা পুঁজে পুঁজে,
কোকিল যেমন পকমে কুঞ্জে,
মাগিছে তেমনি সুর।
ঘুচাইব কিছু সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদ্যারের আগে দু-চারিটা কণা
রেখে দাব স্মরণর।

ঠিক এই কথাই তিনি কবি-চরিত কবিতার মধ্যেও বলিয়াছেন—

আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে-দুখে লাজে ভয়ে,
পরজি’ ছুটিয়া খাই জয় পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্ডে মাতিয়া।
যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বৃকের কাছে,
স্তোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শায়ব-বাস্তে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত ত্রিণে হরিতে,
সেই গন্ধই পড়েছে আমার কাশী,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন বাসী,
সে আভা আমার নয়নে কেলেছে ছায়া,—
আমার দ্বাধারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

• • •

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যাবে,

আমি তাহাদের গঁথে দ্বিধা গীতরবে,

লাজুক হৃদয় যে-কথাটি নাহি কবে,

হরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে ।

কবি সকলেরই মুখপাত্র । এইজন্ত কবির কোনো নির্দিষ্ট বয়স নাই, কবি বলেন—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,

তাহার পানে নজর এত কেন ?

পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো

সবার আমি এক-বয়সী জেনো ।

তাই কবি শিশু ভোলানাথের সহিত অহেতুক আনন্দে ছেলেখেলা করিতেও পারেন, এবং প্রবীণ পাকা যাহারা জগৎ মিথ্যা মনে করিয়া পরকালের ডাক স্ত্রুতিতেই ব্যস্ত তাহাদের জগৎ নৈবেদ্যও সাজাইয়া দেন, ধৈর্য্যও জোগাড় করেন, গীতাঞ্জলি রচনা করেন, গীতিমালা গাঁথিয়া তুলেন ।

কবির কোনো বয়স নাই বলিয়া তিনি চিরনবীন, চিরযুবা, তিনি সবুজের অভিযানে অশ্লেষভাবে যাত্রা ক'রে শুরু পালের 'পরে লাগান ঝড়ো হাওয়া' : কাক্তনী নাটকের সমস্তটাই তো নবীনতার জয়গান । সেখানে বুঝকদল জোব গলায় বলিয়াছে—

আমাদের পাকবে না চুল গো,—মোদের

পাকবে না চুল ।

চিরযুবা কবি কর্তব্যে নিরলস, তিনি কেবল লোটাস্-স্টটার নহেন, তিনি কমিশ্রেট । তাহার কাছে নানা দিক্ হইতে কর্তব্যের আহ্বানের 'আবার আহ্বান' আনে, সে আহ্বান অশেষ । তিনি কর্তব্যের 'শঙ্খ' ধূলায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কখনো স্থির থাকিতে পারেন না, আরাম-বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া অশেষের আহ্বানে তিনি রজনীগন্ধার মালা ফেলিয়া রক্তজ্বার মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন । 'বর্ষশেষ' তাহার কাছে নূতনেরই বার্তা বহন করিয়া আনে, তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

চাৰো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না গগন ক্রন্দন,

হেরিব না দিক্,

গণিব না দিন ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,

উদ্দাম পথিক ।

পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমণ

৩২১

যুদ্ধে করিব পান স্ফূর্ত ফেনিল উল্লসিততা

উপকণ্ঠ ভরি'—

পির শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ খিক্কার লাহুনা

উৎসর্জন করি'।

কবির কাছে হুঃখরাতের রাজা যখন হঠাৎ ঝড়ের সাথে আসিয়া অভ্যর্থনা দাবী করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিমুগ্ধ করেন না, তিনি আপনাকে ডাক দিয়া বলেন—

ওরে দুয়ার খুলে যে রে, বাজা শব্দ বাজা,

গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার গরের রাজা।

বজ্র ডাকে গুলুতলে,

বিদ্রোহের ঝিলিক কলে,

ছিন্নশরন টেনে এনে আড়িনা চোর রাজা,

ঝড়ের সাথে চড়াং এলো হুঃখরাতের রাজা।

—খেয়া, আগমন, ১৩ পৃষ্ঠা

‘দুঃসময়’ যখন আসে তখনও কবি নিভ্র, যদি কোনো আশ্রয় নাই থাকে, যদি কোনো আশা নাই থাকে, তথাপি কর্ম হঠতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে চলিবে না, যাহা থামাইলে চলিবে না।—

যদিও সন্ধ্যা আঁধারে মন্দ মগুরে,

দগ সন্ধ্যাত পেতে হইতে আঁধার,

যদিও দক্ষিণে নাই অনন্ত অধরে,

যদিও দক্ষিণে আঁধারে অজ্ঞে নামিরা,

মহা আশ্রয় জাগিছে মেনে মগুরে,

কিন্তু দগুর অবশুণে ঢাকা,

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ কোর,

এখনি অজ্ঞ, বন্ধ করো না পাখা।

—কল্পনা, দুঃসময়

জগন্নাথের বিজয়-রথ যখন বাহির হয়, তখন তাহার রশি টানিবার জন্ত সকলের কাছে আহ্বান আসে, সকলে গুনিতে পায় না, গুনিতে পান কবি। তাই তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি হইতে গুনি—

উড়িয়ে ধরজা অজ্ঞভেদী রথে

ঐ যে ভিদি, ঐ যে বাহির পথে।

আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি',
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে

টাই ক'রে ডুই নে রে কোনো মতে । — গীতাঞ্জলি, ১১২ নম্বর

কবির এই কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে কথা-কাব্যের 'পণরক্ষা' ও 'পূজারিণী' নামক দুইটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া লিখিত কবিতায় ।

চিরঘুবা কবি দুঃখকে জয় করিয়া দুঃখের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন ।—

কিসের তরে অশ্রু বরে, কিসের লাগি ধীর্যবাস ?
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে কর্ব মোরা পরিহাস ।
রিক্ত ঘারা সর্বস্বারা, সর্বজয়ী বিখে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তার! ক্রীতদাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে কর্ব মোরা পরিহাস ।

তিনি দেবী অলম্বীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে ।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভূতাপদে ।
হৃদভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা এঁকে তোমার টিকা
পর্যাপ্ত সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণ কস্তা ছিন্নবাস ।
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে কর্ব মোরা পরিহাস ।

—কল্পনা, হস্তভাগ্যের গান

কবি সকলকে 'শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান' গাহিয়া নদীজলে-পড়া আলোর মতন শিখিল-বোধন জীবন যাপন করিতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

ওরে থাক্ থাক্ কাঁচনি ।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি ।

—ক্ষণিকা, উদ্বোধন

ভাগ্য যবে কুপন হ'য়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃশ্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন ভরা হাসি
গুটে শেষে ওজন-দরে মিলে ।—

তখনও কবি আনন্দ করিয়াই বিশ্বকে অবজ্ঞা করিতেই বলিয়াছেন। দেবতা যখন হুঃখমূর্তি ধরিয়া মালার বদলে ভীষণ তরবারি উপহার দিয়া কবিকে সম্মানিত করেন, তখন কবি বলিতে পারেন—

দ্রুপের বেণে এসেছ দাঁলে তোমারে নাহি ডরিব হে।

যেথায় বাধা সেথায় তোমা নিবিড় করে ধরিব হে।

—বেণা, হুঃখমূর্তি ও ধান

কবি আত্মত্যাগ চাহেন না, তাঁহার প্রার্থনা কেবল এই—

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নচে মোর প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

হুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নষ্ট বা দিলে সামান্য,

হুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে,

নিজের বল না যেন টুটে,

সহায়েরেতে ঘটিলে ক্ষতি,

কতিলে স্বপ্ন বন্ধনা,

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

—গীতাঞ্জলি, ৪ নম্বর

কবি পরাজয়কেও ভয় করেন না, তিনি মুক্তকণ্ঠে বিধাতাকে বলিতে পারিয়াছেন—

হারের খেলাই খেলিব মোরা,

বসন্ত যদি হারের দলে।

* * *

হেরে তোমার করব সাধন,

ক্ষতির সুরে কাটব বাঁধন,

শেষ ধানেতে তোমার কাছে

বিকিয়ে দেবো আপনারে!

—বেণা, হার

কারণ, কবি জানেন যে বিফলতা সফলতারই সোপান-পরস্পরা মাত্র।—

জীবনে যত পজা হলো না সারা,

জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

এবং—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
 ধূলয় ভাঙের যত হোক অবহেলা,
 পূর্বের পদ-পরশ ভাঙের 'পরে ।

—গীতাঞ্জলি ও গীতালি

কবি হুঃথকে জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুখে হুঃথকে একেবারে অস্বীকার করেন না, সুখে পুষিয়া হুঃথকে ভুলিয়া থাকিতে চাহেন না, আবার হুঃথের মধ্যে সুখেও বিস্তৃত হন না । Shakespeare যেমন বলিয়াছেন যে—The fire in the flint shows not till it be struck. তেমনি আমাদের কবিও বলিয়াছেন—

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
 গন্ধ কিছুই নাহি চালে,
 আমার এ দীপ না জ্বালালে
 দেয় না সে ভৌঁ জ্বালো !
 সন্ধ্যায় মোর তীর দাঁহন জ্বালো !

তাই কবি জানেন যে—

হাসিকান্না হীরাপাত্রা মোলে ভাল,
 কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে ভাল,
 নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাড়ে পাতে,
 তাতা খেঁপে তাতা খেঁপে তাতা খেঁপে । —রাজা
 বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ।
 দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরাফুলের খেলা রে ? —রাজা

“আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিটে নূতন, একপিটে পুরাতন । যখন উটে পড়েন, তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল ; আবার যখন পাটে নেন, তখন সকাল-বেলায় মলিকা, সন্ধ্যা-বেলায় মালতী,—তখন কাঙ্ক্ষনের আশ্রমজরী, চৈতন্যের কনকচাঁপা । উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে প্রকোচুপি ক’রে বেড়াচ্ছেন ।”

—ঋতু-উৎসব, বসন্ত

আমাদের কবি সত্য শিব সুন্দরের পূজারী । সত্য কঠোরমুতি, কড়া মনিব, তাহাকে যে অর্থ্য দিতে হয় তাহা হুঃথেরই অর্থ্য । এইজন্য তিনি ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ‘জাম্ববত’ ধারণ করিবার যে ‘দীক্ষা’ প্রার্থনা

করিয়াছেন তাহা বীরের যোগ্য সংগ্রামের দীক্ষা। দেশের জ্ঞাত
তিনি যে ‘জ্ঞান’ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা অশান্তির পরপারে যে শান্তি
আছে তাহাই (নৈবেদ্য)। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তো জড়ত্ব, অশান্তির মধ্য
দিয়া যে শান্তি উপার্জন করিয়া লইতে হয় তাহাই বীরের কাম্য। কবি
অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলিয়াছেন—

মনেরে আজ কহ যে,

ভালো-মন্দ তাহাই আত্মক,

সত্যেরে লও সহজে। —কবিক।

সত্যসঙ্গ কবি আরও বলিয়াছেন—

আরাম হ’তে ছিন্ন ক’রে

সেই গভীরে লও গো মোরে

অশান্তির অন্তরে যেপায়

শান্তি স্মরণ।

কবি ত্রায়ধর্মের সমর্থক, অত্মায়ের তীব্র প্রতিবাদী, ইহা তিনি তাঁহার
জীবনে ও রচনায় দেখাইয়াছেন—‘গান্ধারীর আবেদনে’ এই ত্রায়নিষ্ঠা স্পষ্ট
হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

যিনি শিব, তিনি তো কেবল আরামের দেবতা নহেন, তিনি আবার
রুদ্ধ। এই রুদ্ধকে স্বীকার করিয়াই শিবের আরাধনা করিতে হইবে।—
‘এক হাতে ওর কুপান আছে, আরেক হাতে হার’।—গীতালি।

কবি বীরধর্মী, তাই তিনি সর্বক্ষেত্রে কাপুরুষতাকে, সঙ্কীর্ণতাকে দিক্কার
দিয়াছেন, রুদ্ধতা হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।
আমাদের এই নিশ্চেষ্ট জীবনকে কবি দিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—‘ইহার চেয়ে
হেতম যদি আরও বেছরিন!’ একদিকে সকল সংস্কার হইতে মুক্তিলাভের
জ্ঞান যেমন তাঁহার “হরষন্ত আশা” দেখা যায়, তেমনি আবার কাপুরুষতাকে
তিনি বিদ্রোহে বিদ্ধ করিয়াছেন, একদিকে ‘হিং টিং ছট্’ বলিয়া কুসংস্কারকে
বাস্তব করিয়াছেন, অপর দিকে নিরীহ ধর্মপ্রচারক খ্রিস্টান পাদ্রীর মাথায়
রক্তপাত করিয়া দেওয়ার কাপুরুষতাকে দিক্কার দিয়াছেন—

তখন রে লাগাও লাঠি,

কোমরে কাপড় খাঁটি,

হিন্দুধর্ম হটুক রক্তা, হুটানো হোক মাটি।

* * *

পুলিশ আসিছে তঁ'তা উচাইয়া, এই বেনা দাও দেড়।

ধস্ত হইল আর্থধর্ম, ধস্ত হইল গেড়। —মানসী, ধর্মপ্রচার

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় দান আমি মনে করি,—আমাদের বুদ্ধিকে সকল সংস্কার ও বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া। এই কথা তিনি বিসর্জন নাটকে প্রথাগতপ্রাণ গতানুগতিক রম্যুপতির জ্বালনী জয়সিংহকে বলিয়াছেন—“আপন বুদ্ধিরে করিলি সকল হ’তে বড়।” দুঃখ-ভয় ও মৃত্যু-ভয় হইতে আমাদের মনকে মুক্তি দিবার প্রয়াসও কবির মহৎ দান।

কবির দেশমুরাগ আবালা যে কিরূপ প্রবল তাহা তাঁহার জীবনস্বয়ি ও সমস্ত কাব্য সাক্ষ্য দিতেছে। কবি কল্পনা-বিলাস ছাড়িয়া কর্মজীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—“এবার ফিরাও মোরে”। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি ও মানব-প্রীতি যে কিরূপ প্রবল তাহার সাক্ষী এই কবিতাগুলি—বঙ্গমাতা, স্নেহগ্রাম, ভারতভীর্ণ, অপমানিত, প্রাচীন ভারত, শিক্ষা, ‘কথা’ কাব্যের সমস্ত কবিতা, এবং জাতীয় সঙ্গীতগুলি : কবি “দীনের সঙ্গী” হইয়া “ধূলানন্দিরে” দেবতার আরাধনা করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে

করছে চাষা চাষ,

পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পণ,

খাটছে কারো মাস।

রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাপে,

ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,

তারই মতন শুচি বসন ছাড়ি’

আয় রে ধূলার ‘পরে।

—গীতান্তলি

“বিশ্ব সাপে যোগে যেথায় বিহারো,

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ;”

কবি অমুভব করেন যে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ’তে দীন,

সেইখানে যে চরণ তোমার রাজ্যে,

সবার পিছে, সবার নীচে,

সব-হানাদের বাকে।

—গীতান্তলি

কবি দেশের অতি সামান্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের আত্মীয় হইতে ইচ্ছা করেন—

ওদের মাঝে মেলাও, বারা চরায় তোমার ধেমু । গীতিমালা

কবির কাছে এই ধরমী তীর্থদেবতার মন্দির-প্রাপ্ত (গীতালি), আবার তাঁহার স্বদেশ মহামানবের সাগর-তীর বলিয়া ভারত-তীর্থ (গীতাঞ্জলি)। কবি তাঁহার স্বদেশকে বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি মনে করেন—

তে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি

ধেপা দিলে আজ কী বেশে ?

দেখিমু তোমারে পূর্ণ গগনে,

ধেপিমু তোমাতে স্বদেশে । —উৎসর্গ

বিশ্বের মধ্যে কবি বিশ্বেরকে উপলব্ধি করেন বলিয়া বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার কাছে জড় মাত্র নহে। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী (চিত্রা)—তিনি প্রকৃতিকে সংগোধন করিয়া বলিয়াছেন যে—

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা,

আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা ।

—চিত্রা, জ্যোৎস্না রাতে

প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের আনন্দের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বগামী কবিরা এতদিন কেবল মাত্র প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিই নববর্ষার সমারোহ দেখিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,

ময়ূরের মতো নাচে রে ।

কবি যখন শৈশবে ভূত্যরাজকন্তরের শাসনে একটি বরের মধ্যে খড়ির গণ্ডিতে বন্দী হইয়া ছিলেন, তখন অতি দুর্লভ বলিয়া প্রকৃতির সহিত ফাঁকে-কুকোরে যে চোরা-চাঁহনির বিনিময় হইয়াছিল, সেই গুপ্তপ্রণয় কবি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

প্রকৃতির দুই রূপ,—রক্ত আর শান্ত,—দুই রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। কাল বৈশাখীর ঝড়, সিক্তরক্ত, বর্ষশেষের ঝড়, কবিকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছে, তেমনি আবার শরৎ, বসন্ত, বর্ষা ঋতুর শান্ত সৌন্দর্যও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

তাই কবি বলিয়াছেন—‘আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে’। মানবের মনে প্রকৃতির সৌন্দর্যসজ্জাত আনন্দ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানবের মনন মিলাইয়া কবি উভয়ের ভেদ-রেখা লুপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। কুটীরবাসী পাখী, নীলমণি লতা, আশ্রম-বৃক্ষ, কেহই তাঁহার সমাদর হইতে বঞ্চিত হয় নাই (বনবাণী)। কবির বৃক্ষবন্দনা যেন বৈদিক ঋষির সৃষ্টির ন্যায় উদাত্ত গম্ভীর মনোহর।—

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে.

চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।

—গীতাঞ্জলি

পূর্বেই কবির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি বলেন—“জীবের মধ্যে অনন্তকে অমুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অমুভব করারই নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।” এই জ্ঞান কবি নর-নারীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনা মনে করেন, তাহা ইহজীবনের ভোগেই পরিসমাপ্ত বা পর্যবসিত হয় না, তাহা জন্মজন্মান্তরের সাধনার ধন। তাই কবির কাছে নর-নারীর প্রেম নির্মল, প্রশান্ত, বিক্ষোভবিহীন। অনন্ত প্রেম, সুরদাসের প্রার্থনা, প্রেমের অভিষেক, পরিশোধ প্রভৃতি কবিতায় কবির মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ যে কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন মজুমদার ‘নির্ভয়’ নামক কবিতায়—

আমরা দুজনা স্বর্ণ-পেলনা গড়িব না ধরণীতে.

মৃগ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।

পঞ্চশরের বেদনা-মাপুরী দিয়ে

বাসর-রাত্রি রচিল না মোরা, প্রিয়ে।

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।

কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি!

কবির কাছে নারীপ্রেমে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ একান্ত হইয়া উঠে নাই, ‘নিষ্ফল কামনা’ কবিতায় (‘মানসী’) কবি বলিয়াছেন—আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের। অতএব ‘নিবাণ বাসনা-বহিঃ নয়নের নীরে’।

নর-নারী যখন ‘হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’ এবং ‘নিমেষে শতক যুগ দূর হেন মানে’ তখন তাহারা অনেক সময়ে কামনার কলুষে প্রিয়তমকে কলঙ্কিত করে তাই কবি তাহাদিগকে বলিতেছেন—

যে প্রাণ আলো ঘেবে তাহে ফেল হাস,

যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ

—কড়ি ও কোমল, পবিত্র প্রেম

যখন মানব-চিত্ত পূর্ণ মিলনের জ্ঞাত ব্যাকুল হইয়া প্রিয়ের মধ্যে আপনাকে ও
আপনার মধ্যে প্রিয়কে বিলীন করিয়া দিতে চাহে অথচ পারে না, তখন
তাহাদের সেই ব্যর্থতাকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

একি ছুরাশার স্বপ্ন হয় গো ষ্টম্বর,

তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌ খানে ।

—কড়ি ও কোমল, পূর্ণ মিলন

কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে দুই রূপে দেখিয়াছেন, একটি তাহার ভোগের রূপ,
অপরটি তাহার কল্যাণী রূপ। ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ এবং ‘দুই নারী’ নামক
কবিতাদ্বয়ে তাঁহার এই অভিমত পরিবাস্ত হইয়াছে। নারী একদিকে যেমন
রাত্রির নর্মসখী উর্বশী, অপর দিকে সে তেমনি প্রভাতের লক্ষ্মী কল্যাণী। এই
কল্যাণী মূর্তিকে বন্দনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

সর্বশেখের গানটি আমার আছে তোমার তরে ! —কণিকা

নারী কবির কাছে অবলা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যে আত্মশক্তির অমিত
সম্ভাবনা নিহিত হইয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে সে অচেতন বলিয়াই সে অবলা
হইয়া অবহেলিত ও নির্ধারিত হয়। তাই তেঁা কবি সাধারণ মেয়েকে সম্বোধন
করিয়া হুঃখ করিয়াছেন—

হায় রে সামান্য মেয়ে,

হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয় !

তাই তিনি সকল নারীকে বিধাতার শক্তির অপব্যয় হইয়া না থাকিয়া ‘সবলা’
হইতে আহ্বান করিয়াছেন—

নারীকে আপন ভাগ্য ভয় করিবার

কেন নাট দিবে অধিকার,

হে বিধাতা !

* * *

দাব না বাসর-কক্ষে বধুবশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,

আমারে প্রেমের বীর্ষে করো অশঙ্কিনী !

বীর-হস্তে বরমালা লব একদিন,

সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
 ক্ষীণদীপ্তি পোষুলিতে ।
 কতু তারে দ্বিষ না ভুলিতে
 মোর দৃশ্য কটিনতা
 বিনম্র দীনতা
 সম্মানের যোগ্য নহে তার,
 কেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার ।

* * *

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যসীমা,
 রক্তে মোর জাগে রক্তবীণা,
 উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
 জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন করে
 কণ্ঠ হ'তে
 নির্ধারিত শ্রোতে ।
 যাগা মোর অনির্বচনীয়
 তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয় । —মহুয়া, সবলা

সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদাও এই কথা অজু'নকে বলিয়াছিলেন—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী ।
 পূজা করি' রাখিব মাথায় সেও আমি
 নহি ; অবহেলা করি' পুথিয়া রাখিব
 পিছে, সেও আমি নহি । পাশে যদি রাখো
 মোরে সঙ্কটের পথে, দুঃস্থ চিত্তার
 যদি অংশ দাও, যদি অসুখি করো
 কটিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
 যদি স্থখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
 আমার পাইবে তবে পরিচর । —চিত্রাঙ্গদা, শেষ দৃশ্য

নারীর নারীত্ব যে সর্বাবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা অবস্থা ও সময়
 বিশেষে স্রুপ্ত থাকে মাত্র, এই কথা কবি প্রচার করিয়া নারীর মর্যাদা রক্ষা
 করিয়াছেন । পতিতা নারীর মধ্যেও তাহার জন্মের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য দেখিয়া
 তাহাকে কবি সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই । পতিতা নারীকে দিয়া তিনি
 বলাইয়াছেন—

নাহিক করম, লজ্জাসরম,

জানিনে জনমে সতীর প্রথা,

তা বলে নারীর নারীষটুকু

ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা ! — কাহিনী, পতিত

পতিতার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখাইয়া কবি ছুটি সনেট লিখিয়াছেন, তাহার একটির নাম ‘করণা’ ও অপরটির নাম ‘সতী’ (চৈতানি) ।—

অপরাজে স্থলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড় ; কর্মশালা হ’তে
ফিরে চলিয়াছে বারের পরিশ্রান্ত জন
বীধমুক্ত তটিনীর প্রান্তের মতন ।
উল্লসনে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথীর কশাঘাত পেয়ে ।
হেনকালে দোকানীর পেলা মুখ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাজ মেলে ।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি’,
পাষণ-কট্টিন পথ উঠিল শিহরি !
সহসা উঠিল শৃঙ্খল বিসম্প কাহার !
স্বর্গে যেন মহাদেবী করে হাঙ্গামার !
উল্লসনে চেয়ে দেখি অলিত-বসনা
লুটায় লুটায় ভূমে কাঁধে বারান্দনা !

পতিতার মনে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শে এক নিমেষেই যেমন,—

জননীর রেহ, রমণীর ধরা,

কুমারীর নব-নীরব-ঐতি

আমার সম্মুখ-বীণার তন্ত্রে

বাজায় তুলিল মিলিত গীতি !

তেমনি সামাজিক বিচারে কলঙ্কিনী নারীও প্রেমের একনিষ্ঠতা ও প্রেমের জন্ত
দুঃখ-বরণের দ্বারা সতীত্বের মর্যাদা পাইবার যোগ্য হইয়া উঠে—

সতীলোকে বসি’ আছে কত পতিব্রতা

পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাহাদের কথা ।

আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী

খ্যাতিহীন কীর্তিহীন কত না কামিনী,—

শুধু শ্রীতি ঢালি' দিয়া মুছি' ল'য়ে নাম

চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি' মর্ত্যধাম।

তারি মাঝে বসি' আছে পতিতা রমণী,

মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি! —চৈতালি, সতী

কবি রবীন্দ্রনাথ মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি উভয়ের মধ্যেই অনন্তরহি লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই ক্ষুদ্র নয়। তিনি বলিয়াছেন—‘ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিন্তের স্থাপনা!’ এই চিন্তা-স্থাপনার ফলে তিনি বিশ্বরূপের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা অতি সহজেই অল্পভব করিয়াছেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি, ব্রহ্ম-সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে কবির আধ্যাত্মিকতার ক্রম-পরিণতির ও নিবিড়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভগবান কখনো প্রভু, কখনো বন্ধু, কখনো বা প্রিয় বা প্রিয়া, কখনো বা কেবল মাত্র ‘তুমি’ বা ‘তিনি’, কখনো বা একেবারে নির্বাক্তিক। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক কবীর, দাদু, নানক, রজ্জবজ্জী, মালিক মহম্মদ জায়েসী প্রভৃতি, এবং হুফী সাধকেরা ভগবানকে লইয়া সাম্প্রদায়িকতার টানাটানি ও বিরোধ দেখিয়া ভগবানকে কোনো নামে অভিহিত করেন নাই। যিনি সকল নাম-রূপের অতীত তাঁহাকে কোনো একটি বিশেষ নামে অভিহিত করিলেই তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা হয়। এইজন্য আমাদের দেশের বাউল ও ভাটিয়াল গানে ভগবান কখনো দবদী, কখনো দাঁই, কখনো বন্ধু, কখনো বা কেবল মাত্র সর্বনাম অর্থাৎ যাহা সকলেরই নাম। রবীন্দ্রনাথের ভগবান কোনো বিশেষ নামে চিহ্নিত হন নাট বলিয়াই তাঁহার গীতাঞ্জলি প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক কাব্য সর্বধর্মের সাধকদের সমাদরের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে। কবির আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি কেবল মাত্র রুদয়ের আবেগ বা e-motion নয়, তাহা যুক্তির ভিত্তির উপরে স্থাপিত, অপ্রমত্ত, বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর। এইজন্য কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে 'ধর্ম' নাহি মানে,

মুহুর্তে বিফল হয় নৃত্য-গীত-গানে

ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানগারা

উদ্ভাস্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি-মদধারা

নাহি চাচি নাথ। দাও ভক্তি শাস্তি-রস,

দ্বিধা হৃদা পূর্ণ করি' মঙ্গল-কলস

সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর সর্ব কর্মে দিবে বল,
বার্ষ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্বপ্রমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব স্থখে দীপ্তি
দাহতীন। সখরিয়া ভাব-অগ্রণীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমৃত গভীর — নৈবেদ্য, অগ্রযজ্ঞ

অথচ কবির এই আধ্যাত্মিকতা কেবল মাত্র শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচার-বিতর্ক
নহে,—এই আধ্যাত্মিকতার সরস প্রেম-মধুর আশ্র-নিবেদনের ও প্রিয়-মিনন-
সজ্জাত আনন্দের অভাব নাই।

কবি আনন্দময়েরই উপাসক, তাঁহার কাছে—‘আনন্দই উপাসনা
আনন্দময়ের!’—চেতালি, ‘অভয়’। কবির কাছে ‘দ্বারে বলে ভানবাসা
তারে বলে পূজা!’—চেতালি, ‘পুণ্যের হিসাব’। কারণ—‘আর পাবো কোথা,
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!’—সোনার তরী, ‘বৈষ্ণব কবিতা’।
কবি জানেন—

নিত্য-কাল মহাপ্রমে বসি’ বিশ্বদূপ

তোমা-মাঝে হরিছেন আশ্র-প্রতিরূপ! —চেতালি, ধান

কবি শুনিতে পান—‘জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে।’ এবং তিনি
জানেন—‘জগতে আনন্দ-যজ্ঞে “গ্রাম্যার নিমগ্ন’। কবি বিশ্ববাসীকে আহ্বান
করিয়া বলিয়াছেন—

আনন্দের সাগর থেকে এসেছে আজ বান,

দাড়ি ধরে আজ বহুরে সবাই, টানয়ে সবাই টান! —গীতাঞ্জলি

কবির দেবতা কখনো রাজার ছলল হইয়া দ্বারে উপনীত হন, হৃদয়ের
মণিহার উপহার পাইবার জন্ত, কখনো তিনি বর ও বধূ-রূপে কবির মনোহরণ
করেন। কবি নাম-রূপহীন অপকৃপের প্রেমে মগ্ন। কবির এই মিস্টিসিজ্‌ম্
সলোমনের সাম, ডেভিডের গীতি, সেন্ট্‌ ফ্রান্সিস্‌ অফ অ্যাসিসি, টমাম্‌ এ
কেম্পিস্‌ প্রভৃতি ও সুফী কবিদের ভক্তির উক্তি স্বরণ করাইয়া দেয়।
ভগবানকে বর-রূপে বধূ-রূপে বোধ করা বৈষ্ণব-ভাব-সাধনার একটা অঙ্গ।
বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর সবাই গোপী। তাই চৈতন্যচরিতামৃত-
গ্রন্থের রচয়িতা প্রার্থনা করিয়াছেন—

অন্তের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
 মনে বনে এক করি' জানি ।
 তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
 তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি ॥
 প্রাণনাথ । শুন মোর সত্য নিবেশন । —চ, চ, মধ্য ১৩

ইংরেজ কবিরাও ভগবানকে বর ও বঁধু রূপে অমুভব করিয়াছেন ।

What if this Friend happen to be—God.
 —Browning, *Fears and Scruples*.
 For me the Heavenly Bridegroom waits ;
 —Tennyson, *St. Augustine's Eve*.
 The bridegroom of my soul I seek,
 Oh, when will he appear ! —Cowper.

কবি রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ কোনো বিশেষ স্ত্রথময় প্রলোভনময় স্থান মনে
 নহে। কবি কল্পিত স্বর্গ হইতে এই মাটির ধরলীকে অধিক গমতাময়ী পুণ্যময়ী
 মনে করেন, তাই তিনি স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময় কিছু-
 মাত্র বেদনা তো অনুভব করেনই নাই, বরং আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।
 এই স্বর্গ ভগবানের রচনা নহে, তিনি ইহা রচনা করিবার ভার সকল মানবের
 উপরে দিয়া রাখিয়াছেন—

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরলী তোমার
 মিলাইয়া আলোকে আঁধার !
 শূন্য হাতে সেধা মোরে রেখে
 হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে ।
 দিয়েছ আমার 'পরে ভার
 তোমার স্বর্গটি রচিবার —বলাকা, ২৮ নম্বর

কবি স্বর্গ-সম্বন্ধে কি মনে করেন তাহা তাঁহার বলাকার একটি কবিতায়
 স্পষ্ট হইয়াছে ।

স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা ভাই !
 তার ঠিক-ঠিকানা নাই ।
 তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ
 ওরে নাই রে তাহার দেশ,
 ওরে নাই রে তাহার দিশা
 ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা !

কিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে

কাকির কাকা মানুষ !

কত যে-গুণগুণির পুণ্যে

জন্মেছি আজ মাটির 'পরে' পূলা-মাটির মানুষ ।

স্বর্গ আজি কুতার্গ তাত্ আমার মেতে,

আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,

আমার বাকুল পুকে,

আমার লজ্জা, আমার লজ্জা' আমার দুঃখে সুখে !

আমার জন্ম-দুঃখারি তরঙ্গে

নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে ।

* * *

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি মায়ে-কোলে !

এতাসে সেই পবন ছোট্টে আনন্দ-কলোলে !

স্বর্গ যদি এই মাটির ধরণীর পুকে আমার মধ্যে আমার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এখান হইতে মুক্তি পাইতে কবি চাহেন না ! কেবল মাত্র মুক্তি তো অর্থশূন্য, বন্ধন যদি নাই থাকে তবে মুক্তি হইবে কিসের হইতে ! বন্ধন স্বীকার করিলেই তো মুক্তি পাওয়া যাইবে । তাই কবি বলিয়াছেন—

বিরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় ।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দনয়

সত্যি বন্ধনের স্বাদ । — নবেজ, মুক্তি

কবি বলেন—

মরিতে চাহি না আমি মন্দের ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।

তাই ভগবানের কাছে তাঁহার প্রার্থনা উন্মিত হইয়াছে—

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ ।

কবি সকলের সহিত অনাসক্ত হইয়া যুক্ত থাকিতে চাহেন পদ্যপত্রম্ ইবাশ্রমা ।

আনন্দবাদী কবি মৃত্যুভয় জয় করিয়াছেন, তিনি মনে করেন মৃত্যু এই জীবনেরই একটি অবস্থা ; ফুলের যেমন পরিণতি ফলে, মানুষের যেমন বাল্য যৌবন বার্ধক্য, তেমনি জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,

মরণ, আমার মরণ, তুমি কণ্ড আমারে কথা। —গীতাঞ্জলি

এইজন্যই কবি কিশোর বয়সেই বলিতে পারিয়াছিলেন—

মরণ রে, তুঁহ মম আশ সমান।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ্মাবলী

মৃত্যু কবির কাছে ঝুলন-খেলা, তাহা ইহ-জীবন ও পর-জীবনের মধ্যে দোল খাওয়া। কবীর সাহেব ও সিন্ধী সাধক কবি বেকসু যেমন বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু হইতেছে ঝুলন বা দোলা বা ইহলোকে পরলোকে বল-লোফালুকি খেলা, তেমনি রবীন্দ্রনাথও জানেন যে মরণই জীবনের শেষ নহে, কবি জানেন যে শেষের মধ্যে অশেষ আছে!*

প্রথম-মিলন ভীতি ভেয়েছে বধূর,

তোমার বিরটি মৃতি নিরাশি' মধুর।

সর্বত্র বিবাহ-বাঁশী উঠিতেছে আজি।

সর্বত্র তোমার ফ্রেড হেরিতেছি আজি।

* কবীর মরণকে ঝুলনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

জনম-মরণ বীচ দেহ অন্তর নহী—

দাচ্ছ গুর বান যু' এক এক আটী।

জনম-মরণ জহী তারী পরত হৈ ;

হোত আনন্দ উত্ত গগন গাজৈ।

উঠত ঝনকার তট নাদ অনন্ত ঘুরৈ,

তিরলোক-মহলকে প্রেম বাজৈ।

চন্দ্র তপন কোটি ধীপ বরত হৈ,

তুর নাঞ্জে উত্ত মত্ত তুলৈ।

প্যার ঝনকার উত্ত নুর বরষত রহৈ,

রস পীতৈ উত্ত তত্ত তুলৈ ॥

সিদ্ধেশ্বরের ভক্ত বেকসু মাত্র ২২ বৎসর বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারা যান তিনি মৃত্যুর সময়ে মাতাকে প্রবোধ দিয়া জন্ম ও মৃত্যুকে জগজ্জননী ও পাখির জননীর মধ্যে বল-লোকালুকি খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

উত্তর মাতৃ বীচ খেল চলে—

গেঁব জু মোকো দেই গেঁব।

ইহলোকে যে জীবনদেবতা অস্ত্রযামী আমাকে সার্থকতা দান করেন, তিনিই মরণ-সিদ্ধিপারে অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া দেখা দেন, তখন বিশ্বয়-স্তম্ভিত হৃদয়ে মামুষ বলিয়া উঠে—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা !'

কবি মৃত্যুকে মাতৃপাণির স্থায় পরম নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছেন—

সে যে মাতৃপানি

স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি' ।

* * *

স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,

মুহূর্তে আবাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে । —নেবেল

কবীর যেমন মৃত্যুকে তাঁহার জীবনের বর বলিয়া আনন্দে বরণ করিয়া লইয়া-
ছিলেন, আমাদের কবির কাছেও মৃত্যু সেইরূপ, গৌরীর কাছে ত্রিলোচনের
তুলা ।

ভগবান্ তো মামুষের "এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর !" অতএব
যে মৃত্যু জন্মান্তরের সূচনা করিতেছে তাহাকে ভয় কি ! এইজন্ত কবি নিজেকে
বলিয়াছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়—

আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়—এই শেষ কথা বলে

যাব আমি চ'লে ।

—পরিশেষ, মৃত্যুঞ্জয়

চেই ত জন্ম মোকো মুকো,

পেপু আজ মোকো দেউ ।

—শ্রীমুক্ত ক্রীতমেধন সেনের সংগ্রহ

ইউরোপীয় লেখকেরাও মৃত্যুকে অন্ততঃ সেতু বলিয়াছেন—

Our life is a succession of deaths and resurrections ;
We die, Christopher, to be born again.

—Romain Rolland.

...and still depart
From death to death thro' life and life and find
Nearer and nearer Him, who wrought
Not matter nor the finites-infinite.

—Robert Browning.

Earth knows no desolation.
She smells regeneration
In the moist breath of decay.

—Meredith.

এবং সর্বশেষে কবি এই বলিয়া মনকে অভয় দিয়াছেন—

নব নব মৃত্যু-পথে

তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে ।

আর—

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,

যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই ।

এবং—

অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি'—

ও চিরমুন্দর, আমি তোরে ভালবাসি ।

কিন্তু কবি চিরন্তন, তাঁহার তো মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই ।

এই সকল কারণে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের হৃদয়ের কবি, আমাদের মুখপাত্র, আমাদের মনের অশ্রুট কথাগুলিকে তিনি আকার দিয়াছেন, যে কথা আমরা বলিতে চাই অথবা বলিতে জানি না, সেই-সব কথা তিনি আমাদের হইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাই তিনি আমাদের সকলের এত প্রিয় কবি। তিনি হুঃখে সাস্তুনা-দাতা, আনন্দের সঙ্গী, অবসাদে উৎসাহদাতা, কুসংস্কার হইতে উদ্ধার-কর্তা, বুদ্ধির মুক্তিদাতা। এই কবির আবির্ভাবে বিশ্ব-বাসী যে কত দিকে কত লাভবান হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা হুঃসাধ্য ।

খ। রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রশ্নান সুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন—“ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আদো যখন পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই।……বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাধাবন্ধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু সেখানে সৌন্দর্য ও শ্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের

মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেই পতাকাবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ্য অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের সেতুতে যখন হই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বন্দিগাছিনাম, সর্বশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আনন্দক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল : আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহা একটি ভূমিকা : 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া দাইতে পারে 'সীমার মর্যেই অসীমের সত্তিত মিলন সাধনের পালা'।"

রবীন্দ্রনাথ মাতা শিব স্বাক্ষরের উপাসক; প্রকৃতি মৌল্যের অদূরস্থ ভাগ্যুর; তাই তিনি প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধ প্রেমিক। প্রত্যেক বড় কবির মধ্যে এইটিই প্রধান লক্ষণ যে, তাঁর বর্ণনীয় বিষয়দ্বয়কে ছাড়িয়ে তাঁর ভাব উপচে ছাপিয়ে ওঠে—তাঁর রচনার সীমার মধ্যে তাঁর ভাব বন্ধ থাকতে চায় না; তদতিরিক্ত, সীমার বহির্ভূত একটি কিছু প্রকাশ করবার আকৃতি সেই রচনা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিগে একটি আকুলতাব সূত্র দ্রুত দ্রুত শোনা যায়। সে-সূত্র হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে অবিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্ত অসীমতার সূত্র, যে ভাবটিকে তিনি পরবর্তীকালে রচিত একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন এবং যে-কবিতাটিকে আমি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-চরিত্রিকায় তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সূত্র-স্বরূপ মুখবন্ধ ও ভূমিকারূপে ছেপেছিলাম—

‘দুপ আপনার মিলাইতে চাহে গন্ধ,

গন্ধ সে চাহে বৃণের রথিতে জুড়ে !

সূর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে

ছন্দ কিরিয়া ছুটে যেতে চায় মূর্খে।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে রঙ্গ,

রূপ পেতে চায় স্তাবের মাঝারে ছাড়া।

অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা ।
প্রলয়ে হুজনে না জানি এ কার বৃত্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা ।
বন্ধ কিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা ।"

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান মর্ম-ব্যাখ্যাতা বন্ধুবর অজিত কুমার চক্রবর্তী "ঐকান্তিক ভাব-গতি" নাম দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সীমাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে বাধাকে অস্বীকার ক'রে বা বাধাকে কাটিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চলবার একটা আগ্রহ ও ব্যগ্র তাগাদা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যা লক্ষ্য, তাতে সমৃদ্ধ থেকে তৃপ্তি নেই; অনায়ত্তকে আয়ত্ত করতে হবে, অজ্ঞাতকে জ্ঞান্তে হবে, অদৃষ্টকে দেখে নিতে হবে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাণী, এই হচ্ছে তাঁর প্রধান বক্তব্য।

যেখানে 'গতি' আছে, সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সর্বানুভূতি—জল-স্থল-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্বদেশকালে ও সর্বমানবসমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে মেলো দিতে তিনি নিরন্তর উৎসুক। যে-কবি দেশ-কালকে অতিক্রম ক'রে শাস্বত সত্যকে যত বেশী প্রকাশ করতে পারেন, তিনি তত বড় কবি। রবীন্দ্র এই হিসাবে কবীন্দ্র, তিনি শাস্বত সত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সামান্য প্রাণ-কম্পের মাঝে, শিশুর হাস্য-কণিকায়, ফুলের হিল্লোলিত রূপ-সুধমায়, নদী-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে যে প্রাণ-শক্তি দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে, তাকে তিনি নব নব রূপ, নব নব শ্রী ও অভিনব মহিমা দান করেছেন; তুচ্ছতমও তাঁর কাব্যে মর্যাদা লাভ করেছে, কারণ তুচ্ছতম পুণিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরঙ্গ ব'লে জেনেছেন। নামিগোত্রহীন ফুলের মধ্যে বিশ্ব-স্বপ্নমার আভাস পেয়েছেন, সমাজে ছোট-লোক ব'লে গণ্য অতি সাধারণ লোকের ছেলের মধ্যেও তিনি বিশ্বমানবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে সত্য স্থির। শঙ্করাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ ক'রে গেছেন—"কালক্রয়াবাহিতম্ সত্যম্"—যা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাদে অবস্থিতি করে, যার কস্মিন্ কালেও কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই সত্য। কিন্তু বর্তমান যুগের যুরোপীয়

দর্শনের বাণী হচ্ছে যে, সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়; যার গতি নেই, স্থিতি নেই, তা জড়, তা কখনো সত্য হ'তে পারে না। যার জীবনী-শক্তি আছে সে আর সকল জিনিসকে নিজের ক'রে নিয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করে, তার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে; খণ্ডভাবে দেখলে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল অবিভাজ্য, কাল অনন্ত-প্রবাহ, মহাকালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নেই; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একটি বিশেষ খণ্ডকালের সম্পর্ক, একটি বিশেষ ক্ষণের তুলনায় কবি কালিদাসের কাল তাঁর কাছে ছিল বর্তমান, কিন্তু আমাদের কাছে তা হ'য়ে গেছে ভূত বা অতীত; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের কাছে বর্তমান, কিন্তু তা "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে" "দূর ভাবী শতাব্দীর" লোকেদের কাছে ভূত হ'য়ে যাবে। এই অনন্ত কাল ও দেশ ব্যপে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দেওয়ার 'ইচ্ছাই' রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সূর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবন থেকে পরিণত যৌবন-কাল পর্যন্ত কেবল এই গতির মাহাত্ম্যই প্রচার ক'রে এসেছেন; আমাদের এই নিশ্চল জড়-ভাবাপন্ন পশু দেশে কিশোর কবি অগ্রগতির জ্ঞাত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেছিলেন। আমাদের এই জড়-ধর্মী দেশে আজকাল যে একটু নড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তার মূলে আমাদের এই কবির উদ্বোধিনী বাণীর অনুপ্রেরণা অনেকখানি রয়েছে।

আমরা দেখতে পাই, কবি কিশোর বয়সেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করবার জ্ঞাত "পথিক"-বেশে যাত্রা করেছেন এবং সকলকে তাঁর যাত্রা-পথের সঙ্গী হবার জ্ঞাত আহ্বান ক'রে বলেছেন—

“ছুটে যাও তবে ছুটে আস সব,
অতি দূর দূর যাব;
কোথায় যাইবে? —কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব;—
সমুখের পথ যেখা ল'য়ে যায়,—”

গুণু 'অকারণ অবারণ চলার' আবেগ তিনি বরাবর অনুভব করেছেন, তাঁর "চলার বেগে পায়ের তাল্পার রাত্তা জেগেছে" আকৈশোর। এই গতির আহ্বানেই "নিরন্তরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" হয়েছে। আমাদের কবির "প্রভাত-উৎসব" গতিরই উৎসব :...

'জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি' গাহিছে এ-কি গান।"

প্রভাত-উৎসবের এই গতি অন্তর থেকে বাহিরে এবং বাহির থেকে অন্তরে, গতির এক অপূর্ব গতায়ত ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন অন্তরে গ্রহণ ক'রে আপন অন্তরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মেলে দেবার আনন্দ এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবির অন্তরের গতি-বেগ "স্রোত" হ'য়ে বয়ে চলেছে ; এবং কবি সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

"জগৎ-স্রোতে ভেসে চল', যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল' রে সেথা যাই।"

কবির কাছে যাত্রার আহ্বানই "মঙ্গল-গীতি"—

"যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত-কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে ক'ল মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল।
যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি' ধিংসা ঘেঘ,
যাত্রা করি স্বর্গনয়ী করুণার পথে
শিরে ধরি' সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি' নিজ দুঃখ শোক।"

কবির বোবন-সুলভ হৃদয়াবেগ যখন তাঁর মনোবীণায় "কড়ি ও কোমল" সুর বাজাচ্ছিল, তখনও সেই সুরের মধ্যে গতির মুছনা ধনিত হয়েচে :—কবি লক্ষ্য করেছেন—

"মানব-হৃদয়ের বাসনা
বিশ্বমত করে চাহে, করে ভায় হায়।"

কবি অনুভব করেছেন—

"লক্ষ স্রবয়ের সাথ শূণ্ডে উড়ে যায়
কত দিন হ'তে তারা ধায় কত দিকে।"

সমুদ্রের অস্থিরতা দেখে কবি বলেছেন—

"কিসের অশান্তি এই মগা পারাবারে।
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।"

আমাদের কবি সাগর-পারের অপরিচিতা বিদেশিনীর অভিসারে
"সোনার তরী"তে বার বার "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করেছেন—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে স্তন্যরী?
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।"

কবি শুধু যেতেই চান "অকূল-পাড়ির আনন্দ" অনুভব করবার জন্য—

"নকাল বেলায় যাটে সে দিন
ভাদিয়ে দিলেম নৌকা-খানি,
কোণায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি।"

* * *

"দ্রলুক তরী চেউয়ের পরে,
ওরে আমার জাগ্রত গাণ।
গাও রে আজি নিশাধ-রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।
যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাহি বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাধন-হারা হাওয়ার ডাকে :
ঘোমর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লগ্ন রে বৃকে দু'চাতে মেলি
অস্তবিশীন অজানাকে।"

কবির মনোরাজ্যের “বনের পাখী” এসে “খাঁচার পাখী”কে বাহিরে উড়ে যেতে ডাকাডাকি করেছে; “কত্যা মোর চারি বছরের” “যেতে নাহি দিব” ব’লে কাতর নিবেদন করলেও কবি-চিত্তের যাত্রা স্থগিত হয়নি। কবি-চিত্ত বিশ্ব-ত্রাণেও ছুনিবার গতির আবেগ মধ্যে দুঃখ ও সাস্থনা দুই-ই অমূল্য করেচে—

“এ অনন্ত চরাচরে স্বর্ণ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন ‘যেতে নাহি দিব’। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।”

কবি “মানস সুন্দরী”কে প্রাণ জিজ্ঞাসা করেছেন—

“কোন বিশ্ব-পায়
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে কোন্ লোকে”—

জীবন-মরণের দোলায় কবি “ঝুলন” খেলতে ব্যগ্র; সমগ্র “বসুন্ধরা” কবি-চিত্তের বিহার-ভূমি—

“ইচ্ছা করে আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে…………”

বিশ্ব-বিমুখ স্বার্থপর ক্ষুদ্রতার বেদনা কবিকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন করে বলেছে
“এবার ফিরাও মোরে”—

“হৃদয়ের অশ্রু-জল-ধারা
মস্তকে গড়িবে ঝরি’ তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন-সর্বস্ব-ধন অপিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি’। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি’ স্নান-অঙ্ককারে
চলেছে মানব-দাত্রী যুগ হ’তে যুগান্তর পানে……”

কবি তাঁর “অসুখানী”কে পথিকের চকল সঙ্গীরূপেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন—

“আবার তোমারে ধরিবার স্তরে
ফিরিরা, ঘরিব বনে প্রান্তরে,

পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে,

দুরাশার পাছে পাছে ।”

তিনি “অতিথি অজানা”র সঙ্গে ‘অচেনা অসীম আধারে’ যাত্রা করবার জন্ত উৎসুক ; দিনশেষে কবির যদি বা কখনও তরলী বাঁধবার প্রসোভন হয়েছে, কিন্তু সেও “বহু দূর দুরাশার প্রবাসে” “আসা-যাওয়া বারবার” করার পর কোনও অজানা বিদেশে অচেনা তরুণীর ভরা ঘটের ছল-ছল আছবানে ! কিন্তু দিনশেষেও কবির ভাগ্যে বিশ্রাম-লাভ ঘটেনি ; যখন

“পোষ প্রথর শীত-জর্জর ঝিল্লী-মুখর রাতি ।”

তখনও এক অবস্ফুটিত তাঁর সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে “সিকুপারে” নিয়ে চলেছে—

“অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাই ।”

কবির “দুরন্ত আশা” “পোষমানা এ প্রাণ” নিয়ে “বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান” থাকতে পারে না। সন্ধ্যার হুঃসময় এসে উপস্থিত হ’লেও কবি তাঁর চিত্ত-বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ করতে নিষেধ ক’রে বলেছেন—

“যদিও সন্ধ্যা নাহি-অনন্ত অঘরে

• • •

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অঙ্গ বন্ধ ক’রো না পাখা ।”

কোথাও যদি কোনও আশ্রয় না থাকে, তবু নভ-অঙ্গন তো আছে, তার মধ্যেই স্বচ্ছন্দ-বিহার করতে হবে।

“বর্ষ-শেষে”র সঙ্গে-সঙ্গে কবি-চিত্ত বন্ধন-মুক্ত হ’য়ে অনস্তাভিমুখ হ’য়ে উঠেছে—

“চাবো না পক্ষাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,

হেরিব না দ্বিক্

গণিব না দিনকণ, করিব না বিতর্ক বিচার,

উদ্দাম পশিক ।

• • •

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে

সে পথ-প্রান্তের

একপার্শ্বে রাধা মোরে, নিরখিব বিরীট স্বরূপ

বুণ বুগাস্তের ।”

রুদ্র বৈশাখের “বিষাণ ভয়াল” তাঁকে ডাক দিলে তিনি বলেছেন—

“ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ,

ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্ত্রা জাগি’ উঠি বাহিরিব ঘারে...”

তিনি অচেনা বহু পথিকের সঙ্গে এক নৌকার “যাত্রী”, তিনি গৃহস্থের ঘরে “অতিথি” মাত্র, তিনি “ছুটির” আনন্দে উল্লসিত হ’য়ে সকল বন্ধনের প্রতি “উদাসীন”, তিনি “স্বপ্নের পিয়াসী”, তিনি “প্রবাসী”। কবি বলেছেন—

“স্নান দিবসের শেষের কুহুম তুলে

এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে

চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।”

কিন্তু কবির এ “যাত্রাশেষ” তো “বিপুল বিরতি” নয়, এ যাওয়া যে দোয়ার ফিরে আসার বেগ-সঞ্চয়ের জন্ত—

“এই মত চলে চিরকাল গো

শুষ্ণ যাওয়া শুধু আসা।”

এ “খেয়া-নৈরে”র এপার-ওপার যাওয়া-আসা।

কবির “পরান-সখা বন্ধু”, “ঝড়ের রাতে অভিসার” করেন কবির কাছে। কবি জানেন, তাঁর বিধাতা তাঁকে কোন্ আদি-কাল হ’তে জীবনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন—

“জানি কোন্ আদি কাল হতে

ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।”

কবি নিজে অনুভব করেন এবং সকলকে অনুভব করতে বলেন—

“জগতে আনন্দ-বজ্রে আমার নিমন্ত্রণ।

সেই আনন্দ-বজ্রের নিমন্ত্রণে যাত্রা ক’রে—

“কবে আনি বাহির হ’লেম তোমারি গান গেয়ে

সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।”

যাত্রার খেয়া-ঘাটে এসে কবির আশঙ্কা ‘ঐরে তরী দিল খুলে!’ কিন্তু তখন তিনি মনকে সাম্বনা দিয়ে বলেছেন—

“আমার নাইবা হ’ল পারে যাওয়া,
যে হাওয়াতে চলতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।”

কিন্তু তিনি যদি বা যাত্রার উত্তোগ-পর্ব সমাধা ক’রে প্রস্তুত হ’লেন, কাণ্ডারীর
তখনো উদ্দেশ নেই—

“কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেদে কেবল ভেসে ;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থ-গামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।”

তখন তিনি কাণ্ডারীকে দেখে বলছেন—

“ওরে মাঝি, ওরে আনার
মানব-জন্ম-তরীর মাঝি,
অনন্দের কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশা উঠছে বাজি ?
কাণ্ডারী গো, যদি এবার পেঁছে থাক’ কুলে,
হাল ছেড়ে দাও. এখন আনার হাত ধ’রে লও তুলে।”

কিন্তু কাণ্ডারীর বিলম্ব দেখে অধীর হ’য়ে উঠেছেন—

“এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে মাঘ যে বেলী মরি গো মরি।”

কিন্তু সন্দেহ-প্রস্তুত কাণ্ডারীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আনন্দে ব’লে উঠলেন—

“নাম-হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে !”

কিন্তু তরী যদি নাই মেলে তা হ’লে কি তবে যাওয়া বন্ধ থাকবে ?

“যে দিল ঝাপ ভব-মাগর মাঝ-খানে
কুলের কথা ভাবে না সে’
চায় না কড়ু তরীর আশে,
আপন স্রুখে স্নাতক-কাটা সেই জানে
ভব-মাগর মাঝ-খানে।”

কিন্তু এত দিন নদী-পথে যাত্রার প্রতীক্ষা করার পর কবি দেখতে পেলেন—

“উড়িয়ে ধ্বজা অত্র-ভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।”

তখন আনন্দিত কবির উৎফুল্ল কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—

“যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখতে আমার ধরে।”

কবির “পথ হ’ল স্বন্দর”; তিনি যাত্রা করতে পেয়েই সন্তুষ্ট, তরীতে না হয় তো রথে তাঁর যাত্রা—সে একই কথা, বাহন তুচ্ছ সাধন মাত্র, যাত্রা করতে পারাটাই হ’ল তাঁর কাছে প্রধান।

কবি নিজেই জানেন যে, গতির মাঝে মাঝে গতি-বিরতিও আছে। “যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা”; কিন্তু পা ফেলেই কবির ভয় হয় বুঝিবা গতি স্থগিত হ’য়ে পড়ল—

“ভেবেছি মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি ধেমে গেছে এসে।

* * *
পুরাতন পথ শেষ হ’য়ে গেল যেথা
সেবার আমারে আনিলে নূতন বেশে।”

কিন্তু চির-নবীন কবি-চিত্তের যাত্রা তো স্থগিত হবার নয়—

“আমি পথিক, পথ আমারি সাধী।

* * *

বাহির হ’লেম কবে সে নাই মনে।

যাত্রা আমার চলার পাকে

এই পথেরই ঝাঁকে ঝাঁকে

নূতন হ’ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা,

পথে যেতেই ভালবাসা,

পথে চলার নিত্য-রঙ্গ

দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।”

মাঝে মাঝে পথ খুঁজতে গিয়ে পথ হারায়—

“এখানে তো বাধা পথের অঙ্গ না পাই,

চলতে গেলে পথ ভুলি যে কেবলি তাই।”

এবং “খুঁজিতে গিয়ে কাছেই করি দূর”, চলা আরো বেড়ে যায়—তখন হতাশ হ’য়ে কবি বলেন—

“এমনি ক’রে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।”

কিন্তু তাতেও লোকসান নেই—

“মিথ্যা আমি কি সন্ধান যাব’ কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।”

কবির “চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে” দেখে কবি পরম আনন্দিত—

“ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে !
নইলে অভাবিতের দেখা ঘটতো না কোনো মতে।”

সেই অভাবিতের দেখাটি কি ?—

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন ?

সেই হারাপথে বিদেশী সাপুড়ের সঙ্গে যাত্রীর সাক্ষাৎ ঘটে—

‘কে গো তুমি বিদেশী,
সাপ-বেলান বীণা তোমার
বাজালো সুর কি দেশী !

* * *

লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
হুঁটায়ে হুঁই-চাপারে।”

কবি সেই বীণীর সুর ধ’রে যাত্রা ক’রে চলেছেন নিরুদ্দেশের পানে—

“শুনেছি সেই একটি বাণী—
পথ দেখাবার মন্ত্রবানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো ।
তোমার মাঝে আমার পথ

ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও ।

বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে

টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও ।

পথের শেষে মিলবে বাসা—

সে কত নয় আমার আশা,

যা পাব' তা পথেই পাব',

দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও ।”

কবি “সুদূরের পিয়াসী,” তাঁর কাছে দূরের ডাক এসে পৌঁচেছে—

“এবার আমার ডাকলে দূরে

সাগর-পারের গোপনপুরে ।”

সেই “সাগর-পারের গোপনপুরে” কবি একা পথিক হ'লেও তাঁর সঙ্গী জুটে
—যায়

“যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি ।

ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড়কে পেলেম সাথী ।”

কবির এই যাত্রা তো আজকের নয়, তা অনাদি অনন্ত—

“অনেক কালের যাত্রা আমার,

অনেক দূরের পথে,

প্রথম বাতির হয়েছিলেম

প্রথম আলোর রূপে ।”

তিনি সকল তার বোঝা ফেলে দিয়ে লঘু হ'য়ে যাত্রা করতে উৎসুক—

“রিক্ত হাতে চল্না রাঙে

নিরুদ্দেশের অন্তরণে ।”

কবির “পথ চলাতেই আনন্দ,” পথের নেশায় তিনি বিভোর—

“পথের নেশা আমার লেগেছিল,

পথ আমারে দিয়েছিল ডাক ।”

কারণ—

“পাশু তুমি, পাশুজনের সখা হে,

পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া ।

যাত্রা-পথের আনন্দ-গান যে গাহে

তারি কণ্ঠে তোমারি গান পাওয়া ।”

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেণা গোলে আপন দ্বার।”

কবি “শিশু-ভোলানাথ”-রূপে বলছেন—

“সাত সমুদ্র হের নদী
আজকে হবো পার।”

শিশু-ভোলানাথ বলেছে—

“আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ’লে।
যত’ ভূমি ভাব তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তো
তোমায় ব’লে ব’লে।

* * *

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।”

‘দাস্তুনী’ নাটকটি আগা-গোড়া চলার মন্দিরা-কীর্তনে ভরা—তার মধ্যে চলার
বাঁশী বেজেছে—

“চলি গো, চলি গো, যাই গো চ’লে,
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।

যাক্জিয়ে চলি পথের বাঁশী,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঞ্জীন বসন উড়িয়ে চলি

জ্বলে-হলে।

পথিক ভ্রবন ভালোবাসে
পথিক জনে রে।

এমন সুরে তাই সে ডাকে
হুণে হুণে রে।

চলার পথের আগে আগে
কতুর কতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।”

চাঞ্চল্য হচ্ছে প্রাণের ধর্ম, শিশু প্রাণের স্ফুটিতে সদা-চঞ্চল, যুবা প্রাণের প্রবল আবেগে উদ্দাম। তাই দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের স্থবিরদের যিনি গতির মুক্তি-বাণী শুনিয়াছেন তিনি কখনো শিশু আর কখনো যুবা, তিনি স্থবির কখনই না—

“সবার আমি সমান-বয়সী যে,

চুলে আমার যতই ধরক পাক।

চির-যুবা কবি “ওধু অকারণ পুলকে” মেতে তাঁর যুবক সঙ্গীদের ডেকে বলেছেন—

“অনেকাতে যাত্রা ক’রে হুহু

পাঁজি-পুঁথি করিস্ পরিহাস,

অকারণে অকাজ ল’য়ে যাড়ে

অসময়ে অপথ দিবে যাস্,

হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে

পালের ‘পরে লাগাস্ ঝড়ো হাওয়া,

আমিও ভাই তোমের ব্রত লব—

মাতাল হ’য়ে পাতাল পানে ধাওয়া।”

যৌবন তো সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্ত হ’য়ে থাকতে পারে না, অসাধ্য সাধন করাই যৌবনের ধর্ম, এইটেই যৌবনের মহিমা—

“পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,

ষ’দে যাবার, ভেসে যাবার

ভাঙ’বারই আনন্দে রে।

* * * *

লুটে যাবার, ছুটে যাবার

চল’বারই আনন্দে রে।”

কবি সকল “অচলায়তন” ভেঙে ফেলে চলার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেছেন। মহা-পরিব্রাজক কবি তাঁর “যাত্রী” পুস্তকের মধ্যেও এই একই কথা বলেছেন। “বলাকা”তে এই মহাবাহীই আগাগোড়া উদ্বেগবিত্ত ক’রে চ’লেছে—

“হেথা নয়, অত্র কোথা, অত্র কোথা, অত্র কোন্‌খানে।”

কবির গানে যখন জীবন-সন্ধ্যার “পুরবো” রাগিনী বেজে উঠেছে, তখনও তাঁর বিশ্রাম বা বিরতির কথা মনে হয় নি, তখনও কেবলই ‘চলো চলো’ বাণী ধ্বনিত হয়েছে—

“আঁধারের রাত্রি-শেষে বরষে-পড়া শিউলি ফুলের
আঁধারে আঁকুল বনতল ; তা’রা মরণ-কুলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে ‘চলো চলো’ ।

• • •

ওরা ডেকে বলে, কবি,
সে তাঁরোঁ কি ভূমি সঙ্গে যাবে... ?”

কবি বলেন,—

“যাত্রী আমি, চলি রাত্রির নিমন্ত্রণে—।”

‘মলয়া’ তার যৌবন-প্রেমের মাদকতা বিলিয়ে—

“বাবার দিকের পথিকের ‘পরে
অনিকের স্নেহ-পানি
শেষ উপহার করণ অথরে
দিল কানে কানে আমি’ !”

তখনও মাদকতা-বিহীন কবি নিশ্চল হ’য়ে পড়েন নি, তখনও তিনি যাত্রার জন্ত
সকলকে আহ্বান ক’রে বলেছেন—

“কালের যাত্রার ধনি শুনিতে কি পাও ?
তারি রথ নিতাই উধাও.....”

কবি রবীন্দ্রনাথ আঠেকশোর চলারই মাহাত্ম্য ঘোষণা ক’রে এসেছেন। কবি
বলেছেন—

“না চলতে চাওয়া প্রাণের কুপণতা, সঞ্চয় কম হ’লে ধরচ করতে সঙ্কোচ হয়.....এই
তরুণ একদিন গান গেয়েছিল—‘আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।’ —সাপর-পারে যে
যপরিচিতি আছে তার অবন্তষ্ঠন মোচন করবার জন্তে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।”

অজ্ঞানাকে জ্ঞানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্ত করবার, অদৃষ্টকে দেখবার যে-
আগ্রহ নিয়ে বৈদিক ঋষি আপনাকে মহীপুত্র বলে পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীকে
ডাক দিয়ে বলেছিলেন—“চট্টবৈতি, চট্টবৈতি” ঠিক সেইভাবেই অমুপ্রাণিত
হ’য়ে আমাদের কবি সকলকে ডাক দিয়ে পুনঃ পুনঃ বলেছেন—“আগে চল,
আগে চল, তাই !”

কবি-চিত্ত সপ্ত-তন্ত্রী বীণার মতো, তাতে কত সুর, কত মুছ’নাই বেজেছে ;
কিন্তু আমার কানে এই গতির বাণীটিই খুব বেশী ক’রে ধরা পড়েছে
যিনি অগতির গতি তিনিই এই গতি-শক্তি-হার্য্য দেশে এই তুর্ধ-কণ্ঠ কবিকে

প্রেরণ করেছিলেন দেশবাসীদের জড়ত্ব থেকে উদ্ধোধিত ক'রে তোলবার জন্তে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে তাঁহার বাল্যকালের কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“.....আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আনুগতিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ-প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ-প্রেমের সময় নয়—তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।.....

“আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল।.....ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সতিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ‘মিলে সব ভারত-সন্তান’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের সুবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পাঠিত, দেশী শিল্প-ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত, ও দেশী শুল্কী লোক পুরস্কৃত হইত।”

এই মেলায় “চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবি” লর্ড লিটনের দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে একটি পद्य রচনা করেন। সেই কাব্যে বয়সের উপযুক্ত উদ্ভেজনা প্রভূত পরিমাণে ছিল। কবি সেটা পড়িয়াছিলেন “হিন্দু-মেলায়” গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে কবি নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

কবি আরও লিখিয়াছেন,—“জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল...ইহা স্বদেশিকের সভা।.....আমার মতো অর্বাচীনও এই সভায় সভ্য ছিল.....এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ [বীরত্বের] উদ্ভেজনার আশুন পোহানো।”

“.....রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে

বাহির হইতেন। রবাহৃত অনাহৃত বাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত
.....তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।”

“আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্
হিন্দু। গঙ্গার ধারে তাঁহার একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল
সভা একদিন জাতিবর্ণ-নির্বিচারে আহার করিলাম।”

“স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার
উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল।”

“ছেলে-বেলায় রাজনারায়ণ-বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল, তখন
সকল দিক্ হইতে তাঁহাকে নুগিবার শক্তি আমাদের ছিল না।.....দেশের
উন্নতি-সাধন কবিবার জন্য তিনি সবদাই কতো রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্লান্
করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।.....এদিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু
তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল
অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা
অপমানকে তিনি দখল করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার চুই চক্ষু জ্বলিতে
ধাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া
আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি [গান] ধরিতেন.....

“এক সূত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন,

এক কাণে দাঁপিমাছি সহস্র জীবন।”

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে একটি সুসম্পূর্ণ
স্বদেশ-প্রেমের আবহাওয়ার মধ্যে বধিত হইয়াছেন এবং সেই ভাবই তাঁহার
জীবনে ও চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।
রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার যে স্বপ্ন ও কল্পনার ভিতর
দিয়া পরিণত বয়স বৃদ্ধি ও বিবেচনায় উপনীত হইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ
পরিচয় “চিরকুমার সভা”য় চন্দ্রবাবুর কল্পনা ও প্রচেষ্টার বর্ণনা উপলক্ষে
ঠাট্টার স্বরে আমাদের শুনাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন যোলা
বৎসর মাত্র, সেই বাল্যকালেই “বাপ্সালীর আশা ও নৈরাশ্র” নামে একটি
প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অল্প বয়সে বিলাতে
গিয়াও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। বিলাতে বরাবর তিনি
দেশী কাপড় পরিয়াছেন, এবং তাহার ভ্রাতৃ অনেক বিদ্রূপও সহ্য করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহেবরানাকে চিরদিনই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যুরোপ-প্রবাসীর পত্রে ১২৮৬ সালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে একটি ব্যঙ্গ-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

“মা এবার ম’লে সাহেব হবো ;

রাঙা চুলে গাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাবো।

শাঙ্গা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাবো,

আবার কালো বদন দেখলে পরে ব্রাকি বলে’ মুখ কেরাবো।”

১৩০২ সালে রচিত চৈতালি নামক পুস্তকে পর-বেশ-পরিহিত ছদ্মবেশী সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

কে তুমি কিরিছো পরি’ প্রভুদের সাজ !

ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুষ্ক’ণ লাজ !

পরবল অঙ্গে তব হ’য়ে অধিষ্ঠান

তোনারেই করিছে না নিত্য অপমান ?

বলিছে না, ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো,

তোমার চর্চের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?

চিন্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,

পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।

ওই ডুচ্ছ টুপিখানা চড়ি’ তব শিরে

ধিকার দিতেছে নাকি তব স্বজাতিরে ?

বলিতেছে, যে মন্তক আছে মোর পায়,

হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কুপায়।

সর্বঙ্গে লাঞ্ছনা বাহ’ এ কি অহঙ্কার !

ওর কাছে জীর্ণ টার জেনো অলঙ্কার !

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে ১৮৯০ সালে জাহাজে চড়িয়া তিনি লিখিয়াছেন—

“সামান্য এই কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চ’লেছি, কিন্তু ভারতবর্ষ একান্ত করুণ স্বরে আমাকে আহ্বান করছে, বলছে—বৎস, কোথায় যাস্ ! আর যাই করিস্ অবজ্ঞার ভাবে চ’লে যাস্‌নে, আর অবজ্ঞার ভাবে ফিরে আসিস্‌ নে।”

পরিণত বয়সেও তিনি স্বদেশবাসীর দ্বারা মাতৃভূমির অপমানে ব্যথিত হইয়া কাতর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

কাহার হৃদয়গী বাণী
 মিলায় 'অনাথর মানি' ?
 কাহার ভাষা হয়
 ভুলিতে সবে চায় ?
 সে যে আমার জননী রে
 কণেক স্নেহকোলা ছাড়ি'
 চিনিতে আর নাহি পারি !
 আপন সন্তান
 করিছে অপমান'—
 সে যে আমার জননী রে !

কবি বাল্যকাল হইতে বাংলা-দেশকে মায়ের মতন ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। বালা রচনা “আলোচনা” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—
 “এমন মায়ের মতো দেশ আছে ? এতো কোলভরা শত্রু, এমন শ্রামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা : কোমল-হৃদয়া তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায় ?”

কিছুদিন কবি আপনার ব্যক্তিগত হৃদয়ের সুখদুঃখ ও ভাবপঞ্জের ভাণ্ডারে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর পান নাই ; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, অর্থ বলি দিয়া স্বদেশের সেবায় ও উন্নতিতে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্ত তাঁহার মনে “দ্রুত আশা” জাগ্রৎ হয় ; তখন নিজেকে ও “মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালী-সন্তান”দের অকর্মণ্য “অল্পপায়ী বঙ্গবাসী স্তম্ভপায়ী জীব” বলিয়া বাঙ্গ করিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেহুয়িন ! বাঙালীর হীনাবস্থা দাস্ত্র ও নিশেষ্টতা কবিচিত্তকে নিপীড়িত করিয়াছে, তাই তিনি কাতর হইয়া স্বদেশবাসীদের বারংবার বিদ্রোহের ব্যথা দিয়া উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

দূর হোক্ এ বিড়ম্বনা বিদ্রোহের ভান ।

সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ !

আমার এই হৃদয়-তলে দরম-তাপ সত্যত জ্বলে

তাই তো চাহি হামির ছলে করিতে লাজ দান ।

কবি কাতরকণ্ঠে জীবনদেবতাকে বলিয়াছেন—ভাববিলাসিতা ও অকর্মণ্য জড়তা হইতে “এবার ফিরাও মোরে”। স্বদেশের যে-সব লোক নীরবে শত শতাব্দীর অত্যাচারের ভারে পিষিয়া মরিতেছে—

এই সব মৃত মান মুক মুখে
দ্বিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রাস্ত্র শুক শুক বৃকে
ধনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহুর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে ভীত ভূমি, সে অগ্নায় ভীকু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধৈর্যে ;...

কিন্তু কবির আদর্শ-স্বদেশ যুরোপের বিলাস-বাহুল্যে ও ক্ষমতাদর্পে ভয়ঙ্কর নহে ; সেই স্বদেশের রূপ শাস্ত, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, সাম্যের প্রভাবে উদার, সেধানকার স্বাধীনতা অপরের পরাধীনতার বৃকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—
সেই স্বদেশের

দেখা মৃত স্মৃতিস্কৃত ক্ষত্রিয়-ধরিমা,
হোণা শুক মহামোহন ব্রাহ্মণ-মহিমা

পাশাপাশি হাত-ধরা-ধরি করিয়া বিরাজিত !

আবার আমাদের কবি বিশ্বপ্রেমিক। অতি শৈশব হইতে তাঁহার কবিচিত্ত সন্ধীর্ণ দেশকালের সীমায় আবদ্ধ থাকার চুংখের ও দীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনো অত্যাচার স্বদেশিকতায় পরিণত হইতে পারে নাই। আমার দেশের সব ভালো, আমার দেশের ভালো করিতে যদি অপরের মন্দ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, এমন উৎকট ভাব নতাসন্ধ প্রেমিক কবির চিত্তে কখনও স্থান পাইতে পারে না। তাই তাঁহার সেই ছেলেবেলা হইতে দেখা যায় তিনি স্বদেশকে ভালোবাসিয়া বিদেশকে মন্দ-বাসেন নাই ; বিদেশের মোহ ও অনুকরণকে ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশের মহত্ত্ব ও সদগুণের সমাদর করিয়াছেন, ‘যুরোপ-বাত্মীর ডায়ারি’তে তিনি লিখিয়াছেন—“কেহ কেহ বলেন যুরোপের ভালো যুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনো প্রকৃত ভালো কখনই পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, তারা অমুযোগী। অবস্থা-বশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর ক’রে দেওয়া যায় না।” সেই

বাণ্যকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের কথা তিনি লিখিয়া আসিয়াছেন; বিশ্বভারতীর পূর্বাভাস তিনি বাণ্যকালেই দিয়াছেন। ১২৮৬ সালে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে প্রকাশিত “কবিকাহিনী” নামক কাব্যে কবি লিখিয়াছিলেন—

কবে দেব এ রজনী হবে অবমান ?
 শ্রান করি' প্রভাতের শিশির-সলিলে
 তরণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
 অমৃত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
 এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ কার' ?
 নাটক ছরিজ ধনী অধিপতি প্রজা ;
 কেহ কারো কুটারেতে করিলে গমন
 মর্মান্বিত অপর মান করিবে না মনে,
 সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
 কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
 দৌড়ন আদিবে গিরি এগনই সেনা
 দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দৌড়িতে —
 যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবন্ধ
 মিলিবেক কোটি কোটি মানবজন্ম !

এই বিশ্বপ্রেমের মহাদর্শ তাঁহার মনে চিরজাগ্রত, তাই ‘প্রভাত-সঙ্ঘীত’ের কবিতাবলীর মধ্য দিয়া আধুনিকতম রচনার মধ্যে পর্যন্ত এই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক মহামিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। “নির্ধারের স্বপ্নভঙ্গ”, “প্রভাত-উৎসব”, “স্রোত” প্রভৃতি কবিতা এক-রকম বাণ্য-রচনা, তখন কবির বয়স মাত্র ২১ বৎসর। সেই-সব কবিতার মধ্যেও “জগৎ প্রাণিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা” ও “জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছো ভাই” প্রভৃতি মহাবাহী প্রচুর দেখিতে পাই।

কবি স্বদেশ-জননীকে বারংবার অতুল্য করিয়াছেন—তিনি তাঁহার সন্তানদের “স্নেহগ্রাস” হইতে মুক্তি দান করণ—

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !
 দেখো না বসায়ো দ্বারে জাগ্রৎ প্রহরী
 হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
 সন্তানদের চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে ।

চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
 সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
 নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব দেবতার ;
 সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার ।

ভারতমাতা স্নেহাধিক্যে বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়া দিয়া সন্তানদের পঙ্গু
 করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে কবিচিত্ত ব্যথিত হইয়া আত্ননাদ করিয়াছে—

মাত কোটি সন্তানেহে হে মুক্ত জননী,
 রেখেছো বাঙালী ক'রে, মায়াবী করো নি !

কিন্তু একদিকে যেমন বিশ্বপ্রেমের মহান্ আদর্শে কবির কাছে স্বদেশ
 একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনি আবার বিশ্বপ্রেমের বহ্যায় স্বদেশ
 তাঁহার কাছে ডুবিয়া হারাইয়া যায় নাই । তিনি বারংবার “ভুবন-মনোমোহিনী
 জনক-জননী-জননী” স্বদেশ-মাতাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—“এবার
 ফিরাও মোরে !” নববর্ষে তিনি ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ
 লবো স্বদেশের শিক্ষা,
 তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
 হে ভারত, লবো শিক্ষা !
 পরের ভূষণ, পরের বসন,
 তেয়াগিবো আজ পরের অশন,
 যদি হই দীন, না হইব হীন,
 ছাড়িবো পরের ভিক্ষা !

“ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ” এই মহাবাকী তিনি আমাদের দেশে পুনঃ প্রচার
 করিয়া বারংবার বলিয়াছেন যে স্বদেশের হ্রঃখ মোচন ভিক্ষার দ্বারা হইবার
 নয়, নিজের জননীর লজ্জা মোচন করিতে হইবে নিজেদের চেষ্টার দ্বারা,
 অর্জনের দ্বারা, নিজেদের ত্যাগের দ্বারা ।

তোমার যা দৈন্ত মাতঃ, তাই ভূষা মোর
 কেনো তাহা ভুলি,
 পরধনে থিক্ গর্ব, করি' করজোড়
 তরি ভিক্ষাবুলি !

পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে ঝাও পাতে

তাই যেমনো রুচে,

যোটা বস্ত্র বুনে ঝাও যদি নিজ হাতে

তাহে লজ্জা ঘুচে ।

স্বদেশের দৈত্বের লজ্জা ঘোচাবার ‘পথ ও পাথের’ কবি নির্দেশ করিয়াছেন—
—কেবল স্বদেশ স্বদেশ বলিয়া, জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী
বলিয়া ভাববিলাসিতা করিলে চলিবে না ; কবি স্বদেশবাসীদের ডাক দিয়া
বলিতেছেন—

“তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব শক্রতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র
কেবলি বাহিরের দিকে উত্তত করিয়া রাখিবার জন্ত উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের
সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঐ পরের দিক্ হইতে
ভ্রুকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও , আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ বেমন করিয়া
প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুক তৃষাভুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া
দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানা-দিগভিমুখী
মঙ্গল-চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বান্ধিয়া ফেলো ; কর্মক্ষেত্রে
সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এতোদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের
উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও গুপ্তান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের
সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে ।”

‘আমরা যদি উচ্চ-নীচের কৃত্রিম ভেদ ও বিরোধ ঘুচাইতে না পারি, তবে—

তবে মোর হৃৎসংগে দেশ, যাঁদের করেছ অপমান,

অপমানে ভাতে হবে তাহাদের সবার সমান !

যতোদিন আমরা দেশের সকল জাতি ও ধর্ম নিবিশেষে মিলিত হইতে না
পারিব, ততোদিন আমাদের দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা ছরাশা ছাড়া আর
কিছুই নয়, এ কথা কবি বারংবার বলিয়াছেন—

“একথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বান্ধিয়া ওঠে নাই,
সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পাবে না । কারণ স্বাধীনতার ‘স্ব’-জিনিসটা
কোথায় ? স্বাধীনতা—কাহার স্বাধীনতা ? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন
হয়, তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না ।
এবং পশ্চিমের জাতি যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে পূর্বপ্রান্তের আসামী তাহার
সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গোরব করিবে না । এক বাংলাদেশেই হিন্দুর

সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাণ্ডা মিলাইবার জন্ত প্রস্তুত, এমন কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।”

এইজন্য কবি মঙ্গল-মহোৎসবের পুরোহিত হইয়া আবাহন-মন্ত্র উদ্গীত করিয়াছেন—

এসো হে আর্য, এসো অনাথ,
 হিন্দু মুসলমান;
 এসো এসো আজ ভূমি ইংরাজ
 এসো এসো খৃষ্টান।
 এসো ব্রাহ্মণ, স্তুতি করি' মন
 ধরো হাত সবা'কার,
 এসো হে পতিত, করো' অপনীত
 সব অপমানভার!
 মার অভিষেক এসো এসো স্বরা,
 মঙ্গলঘট তরুণি সে ভরা
 সবার-পরশে-পবিত্র-করা
 তীর্থনীরে,
 আজি ভারতের মহামানবের
 সাগরতীরে!

‘শিবাজী’ নামক প্রসিদ্ধ কবিতাতেও কবি এই একই কথা বলিয়াছেন—

দে-দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
 শির পাতি' লগে।
 কণ্ঠে কণ্ঠে বকে বকে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
 ধ্যানমগ্নে তব।
 ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরা'-লসন
 দরিদ্রের বল।
 ‘এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে’ এ মহাবচন
 করিব স্মরণ ॥

কবির উদার হৃদয় স্বদেশকে মহামানবের মিলনভূমি বলিয়া অনুভব করিয়াছে। কবির কাছে ভারতবর্ষ কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মাবলম্বীর দেশ নয়। কবির মতে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দু জাতি, ধর্ম তাহার যাহাই হউক। কবি ‘পরিচয়’ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—“তবে কি মুসলমান অথবা খৃষ্টান

সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয় পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্ক মাত্রই নাই।.....ইহা সত্য যে কালীচরণ ঝাড়ুজো মহাশয় হিন্দু-গুপ্তান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু-গুপ্তান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-গুপ্তান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে গুপ্তান।বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু শব্দ ও মুসলমান শব্দ একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। মত-পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।”

রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে জাতীয়ত্বের আদর্শ স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন : “এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব জাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য রূপে পাওয়া যায়—এই কথা নিশ্চিতরূপে বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম চর্গাতি।”

এই তত্ত্বকে ‘গোরা’ নামক উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়া কবি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। আমরা দেখি গোরা নিজেকে ভারতবর্ষীয় হিন্দু মনে করিয়া যখন প্রাণপণে আপনার চারিদিকে পোড়ামির দেয়াল ভুলিয়াছিল, তখনই তাহার নিজের দেওয়া দেয়াল অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল, সে জানিতে পারিল—সে হিন্দু নয়, সে গুটিনির সময়কার কুড়ানো ছেলে, তাহার বাপ একজন আইরিশ্‌মান। এই জানাজানির সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বুঝিতে পারিল—“ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হ’য়ে গেছে,—আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্ক্তি কোনো জায়গার আমার আহ্বারের আসন নেই।” ইহাতে গোরা খুশী হইয়াই পরেশ-বাবুকে বলিয়াছে, “আমি দিনরাত্রি যা ভ’তে চাঙ্কিলুম অথচ হ’তে পারিছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান গুপ্তান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন; দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পন্নীতেও আতিথ্য নিয়েছি কিন্তু কোনো মতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে ব’সতে পারি নি—

এতোদিন আমি আমার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি—
কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজ্ঞাতো আমার মনের ভিতর খুব
একটা শূন্যতা ছিলো। আজ আমি বৈচে গেছি পরেশ-বাবু।”

অবশেষে গোরা পরেশবাবুকে কহিল—“আজ সেই দেবতারই মঙ্গল দিন,
যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির
কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর
দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

কবি ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড সত্তা-রূপে উপলব্ধি করিলেও বঙ্গভূমিকে
বিশেষভাবে ভালবাসিয়া বারবার বলিয়াছেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবানি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আনার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

কবি বার-বারই বলিয়াছেন—

তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি’
ধনু জীবন মানি।

অথবা—

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম না গো তোমায় ভালবেসে !

কবির কাছে স্বদেশ-মাতা কেবলমাত্র মৃত্যুশ্রী নহেন, তিনি চিন্ময়ী—

আজি বাংলাদেশের রুদ্র হ’তে
কখন আপনি
ভুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ’লে জননী !

এই চিন্ময়ী স্বদেশ-জননী বিশ্বমাতারই খণ্ড প্রকাশ রূপে কবির চক্ষে
প্রতিভাত—

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা !
তোমাতে বিশ্বমরীর
তোমাতে বিশ্বমায়ের
অঁচল পাতা।

সেই মাটির দেশই কবির দেহমনে মিলাইয়া আছেন প্রাণ-রূপে ভাব-
রূপে—

তুমি মিশেছো মোর দেহের মনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ স্থানল বরণ কোমল মৃতি
মর্মে গাঁথা !

তাই কবি ভক্তি-গদগদ চিত্তে দেশ-মাতাকে প্রণাম করিয়াছেন—“নমো
নমো নমঃ সুন্দরি মম জননী বঙ্গভূমি !”

কবির মনে এইরূপ স্বদেশপ্ৰীতি সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক প্ৰীতির সঙ্গে
ওতঃপ্ৰোত হইয়া মিশিয়া থাকাতে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা কবির কাছে ভয়ঙ্কর—

Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for
years has been at the bottom of India's troubles.

সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার উপরে ভারতবর্ষকে উঠিতে হইবে, ইহাই তাহার
বহুকালের সাধনা ও উত্তরাধিকার—

“She has tried to make an adjustment of races, to acknowledge
the real difference between them where these exist, and yet seek for
some basis of unity. This basis has come through our saints like Nanak,
Kabir, Chaitanya and others, preaching one God to all races of India.”

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে আনন্দ, বিরোধে হিংসা। এই বিরোধ
দূর করিবার জন্ত কালে কালে দেশে দেশে মহাপুরুষেরা চেষ্টা করিয়াছেন।
মানুষের বিরোধের কারণ হইতেছে অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা; এই অহং
ভাবে এক প্রেমস্বরূপের বোধের* মধো নিমজ্জিত করিয়া সকল বিরোধের
সম্বয় করিতে হইবে; তাহা ছাড়া অস্ত গতি নাই—

Each individual has his self-love. Therefore his brute instinct leads
him to fight with others in the sole pursuit of his self-interest. But man
has also his higher instincts of sympathy and mutual help. The people
who are lacking in this higher moral power and who therefore cannot
combine in fellowship with one another must perish or live in a state
of degradation. Only those people have survived and achieved civilization
who have this spirit of co-operation strong in them. So we find
that from the beginning of history men had to choose between fighting
with one another and combining, between serving their own interest or
the common interest of all.

স্বার্থপর স্বজাতি-প্রীতি বা স্বদেশ-প্রীতির পরিণাম বিনাশ—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে.....

স্বার্থ যতো পূর্ণ হয়, লোভ ক্রুধানল

ততো তার বেড়ে উঠে,—বিষ ধরাতল

আপনার খালি বলি' না করি' বিচার

জঠরে পুটিতে চায়!.....

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে

বাতি স্বার্থতরা, গুপ্ত পর্বতের পানে।

স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া পরার্থে আত্মসমর্পণই যে যথার্থ স্বদেশপ্রীতি একথা তিনি বারংবার বলিয়া 'সফলতার সড়পায়' নির্দেশ করিয়াছেন—“ভাবিয়া দেখো, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি—তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব করো, তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, ‘আচ্ছা তোমার মুখে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনবো, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের নিম্নতম কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এসো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো, স্বজাতির উন্নতির জন্ত তুমি প্রাণ দিতে না পারো, অন্তত আরাম বনো, অর্থ বনো, কিছু একটা দাও! তোমাদের দেশের জন্ত আমরাই সমস্ত করিব আর তোমরা কিছুই করিবে না?’ একথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে?”

আমাদের জাতীয় জীবনের জড়তার এই লজ্জা-মোচনের উপায়-স্বরূপ কবি কতকগুলি কণা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন কালে যে সমাজ-ব্যবস্থা ছিলো, “সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রজাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতধারা ‘যেনাঃ নামতা শ্রাং কিমহং তেন কুর্য়াম্’ এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না।—

নালা ছিলো, তার ফুলগুলি গেছে,

রয়েছে ডোর।

“সেইজন্ত আমাদের এতোদিনকার সমাজ আমাদের কাছে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদের অগ্রসর করিতেছে না,

আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতন ভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্ত যখন সচেষ্ট ভাবে উত্তর হইব, তখনই মুহূর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে আমরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।”

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-সেবার যে-সব উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে উত্তেজনা নাই, পরের প্রতি দ্রোহ বা বিদ্বেষ নাই; এজন্ত তাঁহার প্রণালী শীঘ্র লোকের মন হরণ করে না। তিনি বহুদিন পূর্বে স্বদেশজননীকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করেন—

নিজহস্তে শাক-অন্ন ভুলে দাও পাতে, তাই যেনো কচে,—

যোটা বস্তু বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা গুচে।

কিন্তু পরবিদ্বেষের বশে যখন বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া ফেলার ধুম লাগিয়াছিল তখন কবি তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই কথা তিনি “বরে বাইরে” উপন্যাসে সন্দীপ ও নিখিলেশ চরিত্রের তারতম্য দ্বারা ও ঐকাদিক প্রবন্ধে বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

Prof. Thompson বলিয়াছেন—

“He (Rabindranath) faces both East and West, filial to both deeply indebted to both. He has been both of his nation, and not of it, his genius has been born of Indian thought, not of poets and philosophers alone, but of the common people; yet it has been fostered by Western thought and by English literature: he has been the mightiest of national voices, yet he has stood aside from his own folk in more than one angry controversy.”

কবির কাছে স্বদেশ এত সত্য যে সেখানে কোনো রকমের ভেদ-বিচ্ছেদ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। স্বদেশ তো কেবলমাত্র মাটির দেশ নহে, দেশবাসীদের লইয়াই তো দেশ! আমার স্বজাতি ও স্বধর্মী বলিয়া পরিচিত যে লোক অত্যাচার উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া পরধর্মকে ভয়াবহ প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা অপেক্ষা সংকর্মণীল বিধর্মী যে আমার অধিক আত্মীয় একথা কবি ‘গোরা’ উপন্যাসে পরেশবাবুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—“পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ত্রুতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ঙ্কর অধর্ম

কবিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে, তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে, আর উৎপাত স্বীকার করিয়াও মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে।”

এই কথা আজকালের হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম বিরোধের দিনে বিশেষ ভাবে অমুখাবন করার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ও ভাষাকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া স্বদেশেব সব ভালো ও বিদেশের সব মন্দ এমন কথা কখনো বলিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশের সমস্ত ত্রুটি ও অপূর্ণতা স্পষ্ট ভাষায় নির্মম-ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, কাবণ তিনি যে সত্যদ্রষ্টা কবি! সমাজে ধর্মে শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র তিনি সংস্কারক দেশবন্ধু। কবি আমাদের ‘শিক্ষার হেরফের’ ঘূচাইয়া “আমাদের.....ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন” সমঞ্জস করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন; “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” করিয়া কবি বলিয়াছেন—“ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, একথা ধ্যান করা নেশা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লাহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্ত আপন শূভ্রভণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিষ্ণুমিত্রের তপোবনে শমীরকুম্বে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিনী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজী-বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্ত অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।” কবি দেশের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া আরো বলিয়াছেন—“আমি জানি, ইতিহাস-বিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্ত, লোকহিতের জন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও হৃৎক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে তোমরা আজ বিজ্ঞ বিবরীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যাত করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাজাত পুঙ্গ, অথও পুণ্যের ভায় নবীন-হৃদয়ের সমস্ত

আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের আরম্ভতবর্ণের নামে আহ্বান করিতেছি—তোমাদের পথে নহে, শিক্ষার পথে নহে,—কর্মের পথে। দেশের কাক্যে, গানে, ছন্দায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কীটনষ্টপুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কবিকুটীরে প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্ত, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্ত, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া নাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ব-বিভাগের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অন্ধকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিংড়িকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জামিনভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।”

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আদর্শ যে দ্বিধিকর বা সাম্রাজ্য বিস্তার নহে, তাহা যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপনা করা, তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। অতি বাল্যকালে ১২৮৫ সালের ভারতীতে “কাল্পনিক ও বাস্তবিক” নামক প্রবন্ধে তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে একটি আদর্শ সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে সভ্যতা অপরকে অসভ্য রাখিয়া প্রভু করিতে উৎসুক হইবে না, যে স্বাধীনতা অপরের পরাধীনতার বুক চাপিয়া বিরাজ করিবে না। কবি লিখিয়াছিলেন—

“মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতার-ক্লিষ্ট অত্যাচারে-নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তী উজ্জ্বল করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা নিজে শতাকী হইতে শতাকী পর্যন্ত অধীন ভাবে অন্ধকার-কায়াগৃহে অন্ধ ঘোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেধন যেমন বুঝিব, তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে-সকল দেশ নিপ্লিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য পড়িবার জন্ত দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিখা করিবে। আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে।”

আট-চল্লিশ বৎসর পূর্বে কবি-চিত্ত যে আদর্শ ধারণা করিয়াছিল, তাহাই আজ বিশ্বভারতী রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বভারতী বিশ্বমানবের

জ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান-বিনিময়ের তীর্থক্ষেত্র। এইজন্য যখন বিদেশী শিক্ষা ও শিক্ষায়তন বর্জন করিবার হুজুগ দেশের বৃকে মাতামাতি করিতেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সমর্থন না করাতে পরম নিস্কান্তাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য-সদ্ব কবি কখনো নিস্কা বা মানির ভয়ে নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আবার এই কবিই স্বদেশের লোককে বিদেশী ধরণের শিক্ষাকে প্রকৃত স্বদেশী ধরণে পরিণত করিতে বলিয়া এবং “শিক্ষার বাহন” মাতৃভাষাই হওয়া উচিত বলাতে দেশের লোকের বিরাজাজন হইয়াছিলেন। কবি কখনো গতানুগতিক হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় মতিভ্রা উঠিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে বহুবার লোকগঞ্জনা সহ করিতে হইয়াছে। একটু অসুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে এইখানেই কবি পরম গৌরব ও মহত্ত্ব নিহিত আছে।

পরের পরাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা ঐ মহৎ নামের যোগ্য নয় এ কথা তিনি রূপকের মধ্য দিয়া ‘কাঙালিনী’ নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ‘জীবন-স্মৃতিতে’ও তিনি লিখিয়াছেন—

“আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেদে,
হেরো ঐ খনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেদে—

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রান্তরে দাঁড়াইয়া লুপ্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র— সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?”

তাই কবি নিজের প্রিয়তম পিতৃভূমি ভারতের জগৎ আদর্শ স্বাধীনতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

চিন্তা বেধা ওরশুস্ত, উচ্চ বেধা শির,
জ্ঞান বেধা যুক্ত, বেধা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাক্কণ-তলে দ্বিবদ-শরীর
বহুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি’,
বেধা বাক্য রূপের উৎসমুখ হ’তে
উজ্জ্বলিয়া উঠে, বেধা নির্ধারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধার
সজ্জত সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;

যেথা তুচ্ছ আচারের বন্ধনদ্বারা
 বিচারের স্রোতঃপথ কেলে নাই প্রাণি,
 পোষকের করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
 তুমি সর্ব কর্ণ চিন্তা আনন্দের নেতা,—
 নিজ হস্তে নির্দগ্ন আঘাত করি পিতঃ
 ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত ।

কবির স্বদেশপ্রেম এমনই অসাধারণ, এমনই স্বদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকাঙ্ক্ষী।
 রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধীয় কবিতাবলী সুভাষিত সমূল-বিশেষ।
 সেই রত্নাকর হইতে কয়েকটি মাত্র মণি উদ্ধার করিয়া আমি আপনাদের নিকটে
 উপস্থিত করিলাম। কোনট ছাড়িয়া কোনটি দেখাই এই সমস্তার পড়িয়া
 অঙ্গম নিপুণ মণিকারের মতন সুবিস্তৃত মালা গাঁথিয়া এই রত্নাবলী উপস্থিত
 করিতে পারিলাম না ; ইহার জন্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত। উপসংহারে কবি-
 কণ্ঠেব উদ্গত বাণীর সঙ্গে আমার প্রজ্জ্বলিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

বাংলার মাটি	বাংলার জল,
বাংলার বায়ু	বাংলার কল
পূণ্য হউক	পূণ্য হউক
পূণ্য হউক	হে ভগবান !
বাংলার ঘর	বাংলার হাট,
বাংলার বন	বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক	পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক	হে ভগবান !
বাঙালীর পণ	বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ	বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক	সত্য হউক
সত্য হউক	হে ভগবান !
বাঙালীর শ্রাণ	বাঙালীর মন,
বাঙালীর যত্ন	যতো তাই বোম
এক হউক	এক হউক
এক হউক	হে ভগবান !

অ। মৃত্যু-সম্মুখে আত্ম-সম্মুখের প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ সভ্য শিব মন্ডরের প্ৰধারী কবি, “জগতে আনন্দ-রঞ্জে” তাঁহার নিয়ন্ত্রণ, সেই বজ্রের তিনি প্রদান পুরোহিত। তাই তাঁহার নিকট কোনও ব্যাপারই আনন্দহীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যে মৃত্যুর ভয়ে জগৎবাসী সন্ত্রস্ত, সেই মৃত্যুকেও তিনি অস্তর-বৃত্তিতে দেখিয়াছেন, এবং মৃত্যুর বিভীষিকা ঘোচন করিয়া মৃত্যুকেও সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন।

কিম্বদন্তি কবি রাখার বেনামী মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

যরণ রে তুঁহঁ মম জাম সমান ।

—ভাসুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি

কারণ মৃত্যুতে সকল সম্ভাপ দূর হইয়া যায়। আর বাস্তবিক মৃত্যু তো কোথাও নাই।—

নাই তোম নাই রে ভাবনা,

এ জগতে কিছুই মরে না ।

• • •

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,

নিপুঙ্ক তাহার জলরাশি ।

চারি দিক্ হ’তে সেথা অবিরাম অবিলম্ব

জীবনের স্রোত নিশে আসি’ ।

• • •

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে

রচিত হতেছে পলে পলে,

অনন্ত-জীবন মহাশেষ ।

—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত জীবন

মহাজীবন হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি-জীবন যেন অগ্নিজালা হইতে বিনিগত বিস্কুলিন, তাহা বাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয় পাইয়া নির্বাণ লাভ করে। আর পার্থিব জীবনই তো এক মাত্র জীবন নহে, আর এই জীবনও তো মরণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে, প্রতি পলে কত পরিবর্তন ঘটে এই দেখের অন্তরালে, শৈশবের পরে বৌবন ও বৌবনের পরে বার্ধক্য এবং বার্ধক্যের পর দেহান্তর একই মৃত্যুর পৃথক-পরম্পরা ।

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বল গ্রাণ ?

সে তো শুধু গলক নিমেষ ।

অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার

কোথাও নাহিক তার শেষ ।

যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,

মরিতেছি প্রতি পলে পলে,

জীবন্ত মরণ দোরা মরণের ঘরে থাকি,

জানিনে মরণ কারে বলে ।

* * *

মৃত্যুরে হেরিলা কেন কাঁদি ।

জীবন তো মৃত্যুর সমাধি !

জীবন-মরণ তো কেবল ইহলোকের ব্যাপার নহে, তাহা লোক-লোকান্তরের একটি সংলগ্ন ঘটনা—

কবে রে আসিবে সেই দিন—

উষ্ণিবে সে আকাশের পথে,

আমার মরণ-ডোর দিবে

বেঁধে দেবো জগতে জগতে ।

আমার মরণ-ডোর দিবে

গেথে দেবো জগতের মালা,

ববি শলী একেকটি ফুল,

চরাচর কুহুমের ডালা ।

—প্রভাত-সঙ্গীত

কারণ—

অস্তিত্বের চক্রতলে

একবার বাঁধা প'লে

পাষ কি নিস্তার ?

এই মরণ-ষাট্রায় কাহারও সহিত কাহারও বিচ্ছেদ হয় না, কারণ সকলেই মরণ-ষাট্রী, কেহ আগে আর কেহ পিছে চলিতেছে মাত্র, মহাষাট্রী-পথে আবার লোক-লোকান্তরে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে যাঁওলা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে ।

তোরাও আসিবি সবে

উষ্ণিবে রে কল দিকে,

এক সাথে হইবে মিলন,

জোরে জোরে আসিবে বাঁধন ।

জীব অগুঁচৈতন্ত, মহাপ্রাণ বিড়্চৈতন্ত। অণু ক্রমাগত বিভ্রমলাভের সাধনা
কবিতা মৃত্যুর পথে অগ্রণর হইয়া চলিয়াছে।

অণুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময়।
এ আশা হৃদয়ে জাগে তোমারই আশাস-বলে,
মরণ, তোমার হোক জয়।

—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত মরণ

বিষজগৎ নাবিক, আমরা তাহার বাত্রী পথিক, আমরা প্রবাসী, অনন্তের
মিলন-প্ররাদী হইয়া অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি।

গাও বিষ গাও তুমি
হৃদয় অদৃশ হ'তে,
গাও ভব নাবিকের গান —
শত লক্ষ বাত্রী ল'য়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুক্তি নগর
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিভে গাই
ম'রে যাই অনীম মধুরে,
বিলু হ'তে বিলু হ'রে মিলায়ে মিশাবে গাউ
অনন্তের হৃদয় হৃদুরে। —হবি ও গান, পণিমাঘ

আমাদের জীবনের খণ্ডতা কেবল আমাদের পার্শ্বিক জীবনের ব্যবহারিক
বোধ মাত্র, কিন্তু আসলে—

আকাশ-মণ্ডপে শুধু ব'সে আছে এক 'চির-দিন'।

—কডি ও কোমল, চির দিন

“আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাই আমরা মরণকে ভয় করি। আমরা ভাবি মৃত্যু;
বুধি জীবনের শেষ। কিন্তু যেহেতাই আমাদের বর্তমানে সমাপ্ত, জীবনটা একটা চকস অসমাপ্ত
তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।”

—পঞ্চভূত, মধুর

আমাদের অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে। বাহ্য ভূমি তাহা সত্য, তাহা অমৃত।
তাই আমার মরণ নাই। মৃত্যু বলিয়া প্রতীয়মান অবস্থা জীবনেরই
প্রকারান্তর মাত্র; অসম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণতা-লাভের সহায় ও উপায় মরণ।

এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা অস্পূর্ণ অগ্রাপ্ত থাকে, তাহার সম্পূরণ হয় মরণে।
মৃত্যুর পূর্ভ-ধারায় ইহ-জীবনের সকল দৃষ্ট বিরোধ মানি ধৌত হইয়া যায়,
তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ।

জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি-হারা।

—নীতান্ত্রি

জীব তাহার জীবনের অস্তিত্ব অমুভব করে পরিবর্তন-পরম্পরার ভিত্তর দিয়া,
এবং সেই পরিবর্তনেরই নামান্তর মৃত্যু। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বাস
করিবার সময়ে মাতাকে চিনে না, কিন্তু মাতৃকোড়ে জন্মগ্রহণ করিবারাত্রই
মাতাকে আপনার সর্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া লয়; তেমনি আমরা
মৃত্যুকে অপরিচয়ের জন্ত বৃথা ভয় করি, কিন্তু মৃত্যু জীবের পরমাত্মীয়, সে
আত্মার প্রণয়ী। মৃত্যু প্রাণের প্রণয়-লাভের জন্ত দিবারাত্র সাধনা করিতেছে,
তাহার মন হরণ করিবার জন্ত তাহার নিরন্তর অবিশ্রাম আরাধনা চলিতেছে;
মৃত্যুর চঞ্চলা প্রেমসী প্রথমে তাহার কাছে ধরা দিতে চাহে না, কিন্তু অবশেষে
তাহাদের মনোমিলন ঘটিয়া যায়।—

চপল চঞ্চল প্রিয়া	ধরা নাহি দিতে চায়,
হির নাহি থাকে,	
মেলি' নানাবর্ণ পাখা	উড়ে উড়ে চ'লে যায়
নব নব শাখে।	
তুই তবু একমনে	মৌনব্রত একাসনে
বসি' নিরলস,	
ক্রমে সে পড়িবে ধরা,	গীত বন্ধ হ'য়ে যাবে,
মানিবে সে বশ।	

* * *

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে	নির্জন শয়নপ্রাণ্ডে
এম বরবেশে,	
আমার পরাণ-বধু	ক্লান্ত হস্ত প্রদারিয়া
বহু ভালোবেসে	
ধরিবে তোমার বাহু ;	তখন তাহারে তুমি
মস্ত পড়ি' নিয়ো ;	
রক্তিম অধর তার	বিবিড় চুখন-দানে
পাণ্ড করি' যিহো।	—সোনার তরী, প্রতীক্ষা

মৃত্যুকে বাহারী ভাষায় করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার তাহাকে জীবন মনে করে ; কিন্তু বাহার সহিত মৃত্যুর মনোমিলন ঘটে, বাহার প্রাণ সে হরণ করে, সে তাহার মনোহারিত্ব বুঝিয়া তাহার মিলনের জন্ত সমুৎসুক হইয়াই থাকে—

তবু' অশ্রুধারায় কলকল
 গগন মরণ, হে মোর মরণ,
 সুখে ধৌরীর আঁধি ছলছল
 তাঁর কাঁপিতে নিচোলাবরণ।
 তাঁর হাতা কীধে দিগে হামি কর,
 কেঁপা বরেরে করিতে বরণ,
 তাঁর লিতা মনে মানে পরমায়,
 গগন মরণ, হে মোর মরণ।

—উৎসর্গ, মরণ

যে মৃত্যু লাভ করিয়াছে সে তো সমাপ্ত হইয়া যায় নাই—

ব্যাপিয়া সবস্ত বিবে দেব তারে সর্ব দৃষ্টে
 বৃহৎ করিয়া।

—চিত্রা, মৃত্যুর পরে

আমার জীবন তো আমার এই দেহটির মধ্যেই পরিসমাপ্ত নহে, তাহা নব নব কলেবরে আমার হইয়া আমাকে আমিত্বের আশ্বাস জানাইতেছে ও জানাইবে। আমার জন্ম হইতে জীবন মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে, সে কি আজিকার ঘটনা। সে যে—

শত জনমের চির-সফলতা,
 আমার প্রেরসী, আমার দেবতা,
 আমার বিশ্বরূপী।

—চিত্রা, অন্তর্ধারা

আমার জীবনদেবতা যদি আমার ইহ-জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতার আনন্দ না পাইয়া থাকেন, তবে তাহাতেই বা ক্লেশ করিবার বা নিরাশ্বাস হইবার কি আছে—

জন্ম লাভ তবে আজিকার সত্য,
 আশ্রয় নব রূপ, আশ্রয় নব শোভা,

নৃতন করিয়া লহ আর ব্যয়,

চির-পুরাতন যোরে,

নৃতন বিবাহে বাঁধিবে আমার

নবীন জীবন-ডোরে।

—চিত্রা, জীবনদেবতা

অনন্ত-পথ-যাত্রী মানব তাহার যাত্রা-পথের একটি আতিথ্যস্থান ছাড়িয়া
যাইতে কাতর হয়, সঙ্গীদের ছাড়িয়া যাইতেছে মনে করিয়া ভয় পায়, কিন্তু
সে তো চির-একাকী,—

তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে

কোথা হ'তে কোথা গেছ না রহিবে মনে। —চৈতালী, যাত্রী

এক নব নব পরিচয়ের ভিতর দিয়া তাহার যাত্রা—

পুরাণো আবাস ছেড়ে বাই যবে,

মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,

নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন,

সে কথা ভুলিয়া বাই।

জীবণে মরণে নিখিল ভুবনে

যখনি যেখানে লবে

চির জনমের পরিচিত গুহে,

তুমিই চিনাবে সবে। —গান

যিনি জীবন মরণের বিধাতা, তিনি প্রাণের সহিত মরণের কুলন ও দোল
খেলা দেখিতেছেন,—তিনি প্রাণকে দোলা দিয়া মরণে-জীবনে ঢালাঢালি
করেন,—

গলকে আলোকে তুলিছ, গলকে

জাঁধারে নিতেছ টানি'।

* * * *

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লগ,

বাম হাত হ'তে ডানে।

তাহাতে—

আছে তো যেমন যা ছিল।

হারার নি কিছু, কুরার নি কিছু,

যে মরিল, যে বা বাঁচিল।

—উৎসর্গ, মরণ-কোলা

মৃত্যু পরম কারুণিক, সকলের ভেদ ঘুচাইয়া সমতা-সম্পাদনের সহায়—

ইহ-সংসারে ভিখারীর মতো
বঞ্চিত ছিল যে জন সতত,
করণ হাতের মরণে তাহারে
বরণ করিয়া নিলে।

* * *

রাজা মহারাজা যেথা ছিল বারী,
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া,
নিলে তারে এ নিম্নিলে।

—মোহিত সেন সংস্করণ, বরণ—বরণ

রাজা প্রজা হবে জড়ো,
পাক্বে না আব ছোট বড়,
একই শ্রোতব মূণে ভাসব সুখে
বৈতরণীর নদী গেরে। —আরশ্চন্দ্র

মৃত্যুভীতি নবোতার প্রণয়ভীতির তুল্য, কিন্তু একবার প্রণয়ীর সহিত
পরিচয় হইয়া গেলে আর ভয় থাকে না—

প্রথম মিলন-ভীতি 'হঠাৎ বধুর
'তোমার বিবাহ মূর্তি নিরখি' মধুর।
সর্বত্র বিবাহ-বাঁশ উঠিতেছে বাজি',
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

জন্মের পূর্বে এই দেহও সংসার জীবের অজ্ঞাত থাকে, তাহার সঙ্গে
পরিচয় হওয়ায়াত্র তাহাদের—

নিমেষেই মনে হলো মাতৃবন্ধ সম
নিভাস্ত পূর্ণাচরিত একাত্মত মম।

তেনমই "মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর।"—

জীবন আমার
এত ভালবাসি ব'নে হয়েছে প্রভাস,
মৃত্যুরে এমন ভালবাসিব নিশ্চয়।
জন হতে তুলে নিলে শিশু কাদে ডরে,
মুহুর্তে আশ্বাস-পায় গিরে স্তন্যস্তরে।

ইহলোক ও পরলোক দুই-ই বিশ্বমাতার অমৃতপূর্ণ স্তন, আর মৃত্যু—

সে যে মাতৃপাদি

স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'। —সোনার ভরী, বঙ্কন

নিজের মরণে যেমন ভয় বা দুঃখের কোনও কারণ নাই, প্রিয়জনের মৃত্যুতেও তেমনই কোনও ক্ষোভের কারণ নাই।—আমরা ক্ষোভ করি, যে হেতু—

অল্ল লইয়া থাকি, তাই যোর

বাঁহা যায় তাহা যায়।

কণাটুকু যদি হারায় তা হ'লে

প্রাণ করে তার যায়।

কিন্তু বাস্তবিক ক্ষোভের কোনো কারণ নাই—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভাসু,

কত না তারায় অণু পরমাণু। —'নেবেজ

তখন মৃত্যু আমাকে পরলোকে লইয়া যাইবে, তখন—

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া,

তোমাতে হেরিব একা ভুলন ভুলিয়া। —নেবেজ

মৃত্যু তো ইহলোক হইতেও চিরবিদায় বা চিরনির্বাসন নহে। দেহ ও আত্মা দুই-ই তো এখানেই নানা আকারে বহিয়া যায়।—মৃত্যুতে হারাইয়া- যাওয়া ষোকা হাওয়ায় জলে, তাবার আব চাঁদের আলোর মায়ের কাছে আসা- যাওয়া করে, সে স্বপ্নের ঝাঁকে মায়ের মনের মধ্যে আবিস্কৃত হয়। তাই ষোকা মাকে সান্দনা দিয়া বলিয়াছে—

মাসা যদি শুধায় তোরে

ষোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে।

বলিস্ ষোকা সে কি তারায়,

জাছে আমার চোখেব তারায়,

মিলিয়ে আছে আমার বুকের কালে —শিশু, বিদ্যাব

সাজাহানের প্রেমসী তাজমহলে সমাধিতলে কেবল ছিলেন না, তিনি সাজাহানের নিকট সর্বব্যাপিনী—

যেথা তব বিরচিঙ্গী প্রিয়া

বয়েছে মিশিরা

অজ্ঞাতের অল্প আকাশে,
 ক্রান্ত-সন্ধ্যা দিশন্তের করণ নিঃশ্বাসে,
 পুণিয়ার বেহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
 জাযার অতীত তীরে
 কাঙাল নরন বেধা দ্বার হ'তে আসে কিরে কিরে।—বলাকা, সাজাহান

প্রিয় যখন মৃত্যুতে নরন-সমুখ হইতে অপসারিত হইয়া যায়, তখনও সে
 অন্তর্হিত হয় না।—

নরন-সমুখে তুমি নাই,
 নরনের মাঝখানে দিয়েছ যে ঠাই ;
 আমি তাই
 জ্বালালে জ্বালা তুমি, নীলিমার নীল।
 আমার নিবিল
 তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। —বলাকা, ছবি

উন্মিতচেহে চরাচরে অশান্তি অনন্ত করে
 সজীত উদার।
 সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
 জীবন তাহার।
 ব্যাপিরা সমস্ত বিধে বেধ' তায়ে সর্বদত্তে
 বৃহৎ করিয়া ;
 জীবনের ধূলি ধরে বেধ' তায়ে ছুরে ধুরে
 সমুখে ধরিয়া। —চিত্রা, মৃত্যুর পরে

আমি যখন আমার বর্তমান দেহে থাকিব না, তখনও তো পৃথিবীতে
 সকাল-সন্ধ্যা ঋতু-পর্যায় আসিবে ; কালে হয় তো আমার পরিচিতদের মন
 হইতে আমার স্মৃতি মুছিয়া যাইবে, কিন্তু 'আমি' তো লোপ পাইব না—

তখন—

কে বলে গো সেই গভাতে নেই আমি
 সকাল বেলায় করবে খেলা এই আমি।
 নুতন নামে ডাকবে বোরে,
 বাধ্বে অতুল বাহু-ডোরে,
 আসব দ্বার চিরদিনের সেই আমি। —এবাবিগী

বলাকার উড়িয়া চলা দেখিয়া কবির—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া

খলিয়া খলিয়া

চুপে চুপে

রূপ হতে রূপে,

প্রাণ হ'তে প্রাণে ।

মৃত্যুর প্রেম সর্বনাশা, তাই সে ক্রমাগত প্রাণ হ'তে প্রাণ টানিয়া নব নব
সুধাপাত্র আশ্বাদন করাইয়া লইয়া চলে,—

সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি বরছাড়া । —বলাকা, নবী

যাহার

কালের মন্দিরা যে সন্ধ্যাই বাজে ভাইনে বারে দুই হাতে ।

সেই মহাকাল প্রত্যেককে

ডাক দিল শোন মরণ-বাচন-নাচন-সভার ডকাতে । —প্রবাহিনী

আমরা সকলেই এখানে প্রবাসী ; তাই কবি সুদূরের পিরাসী হইয়া
বলিয়াছেন—

সব ঠাই যোর ঘর আছে, আমি

সেই ঘর মরি খুঁজিয়া । —উৎসর্গ, প্রবাসী ও সুদূর

বয়সের জীর্ণ পথশেষে মরণের সিংহদ্বার পার হইয়া নবজীবন ও নবযৌবন-
লাভের আহ্বান আমাদের কাছে নিরন্তর আসিতেছে ; কিন্তু আমাদের
অজ্ঞানাতে ভয় লাগে ; তাই আশ্বাস দিয়া কবি বলিতেছেন—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে ।

অচেনাকেই চিনে চিনে

উঠবে জীবন ওরে ।

জানি জানি আমার চেনা

কোন কালেই ফুরাবে না,

চিহ্নহার্য পথে আমার

চানবে অচিন ভোরে ।

ছিল আমার মা অচেনা

ছিল আমার কোলে ।

সকল প্রেমেই অচেনা গো,

তাই তো জন্ম গোলে । —ঈতালি

মৃত্যুর প্রেমাত্মিসারেই জীবনের মড়াঘাতা—

আমি তো মৃত্যুর গুল প্রেমে

র'ব না ঘরের কোলে গেম্বে ।

আমি চিরযৌবনের পবাইব মালা,

শতে মোর তারি তো বরণডালা ।

ফেলে দিব আর সব ভার,

নারীকোর কৃপাকার

আয়োজন ।

ওরে মন,

যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন ।

তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,

গান গায় চল তারা রবি । —বলাকা

কবি বলেন—

আমি যে অজ্ঞানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ । —বলাকা

এবং সেই জন্ত তিনি নির্ভয়ে বলিতে পারিয়াছেন—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ?

জয় অজ্ঞানার জয় ।

—প্রবাহিনী

সেই অজ্ঞান মৃত্যুর ভিতর দিয়া—

চিরকালের ধনটি তোমার অশকালে লও যে নূতন করি' । —বলাকা

অতএব মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া—

বলো অকম্পিত বৃকে,—

তোরে নাহি করি ভয়,

এ সম্মুখে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয় ।

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ' ।

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক ।

—বলাকা

মৃত্যু তো মানবের—

বহু শত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা ।

জীবের জীবন লইয়া—

হেহযাত্রা মেঘের থেঁতা বাঙরা,
মন তাহাধের ঘূর্ণি-পাকের জাঙরা ;
নৈকে বৈকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার ।

— বলাক

মহাপ্রাণ বা সমগ্র প্রাণ হইতে যে প্রাণধারা নিরন্তর প্রবহমান হইতেছে তাহা
তো মৃত্যুর দ্বার দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে—

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিগেই স্রোতের জরঘাত্রা ।

—নটীর পুত্র

সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে
যে অশুভীন প্রাণ ।

—গান

জগতে কিছুই শেষ হয় না, কারণ শেষ তো অশেষেরই অংশ—

শেষ নাহি যে, শেষ কথা 'ক বলবে ।

• • •

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অজ্ঞকারের পেরিয়ে দুয়ার
যার চ'লে আলোকে ।
পুরাতনের দ্বার টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল কোটা হ'লে
মরণে ফল ফল্বে ।

—গীতাঞ্জলি

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগুচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে ।

—গীতাঞ্জলি

হে অশেষ, তব হাতে শেষ

থরে কী অপূর্ণ বেশ ?

কী মহিমা !

জ্যোতিহীন সীমা

মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'

বার গলি',

গড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার । —পূরবী, শেষ

কবি শরৎকান্ত-সঙ্কে লিখিয়াছেন—

“আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারের বারে নুতন করিয়া কিরিয়া কিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আভিনায় আশ্রয়বী-
ধানের আর অস্ত্র নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার কিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের
মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া কিরিয়া পাওয়ার উৎসব।”

কবির কান্তনী নাটকের অন্তরের কথাও এই—

নুতন ক'রে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ,

ও মোর ভালোবাসার ধন ।

কবি বলেন—

মৃত্যু সে যে পশ্চিকেরে ডাকে ।

—পূরবী, মৃত্যুর আহ্বান

এবং—

অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ ।

—পূরবী, কন্ডাল

“সৃষ্টিকর্তা” যিনি—

তিনি উদ্ভাসিনী অভিসারিণীকে

ডাকিছেন সর্বহার্য মিলনের প্রলয়-তিমিরে ।

—পূরবী, সৃষ্টিকর্তা

সৃষ্টিকর্তার এই ডাক কেন, না—

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,

পেতে হবে তব পরিচয় ।

—পূরবী, হুপ্রস্তাব

ক্লান্ত হতাশ জনকে কবি বারংবার আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

নাশির যে রে প্রাণের বোঝা,

আরেক বেশে ঢুকে মোজা

মৃত্যু ক'রে বাঁধি ফেলা,

মৃত্যু খেলা খেলুবি সে টাই ।

—বোটারুয়ারির হাট

পরিশিষ্ট—মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

৩৮৫

ভগবান্ অনন্ত, আর তাঁহার সৃষ্ট জীবনও অনন্ত ও অনাদি—

সকলেই কাছে থাকি' আনন্দ-আগরে থাকি'

অমৃত করিছ বিতরণ,

পাইয়া অনন্ত প্রাণ

জগৎ পাইছে গান

গগনে করিয়া বিচরণ ।

*

*

*

*

জাগে নব নব প্রাণ,

চিরজীবনের গান

পূরিতেছে অনন্ত গগন ।

পূর্ব লোক-লোকান্তর

প্রাণে মগ্ন চরাচর

প্রাণের সাগরে সম্ভরণ ।

জগতে যে দিকে চাই

বিনাশ বিরাম নাই,

অহরহ চলে যাত্রিগণ ।

—গান

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে

ভাসালে আমাদের জীবনের স্রোতে ।

সেই আদি কাল কি অল্পকাল,—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান পেয়ে—

সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয় ।

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে এই জন্ত যে তাহার আহ্বানে সংসার ছাড়িয়া যাইবার সময় আমাদের প্রিয় সামগ্রী পশ্চাতে ফেলিয়া বাইতে হয় । কিন্তু মরণ তো রিঙ্ক নয় ।

কে বলে সব কেলে যাবি

মরণ হাতে ধরবে যবে !

জীবনে তুই যা নিয়েছিলি,

মরণে সব দিতে হবে ।

অতএব মৃত্যু যখন সমারোহ করিয়া প্রিয়সমাগমের জন্ত আসে তখন—

রাজার বেশে চল্ রে হেমে

মৃত্যুসময়ের সে উৎসবে ।

বর যে দিন বধূকে বরণ করিয়া লইতে আসিবে, সে দিন তো ভাষাকে শূন্য হাতে বিদায় করিলে চমকিবে না, ভাষাকে প্রাণের অপমান হইবে যে ।

যদিও যে দিন বিয়ের শেষে আসবে তোমার হারায়ে,

সে দিন ভাবি কি বন দিবে উহারে ?

তবু আমার পরাধর্মান

সমুখে তার দিব আনি",

শূভ বিচার করব না তো উহারে,—

যদিও যে দিন আসবে আমার হারায়ে ।

মৃত্যু-বরের অস্ত্র জীবন-বধু মিলনোৎসুক হইয়া সর্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—

সারা জন্ম তোমার লাগি'

প্রতিদিন যে আছি আনি',

* * *

যা পেরেছি, বা হেরেছি,

যা কিছু মোর আশা,

না জেনে যার তোমার পানে

সকল ভালবাসা ।

মিলন হবে তোমার সাথে,

একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,

জীবন-বধু হবে তোমার

নিত্য অঙ্গুগতা,

* * *

সে দিন আমার হবে না ঘর,

কেই বা আপন, কেই বা অপন,

বিজ্ঞ রাতে পতির সাথে

মিলবে পতিব্রতা ।

যরণ, অরণ্য যরণ, তুমি

বড় আমারে কথা । —গীতাঞ্জলি

আমি অনাদি, আমার অস্ত্র অনাদি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, মৃত্যু
সেই অনাদি মহাকালেরই মিলনদূত,—সেই অস্ত্র আমার অভিসারও অনাদি
অস্ত্র—

যেদিন মিলনদূত সেই দিন অস্ত্র সাহি ।

তাই

তোমার খোঁজা শেষ হবে না হোর

যবে আমার জন্ম হবে তোমার ।

চলে যাব নবজীবনলোকে,

নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,

নবীন হ'বে নূতন সে আলোকে

পরবো তব নবমিলন ভোর ।

মরণযাত্রায় তো মানব একাকী যাত্রী নয়, তাহার সঙ্গে তাহার বিধাতাও
যে সহযাত্রী—

যবে মরণ আসে নিশীথ গৃহঘারে,

যবে পরিচিতির কোল হ'তে সে কাড়ে,

যেন জানি পো সেই অজানা পারাবারে

এক তরীতে ডুবিও ভেসেছ ।

—গীতিমাল্য

আমাদের সংসার-বন্ধন ছাড়িয়া যাইতে ক্লেশ বোধ হয়, তাই মৃত্যু সেই
বন্ধন মোচন করিয়া আমাদের প্রিয়তমের সকাশে লইয়া যায়,
কাজেই মৃত্যু ভয়ানক নহে, সে আমাদের আনন্দদূত ।—

মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে,

তুমি আমার আনন্দ ।

আমার জীবনদেবতার সহিত মিলন হইবে বলিয়াই আমার প্রাণবধু
স্বয়ংবরা হইয়া মৃত্যুর পথে অভিসারিকা—

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী

অনাদি প্রোত বেয়ে ।

* * *

তোমার আমার মিলন হবে ব'লে

যুগে যুগে বিশ্বভুবন-তলে

প্রাণ আমার বধু বেশে চলে

চিত্র স্বরধরা । —গীতিমাল্য

আমি যে এই অজ ধারণ করিয়া আমার প্রাণকে আশ্রয় দিয়া প্রকাশ
করিয়াছি,

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে বৃক্ষ-মুখাভিরেণ তত,

ভূখন কত তাঁর-জলের ধারণ করেছে তার বজ । —গীতিমাল্য

মৃত্যু বধি না থাকিত তাহা হইলে জীবনই থাকিতে পারিত না, মৃত্যুর
দ্বারাই আমরা জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি—

মরণকে গ্রাণ বরণ ক'রে বাচে । —গীতালি

এবং প্রত্যেক জীব—

বহিল মরণ-রঙ্গী জীবন-স্রোতে ।
সে যে ঐ ভাঙা-গড়ার তানে তানে
নেচে বাস বেশে বেশে কালে কালে ॥ —গীতিমাল্য

“সবাই যারে সব দিতেছে,” সেই আমাদের প্রিয়তম আমাদের সর্বস্ব
হরণ করিবার অশ্রু

মরণের পথ দিয়ে ঐ
আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসুছে বীরের সাঙ্গে ।

সেই প্রিয়তমকেই বলতে হবে—

মরণ রাবে ডুবিয়ে গেবে
সাক্ষাৎ তবে মিলন-বেশে,
সকল বাধা মুচিয়ে কেলে
বাধ বাহুর ডোরে । —গীতানন্দ

মরণই আমাদের জীবন-তরলী কাণ্ডাবী,—

মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই ।

গানের রাজা কবি জীবন-মরণের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

তোমার কাছে এ বর নাগি—
মরণ হ'তে যেন আগি
গানের হুসে ।
বেহুনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার শুভহৃদ্য-হেন
নবীন জীবন ধৌল, ধৌ পূরে
গানের হুসে ।

মানুষের জীবন তো অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া পশ্চিক, কিন্তু সে চির-পুরাতন হইয়াও মৃত্যুর বশে চির-নূতন—

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে ।
 রাজ্য আমার চলার পাকে
 এই পথেরই বাকি বাকি
 নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।
 কে বলে, "যাও যাও"—আমার
 যাওয়া তো নয় যাওয়া
 টুটবে আগল বারে বারে
 তোমার দ্বারে
 লাগবে আমার কিরে কিরে কিরে-আমার হাওয়া ।

• • •
 পশ্চিক আমি পথেই বাসা,
 আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা ।
 ভোরের আলোর আমার তারা
 হোক না হারা,
 আবার জলবে সাথে আবার-মাঝে তারি নীরব চাপসা ॥

—প্রবাহিণী

কবি একদিন রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

পরজন্ম সত্য হ'লে
 কি ঘটে মোর সেটা জানি ।
 আবার আমার টানবে ধরে
 বাংলা দেশের এ রাজধানী । —কলিকাতা, কর্ণফল

কিন্তু কবি পরজন্মে স্থির বিশ্বাস করেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করে
 আবার আসি কিরে
 দুঃখ-স্বপ্নের ঢেউ-খেলানো
 এই নাগরের তীরে । —গীতালি

কবি লিখিয়াছেন—

জগৎ-রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রথম রস
 মৃত্যুই তাহাকে স্বার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে । যদি মৃত্যু না থাকিত, জগৎজের বেখানকার

বাঁধি তাহা। তিরিহাল সেইখানেই এহি অধিকৃতভাবে ধাক্কাইয়া থাকিবে; তবে জগৎটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সর্বাঙ্গ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া রহিত। এই অস্বস্তি-নিশ্চলতার চিরস্থায়ী তার বহন করা এ্যাপীলের পক্ষে বড় দুঃস্বপ্ন হইত। মৃত্যু এই অস্বস্তির ভীষণ ভাবকে সর্বদা লম্বু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র বিস্তারিত। যেদিকে মৃত্যু সেইদিকেই জগতের অসীমতা। সেই অস্বস্তি রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারমাণী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।—একে, বাহা প্রত্যক্ষ, বাহা বর্তমান তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহার একেশ্বর কোরাঙ্কোর আর শেষ থাকিত না—তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত যে ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের তার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত, মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত।

মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো মর্ষাদাই থাকিত না। এখন জগৎস্থল লোক ধাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের পোয়বে পোয়বাধিত।

জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেইজন্ত আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের অমরতা, সব সেইখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয়, কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না; সেগুলি মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই—হুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাপণ বাসনা নিশ্চল হয়,—সকলজাতি মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিফলিত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অগ্রমাণ করে—জগতের যে সীমার মৃত্যু, সেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম হৃদয়তম কল্পনার কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্রুশানবাসী,—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতনে।

জগতের নবরতাই জগৎকে স্থল করিয়াছে। এইজন্ত মানুষের দেবলোকেও মৃত্যুর কল্পনা, —সত্যের মেহত্যাগ, মন-ভঙ্গ ইত্যাদি। —পঞ্চভূত

“জীবনকে সত্য ব’লে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার স্বার্থ প্রজ্ঞা নেই ব’লে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক’রেও মৃত্যুর বিভীষিকার প্রতিবিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে চুটেছে, সে দেখতে পার—যাকে সে ধরছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন!”

‘কালগুণী নাটকের অন্তরের কথা’ ইহাই।

‘স্বকলম’ বখন জগতের সেই যে বিরাট বৃদ্ধা স্নানোত্তর মতো পৃথিবীর
“বৌবন-সমুদ্র গুহে খেতে চায়” তাকে ধরিবার ‘জন্তু’ অভিযান করিয়া
বাহির হইরাছিল, তখন তাহার। বলাবলি করিতেছিল—

বিদ্যার বানিতে বখন কোমল ধৈর্য লাগে তখন সকলের দিকে চোখ মেলি। আর
সেখি বড় মধুর। যদি সবাই চ’লে চ’লে না যেতো তা হ’লে কি কোম নাখুরী চোখে
পড়তো। চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে বৌবন শুকিয়ে যেত। তার
মধ্যে কারা আছে, তাই বৌবনকে সমুদ্র দেখি। জগৎটা কেবল ‘পাবো’ ‘পাবো’ কহে
না,—সঙ্গে সঙ্গেই বসে ‘ছাড়বো’ ‘ছাড়বো’। হৃষ্টির গোখলি লগ্নে ‘পাবো’র সঙ্গে ‘ছাড়বো’র
বিষে হ’রে গেছে রে—তারের মিল ভাঙে সেই সব স্তম্ভে যাবে। —কালুজনী

দাবন ব’য়ে যার ধরাতে

বরণ-গীতে গজ্ঞে রে—

কেনে দেবার ছেড়ে দেবার

মরবারই আনন্দ রে—

—গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা-ফুলের মেলা।

দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরাফুলের খেলা।

যে ঢেউ ওঠে তারি হরে

বাজে কি গান সাগর জুড়ে।

যে ঢেউ পড়ে তাহারো হর জাগ্ছে সারা বেলা। —অরুণ রতন

মৃত্যু যে অবসান ও শেষ নহে তাহা কবি বারংবার বলিয়াছেন।—

আমাদের মধ্যে একটা মৃত্যু আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাতেই সব চেয়ে
বেশী বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে প’ড়ে যায়, মনে করি সে যুগি
একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে প্রজ্ঞাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি। আমার
চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে, আমার দেখা-শোনার
বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হ’য়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে
জানছি, সে যার মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনো
তারই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমার সীমাবদ্ধ নয়।
আমার যেখানে জানার শেষ, সেখানে তিনি ফুরিয়ে জাননি। আমি যাকে দেখছি, সে,
তিনি তাকে দেখছেন—আর তাঁর সেই দেখার নিবেদন পড়ছে না।”

—শান্তিনিকেতন, দ্বাদশ বৎস. বাত্মস্মৃতি

আমি ক’লে যে কাঙালি: সব জিনিসকেই হালের মধ্যে দ্বিষ্টে চায়, সব জিনিসকেই মৃত্যুর
মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ঠাকি দেয়—তখন সে মনের খেঁচে সবস্তু সংসারকেই ঠাকি

বলে দাল দিতে থাকে—কিন্তু সন্ধ্যার বেলা তেমনই থেকে যায়, ফুটা তার দানে আঁচকাট
কাটতে পারে না। অতএব মৃত্যুকে বধন দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকি মনের একটা
বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছই
হারার না, বা হারাবার সে কেবল অহং হারায়। —শান্তিনিকেতন, সপ্তম খণ্ড, মৃত্যু ও অমৃত
তাই কবি বলিরাছেন—

বধন আবার আমি
কুরায়ে বার খাবি,
তখন আবার তোমাতে প্রকাশ।

এবং—

মৃত্যু আপন পায়ে গরি' বহিছে যেই প্রাণ,
সেই তো তোমার প্রাণ, —গীতালি

প্রাণ যে মুক্তধারার প্রবাহিত হইয়া চলিতে পারিতেছে তাহার কারণ—

নাচে যে নাচে, মরণ নাচে
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। —মুক্তধারা

মরণকে যে প্রাণের পরিচয় বলিয়া না জানিতে পারে তাহার প্রাণ হয় ক্ষুদ্র ও
সঙ্কীর্ণ।—

মরণকে তুই পর করহিস, তাই,
জীবন যে তোমার ক্ষুদ্র হলো তাই। —প্রবাহিণী

অতএব—জীবনেরই তো কেবল জীবনেরই দেবতা নন, তিনি মৃত্যুবিধাতা—

তোমার মোহন রূপে
যে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ-নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে। —গীতালি

মৃত্যু হইতেছে জীবনের পরিণতি,—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কণ্ড আমারে কথা। —গীতালি
জীবনকে তোমার ভয়ে দিতে
মরণ-আবৃত্ত খেতেই হবে। —গীতালি

জীবনের ধন কিছুই বাবে না কেহ;

মৃত্যু তাহের বত হোক অবহেলা,

তাহের পদ-পদম তাহের 'পরে'।

—স্বভাষি

কবি কীটিলও বলিয়াছেন যে—

Death is Life's high meed.

Death is the Crown of Life.

পূর্ণাংপূর্ণ যিনি তাঁহারই মধ্যে তো সকল অংশ নিবিষ্ট ও নিহিত হইয়া রহিয়াছে
অতএব কোথাও কোনও ক্ষতি নাই, বিনাশ নাই, বিচ্ছেদ নাই। এই সত্যাদৃষ্টি
লাভ করিয়া কবি আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,

বিরহ-বহন লাগে;

তবুও শান্তি তবু আনন্দ

তবু অনন্ত জাগে।

তবু শ্রম নিতানন্দ, হাসে হৃৎ চল তরা,

বসন্ত নিকুলে আসে বিচিত্র রাগে।

তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,

কুহব খরিয়া পড়ে, কুহব ফুটে,

নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি ষষ্ঠদেশ,

সেই পূর্ণতার পারে মন স্থান রাগে।

—গান

কিন্তু কবি জীবন-মরণ-বিধাতার স্বরূপ অনুভব করিয়া এখন প্রার্থনারও
উপেক্ষা উঠিয়াছেন। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রার্থনার আবশ্যক
হয়। কিন্তু পূর্ণাংপূর্ণ যিনি তিনি তো কোনোমতেই অংশকে পরিভাগ
করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইবে, তাই কবি
সংশয়ভরিত হইয়া, পূর্ণের মধ্যে অংশের নিশ্চয় আশ্রয় জানিয়া, নিশ্চিত
হইয়াছেন। তিনি এখন মৃত্যুভয়ের অতীত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। বতরুণ
তয়ের স্বরূপ জানা না যায়, ততরুণই আশঙ্কা থাকে, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া
উপস্থিত হইলে, মৃত্যুকে আর ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। বজ্রাঘাত হইবে
এই সম্ভাবনাতেই ভয়, কিন্তু বজ্রপাত হইয়া গেলে আর ভয় কিসের? যিনি
জীবন-বিধাতা, তিনিই তো স্বয়ং মৃত্যুরূপী; তিনি মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া মানবের
পরীক্ষা করেন, কিন্তু যে মানব মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে পারে, তখন সে

বিখ্যাত গুণ্ডাম-দেখানোকে জন্ম করিয়া স্বয়ং বিখ্যাত উপরও জন্ম হয়।
তাই গুণ্ডাম কবি কহিয়াছেন—

যখন উত্তত ছিল তোমার অপনি,
তোমায়ে আমার চেয়ে বড় ব'লে নিয়েছি পুঁনি'।
তোমার আখাত সাথে নেমে এসে তুমি
যেথা যোর আপনার তুমি।
ছোট হ'রে পেছ আমি।
আমার টুটল সব লাঙ্গ।
যত বড় হও,
তুমি তো বড়ার চেয়ে কড় নও।
আমি তার চেয়ে বড়, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

‘গু’। রবীন্দ্র-পরিচয়

আমি যখন সাবেক হিসাবে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার বয়স বড় জোর বারো বৎসর হবে। আমি সেই বয়সে, আর সেই বিভা নিয়ে তখনকার সকল বড় সাহিত্যিকের বই প’ড়ে শেষ করেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সকল উপন্যাস, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি কবির কাব্য, দীপবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির নাটক আমি পেটুক ছেলের মতনই গিলেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর ‘সীতারাম’ উপন্যাস সত্তা প্রকাশিত হ’লে আমার সেখানি পড়বার আগ্রহ এমন প্রবল হয়েছিল যে লোকানে বই কিন্তে বাবার বিলম্ব আমার সয়নি; বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর কাছেই আমার থাকতাম; তাই তাড়াতাড়ি আমি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর কাছে বই কিন্তে গিয়ে তাঁর ধনক খেয়ে এসেছিলাম, এবং তিনি যদিও আমাকে বলেছিলেন যে, এ বই তো তোমার যতন ছেলেমানুষের পড়বার নয়, তবু আমি তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়েই পোকান থেকে সেই বই কিনে প’ড়ে কবে নিশ্চিত হ’তে পেরেছিলাম। আমার বই পড়ার জন্য এই রকম লোভ থাকে সবক’ে আমি রবীন্দ্রনাথের কোন বই বা রচনা বি.এ. রূপে পড়ার আগে

পড়ি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নামে যে একজন কবি আছেন, এ সংবাদও আমার কাছে পৌঁছেনি।

বাংলা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে, ইংরেজী ১৮৯৪ সালে, বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে কলকাতার টার থিয়েটারে একটি শোকসভা হয়। তখন আমি ফার্ট' ক্লাসে পড়ি। বঙ্কিমবাবুর প্রতি মস্তীর শ্রদ্ধা থাকাতে আমি সেই সভায় উপস্থিত হই, যদিও তখন আমার পারের মধ্যে একটা বা হ'য়ে আমি এক রকম পঙ্খ হইতেই ছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা সম্বন্ধে প্রথম পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ, আর সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সেই দিন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলাম, এবং তাঁর মধুর অগচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে ও সুন্দর চেহারা দেখে একটু আকৃষ্ট হলাম। তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত শ্রোতা এক বাক্যে চীৎকার করতে লাগলেন—"রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!" আমি তখন পাড়ারগেয়ে ছেলে, ঐ চীৎকারের কোনো মর্মই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। শোকসভার গান্ডীর্ষহানির আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গান গাইলেন না। আমিও রবিবাবুর বিশেষ কোনো পরিচয় না পেয়েই বাড়ী ফিরে এলাম।

তার পর দ্বিতীয় দিন রবিবাবুকে দেখলাম আমি যখন ফার্ট' আর্টস পড়ি, ১৮৯৬ সালে, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট' হলে; সকল কলেজের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার সভায় তিনি অন্ততম বিচারক ছিলেন, অপর দুজন বিচারক ছিলেন কবির নবীনচন্দ্র সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। সেদিনও সকল শ্রোতা ও দর্শকেরা সভার কার্ণশেবে চীৎকার জুড়ে দিলেন, "রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান!" রবিবাবু অস্বাভাবিক 'অস্বীকার' করে লজ্জান্বিত মুখে কেবলই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছেন, আর জনতাব চীৎকারও চলে। আমি জনতার অভ্যুত্থান দেখে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম, একজন ভ্রমলোক কিছুতেই গান গাইবেন না, তবু তাঁকে গাইতে পীড়াপীড়ি করা আমার কাছে অত্যন্ত বেয়াদবী বলে মনে হলো। আর মনে হলো যে এমনই বা কি গান যে শোনবার জন্ত এমন কাক্সানি করতে হবে। আমি বিরক্ত হ'য়ে সভাত্যাগ করে বেরিয়ে চলে যাইলাম, ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার কানে অশ্রুতপূর্ব মধুর কণ্ঠের স্বরধ্বনি ভেসে এসে আবেশ করল, আমি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত এক অজীশ্বর রাণো নীত হ'য়ে চট করে ফিরে গাড়িয়ে দেখলাম রবিবাবু গান

গাইতে আরম্ভ করেছেন। আমি সত্যার সামনের দিকেই বসেছিলাম, কিন্তু উঠে চলে আসার পর আমার সম্মুখে অগ্রসর হবার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি জনতার ব্যুহ ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে সেই ঘরপ্রান্তে দাঁড়িয়েই মজ্জবৃদ্ধ জুজিভৈরব মতন গান শুনতে লাগলাম। সে যেন মহাক্কণ্ঠের স্বর নয়, যেমন মধুর তেমনি তীক্ষ্ণ স্পষ্ট, আর গানের ভাষা স্রবের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। তিনি শেখিন গাইলেন—

আমার বোলো না গাহিতে বোলো না।
 এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
 শুধু মিছে কথা, ছলনা।
 এ যে নরনের জল, হতাশের ঝাল,
 কলকের কথা, বরষের আপ,
 এ যে বুককাটা হুখে, ভরষিছে বুক,
 গভীর মরম-বেদনা।
 এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
 শুধু মিছে কথা ছলনা।
 এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী,
 কথা গের্গে গের্গে নিতে করতালি,
 মিছে কথা ক'রে, মিছে ঝল ল'য়ে,
 মিছে কাজে নিশি বাপনা।
 কে জাগ্রিবে আজ, কে করিবে কাজ,
 কে বুঢ়াতে চাহে জনবীর নাজ,
 কাতরে কাঁদবে মারের পায়ে দিবে
 সকল প্রাণের কামনা।
 এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
 শুধু মিছে কথা ছলনা।

তখন আমার নবীন মনে স্বদেশপ্রেমের রঙীন নেশা নূতন লেগেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীত আমাকে একেবারে মোহাবিষ্ট ক'রে ফেললে।

তার পরে আবার আর একদিন ঐ ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হলে রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নামক নাটিকা পাঠ করেন। তার অল্পদিন আগেই আমার সহপাঠী বঙ্কু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ঐ হলোই রবিবাবুর কবিতার এক সমালোচনা পাঠ করেন। এই দুই সভ্যতাই সঙ্গাপতি ছিলেন

গুরুদাসবাবু। রবিবাবু তাঁর নথরচিত নাটিকা পাঠ করতে উঠে ভূমিকা স্বরূপ বলতে লাগলেন—“কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু আমাকে এই হলে কোনো লেখা পড়তে অমরোধ করেছিলেন। তাঁর সেই অমরোধ রক্ষা করবার স্বযোগ আমার হয়নি। সম্রাতি আজ্ঞাকার মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে এখানে কিছু পাঠ করতে অমরোধ করেন। আমি মনে করলাম যে এই স্বযোগে বঙ্কিমবাবুর অমরোধের ঋণ পরিশোধ করতে পারব, তাই আমি আমার লেখা পাঠ করতে সন্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার লেখা এখানে পাঠ করতে আমার স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, অল্প কয়েক দিন আগে এই হলে, সভাপতির অধীনে হয় তো বা ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা পাঠ হয়ে গেছে। যিনি সমালোচক, তিনি বয়সে তরুণ। তরুণ বয়স যথার্থ সমালোচনার সময় নয়। তরুণ বয়সে লোকে কবি হতে পারে, কিন্তু সমালোচক হতে হ’লে প্রবীন বয়সের দরকার। কাঁচা বাঁশে বাঁশী হতে পারে বটে, কিন্তু লাঠি হ’তে হ’লে পাকা বাঁশের দরকার। মানুষকে ভাইপো হয়েই জন্মাতে হয়, কিন্তু অনেক লোকে জ্যাঠা হবার পূর্বেই জ্যাঠাইয়া যান। সকল মানুষের মধ্যে সকল গুণ থাকে না, আর তা প্রত্যাশা করাও যায় না। ময়ূরের পুচ্ছ আছে, কিন্তু তার কণ্ঠে কোকিলের সুস্বর নাই, আবার কোকিলের কণ্ঠ আছে, তার ময়ূরের মতন সুন্দর পুচ্ছ নেই। ইক্ষুদণ্ডে আত্মকল ফলে না, আর আত্মশাখায় ইক্ষুরস পাওয়া যায় না। অতএব কবির কাব্যে কি আছে তারই বিচার না ক’রে, কি নাই তাই নিয়ে তাকে দোষারোপ করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। তাই আজ আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এখানে এসেছি আমার লেখা পাঠ করতে।”

এই ভূমিকা ক’রে তিনি গান্ধারীর আবেদন পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। সে কৌ কণ্ঠস্বর, কৌ সুন্দর উচ্চারণ, কৌ কবিত্বমধুর ওজস্বী ভাষা। সমস্ত শ্রোতা তরু হ’য়ে শুনতে লাগলেন।

সেই সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পত্নীর অসং-
মানহতক লেখা প্রকাশ ক’রে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধারীর উক্তি
মধ্যে আমরা রবিবাবুর দিকার অজ্ঞান ক’রে অত্যন্ত আনন্দ অহত্ব করে-
ছিলাম, এখন তন্নাশ রবিবাবু গান্ধারীর অবানী বলছেন—

পুষ্কর পুষ্কর

স্বর্গ ন'রে বাধে অহরহ,—ভাঙ্গো মন
 নাহি বুঝি তার,—কণ্ঠসীতি ভেদবাতি
 কুটনাতি কত শত,—পুষ্করের সীতি
 পুষ্করেই জানে । বলের বিরোধে বল,
 ছেনের বিরোধে কত জেগে উঠে হল,
 কোশলে কোশল হানে—মোরা থাকি দূরে
 আপনার গৃহ-কর্মে শান্ত অন্তঃপুরে ।
 যে সেখা টানিয়া আনে বিবেক-অনল
 বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে,—পুষ্করের হাড়ি'
 অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
 গৃহমচারিণীর পুণ্যক্ষেত্রে 'পরে
 নন্দন পরশ স্পর্শে অসম্মানে করে
 হস্তক্ষেপ,—পতি সাথে বাধায় বিরোধ
 যে-নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
 সে শুধু পাথর নহে, সে সে কাপুক্ষ্য ।

এই নাটিকা পাঠ শেষ হ'লে শুক্লাসবাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুকে দিয়ে রবিবাবুকে
 ধন্তবাদ দেওয়ালেন । হেমেন্দ্রবাবু প্রথমে কিছুতেই সম্মত হচ্ছিলেন না, শেষে
 শুক্লাসবাবুর পীড়ান্বিত ভাষা হ'য়ে ধন্তবাদ দিলেন, সে যেন বেহুলার
 অল্পরোধে চাঁদ সদাগরের হাতে মনসাদেবীর পূজা পাওয়া ।

যখন রবিবাবু হেমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ্য ক'রে কবিদরসালো তিরস্কার
 করছিলেন, তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন বন্ধু
 সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গিয়ে নিজেদের বিবক্তি ও প্রতিবাদ প্রকাশ করে-
 ছিলেন ।

ধন্তবাদ প্রভৃতি শেষ হলে, সমস্ত শ্রোতা আবার চীৎকার আরম্ভ করলে—
 রবিবাবুর গান, রবিবাবুর গান !

আমি এর পূর্বে একদিন রবিবাবুর গানের আশ্রয় পেয়েছি, আজ আর
 জয়গা ছেড়ে নড়বার নাস্তি করলাম না । অনেক অহরোধের পর রবিবাবু
 গায়িলেন—

কে এসে ধাক্কা দিলে কিরে,

স্বাক্ষর সঙ্কলন—

কে বুঝা আপাতরে
চাহিছে সুখপরে
সে যে আমার জননী রে ।
কাহার সুখামরী বাগী
বিলার অনাদর মানি ।
কাহার ভাবা হার,
ভুলিতে সব চার ।
সে যে আমার জননী রে ।
অনেক ব্রহ্মকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি ।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে ।
বিরল কুটীরে বিধর,
কে ব'সে সাজাইয়া অর ।
সে ব্রহ্ম উপহার
রুচে না বুঝে আর ।
সে যে আমার জননী রে

সেই সভায় অনেক বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গ—না ইংরেজ না-বাঙালী গোছের বিদেশী পোষাক-পরা ও বিদেশী ভাষার কথা বলার চেষ্টিত লোক ছিলেন, তাঁদের অবস্থা দেখে আমরা তখন অত্যন্ত সুখ অনুভব করেছিলাম । আমাদের মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন স্বদেশভক্ত কবির তীব্র তিরস্কারে লজ্জিত হ'য়ে নিজের গায়ের বিদেশী পোষাক গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচেন ।

‘গান্ধারীর আবেদন’ নাটকটির মধ্যে আমরা সাময়িক ইতিহাসের ছাত্র-পাত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম । তখন আমাদের মনে হরেছিল ধূতরাষ্ট্র হচ্ছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, তর্কোক্ত Bureaucracy, গান্ধারী ইংরেজ জাতির জ্ঞাননিষ্ঠা (British sense of Justice), ভাষ্কর্য British prestige, পাণ্ডবেরা স্বাধিকারবঞ্চিত ভারতবাসী এবং দ্রৌপদী ধর্মপথে চলার শাস্তি ও গৌরব !

এর পরে তখনকার লেকটেন্যান্ট গভর্নর উডবার্ণ সাহেব একবার ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সকল মেম্বারকে তাঁর বেল্‌ভিডিয়র প্রাসাদে নিমন্ত্রণ

করেন। সেই দিন রবিবাব স্বপ্নে ঢাকাই মসজিদের একটি প্রচুর ঝুঁটি দেওয়া ঘাঘরার মতন মুসলমানী জোকবা গারে দিয়ে ও পাজাবী নাগরা জুতা পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে কেমন দেখতে হয়েছিল তা তাঁরা বুঝতে পারবেন, ধারা বাংলার ইতিহাসে ইংরেজ আমলের পূর্বের নবাবদের ছবি দেখেছেন। সেইদিন হেমেন্দ্রবাবু গিয়েছিলেন, রবিবাবু তাঁকে কাছে ডেকে আলাপ করেন, এবং যখন কটো তোলা হয় তখন হেমেন্দ্রবাবু বেছে বেছে রবিবাবুরই পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলান।

আমি তখনো রবিবাবুর কোনো বই কোনো চোখেও দেখিনি। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়তে ভর্তি হয়েছি, আর থাকি হিন্দু হোস্টেলে। সেখানে একদল লোক ছিল যারা রবিবাবুর কাব্যকে অস্পষ্ট ও অর্থহীন ব'লে নিন্দা করত, এবং আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতাম, রবিবাবুর কোনো লেখা না পড়েই।

একদিন এক মজলিশে রবিবাবুর নিন্দা হচ্ছিল। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিচ্ছিলাম। সেখানে মুখ বুজে বসেছিলেন আমাদের সহপাঠী অধুনা স্বর্গগত নলিনীকান্ত সেন। কিছুকণ পরে আমাদের নিম্নাসভা ভেঙে গেলে নলিনী নিজের ঘরে চ'লে গেল এবং থানিক পরে আমার ঘরে ফিরে এসে আমার বিছানার উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী কেলে দিয়ে কোনো কথা না ব'লে ঘর থেকে চ'লে গেল। নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে কি বই দিয়ে গেল দেখবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দেখলাম রবিবাবুর গ্রন্থাবলী। তার প্রথম পৃষ্ঠা খুলেই পড়লাম—

ডন নলিনী খোলো গো আঁধি,
দুঃ এখনো জাঙিল না কি।
দেখ তোমারি দুরার 'পরে
সবি এসেছে তোমারি রবি।

করেক পৃষ্ঠা উটেই আবার পড়লাম—

শুনছি শুনছি কি নাম তাহার
শুনছি শুনছি তাহা।
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী—
কেমন মধুর আদ্য।

নালিনী নালিনী নালিনী নাম

বালিমে প্রাণের গভীর ধ্বংস

কত আনমনে উঠেচে মুখে

নালিনী নালিনী নালিনী নাম।

তরুণ বয়সে প্রাণে যে কবিত্ব জাগে, এ আকৃতি প্রকাশ করবার জন্য, মুক মন ভাষা খুঁজে ব্যাকুল হয়, আমার প্রাণে সেই কবিত্ব সেই আকৃতি যেন কবির লেখায় ভাবা পেরে, হাঁপ, ছেড়ে, বাঁচল। আমার মনে হ'লো আমি যে কথা বলতে চাই অথচ পারি না, সেই কথাই তো এই কবির আমার জবানী ব'লে রেখেছেন। আমার মনের এই কথাটি কবি পরে 'কণিকা' কাব্যে বলে চুকেছেন—

তোমাদের চোখে আঁধারের ঝরে হবে,

আমি তাগদের পেঁথে বিই গীতরবে,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে

যরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

ববীন্দ্রনাথের কবিতা আমার প্রাণমন হরণ করল। আমি আর পরের বই পড়তে পারলাম না। নালিনী সেনকে তার বই ফিরিয়ে দিয়ে তখনই ছুটলাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ের দোকানে। একখানি টালী আকারের গ্রন্থাবলী কিনে নিয়ে হোষ্টেলে ফিল্ডাম এবং সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আমার জীবনের আনন্দ বন্ধু শিক্ষক গুরু সহচর হ'য়ে আছে।

এই সময়ে আমাদের সহপাঠী সুরেশচন্দ্র আইচ আমাদের সঙ্গে হিন্দু হোষ্টেলে বাস করছিলেন। আমি শুন্লাম তিনি রবিবারে গান গাইতে পাবেন। এব পবে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধু হ'তে অধিক বিলম্ব হয়নি। কত সন্ধ্যা আমরা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সুরেশের মধুর কণ্ঠের গান শুনে অতিবাহিত করেছি, তার স্মৃতি আজও মনকে হর্ষবিষাদে অভিভূত করে—সুরেশ আজ পরলোকে, সে আমাকে যে অমৃতের আনন্দ দিয়ে গেছে, তা আমার জীবনকে মাধুর্যে অভিষিক্ত করে রেখেছে।

এই সময়ে বা এর পরে—এখন তা ঠিক মনে নেই, এবং কি উপলক্ষ্যে তাও এখন স্মরণ নেই, কলকাতার লোকমান্য টিলক, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদন-মোহন মালবীর প্রভৃতি বেশনেজারা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গ

এলবার্ট হলে স্বধর্মী-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভার আর কি কি হয়েছিল এবং কে কি বলেছিলেন তা আজ আর কিছুই মনে নেই ; কেবল মনে আছে রবিবাবু গান গেয়েছিলেন—

জননীর ঘরে আজি শুই

তল দো শখ বাজে।

থেকো না থেকো না জরে তাই

মদন মিথ্যা কাজে।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গান—

“আমি ভুবনমোহিনী !”

আমি তাঁর কণ্ঠ থেকে ঐ সময়েই ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে কোনো উপলক্ষে শুনেছিলাম।

বাংলা ১৩০৮ সালে ঈশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় মজুমদার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ও নবপরিচয় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের আয়োজন করতে থাকেন। আমার বই কেনার প্রবল ঝোঁক ছিল। আমি বই কিনতে বাওয়া উপলক্ষ্যে মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। সেট সময়ে ঈশবাবুর ভাই-পো প্রবোধবাবু ফরাসী লেখক থিওফিল গ্যাতিয়ের লেখা ময়ুর উপত্যাস মাদমোয়াজেল্ ও বোপ্যা পুস্তকের একটি প্রশংসাসূচক পরিচয় পাঠ করেন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে। মিটিং শেষ হ’রে গেলে আমি প্রবোধবাবুকে তাঁর লেখার প্রশংসা জানিয়ে ফরাসী বইখানির ইংরেজী তর্জমা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলাম। এই সূত্রে প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এবং তিনি আমাকে সন্ধ্যাকালে মজুমদার লাইব্রেরীতে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন এই বলে যে, “সন্ধ্যাবেলা আসবেন না আমাদের ওখানে, অনেকে আসেন, সাহিত্য আলোচনা হয়।”

এর পর থেকে আমি মজুমদার লাইব্রেরীর সাক্ষ্য মজ্জলিশের একজন সদস্য বলে গণ্য হ’রে গেলাম। এখানে “উদ্ভাস্ত-প্রেম”-প্রণেতা চন্দ্রশেখর সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমার হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি মজুমদার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে রবিবাবু ব’সে আছেন। আমি লাইব্রেরী ঘরে বসলাম, এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য-লাভে ভাগ্যবান লোকদের ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই প্রবোধ মজুমদার লাইব্রেরী ঘরে এলেন, এবং আমায়ী থেকে

রবিবাবুর ‘কাহিনী’ বইখানি বার ক’রে নিয়ে চ’লে যচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম “স্ববোধবাবু, এ বই কি হবে?” তিনি বললেন—“রবিবাবুকে দিয়ে ‘পতিতা’ কবিতাটা পড়াব।” আমি অভ্যস্ত ভয়ে ভয়ে নিভাস্ত সঙ্কেচ ও কুঠার সহিত তাঁকে বললাম—স্ববোধবাবু, আমি বাব?” তিনি বললেন—“আম্বন না।” আমি কৃতার্থ হ’য়ে সেই ঘরে গেলাম।

অপরিচিত আমাকে যেতে দেখে রবিবাবুর মুখে একটি লাজুক হাসি ফুটে উঠল, এবং তাঁর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উঠল। ‘পতিতা’ কবিতাটা পড়বার কথা আগেই স্থির হ’য়ে ছিল। কিন্তু অপরিচিত আমার সামনে ‘পতিতা’ সম্বন্ধে কবিতা পড়তে তাঁর লজ্জা বোধ হচ্ছে ব’লে আমার মনে হলো। তিনি মাথা নত ক’রে নতনেত্রের উদ্ভট দৃষ্টি আমার মুখের দিকে প্রেরণা ক’রে বলতে লাগলেন—“এ কবিতাটা কি বোঝা যায়?” আমি বললাম, “বোঝা যাবে না কেন? এ কবিতা তো চমৎকার!” তখন বুঝি নি যে রবিবাবু আমার মতের স্রষ্টা ঐ কথাঃ বলেন নি, তিনি কবিতা পাঠের ভূমিকা স্বরূপ নিজের কাছেই নিজে ঐ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি আমার কথা কানে না তুলেই নিজের মনে ব’লে যেতে লাগলেন—“আমি এই কবিতায় বলতে চেয়েছি—রমণী পুষ্পতুল্য—তাকে ভোগে ও পূজায় নিয়োগ করা যেতে পারে! তাতে যে কদর্যতা বা মাদুর্য প্রকাশ পায় তা সুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না, —রমণী বা সুল চির-অনাবিল,—তাতে সুল বা রমণীর কোন ইচ্ছা মানা হয় না ব’লে সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, তাতে নিয়োগকর্তার মনের কদর্যতা বা মাদুর্য মাত্র প্রকাশ পায়। যে সহজ-পূজা তাকে ভোগের পদবীতে নামিয়ে আনে যে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, অল্পকূল অবস্থা পেলে সে পুনর্বীর পবিত্রতা লাভ করতে পারে। পাপের অজ্ঞায়ে সে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে মাত্র, কিন্তু তার আত্মা একেবারে নষ্ট হয়নি—তার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের মতো হয়ে আছে। ঋষি কুমারই পতিতার কলুষ-তামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ ক’রে প্রকৃত জীবনপথের সন্ধান তাকে দেখিতে দিলেন। ভক্ত যখন জাগার তখনই তো ভগবান্ জাগেন, তাই তো আমরা বলি জাগ্রৎ ভগবান্। পতিতার নারীত্বের পূজারী কেউ ছিল না, ঋষিকুমার তার প্রথম পূজারী হয়ে তাকে তার

গায়কীসের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন। সংগত সে পর্বত-লিঙ্গের যে পর্বত
না ভাবের ভাবুক এসে তার উপাসনা করছে। শক্তির পূজা না ধোনে
শক্তি জাগ্রিত হয় না।”

এই ভূমিকা ক'রে তিনি কবিতাটি পড়তে আরম্ভ করলেন। সে বর
কানের তিড়র দিগ্গজমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐশ্বর্য আকুল করিয়া তুলিল।

পতিতা কবিতাটি পড়া হ'লে সুবোধবাবু অমরোষ করলেন ‘বিসর্জন’
নাটকের রঘুপতির উক্তি পাঠ করতে।

এর পূর্ব-রাত্রিই সঙ্গীতসমাজে ‘বিসর্জন’ নাটক অভিনয় হ'রে গেছে
বরেন্দ্রার মহারাজা গায়কোরাড়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে। রবিবার তাতে রঘু-
পতির ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। তিনি রঘুপতির উক্তি পড়তে
অনুরক্ত হ'রে বললেন, “নাটকের পাত্র-পাত্রীর কথা কেবল পড়লে তার যথার্থ
ভাবটি প্রকাশ করা যায় না। নাটক অভিনয়ে যে অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি থাকে
তাতে ভাব প্রকাশে সাহায্য করে। ইংরেজী ড্রামা মানে একশান, মোশান।”

তার পর তিনি রঘুপতির উক্তি পাঠ করলেন।

পাঠ শেষ হ'লে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—“ব্রাহ্মণ” কবিতাব মধ্যে
যে আছে—

‘যে বনে ষারিছাহুৎ

বহুপারল্যা করি পোহোছহু তোর,

অয়েছিল ভতৃহীন জবাবার ক্রোড়ে,

গোত্র তব নাচি জানি তাত।’

এর অর্থ কি? আমার এক বন্ধু এর অর্থ করেন সে অনেক দেবারাধনা মানং
করার পর তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু আমি বলি ওর অর্থ বহু ব্যক্তিগত সঙ্গে
ব্যক্তিগতের মধ্যে তোমার জন্ম, তাই আমি জানি না যে তুমি কাব পুত্র।
আমাদের মধ্যে কার অর্থ সঙ্গত?”

রবিবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে যখন নীচ ক'রে মূর্ছ স্বরে বললেন—“আপনি
যে অর্থ করেছেন তাই ওর অর্থ।” অপরিচিত আমার কাছে ঐ কথার
আলোচনায় তিনি অত্যন্ত লজ্জা ও মজোচ বোধ করছেন বুঝতে পেরে আমি
আমি কোনো কথা বললাম না।

এই আমার রবিবারের সঙ্গে ঐশ্বর্য সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ।

এই সময় মজুমদার লাইব্রেরীর উদ্বোধনে পক্ষান্তে একটি ক'রে সাহিত্যিক সভা হতো। তাতে গান, আবৃত্তি, প্রকল্পপাঠ, আলোচনা প্রভৃতি হতো। সেই সভায় রবিবাবু, অক্ষরকুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা যোগ দিতেন। একদিন রবিবাবু গান গাইতে আরম্ভ করলে একটা কলি পুনঃপুনঃ ফিরে ফিরে গাইছেন আর লজ্জিত ভাবে মুচ্চি মুচ্চি হাসছেন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি গানের পথ ভুলে গেছেন, ও মনে করবার চেষ্টা করলেও মনে করতে পারছেন না। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে গানের পদ চেষ্টা করে ব'লে দিতে লাগলাম, ও তিনি গাইতে লাগলেন। আমি তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাতে তিনি আমার দিকে এমন কোমল দৃষ্টিতে একবার চাইলেন যে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে গেল। তাঁর সেই দৃষ্টিতে লজ্জা, কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, ফুটে উঠেছিল।

এই সময় আমি আমেরিকার কবি অলিভার ওয়েগেন্স হোলমন্স সাহেবের একটি কবিতা অনুবাদ করেছিলাম “বুদ্ধের স্বপ্নদর্শন” নাম দিয়ে। আমি সেই কবিতাটিতে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর ক'রে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদকের নামে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেট ছাপা হলো দেখে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। রবিবাবুর বিচারে যে কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে গেল সে তো দিগ্বিজয়ী হ'তে পারে। তখন আমি শৈলেশবাবুকে বললাম যে সেটি আমারই লেখা, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরই রূপান্তর মাত্র। রবিবাবু শৈলেশবাবুর কাছে আমার কথা শুনে বলেছিলেন যে আমার ‘আত্মগোপন’ ক'রে ছয়নাম নেবাব কোনো আবশ্যক ছিল না।

এই সময়ে আমি লেখবার চেষ্টা করছিলাম। আমি একটি প্রবন্ধ “দাবার জয় কথা” লিখে ‘বঙ্গদর্শন’ে ও “লিখনসৃষ্টির ইতিহাস” লিখে ‘ভারতী’তে ভরে দিয়েছিলাম। দুটিই আমার স্বনামে ছাপা হলো। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে নিজে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আমি তাঁকে ভারতী সম্পাদনে সাহায্য করতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তখন বি, এ, পাস ক'রে বেকার ব'লে ছিলাম, কেবল ছপুর্ বেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। আমি সরলা দেবীকে সাহায্য করতে সম্মত হলাম। আমি শুধু লেখক হওয়ার জবোব পেলাম না, বহু বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগলাম এবং বহু লেখকের লেখা আমার হাত দিয়ে প্রাথমিক হ'লে প্রকাশিত হ'তে লাগল।

কাশীতে সাহিত্য-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানকার সেক্রেটারী আমাকে অহরোধ করলেন উদ্বোধনের উপযোগী একটি গান লিখে দিতে হবে। আমি কবিতা লিখবার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে করলেও কবিত্বের প্রতি আমার কোনো দিনই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। তখনো রবিবাবুর পরবর্তী কবিদের অভ্যাস হয়নি। আমি কাশীর সাহিত্য-পরিষদের সেক্রেটারী মহাশয়কে লিখলাম যে “আমি হতে এই কার্য হবে না সাধন। তবে আমি রবিবাবুকে দিয়ে অথবা সরলা দেবীকে দিয়ে আপনাদের একটি গান লিখিয়ে দেবো!” সেক্রেটারী মহাশয় অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত লাভের সম্ভাবনার উৎসাহ হ’য়ে আমাকে ধন্তবাদ দিয়ে পত্র লিখলেন। আমিও দুই জনের কাছে গান রচনা ক’রে দেবার অহরোধ ক’রে পাঠালাম। রবিবাবু ছিলেন তখন শিলাইদহে। তিনি আমাকে পত্র লিখলেন যে তিনি শীঘ্র কলকাতায় আসছেন, এবং কোন নির্দিষ্ট তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যদি আমি যাই তা হ’লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’তে পারবে।

আমি নির্দিষ্ট দিনে বিকাল বেলা জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে ঘারোয়ানকে দিয়ে আমার নামের কার্ড রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখনই নীচে নেমে এলেন। তাঁর পরপে একটা ঢিলা পাজামা, ঢিলা পাঞ্জাবী গারে—আর পাঞ্জাবীর গলার বোতামটি খোলা। পরে লক্ষ্য করেছি তিনি কখনই জামার গলার বোতাম দেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি আমাকে কি করুণাস করেছিলেন না?” আমি বললাম—“সরস্বতীবন্দনা সম্বন্ধে একটা গান লিখে দিতে বলেছিলাম।” আমার কথা শুনেই তিনি ব’লে উঠলেন—“ওরে বাসু রে! গান লেখবার সাধ্য কি আমার আছে আর! গান-টান আর আমার আসে না।—

চলে গেছে ঘোর বীণাপানি। (চৈতালি)

আমার একটা পুরাণো গান আছে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে

হৃদয় কমল বন মাঝে।

সেই গানটা দিয়ে কাজ চালায়ে নেবেন।”

আমি বার্ষিকবোর্ড হ’য়ে ফিরে এলাম। কবির বীণাপানি কবিকে ত্যাগ ক’রে গেছেন বলে কবি ১৩০২ সালে বিলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার পরে হাজার গান রচনা করেছেন আর হাজার খানেক কবিতাও লিখেছেন।

১৩১২ সালে আমি “নৈতিক ব্রহ্মচারী” নামে একটি পত্র লিখে প্রকাশ করার জন্য ‘প্রবাসী’তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রামানন্দবাবু পত্রটি ফেরৎ দিয়ে অসুযোগ করলেন পত্রটির আরতন সংক্ষেপ ক’রে দিলে ছাপা হ’তে পারবে। দীনেশবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় অবধি খুব ঘেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁকে ঐ পত্রটির কথা বলাতে তিনি বললেন—“তুমি ঐ পত্রটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও, আর তাঁকেই বলা সংক্ষেপ ক’রে দিতে।”

দীনেশবাবুর পরামর্শ অনুসারে তাঁর নাম ক’রেই আমার পত্রটি রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখন শিলাইনহে। তিনি আমাকে লিখলেন, তিনি শীঘ্রই কলকাতার কিরে আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি মোকাবেলার আমার সঙ্গে আমার পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

একদিন প্রাতে রবিবাবুর জোড়াসাঁকোর নূতন লাল বাড়ীতে গেলাম। নীচে পূর্বদিকের কোণের ঘরে তিনি বসে ছিলেন, আর সেখানে ছিলেন—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি। আমি নমস্কার ক’রে রবিবাবুর ডান দিকে ফরাসের একপ্রান্তে বসলাম। তখন ‘বঙ্গদর্শনে’ রবিবাবুর ‘চোখের বালি’ শেষ হ’য়ে ‘নৌকাডুবি’ বাহির হচ্ছে। তার সম্বন্ধেই কথা চলছিল। আমি বখন গেলাম, তখন শুন্লাম দীনেশবাবু বলছেন—“আপনি তো দুটি মেয়ে এনে উপস্থিত করেছেন। ওদের কার সঙ্গে শেষকালে রমেশের প্রণয় প্রবল হবে? দুজনের মধ্যে রমেশকে ফেলে যে গোলমালের সৃষ্টি করলেন, তা থেকে উদ্ধার পাবেন কেমন ক’রে!”

রবিবাবু হেসে বললেন—“আমি তো তা কিছুই জানি না যে রমেশ কমলা আর হেমলিনীৰ মধ্যে পড়ে কি যে করবে। আমি তো কখনো আগে ভেবে চিন্তে কিছু সিঁধিনা, লিখতে লিখতে যা হ’য়ে গড়ায়। দেখা যাক শেষে কি হয়।”

আমি বললাম—যদি তেমন তেমন কোনো গুণগোল উপস্থিত হয়, তা হ’লে একজনকে মেরে ফেললেই হবে।

এর উত্তরে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—এ বয়সে আর আমাকে জীহত্যা করতে বলবেন না।

তাঁর এই কথা সকলের মনে লাগল, কারণ এর অল্পদিন আগেই তাঁর জীবিয়োগ হয়েছিল।

‘অতঃপর’ কথাবার্তা চলছিল ততক্ষণ রবিবাবু মাকে ‘মাকে’ ‘আবার’ দিকে অপমানভূমিতে ডাকাছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে তিনি ‘আমাকে’ চিন্তে পারছেন না, অথচ তিনি তিনি করছেন, এবং আমি কে হতে পারি তা বনে বনে মিলিয়ে বেছে বেছে দেখছেন। তিনি নিষ্ঠুর ভাবছিলেন যে এই প্রমত্ত লোকটি কে, যে বিনা পরিচরে আমাকে পরামর্শ দিতে সাহস করে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর কথার মধ্যেই রবিবাবু হঠাৎ আমার দিকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি কি চাকরবাবু?” আমি তাঁর অজ্ঞান মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিতেই, তিনি আবার যে কথা চলেছিল তারই আলোচনার যোগ দিলেন।

যখন সভা ভক্ত হলো তখন তিনি আমাকে বললেন আমি আপনাকে যা বলবার তা শৈলেশকে দিয়ে বলে পাঠাব।

এর পর আমি অবহাবিপর্যয়ে কয়েক বৎসর কল্কাতাছাড়া হ’রে ছিলাম। রবিবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি।

ইংরেজী ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের তরফ থেকে কল্কাতার ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নামে একটি পুস্তক প্রকাশের ও বিক্রয়ের দোকান খুলি। আমার উপরে ভার ছিল সকল প্রসিদ্ধ লেখকের কই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করার। আমি রবিবাবুকে দিয়ে বউনি কর্তৃক সঙ্কলন করে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে গেলাম। রামানন্দবাবু আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে রবিবাবু বললেন—“এর ক্ষণ আপনার কোনো সুপারিশ আনব’ল’ আবশ্যক ছিল না। কেউ যদি আমার এই সমস্ত কুর্কমের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেন, সে তো আমার পরম উপকার করা হবে। আপনি হবে বলবেন আমার সব বই আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো।”

এই হলো তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সূত্রপাত।

এই সময় সত্যেন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন তাঁর ‘তীর্থ-সলিল’ ছাপা চলেছে। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা প্রেস থেকে প্রক দিয়ে আমার বাসার আসতেন। আর আমাকে তাঁর কবিতা শোনাতেন। একদিন আমি তাঁর ‘বেলু ও বীণা’ উৎসর্গ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলাম “এ কইটা আপনি কাকে উৎসর্গ করেছেন?”

সত্যেন্দ্র বললেন—“আপনিই হলুন না।”

আমি দেখলাম সেই উৎসর্গ-লেখা আছে—

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন

যিনি কবিশ্রমের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন

যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক

সেই অত্রোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন

কবির উদ্দেশে

এই সামান্ত কবিতাজলি সদয়মে অঙ্গিত হইল।

যেথ—আমি বললাম—“ইনি হয় শেকস্পীয়ার, আর নয় রবিবাবু।”

সত্যেন্দ্র উত্তর করলেন—“স্বদেশের কবি থাকতে আমি বিদেশে যাব কেন?”

আমার আনন্দের অবধি থাকল না। আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে, রবিবাবু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তখনও আমাদের দেশে তাঁর প্রতিভা সর্বজনসমাদৃত হয়নি, একদল নিন্দক প্রবল হ’য়ে তাঁকে খাটো করবারই এত এহণ করেছিল। তাই আমার মনের ধারণা লোকের কাছে আমি প্রকাশ ক’রে কখনো বলতে সাহস করিনি। সেদিন সত্যেন্দ্রকে আমারই মতামতুল পেয়ে আমি আনন্দিত হলাম, আমার পৃষ্ঠপোষক পেয়ে আমার সাহস বাড়লো, আমি মনে জোর পেলাম।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ পাকে চক্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে জানাতে লাগলেন যে আমাকে তিনি তাঁর বিজ্ঞানগরে চান। আমাকে একদিন বললেন—“চাক, তুমি কি আমাকে একজন এমনি লোক দিতে পারো একটু সংস্কৃত জ্ঞানে, ইংরেজীটার নেহাৎ ভুল করেনা, আর আমার লেখাগুলোকে নিতান্ত তুচ্ছ ব’লে অবহেলা করে না।”

বন্ধুর অজিত চর-বতী আমাকে বললেন—“শুরুদেব, তোমাকেই চান।”

আমি তখন সত্ত্ব ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস খুলেছি, আমার উপর নির্ভর করে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণিবাবু অনেক টাকা ব্যয় করেছেন, এখন আমার পক্ষে তাঁর কর্ম ত্যাগ ক’রে বোলপুরে চ’লে যাওয়া উচিত হবে না বলে আমার মনে হলো। আমি রামানন্দবাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কবলাম; তিনি বললেন—“না, আপনি এখন যেতে পারেন না।”

আমি যাধ্য হয়ে কবিশ্রমের আয়তন স্বীকার করতে না পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলাম। তখন কবিকে বললাম—“আপনি যদি লোক চান তো আমার চেয়ে বহুদূরে ভালো লোক আপনাকে এনে দিতে পারি।”

তিনি লোক চাওয়াতে আমি বঙ্কুর বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেনকে শান্তিনিকেতনে আসতে প্ররোচিত করি।

আমি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের আগ্রহে আমার জ্বিনিপত্র রেখে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। ক্ষিতিমোহন বললেন—“তুমি বাও, আমি একটু পরে বাজি, তারপর একসঙ্গে বেড়াতে যাব।”

ক্ষিতিমোহনের কাছে আগে গিয়ে পরে তাঁর কাছে এসেছি, এই নিয়ে কবি আমাকে ঠাট্টা ক’রে বললেন—“ক্ষিতিমোহনের মোহ এতক্ষণে কাটল।”

আমি লজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম ক’রে তাঁর কাছে বসলাম।

তিনি তখন শান্তিনিকেতনে শালবীথির ধারে মাঠে একখানা তক্তপোষের উপর একলা ব’সে ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষিতি এসে আমার পাশে ব’সে বললেন—“চাকু, চলো বেড়াতে যাই।”

কবি হেসে বললেন—“হী, যখন চাকুচক্র ক্ষিতি আর রবির মাঝখানে পড়েছেন, তখনই জানি যে রবির গ্রহণ লাগবে।”

ক্ষিতিমোহন আমার আশা ত্যাগ করে পলায়ন করতে করতে ব’লে গেলেন—“না না, আমি চাকুকে নিয়ে যেতে চাইনে, ও আপনার কাছেই থাক।”

“শারদোৎসব” নাটক সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, শান্তিনিকেতনে ছাত্রশিক্ষকে মিলে তার অভিনয় করবেন, তার আগে বইখানি শোভন রূপে ছেপে প্রকাশ করবার জন্ত আমার ডাক পড়েছে। কবি বই প’ড়ে আমাদের শোনালেন। কথা হলো যে প্রারম্ভে একটি মঙ্গলাচরণ দিতে হবে। কবি অস্বস্তি করলেন, শাস্ত্রী মহাশয় একটা সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ লিখে বা বেদ থেকে খুঁজে দেবেন। আমি বললাম—“যাঁর লেখা বই সেই কবিই মঙ্গলাচরণ লিখবেন, আর কারো অনধিকার প্রবেশ এখানে বাটবে না।”

কবি হেসে বললেন—“আমার প্রকাশকের তো বড় কড়া শাসন দেখি। তা তোমরা যদি আমাকে এখন ছুটি দাও তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি যে, আমার প্রকাশকের হুকুম তামিল করতে আমি পারি কি না।”

তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলেন—গান তৈরী ও সুর সংযোজনায় সয় হয়ে গেছে। সে গানটি শারদোৎসবের প্রথমেই আছে—

তুমি নব নব রূপে এস এগে,
এস গন্ধে বরণে এস গানে।

রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে একবার শিলাইদহে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কাছারীর পরপারে চরের গারে বজরা বেঁধে বাস করছিলেন। হুখানি বজরা পাশাপাশি বাঁধা, একখানিতে কবি নিজে বাস করেন, আর অন্যখানিতে অজিতকুমার পীড়িত হ'য়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্ত বাস করছিলেন। আমি অজিতের বজরায় বাসা পেলাম। আমি কবিকে প্রণাম ক'রে স্বাগত করলাম। অপর বজরায় যাব ব'লে উঠলাম। কবির বজরা থেকে অজিতের বজরায় যাবার একটি তক্তা এক বোট থেকে আরেক বোট পর্যন্ত ফেলা ছিল। আমি যখন অপর বজরায় যাবার জন্ত উঠলাম, কবি আমাকে বললেন—“চাক্র দেখো সাবধানে যেয়ো, এখানে জোড়াসাঁকো নেই, এক সাঁকো দিবেই পার হ'তে হবে।”

সে সময়ে তিনি আমাকে যে যত্ন করেছেন তা আমার জীবনের মহার্ঘ সম্বল। নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়ানো, আমার সুখ-স্বাস্থ্য্য সন্ধানে সর্বদা উৎসুক থাকা, অজিতকে ক্রমাগত বলা, দেখো অজিত, তোমার বন্ধুর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

পরদিন রাত্রে আমাকে তাঁর বোটে থাকতে অহরোধ করলেন। এত বড় লোকের অত কাছে থাকতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগল। আমি বললাম—আমি তো অজিতের সঙ্গেই বেশ আছি, এখানে শুলে আড়ট হ'লে আমারও অসুবিধা হবে, আর আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।

কিন্তু কবি কিছুতেই শুনলেন না, অজিতকে বললেন—“অজিত, তোমার বন্ধু তোমাকে ছেড়ে থাকতে চান না। অতএব তুমিও তোমার বাসা বদল ক'রে এই বোটে এসো।”

সন্ধ্যার সময় খুব ঝড়জল আরম্ভ হলো। কবি বললেন—“অজিত অতিথির সন্ধ্যানা করো, গান ধরো।”

কবি গান ধরলেন, অজিত সঙ্গে যোগ দিলেন—

আজি স্বপ্নের রাতে তোমার অজিসার
পরামর্শনা বন্ধ হে আমার।

তারপর আবার গান ধরলেন—

কোথার আলো কোথার গুণে আলো !

বিরহানল আলো রে উঠে আলো !

এই ছটি গানই আমি ‘প্রবাসী’র জন্ত চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

এই সময় ‘প্রবাসী’তে ‘গোরা’ বাহির হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন আরো একদিন থেকে ‘গোরা’র কপি সঙ্গে নিয়ে যেতে। আমি তাঁর কাছে থেকে ‘গোরা’ লেখার পদ্ধতিও দেখবার সৌভাগ্যলাভ করলাম। বাড়ি কাঁচ ক’রে ঘস্‌ঘস্‌ ক’রে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর খানিক লিখে ফিরে প’ড়ে দেখে অপছন্দ অংশ চিত্রবিচিত্র ক’রে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কত সুন্দর সুন্দর রচনাংশ যে কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন তা দেখে আমাদের কষ্ট হয়েছে। আমি বললাম যে, আপনি যা লিখে ফেলেন তাতে আর তো আপনার অধিকার থাকে না, তা বিশ্বাসীর হ’য়ে যায়, অতএব সব থাক।

কবি হেসে বললেন—“তুমি বড় কুপণ। সব রাখলে কি চলে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস না থাকলে কি সৃষ্টি কখনো সুন্দর হ’তে পারে।”

শিলাইদহে থাকবার সময় কবির খুব ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময় তাঁর উপাসনায় তন্ময়তা আর গভীর ধ্যান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভোর-রাত্রে একখানি চেয়ার বোটের সামনে পেতে পূর্বদিকে মুখ ক’রে তিনি ধ্যানে বসতেন, আর বেলা হ’লে সূর্যের আলোক প্রভঞ্জন হ’য়ে তাঁর মুখের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। তাঁকে সেই তন্ময় অবস্থায় দেখে আমার মনে হতো ‘নৈবেদ্যে’র সেই কবিতাটি যেটি তিনি, তাঁর পিতা মহষিকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে

জীবন সমর্পণ,

ওরে দান তুই জোড় কর করি,

কর তাহা ধরশন।

মিলনের ধারা পাড়িতেছে করি,

বহিরা বেতেছে অন্তঃস্রবী,

কুন্তলে রাখাটি’ আধিরা, লহ রে

সুজ্ঞানিঃ স্বরূপ !

ক করিছে প্রভু হৃদয়ে,

জীবন সমর্পণ !

ওই যে আলোক পড়েছে উহার

উদার লগাটবেশে,

সেখা হ'তে তারি একটি রঙ্গি

পড়ুক মাথায় এসে !

বোলপুরেও আমি তাঁকে এমনি ধ্যানরত অনেকদিন দেখেছি। তখন তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশিত উপদেশাবলী প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে বলতেন আর প্রত্যহ প্রত্যবে মন্দিরের পূর্বদিকের বারান্দায় ব'সে ধ্যানস্থ হতেন, এবং মুখে রোদ এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো না। 'গীতাঞ্জলি' রচনার সময় আমি লক্ষ্য করেছি তিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'বে নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে যেতেন।

কোনো এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা বহু লোকে বোলপুরে গিয়েছিলাম। খুব সম্ভবত 'রাজা' নাটক অভিনয় উপলক্ষ্যে। বসন্ত কাল, জ্যোৎস্না রাত্রি। যত দ্রোলোক ও পুরুষ এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই পারুলডাঙ্গা নামক এক রম্য বনে বেড়াতে গিয়াছিলেন। কেবল আমি যাইনি রাত জাগ'বার ভয়ে। রাত্রিতে আমাব ঘুম ভেঙে গেল গায়ে কিসের স্পর্শ লেগে। জেগে দেখি স্বয়ং কবি এসে আমার গায়ে তাঁর নিজেব গায়ের মলিনা চাদব ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন। আমি ধমড ক'রে উঠে বসলাম। কবি আমাকে বললেন—“তুমি উঠো না, ঘুমোও, তোমার গীত করছে, তাই গায়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি।”

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আমার সৌভাগ্যের কথা। কোন্ সুকৃতিব ফলে আমার মতন গুণহীন এত বড় কবি স্বর্ষিবে স্নেহভাজন হ'তে পারল।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। গভীর রাত্রি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল যেন শান্তিনিকেতনের নীচের তলার সামনের মাঠ থেকে কার যুহু মধুর গানের স্বর ভেসে আসছে। আমি উঠে ছাড়ে আলসের ধারে গিয়ে দেখলাম, কবিগুরু জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খোলা জায়গায় পাখিচারি করছেন আর গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান গাইছেন। আমি খালি পারে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলাম। আমি গুরুদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু

তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন না, আপন মনে যেমন গান গেয়ে গেয়ে পারচারি করছিলেন তেমনি পারচারি করতে করতে গান গাইতে লাগলেন। গান গাইছিলেন খুব মৃদুস্বরে। আমি পিছনে পিছনে বেড়াতে বেড়াতে গানের কথা ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তিনি গাইছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা রাতে সবাই সেজে বসে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

যাব না গো যাব না বে,

ধাক্কব প'ড়ে ঘরের মাঝে,

এই নিরালস্য রব আপন কোণে।

যাব না এই মাতাল সমীরণে ॥

আমার এ ঘর বহু বতন ক'রে

ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে বে জাগুতে হবে,

কি জানি সে আসবে কবে—

যদি আমার পড়ে তাহার মনে।

যাব না এই মাতাল সমীরণে।

এই গানটি পরে ‘গীতাঙ্গি’তে স্থান পেয়েছে, এবং সেখানে তারিখ দেওয়া আছে ২২এ চৈত্র ১৩২১ সাল।

অনেকক্ষণ পরে গ্যন খাম্লে তিনি অতি মৃদু স্বরে কথা বললেন—“চাকু এসেছে?”

আমি তাঁকে প্রশ্নাম ক’রে পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি তেমনি মৃদু স্বরে বললেন—“যাও তুমি শোও সে।”

বললাম তিনি একলা থাকতে চান। আমি চ’লে এলাম। ‘গীতাঙ্গি’র গানগুলি রচনার সময় আমি কবির কাছে ছিলাম। অনেকগুলি গান রচিত হ’লে তিনি আমাকে বললেন—“চাকু, তুমি আমার এই গানগুলি নকল ক’রে দিতে পারো, তা হলে ছাপ’তে দিতে পারি। যে খাতায় গান লিখেছি সেটা প্রেসে দেওয়া চলবে না, খাতাখানা রখী চেয়েছে।”

আমি গানগুলি নকল ক’রে দিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার কেমন লাগল?”

আমি বললাম—একটা গান একটু অস্পষ্ট হয়েছে, যাদে ঠিক ধরা যায় না।

কবি চ'টে সেলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন—“তুমি কিছু বোঝো না, ও ঠিক আছে।”

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—আমি বুঝতে পারিনি সেই কথাই বলছিলাম, কবিতার কোনো ক্রটির কথা আমি বলি নি।

কবি গভীর ও নীরব হ'য়ে বইলেন। আমি প্রশ্ন্য করে চলে গেলাম।
তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আমি ধেয়ে-ধেয়ে ঘুমিয়ে গেছি। রাজে আমার বাবা বেগুন্ধে কবির
কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভেঙে গেল—“চাক, তুমি ঘুমিয়েছ ?”

আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম, এবং মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলে
তাড়াতাড়ি মশারি সরিয়ে কবিত্তরকে বসবার জায়গা করে দিলাম।

তিনি আমাকে বললেন—“চাকর, তুমি ঠিকই বলেছ, ঐ গানটার কোনো মানেই হয় না, আমি প’ড়ে দেখি যে আমি নিজেই তার মানে বন্ধুতে পারি না, কি ভেবে যে লিখেছিলাম তা এখন আর ধরতেই পারি না। সেটাকে বদলে এনেছি, দেখো তো এটার কোনো মানে হয় কি না।”

আগের গানটি কেটে সেই কাগজে সেই গানের পাশে নতুন করে আর একটি গান লিখে এনেছেন, কেবল আমাকে তিরস্কার করায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি ভেবে আমাকে সাধনা দেবার সেটি যে কৌশল মাত্র, তা আমার বুঝতে বাকী রইল না। আমার মনের ক্রেশ দূর করবার জন্ত নিজের ফ্রন্ট স্ট্রীকার করে এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে থেকে আবার একটি নতুন গান রচনা করেছেন। ষড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখন ১১টা বেজে গেছে।

নিম্নে প্রথম লিখিত কবিতাটি তার সংশোধন সমেত দিলাম, এবং তার পরে পরিবর্তিত ও 'গীতালি' পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাটিও তার সকল সংশোধন সমেত দিলাম।—

কেন আর যিখা আশা
 বারে বারে,
 হাত ধরে
 ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ
 হাবে না রে ।

এ তোমার স্নাত্তিশেষের ভোজের পাখী,
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি.
বারে তুই বিজন পাথে চ'লে যা রে ।

ওদের ঐ কলকুন্ডি শিশির-রাতক -
 বসে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে ।
 সেটাকে পান্থে বা বে আঁখার নিশা
 তোমার এই কোটা কুলের আলোর তৃষা,
 সে যে তাই চেয়ে আছে পূবের পারে ।

২

যে থাকে থাক না
 তরা থাকে ঘরের ঘারে
 যে ঘাবি বা না
 বা না তুই আপন পারে ।
 যদি-ই জোয়ের ক্ষমী
 জোরি নাশ গায় রে
 তোমারই গেল ডাকি,
 একা তুই চ'লে যা রে ।

কুঁড়ি চার আঁখার রাত
 রসে মাতি ।

শিশিরের অপেক্ষাতে ।

চায় না নিশা
 কোটা কুল আলোর তৃষা
 প্রাণে তার আলোর তৃষা
 কাঁদে সে অমানিশার
 সে কাঁদে সে অন্ধকারে ।

‘গীতালি’র উৎসর্গের কবিতাটিতেও বহু পরিবর্তন করা হয়েছিল,। কবি এইরূপে বহু কবিতা রচনা করেছেন এবং কোন না কোন কারণে সেগুলিকে প্রকাশ করেন নি। সেগুলিকে প্রকাশ করতে পারলে কবির মনের চিন্তার একটু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ‘আমার খাতিরে যে কবিতাটিকে একেবারে বর্জন ও লোকলোচন থেকে বিসর্জন করেছেন সেটিও যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

যখন ‘গীতালি’র গান নুকল করছিলাম সেই সময় একদিন বজ্রবর অসিত-কুমার হালদার আমাকে বললেন—“চলো গয়া বেড়িয়ে আসি।” অসিতের প্রস্তাব শুনে রবিশ্যাবুর আমাত্য ঐকান্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ও

যেতে প্রস্তুত হলেন। শেষে কবিও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এক জনে আমাদের দল বেশ গুঠি হয়ে উঠল। শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও মীরা দেবীও চললেন। যাত্রার সময় রবিবাবু আমাকে বললেন—“চাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে যাব।

আমি অনেক অহরোধ করে তাঁকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম, তাঁকে এই বলে বুঝিয়ে বললাম—তাতে আপনার তো কষ্ট হবেই, আর আপনার কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমাদেরও শান্তি-স্বস্তি কিছু থাকবে না।

গরার তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁরা সহরে একদিন রবীন্দ্রনাথকে সন্ধান করলেন। সেই সভায় বসন্তবাবু গান গাইলেন। আর এক ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজালেন। একটি কচি মেয়ে আবৃত্তি করলে। তার প্রথম গাইনটি মনে আছে—

তবু মরিতে হবে।

সভ থেকে বেরিয়ে বুদ্ধগয়ায় আসবার রাত্তার গাড়িতে বসবাবু আমাকে বললেন—“দেখেছ চাক, আমার পাপের পান্ডিত্য আমি না হয় গোটা-কতক গান কবিতা লিখে অপরাধ করছি, তাহ বলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এ রকম যন্ত্রণা দেওয়া কি ভদ্রতাসম্মত। গান হলো, কিন্তু হৃদয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পাল্লা দিতে লাগলেন যে কে-কত বেতলা বাজাতে পারেন আর বেশুরো গাইতে পারেন, গান যায় য'দ এপথে, তো বাজনা চলে তার উল্টো পথে। গায়ক বাদকের এমন স্বাতন্ত্র্য এক্ষণে চোটা আমি আর কখন কালেও দেখিনি। তার পর ঐ একবক্তি ক'চ মেয়ে তাকে দিয়ে নাকি সুরে আমাকে শুনিয়ে না দিলেও আমার জানা ছিল যে,—তবু মরিতে হবে।”

রবিবাবু বুদ্ধগয়ায় পাণ্ডার অতিথি হ'য়ে বুদ্ধগয়াতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসার একদিন নন্দলাল ব'লে এক ভদ্রলোক এসে ‘বরাবর’ পাঠাড দেখে যাবার জন্ত অহরোধ করতে লাগলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে তিনি সেখানকার এক জমিদারের প্রধান কর্মচারী, তিনি সেখানে থাকবার তাঁর যান-বাহন আহাঙ্গারির সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন, কবি শুধু কষ্ট করে গিয়ে দেখে আসবেন বৌদ্ধ আমলের গিরিগুহা।

আমরা সবাই রওনা হলাম। কবির দৌহিড়ের জন্ত হওয়াতে মেয়েরা আসতে পারলেন না, এক উদ্বেগ জন্ম নগেনবাবুরও আসা হলো না। গরার

থেকে রেল বেলা নামক ষ্টেশনে নেমে আমরা এক হাতীতে রওনা হলাম। রবিবাবু পাঙ্কীতে যাবেন, কিন্তু পাঙ্কী তখনও আসে নি, নন্দলালবাবু আশ্বাস দিলেন—“আপনারা চ’লে যান, হাতী আস্তে আস্তে যাবে, আর পাঙ্কী পরে রওনা হলেও আগে চ’লে যাবে।”

আমরা চ’লে গেলাম। নন্দলালবাবু আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফল দিয়ে দিলেন পাথর, এবং ব’লে দিলেন সেখানে তাঁবু পড়েছে এবং পাচকেরা অন্ন প্রস্তুত ক’রে রেখেছে।

আমরা বরাবর পাহাড়ের নীচে পৌছে দেখি মাঠ ধূধু করছে, কোথাও তাঁবু বা খাত্তপানীয়ের কোনো আয়োজন নেই। কবির আস্তে দেরী হচ্ছে দেখে আমি প্রস্তাব করলাম আমরা আগে গিয়ে শুহাগুলো দেখে আসি। কবি যে আসবেন তার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, আর যদি আসেনই তবে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা যাবে তাতেও কোন ক্ষতি হবে না। আমরা শুহা দেখে নেমে এলাম। তখনো কবির পাতা নেই। ক্ষুদার নাড়ী চোঁ চোঁ হচ্ছে। সঙ্গীরা অল্পবয়সী,—তাদের গৃহাবস্থাও নেই। তারা ফলের খাঞ্চা আক্রমণ করলে। আমি তাদের মুখ থেকে কেড়ে একটি নাসপাতি ও একটি কলা রক্ষা করলাম কবির জন্ত।

অনেকক্ষণ পরে কবির পাঙ্কী এলো। কবি এসে যখন গুলগেন মাঠের মাঝখানে একটি গাছ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, এবং বিস্তৃত মেঠো বাতাস ছাড়া আর কিছু খাত্ত সংগ্রহের সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি বল্লেন—“ভাগ্যে স্নেহেরা আর শিশুটি আসেনি। আর পাহাড় দেখে দরকার নেই, ফেরো।”

আমি বললাম—এতদূর যখন এলেন তখন শুহা না দেখেই কিরে যাবেন?”

তিনি পাঙ্কী থেকে নামতে কিছুতেই রাজ্য হলেন না। তখন আমি জোর ক’রে তাঁকে কিছু খাওয়ার জন্ত অনুরোধ করলাম। তিনি কেবল একটি কলা খেলেন। আমি নাসপাতি ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না ক’রে বল্লেন—“আমার কি শক্ত খিনিস খাবার জো আছে। তোমরা যদি কিছু খেতে পাও তবে উমাচরণকেও একটু দিও।”

আমি বললাম—উমাচরণকে খেতে দিইছি।

উমাচরণ তাঁর ভৃত্য, ঝালককাল থেকে তাঁর পক্ষীর কাছে আমারে যত্ন কাজ দিখে মানুষ হয়েছেন। ভৃত্যের প্রতি কবির সন্তানবাৎসল্য ছিল।

সন্ধ্যাবেলা বেলা ষ্টেশনে ফিরে গেলাম। কবির সমস্ত দিন স্নান হয়নি, আহার হয়নি, রৌদ্রে পথে যাতায়াতে ও মনের বিরক্তিতে তাঁর চেহারা অত্যন্ত স্নান ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি ষ্টেশনের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত প্লাটফর্মের উপর পাঁচচাবি করে বেড়াতে লাগলেন।

আমরা কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করছিলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমি আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তিনি আমাকে নিকটে দেখে বললেন—“জীবনে তুং পাওয়ার দরকার আছে।”

আমি তাঁর কথা সমর্থন করে কি বলতে গেলাম। তিনি সে কথা গ্রাহ্য না ক’বে তুং সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব অবতারণা করে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমি বুঝলাম, ঐ যে দার্শনিকতা তা কেবল নিজের বিবস্ত্র মনকে সাস্থনা দেবার ও কষ্ট মনকে শান্ত কববার উপায় মাত্র, তাঁর ঐ উক্তি স্বত্ত্ব, আমাকে উপলক্ষ্য ক’বে নিজেকে বসা। অতএব আমি চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে শুনতে লাগলাম মাত্র। আমার অত্যন্ত তুং তত্ত্ব যে যে চমৎকৃত উদ্ভাস প্রকাশিত হ’বে এখন মনে নও, যদি না পঞ্চম অধ্যায়ের পাতা ১০১ নং ১৩১ পৃষ্ঠা ‘বু’ নামক পাতা ১০১ নং ১৩১ পৃষ্ঠা-এখানে প্রবন্ধ আছে তাই চমৎকৃত উদ্ভাস প্রকাশিত হ’বে।

আমাদের এবাবের যাত্রার কাঁঠো ‘মামলী’ পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল, গুলি পথে সন্ধ্যায়। সেখানে নেই তাই আমি ব’ছি।

এবি

১৫ প্রকাশিত হয় গেলে একখানা চমৎকৃত প্লাটফর্মের মধ্যখানে পেতে দিয়ে তাঁকে বসতে গুলি পথে কবিতা তখনো আমাদের ট্রেন যাত্রাও নেই পাচ্ছে। যাত্রার পরে গরু থেকে একখানা টেন এলো। সেখানে ট্রেনের প্লাটফর্মের উপর ঐ যাত্রাবরণ চেহারা ও পোষাকে বসে বসে বসে হ’য়ে এসে থাকতে দেখে ট্রেনের সকল গাড়ী জানালা থেকে মুখ ব’কে পড়ল। টেন চলে গেল। কয়েকজন যাত্রী লোক সেই ট্রেনে নেমে ছিল। তারা বাইবে বেরিয়ে যাবার পথে সৌম্যমুখি কবিকে সমাসীন দেখে তাঁর থেকে সরে অথচ তাঁর সামনে ধমকে পাড়িয়ে গেল। তাঁদের একজন দেখে দেখে গম্ভীর ভাবে বললে—কোই বৈস (সম্মানবান্ধ) হৈ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে—নেই, কোই বাজা হৌইহৈ।

কৃত্তিবাসী দুইজনকেই অহুমান না-পছন্দ করে মাথা বেড়ে বললে—নেহি
কোই সাধু হৈ অকর ।

আমার মনে হলো ঐ তিনজনকেই অহুমান সত্য—তখন কবির মূখে
আভিজাত্যের গাভীর্য, রাজসিক তেজ, আর সাহসিক ভাবের স্নিগ্ধতা মিলে
এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। কবির মনে তখন যে সাহসিক
ভাবের কি চেউ চলেছিল তার সম্বন্ধে তাঁর ‘গীতালি’ পুস্তকের শেষের কয়েক
পৃষ্ঠা চিরকাল সাক্ষী হয়ে থাকবে।

পাছ তুবি পাছজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমার পাতরা ।
বাতাপথের আবলম্বান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওবা ।
হৃথের মাঝে তোমারি মেখেছি,
হৃংখে তোমারি পেয়েছি প্রাণ ভরে ।
জয়িয়ে তোমারি গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন ঘোরে ।

বুদ্ধগয়ায় একদিন তিনি সমস্ত দিন অম্লাত অভুক্ত থেকে ঘরে দরজা
দিয়ে কেবল গান লিখে লিখে ভগবানের সঙ্গে মিলন অনুভব করেছিলেন।
তারও একটু পরিচয় ‘গীতালি’র পাতায় লেগে আছে।

তোমার কাছে চাইনে আমি অবনর ।
আমি গান শোনাব গানের পর ।
বাইরে হোখাব দ্বারের কাছে
কাজের শোক ঝাড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে সাক্ষা কিরে
আপন ঘর ।

আমি গান শোনাব গানের পর ।

গয়া থেকে রবিবাবু এলাহাবাদ গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো।
আর সবাই শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। এই যাত্রায় ১৩২১ সালে
এলাহাবাদে ‘বলাকা’র জন্ম হয়। যখন তিনি ফিরে কলকাতায় এলেন তখন
ষাট মাস। তিনি আমাকে বললেন—“দেখ চাক, আসবার সময় রেল
লাইনের দুধারে দেখলাম কত ফুল ফুটে রয়েছে। তারা সব ফুলের

অগ্রদূত। তাদের ওপর আমার একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমাদের দেশের বুনা ফুলের তো কোন নাম নেই। অজ্ঞানে পণ্ডিত মহাশয়রা পুষ্প বিং বলেই খালাস। তাদের পরিচয় জানবার জন্য কারো মনে যদি এতটুকু আগ্রহ থাকত, তা হলে যুরোপীয় ফুলের মতন তাদেরও নাম গোত্র সব নির্ণয় হ'য়ে যেত।”

আমি বললাম—আপনি ওদের নামকরণ ক'রে ওদের জাতকর্ম করে দিন, ওরা ঐ নামেই চিরকাল পরিচিত হবে।

কবি কবিতা লিখলেন, কিন্তু প্রচলিত ফুলের বেনামীতে।—

ওরে তোমার বরা সহে না আর।

এখনো পাঁচ হরিন অবমান।

পনের ধারে আভাস পেয়ে কার

সবাই মিলে পেয়ে উঠিস্ গান।

ওরে পাগল চাপা, ওরে উদ্ভব বকুল,

কার তরে সব ছুটে এলি কোতুকে আকুল।

আমার স্মৃতি থেকে লেখার সময়ের পৌর্বাপর্য্য সব ঘটনায় রক্ষা ক'রে বলতে পারছি না একটু সাদটু উন্টাপান্টা হ'য়ে যাচ্ছে। পাজিপুথি মিলিয়ে দেখে বুনে লিখলে হয় তো কতকটা পৌর্বাপর্য্য রক্ষা হ'তে পারত। কিন্তু আমি তো ইতিহাস লিখছি না, আমি লিখছি আমার মনে রবীন্দ্রনাথের ছাঁদ। তাই ঘটন'র ওলোট পালোটে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

একবার এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা অনেকে শান্তিনিকেতনে গেছি। কবি আমার সঙ্গীদের বললেন—“দেখো, তোমরা যেখানে থাকবে সেখানে চারুকে আর সত্যেন্দ্রকে নিয়ে যেয়ো না। তোমরা সমস্ত রাত গোলমাল করবে, ঘুমবে না। চারু বড় খুমকাতুরে আর সত্যেন্দ্রের শরীর ভালো নয়। তোমরা ওদের আমাকে দিয়ে দাও। আমি ওদের খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে রাখবো।”

বন্ধুরা আমাদের আশা ত্যাগ ক'রে তাঁদের বাসায় চ'লে গেলেন। আমরা কবির সঙ্গে আহার ও আলাপ ক'রে শয়ন করলাম কবিরই শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরে, তাঁরই বিছানায় তাঁরই মশারি খাটিয়ে। অল্প হু-একটা কথা বলার পর সত্যেন্দ্র ও আমি নীরব হ'য়ে গেলাম। খানিক পরে সত্যেন্দ্র ঘুহুসরে আমাদের ডাকলেন—“চারু, ঘুমিয়েছ'”

আমি বললাম—না।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—“কি ভাবছ?”

আমি পাণ্টে প্রহ্ন করলাম—তুমি কি ভাবছ?

সত্যেন্দ্র বললেন—“আমি ভাবছি যে আমাদের কি সৌভাগ্য। আমার আনন্দে ঘুম আসছে না।”

একবার ১৯২২ সালে বা ১৯২১ সালের শেষে ‘প্রবাসী’র জন্ম একখানি উপহাস আবণ্ডক হয়। রবিবাবুকে অহুরোধ করবার জন্ম আমি আর সত্যেন্দ্র তাঁর কাছে গেলাম। রবিবাবুকে আমাদের আবেদন জানালে তিনি আমাকে বললেন—“তুমি নিজে লেখ না।”

আমি বললাম “আমার প্রট মনে আসে না। প্রট পেলো লিখতে চেষ্টা ক’রে দেখতে পারি।”

কবিগুরু বললেন—তোমরা সব বড় পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মতে তাহলে তোমাদের আমি দেবার প্রট দিতে পারতাম। তখন আমার মনে হতো আমি ছহাতে প্রট বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি। একটা প্রট আমি নিজে লিখব ব’লে ভেবে রেখে ছিলাম, সেইটেই তোমাকে দিই। ধরো একটা শিক্ষিত মেয়ে এক অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার আদর্শের সঙ্গে ওদের কি রকম বিরোধ বেধে যাবে তাই দেখাও।……

ঐ প্রটটা আমার ‘শ্রোতের কুল’ নামক উপহাসের ভিত্তি।

এর পরেও আমি তাঁর কাছ থেকে প্রট পেয়েছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ম তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“চাক কি লিখছ?”

আমি তো সর্বদাই কিছু না কিছু লিখি, বেকার বসে কখনো থাকি না। কিন্তু সেসব লেখা কি কবীজ্ঞ রবীজ্ঞ নাথের কাছে লেখা ব’লে গণ্য হবার যোগ্য। তাই তিনি আমাকে যখনই জিজ্ঞাসা করেন আমি কিছু লিখছি কি না, তখনই আমি আমার লেখার বিষয় গোপন ক’রে বলি, না আমি কিছুই লিখছি না। আমি কিছুই লিখি না শুনে তিনি বললেন—“দেখ, সরস্বতী জীলোক, তাকে বশ কর্তে হলে কেবল সাধ্যসাধনার তার মন পাওরা যাবে না, তার উপরে মাঝে মাঝে কড়া হুকুম করাও দরকার।

জানো তো যে মেয়েরা কড়া স্বামী খাল লঙ্কা আর জোঁনা টক পছন্দ করে।
তুমি একটু হুকুম ক'রে দেখো, ঠিক বশ মানাতে পারবে।”

আমি বললাম—একটা প্লট পেলে লিখতে চেষ্টা করতে পারি।

কবি একটু উন্নয়ন হয়ে বললেন—“প্লট। আচ্ছা ধরো.....”

তার পর যে গল্পের কাঠামো বললেন তাকে আমি “তই তার” নামক উপন্যাসে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। এর পরে আমার “হেরফের” উপন্যাসের প্লট বোলপুরে পেয়েছিলাম, আর “ধোঁকাব টাটি”র প্লট তিনি আমাকে শিলং পাহাড় থেকে পরে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যদিও রামবাচর চিত্র এঁকে আমি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছি।

একবার মাঘোৎসবের দিন আমি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে ছিলাম। আমি যেতেই দারোয়ান আমাকে বললে—“বাবুশায় আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।”

বন্ধুরা সব সভায় গেল, আমি কবির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীর উপর-তলায় একেবারে পশ্চিমের দিকেই ঘরে গেলাম। কি জন্তে আমাকে ডেকেছিলেন তা আমার এখন মনে নেই, কিন্তু সেদিন আমি আর একটি যে দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

দারোয়ান এসে খবর দিল একজন লোক বাবুশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কবি বললেন—“তাকে বলো, এখন তো আমার সময় নেই, উপাসনা আরম্ভ হবার সময় হয়ে এসেছে, আমাকে সভায় যেতে হবে।”

দারোয়ান বললে—সেই লোকটিকে এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি বলছেন তিনি বেশীকণ বিলম্ব করাবেন না, তিনি কেবল মাত্র প্রণাম ক'রেই চলে যাবেন।

কবি তাঁকে আস্তে অন্তর্মতি দিলেন।

যিনি এলেন, দেখলাম, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, অপর একজন তাঁর হাত ধরে নিয়ে আসছে। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন—“আমি কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এসেছি।”

কবি বললেন—হ্যাঁ, আমি রবীন্দ্রনাথ।”

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বললেন—“আমি অন্ধ, আমার এক মেয়ে সম্ভ্রান্তি বিধবা হয়েছে। কিন্তু বিধবা হ'য়ে সে কয়েকদিন কান্নাকাটি ক'রে

হঠাৎ চুপ করে গেল। আমার কৌতূহল হলো জানতে যে তার কি হলো যে হঠাৎ কারা বন্ধ হ'য়ে গেল। তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে—‘আমি রবিবার, ‘নৈবেদ্য’ বই প’ড়ে তা থেকে পরম সাবুনা পেয়েছি, আর আমার শোক জুড়ে কিছু নেই।’ আমি তাকে বললাম—‘দারুণ শোক তাপ দূর হয়ে যায় এমন যে বই তুমি পেয়েছ, তা আমাকে প’ড়ে শোনাতা’।’ মেয়ে আমাকে সেই বই প’ড়ে প’ড়ে শোনালে। আমি তা শুনে মুগ্ধ হ’য়ে গেছি, আর বড় সাবুনা লাভ করেছি। এই কথাটি ব’লে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার জন্য আমি কলকাতায় এসেছি।”

এই কথা ব’লে অন্ধ আবার ক’বন্ধকে প্রণাম ক’রে ধীরে ধীরে চ’লে গেলেন। আমি ‘নৈবেদ্য’র ভাব দ্বন্দ্বের ধারণ ক’রে কবির সঙ্গে যাবোঁসবের উপাসনার যোগ দিতে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের বিনয় ও ধৈর্য অসাধারণ। কলকাতার এলে তাঁর কাছে দর্শকের আনাগোনার অন্ত থাকে না। সকাল সাতটা থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত লোক আসতে থাকে। যার যখন অবসর ও ইচ্ছা সে তখন আসে, কিন্তু কবির যে বিশ্রাম করার অবসর পাওয়া দরকার, তাঁর যে স্নানাহার আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কাকরই হ’ল থাকে না। আমাবও থাকত না অপরাধ স্বীকার ক’রে রাখি, আমাদের মনে হতো যে আমাদের যখন অবসর আছে তখন তাঁরও আছে। এক একদিন দেখেছি, লোকের পরে লোক আসছে কবি ঠায় ব’সে আছেন, নড়া নেই চড়া নেই বসার ভগ্নী পরিবর্তন করা নেই। ভৃত্য এসে দূরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে দিতে চাচ্ছে যে আহা! অপেক্ষা করছে, কবি তার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাবিয়ে নীংবে তিরস্কার করেছেন আর সে বেচারি মুখ কাচুমাচু ক’রে পরায়ন করেছে। আমি অনেক সময় আগন্তুকদের কৌশলে বিদায় ক’রে দিয়ে কবিকে উদ্ধাব করেছি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা গেছি, লোকের পরে লোক আসছেন, কেউ নৃত্য গান শিখে নিচ্ছেন, কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু পড়িয়ে শুন্ছেন, কেউ নানা বাজে কথা পেড়ে বকর বকর করছেন, আর কবি অপরিচয় ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের সকলের মন রক্ষা করছেন। সাত্রি আটটা বেজে গেল, আমরা উঠি উঠি করছি, এমন সময় এক জঙ্গলোক এলেন। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন—“আজ্ঞা আপনার ড্রুন্ডের স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যত কি? আমার তো মনে হয়”—চলল তাঁর অনর্গল বক্তৃতা। কবি তাঁকে বললেন—“ওকণ,

তোমার সঙ্গে বাক চাকর পরিচয় নেই, ও সম্পাদক মাহুদ, ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখলে তোমার ক্রুডের কিছু হিসে লাগতে পারে।” সে ভদ্রলোক কবির ব্যঙ্গ বুঝতে পারলেন না। তিনি কেবল এক “ও” বলে আবার বক্তৃতা লাগলেন। তাঁর বকুনি আর খামে না দেখে আমি উঠবার উপক্রম করলাম, তখন প্রায় রাত্রি দশটা। আমাকে চ'লে যেতে উদ্বৃত্ত দেখে কবি আমাকে বললেন, “চাকর, তুমি চলে যেও না, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, তুমি আর একটু বোসো।”

এতক্ষণে সে ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি চ'লে গেলে কবি কুপিত ভাবে আমাকে বললেন—“চাকর, তোমাকে আমি আমার বন্ধ ব'লে জানতাম, কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার ঘুচল।”

আমি তো অবাক। ভীত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি হেসে বললেন—“তুমি আমাকে ঐ ক্রুডের ভূতের হাতে অসহায় ফেলে রেখে চ'লে যাচ্ছিলে কোন্ আক্কেলে?”

আমি তো এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে হেসে বাঁচলাম।

সেই ভদ্রলোক এতক্ষণ ফ্রেড নামকে ক্রুড্ উচ্চারণ ক'বে ক'রে আমাদের মনের মধ্যে যে হাস্ত জমা ক'রে তুলেছিলেন, তা এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে গেল।

এর পবে একদিন আমি বাত নটাব সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ঘরে তখনো অনেক লোক ব'সে বয়েছেন। আমাকে দেখে রথীবাবু আমাকে বাইরে ডেকে বললেন—“সবাল থেকে বাবা এই ঘরে ব'সে আছেন, তাঁর এখনো স্নানাহারও হয় নি, আপনি যদি পারেন সব লোককে বিদায় করতে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।”

আমি তখন নিতান্ত অসন্তোষ মতন ঘরের সব লোককে ডেকে ডেকে কবির অবস্থা জ্ঞাপন করতে লাগলাম। রুট হবে ব'লে বাড়ীর লোকেরা যে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, আমি বাইরের লোক হওয়াতে তা অনায়াসে ব'লে সকলকে বিদায় করতে লাগলাম। সকলকে বিদায় ক'রে আমি বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েছি, দেখলাম আর একজন ভদ্রলোক তখন সিঁড়িতে উঠছেন। বাত দশটা হয়েছে, তাঁর ডাক্তারী ব্যবসায়ের বিশ্রামের অবসরে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। আমি তাঁকে সিঁড়িতেই গ্রেপ্তার ক'রে কবির ঘরবস্তার সংবাদ জিজ্ঞাস্য, কিন্তু তাঁর অস্থকম্পা উদ্বেক করতে পারলাম না। তিনি আবার

ভয়ানক বাতাল ও গল্ল; তিনি একবার কথা ফেঁদে বসলে কোথায় যে তাঁর কথা সেমিকোলন পড়বে তা কেউ বলতে পারে না, তাঁর কথার তো কোথাও দাঁড়ি ছেদ নেই-ই। তাঁকে নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধরে প্রবেশ করতে দেখে রথীবাবু যেরকম হতাশ নিক্রপায় ভাবে আমার দিকে চাইলেন, তাতে আর আমার চ'লে যাওয়া হলো না, আমি কাঁবকে উদ্ধার করবার জন্য আবার ঘরে ফিরে গেলাম, এবং পাঁচ মিনিট পরেই আগন্তুককে স্পষ্ট ব'লে দিলাম যে রাত অনেক হয়েছে, এখন আমাদের চলে যাওয়া নিতান্ত উচিত।

রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যের পরিচয় আমি আর একদিন পেয়েছিলাম, তা যথাস্থানে বলতে ভুলে গেছি। ১৩২১ সালে যখন 'গীতালি'র গান রচনা চলছিল, তখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম তা আগে বলেছি। তার কিছুদিন আগে কবি সুরলে নূতন বাড়ী কিনেছেন, যেখানে এখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত আছে। একদিন কবি বল্লেন, "চলো চার, তোমাকে আমার নূতন বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি।" আমরা এক ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে রওনা হলাম। বোলপুর বাজারের কাছে গিয়ে একটা অপরিচর রাস্তার মধ্যে গাড়ীর মোড় ফেরাবার দরকার হলো। কবি গাড়ীর ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে কোচম্যানকে বলতে লাগলেন—"ওরে, এখানে মোড় ফেরাতে চেষ্টা করিসনে, করিসনে, গাড়ী উল্টে যাবে গাড়ী উল্টে যাবে।"

কোচম্যান তাঁর নিষেধ না শুনে গাড়ী ঘোরাতেই লাগল। কবি শাস্ত্র ভাবে আমাকে বল্লেন যে গাড়ী উল্টে যাবে, তুমি ভয় পেয়ো না, গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করো না। এই ব'লে তিনি আমার হাতে চেপে ধরলেন পাছে আমি তাঁর নিষেধ না মেনে লাফ দিতে যাচি। দেখতে দেখতে গাড়ী সত্যিই উল্টে গেল। কিন্তু আমাদের কিছুমাত্র আঘাত লাগেনি। আমরা গাড়ীর খোল থেকে গর্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠার মতন ক'রে বেরিয়ে এলাম। তার পর হেঁটে শান্তিনিকেতনে ফিরলাম, সেদিন আর সুরলে যাওয়া হলো না।

জালিমান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যেদিন এল, সেদিন কবির বিচলিত ভাব আর অর্ধবর্ষ দেখেছি। সমস্ত দিন অনাহার অন্নাত। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা, মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কারো সঙ্গে কোন কথা নেই, কেবল বারান্দার একধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত পায়চারি করছেন। কাছে কেউ

যেতে সাহস করছে না, কেবল এগুজ সাহেব একবার তাঁর কাছে গিয়ে কি বল্লেন, আর কবি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—“ও নো নো নো !”

তার পর তাঁর লেখবার টেবিলে বসে ধস্‌ধস্ করে লর্ড চেমসফোর্ডকে পত্র লিখে নিয়ে এসে এগুজ সাহেবকে দেখতে দিলেন। এগুজ সাহেব সেই চিঠি পড়ে বল্লেন বড় উগ্র হয়েছে। চিঠিটা আরো মোলায়েম করা দরকার। কবিকে অনেক সাধাসাধি করে সাহেব কিছু পরিবর্তন করতে সম্মত করালেন। কিন্তু যা পরিবর্তন হলো তাও সকলের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করতেই লাগল। কবি আর মোলায়েম করতে বাজী হলেন না। সেই চিঠিই বোধ হয় লাট সাহেবের কাছে গিয়েছিল, এবং সমস্ত ভারতবাসীর আহত আত্মসম্মান রক্ষা করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্তি হ'লে সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করেন যে সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করাতে হবে। সত্যেন্দ্র আর মণিলাল পরম উৎসাহ সহকারে টাকা সংগ্রহ করতে ও লোকমত গঠন করতে লেগে গেল। আমি ববাবব ভাদেব সহকারী হ'য়ে কাজ কবে অনুষ্ঠানটিকে সুসম্পন্ন করে তুলেছিলাম। ভাগ্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে আমরা তাঁকে দেশের সাহিত্য-পরিষৎকে দিয়ে সম্বর্ধনা করাতে পেরেছিলাম, তাই দেশের ঈজ্ঞা রক্ষা হয়েছে, নইলে আমাদের লজ্জা রাষ্ট্রের আর জাতির থাকত না।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আহার করবার দৌভাগ্য আমার কয়েকবার হয়েছে। কবির সবই কবিত্বময়। আহার-স্থান সজ্জিত করা হয়েছিল যেন এক পরীস্থান রূপে। ছুটি নিমন্ত্রণ সভার বর্ণনা দেবার ক্ষীণ চেষ্টা আমি করেছি আমার ‘ঘৃনাপুলনের ভিখাবিনী’ আর ‘জোড়বিজোড়’ নামক উপজ্ঞানের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ এমনি বিনয়ী যে ‘প্রবাসী’র জন্ত কোনো লেখা আমার হাতে দিয়ে বা চিঠিতে পাঠিয়ে আমাকে বলতেন—দেখো ‘প্রবাসীতে চলবে কি না’।

আমি বাংলা বানান সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করে বানান সংস্কার করবার চেষ্টা করেছি। আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার যে আমি রবীন্দ্রনাথকে আমার মতাবলম্বী করতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তোমার এক ‘মতো’ ছাড়া সব বানান আমি যেনে নিলাম, তবে যদি স্থনীতি চাটুজ্ঞও তোমাকে সমর্থন করেন তবে অগত্যা আমাকে সেটাও যেনে নিতে হবে।

একবার স্বাধীনতা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তিনটি বক্তৃতা করেন এবং সেগুলি পরে ‘বঙ্গবাণী’তে প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময় চীনদেশে যাবেন বলে বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জীমান্ প্রাথমিকশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলে দিলেন যে প্রফ চাকুরী দিয়ে দেখিয়ে নিলে আমি নিশ্চিত হ’য়ে বিদেশে যেতে পারব। প্রথম—প্রবন্ধের প্রফ যেদিন আমার কাছে এলো তার পর দিন কবি চীনে যাবেন। আমি রাতে তাড়াতাড়ি প্রফ দেখে সকালেই কবিকে একবার দেখিয়ে নেব বলে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। প্রফের মধ্যে ‘আকুতি’ শব্দটা ‘আকুতি’ হয়ে থেকে গিয়েছিল, আমি সংশোধন করিনি। কবি আমাকে বললেন—“চাকুরী, তোমার দেখা প্রফে এমন ভুল থেকে গেল কেমন করে।

এই তিরস্কারও আমাব কাছে পরম পুরস্কার বলে মনে হলো।

চীন থেকে যেদিন ফিরে এলেন, সেদিন আমিও ষ্ট্রিমার-ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। আমি তখন কঠিন পীড়াগ্রস্ত, একরকম চলচ্ছত্রহীন। কবিগুরু ডাঙার নেমেই আমাকে দেখে সম্মুখে আমার পিঠে হাত রেখে আমাকে বললেন—“চাকুরী, তোমার একি দশা হয়েছে! প্রতিপক্ষের মা ইব।” সেই বহু-স্পর্শ আঙ্গুল আমার অঙ্গের ভূষণ হ’য়ে রয়েছে।

তখন ‘পূর্ববী’তে প্রকাশিত কবিতা লেখার পালা চলেছে। আমাকে কবি পত্র নিধে জানালেন—“চাকুরী, কয়েকটা কবিতা লেখা হয়েছে, বন্ধের অনেক, আগে তোমাকে প’ড়ে শোনাতে চাই, দেখে যেতে পাবো যদি কোনোটা তোমাদের ‘প্রবাসী’তে চলে।” আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে প’ড়ে শোনালেন অনেকগুলি কবিতা। আমি বললাম—এ যে দেখি আপনার আবার ‘মানসী’ ‘সোনার তরী’র যুগ ফিরে এসেছে!

কবি হেসে বললেন—“তবে যে তোমরা বলে আমি আর কবিতা লিখতে পারি না। তবে ভালো হয়েছে বলে তুমি বেশী লোভ কোরো না, একটা—গোণা একটা—বেছে নাও।”

আমি দুটি কবিতা বেছে তাঁকে বললাম—এই দুটির মধ্যে কোনটো আমি নেবো, তা আর আমি ঠিক করতে পারছি না, আপনিই মিন বেটা হয়।

কবি হেসে বললেন—“তুমি ডাকি ডাঙার, দুটো নেবারই ফল। তবে এই দুটোই নাও।”

যখন আমি কবির কবিতা থেকে চয়নিকা প্রথম প্রকাশ করি, তখন কবির সঙ্গে বহু কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। পরেও ঢাকার শিক্ষকতা করার উপলক্ষে অনেক কবিতার মর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছি।

সেই সময় আমি তাঁর সমস্ত গানেরও একটা সংগ্রহ প্রকাশ করি আমি তখন তাঁকে অমুরোধ করে করে বহু গান তাঁর কাছ থেকে ওনেছি। প্রেমের গানও বাদ দিই নি। আমি তাঁকে যেদিন “বিধি ভাগর আমি যদি দিয়েছিল, দেখি আমারই পানে ভুলে চাইবে না” গানটা গেয়ে শোনাতে অমুরোধ করলাম, সেদিন আমাকে তিনি বললেন—“চাক, তুমি আমার মান মর্যাদা আর কিছু রাখলে না। তবে দরজা দাও, তোমার কাছে তো খেলো হয়েইছি, আর অপরের কাছে আমাকে খেলো কোরো না।”

কবি যখন কলকাতায় ‘ফাস্তুনী’ নাটকের অভিনয় করেন, তখন তাঁর হুকুমে আমার মতন মুখচোরা অক্ষমকেও রঙ্গমঞ্চে নামতে হয়েছিল। শেষ দৃশ্যে যখন কবি-বাউল সকলের সঙ্গে মিলে বসন্তের বন্দনা গান করছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখার প্রলোভন ত্যাগ করতে না পেরে পকেট থেকে আমার চশমা বার করে চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কবি নাচতে নাচতে আমাব কাছে এসেই দিলেন এক ধমক—চশমা খুলে ফেল বলছি।

ঢাকা ইউনিভারসিটিতে একজন বাংলার উপাধ্যায় চাই জেনে আমি সেই পদের জন্ত প্রার্থী হবো স্থির করে রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ পাবার জন্ত তাঁকে শান্তিনিকেতনে পত্র লিখলাম। তিনি তখন কলকাতায় এসেছেন, আমি পীড়িত ছিলাম বলে খবর পাই নি। দুদিন পরে খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে আমার আবশ্যক নিবেদন করলে তিনি বললেন—“দেখো দেখি তোমার কাণ্ড, তোমার কি সব অসামগ্রিক, যদিও তুমি সামগ্রিক পত্রিকার সম্পাদক? এতদিন তুমি কি করছিলে? আজই সকালে আমি একজনকে ঐ কাজের উপযুক্ত বলে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছি, এখন আমি তোমাকে কি বলে সুপারিশ করি বলো তো। তুমি আমাকে কী মুন্সিলেই যে ফেললে তার আর ঠিকানা নেই।”

আমি বললাম—আপনি আমাকেও একটা বা হয় লিখে দিন। তার পর আমার শুপনমা আর আপনার প্রশংসা আর অপর প্রার্থীর শুপনমা ও আপনার প্রশংসা বাচাই হ’লে বার ভাগ্যে হয় জর জুটে বাবে।

কবি চিন্তিত হয়ে গভীর হলেন। আমি বুঝলাম যে আমার অনুরোধ তাঁকে বিপন্ন করেছে। তখন আমি প্রশংসাপত্র বিনাই বিদায় নেবো ভাবছি, এমন সময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার যাও ক্লীণ আশা ছিল, তাও আব রইল না, আমার স্থির ধারণা হলো যে আব আমার কোনো প্রশংসাপত্র পাওয়ার পথ খোলা রইল না।

কবি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন এবং ঘর থেকে যেতে যেতে বললেন—“চার, তোমরা বোসো, আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, আমাকে কাপড় বদলে এখনি বেরতে হবে”

অল্পক্ষণ পবেই কবি কাপড় বদলে আলখালা প’রে ফিরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে তিনি চোখেই ইসাবায় আমাকে তাঁর অনুসরণ ক’বে বোঝে বললেন। আমি উঠে বেবিয় পড়লাম, এবং কবির সঙ্গে মোটবে চ’ড়ে বডনা হলুম—কোথায় তা তখনো জানি না। মোটব জোড়াসাঁকো থেকে নিজস্ব হুঁড়ে গেলে তিনি শোফানকে ডাক্তার করাজন মোটব বিশ্বভাবতীর্থ আর্টস সিনেমা হলে নিয়ে গেলেন। সেখানে মোটব বিশ্বভাবতীর্থ আইস চ্যান্সেলর হাউসে গেলেন এবং সেখানে, এতে যা না যে প্রশংসা করতেন তা শাশুর সন্তানকে অংশেব ছিল। সেই পএ আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“দেখো তো, হবে।”

আমার মন শান্তি এমনি পূর্ণ হ’লে নিম্নেছিল যে আমি কখনো এতে পাবলাম না। তখন কবি আমার কানে বললেন—“দেখ চাব, তোমার জগৎ আজ যা অবশেষে তা শাশুর প্রতি নিকট কেনে যাওয়াইবে জেনে ও করতাম না।”

কবীন্দ্রর সঠি পশসার জোড়াই ঢাকায় আমার চাকুরী হ’লে গেল

কবি-মানসবীহ পঠিত্য বিস্তৃত হ’য়ে পড়ল। কবি-মানসেব পঠিত্য দেবার আর স্থান নেই। শুধু তাঁর ক’বমনেব কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ ক’বেই আমার প্রসঙ্গ সমাপ্ত ক’ব।

রবির উদয়ে যেমন বিশ্ববাসী নবচেতনা লাভ করে, আমাদের ববিব উদয়েও তেমনি আমাদের দেশের এক অপূর্ব চেতনা লাভ হয়েছে। তিনি মরোত্তম, তিনি আমাদের দেশের শুধা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতিভা,

তিনি সত্য 'শিব' সূন্দরের উপাসক কবি। তিনি ব্যক্তি-জীবনে ও জাতি-জীবনে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হওয়ার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে ক্রমাগত "শত্রু" বাঞ্জিয়ে "আবার আহ্বান" করেছেন—আগে চল আগে চল ! তিনি সূন্দর ভবনকে ভালোবেসেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে জাম সমান—মৃত্যু

সে যে মাতৃপাণি

শুন ওতে স্তনাগুবে লইচেছে টানি।

ইহ পরকালকে সূন্দর আনন্দময় ন'লে যিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে অভয় দিয়ে কেবল মাত্র সত্যের পথে চলতে বলেছেন বন্ধন থেকে মুক্তিতে, মৃত্যু থেকে অমৃত্যুতে, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে সত্য হোক।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশ্লেষিত বলাকার দুইটি কবিতা

রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁহার নিজের কাব্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাব ধৌবনে একবার গিখিয়াছিলেন—

পরজন্ম নহাং

কি বটে মার সেট জাতি।

শাব্যব আশ্রয় টানবে ধবে

বাড়ি গা মশের এ রাজধানী

গল্প গল্প 'পুতু' হৈছে

চাঁরাতি আমায় কানবে বৈধ

ওনেক মশায় ওনেক পাতক

সে মগপাপ করব মোচন।

আমায় হস্ত কর্ত্ত হবে

আমায় সেথা সমালোচন। কণিকা

কিন্তু পরজন্মের জন্ত কবিকে আর অপেক্ষা করতে হয় নাই। জীবিতকালেই তিনি তাঁহার স্বরচিত বহু গল্প-পত্রের সমালোচন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া

গিয়াছেন। নীচে বলাকার 'শব্দ' 'শাজাহান' নামক বিখ্যাত 'কবিতা' ছটির বিশ্লেষণ কবি যেভাবে করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইল। কবিতা ছটির বিশ্লেষণ দীর্ঘ নয়। কিন্তু স্বয়ং-পরিসরের মধ্যে কবিতা ছটির ভাব সুপরিব্যক্ত হইরাছে।

শব্দ—বলাকার শব্দ বিধাতার আহ্বান শব্দ। এতেই বুকের নিময়ণ ঘোষণা করিতে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অজ্ঞানের সঙ্গে। সময় এলে উদাসীন ভাবে এ শব্দকে মাটিতে পড়ে থাকিতে দিতে নেই। দৃশ্য-স্বীকারের ছকুম বহন করিতে হবে, প্রচার করিতে হবে।

শাজাহান—শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে দেখতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙ্গে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিঘাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে ধ্বংস করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলি সীমা ভেঙ্গে ভেঙ্গে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনই চিরকালের নয়—তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই রকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো ধসে পড়েছে—তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র কতি হয়নি।

তাজমহলের শেষ ছটি লাইনের সর্বনাম "আমি" ও "সে"—যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতি বন্ধন নেই,—আর যে-অহং কাঁদচে, সেই তো ভার বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বলতে কবি নয়—"আমি—আমার ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল যে মাছুষটা বলে, তারই প্রতীক ঐ গোরহানে—আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোক-লোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো একখানে ধরে না,—না তাজমহলে, না ভারত সাম্রাজ্যে, না শাজাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীণ অস্তিত্বে।

নিদর্শনী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৪০৫	অসিতকুমার হালদার	৪১৬
অচলারতন	৯৬, ১২৫-১২৭, ১২৮, ৩৫২	অহল্যা	২৮৮
অজিতকুমার চক্রবর্তী	২৩৫, ৩৪০, ৪০৯, ৪১১	আইনুস্টাইন	২৭২
অজিতকুমার চক্রবর্তী		আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাই	৬৩-৬৪
উদ্বোধন কবিতা সম্পর্কে	৫	আগমন ১৪, ৭৮-৭৯, ১২৩, ২৬০, ৩২১	
অতিথি	১২-১৪	আগমনী	২৩১, ২৩৮-২৩৯
অতীত	৫০-৫১	আজ এই দিনের শেষে	২১২-২১৩
অথর্ববেদ	১৫, ৪৫	আজ প্রভাতের আকাশটি এই	১৭২-১৭৩
অধিভারতী	৪৮	আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে	৬১-৬২
অনন্ত জীবন	৩৭২	আজি ঝড়ের রাতে তোমার	
অনন্ত প্রেম	৬১, ১১২, ৩২৮	অভিসারে	১০৫
অনন্ত-মরণ	৫৫, ৩৭৪	আত্মবিক্রয়	৮৪, ১৩০
অনাবগ্ৰক	৮৩-৮৪	আঁধার আসিতে রজনীব দীপ	৬৬
অন্তর্গামী	৩০৮, ৩৪৪, ৩৭৬	আনাতোল ফ্রাস্	২৪৫
অন্তহিতা	৭৯, ২৬০	আবর্তন	৪৮, ৩১৭
অপমান	১১৪-১১৫	আবহুল ওহুদ	২১, ২৩৫
অপমানিত	৩২৬	আবহুল ওহুদ	
অপরূপ	৪২	উদ্বোধন কবিতা সম্পর্কে	৫
অপূর্ব রামায়ণ	৩০	আবার আহ্বান	২৩৯, ২৪৭
অপ্রমত্ত	৩৩৩	আবার এসেছে আষাঢ় গগন ছেয়ে	
অবমান	২৩১, ২৩২	(গান)	১৪
অবারিত	৩১৭	আবির্ভাব	১৬-১৮, ৬১
অবিনয়	২৭৯	আবু বেন আদম (Abu Ben Adhem)	২৬
অভয়	১৫, ৩৩৩	আবেদন	৬৪, ৬৮
অত্র-আবীর	১৫৯	আমরা চলি সমুখ পানে	১৪৭
অরবিন্দ ঘোষ	২৬৬	আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল	
অরুণ রতন	১২১	অলঙ্কার	১১৭
অল্ড্ ল্যাং সাইন (Auld Lang Syne)	২৩৪	আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে	১১৮
অশেষ	২৪৮, ২৫৭	আমার ধর্ম	৫৬, ৯১, ১২১, ১২৬
		আমার ধর্ম প্রবন্ধে ধেমার আগমন	
		কবিতার ধর্মকথা	৭৮

আমার নরন ভুলানো এলে ১০৩-১০৪	উদ্ভাস্ত প্রেম	৪০২
আমার মনের জানালাটি আজ	উদ্বোধন	২-৬, ৩২২
১৭০-১৭২	উপনিষৎ	৩, ৪২
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে.	উপহার	১৬৫
১১৭	ঋগ্বেদ	১৫, ২৪২, ২৬২
আমার মাথা নত ক'রে দাও হে ১০১	ঋতু-উৎসব	২৭১, ২২৪
আমার মিলন লাগি' তুমি আসছ	ঋতু-রঙ্গ	২৭১
কোথা থেকে ১০৭	ঋতু-সংহার	৮, ১০, ১১
আমি চকল হে ৪৩	ঋতু-সংহাব	
আমি যে বেসেছি ভালো এট	ও ঋণিকার সেকাল	৯
জগতেরে ১৮২-১৮৫	এ. ই. (জর্জ রাসেল)	
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ১০৭	ও নবীনতার জয়গান	১৪৬
আরনল্ড, সার এডুইন্ ও তার-	এই দেহটির ভেলা নিয়ে	২০৩-২০৫
মহলের প্রশস্তি ১৫২	এই মোর সাধ যেন এ জীবন	
আর্ল, জন ৩৪	মাঝে ১১২	
আলোকে আসিমা এরা লীলা করে	একলা আমি বাহির হলেম তোমার	
যায় ৬২-৬৩	অভিসারে ১১৩	
আলোচনা ৩৫৭	একটি আঘাতে গল্প ৩০৪	
আশ্রমবিভাগালয়ের সূচনা ২৬	একাকিনী ২৮৭	
আষাঢ় ১৪	এটারনাল চাইল্ড্ (দি) ৩৪	
আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিষে এলো ৯২	এণ্ডাইমিয়ন (Endymion) ২৪৬	
আহ্বান ১, ২৪৭-২৫২	এন্থ্রাণ্ট্ মেরিনার ২৬	
ইউলিসিস্ ৪৫, ১৬৫	এবার নীরব করে দাও হে তোমার	
ইন্ অ্যান্ড্রাম, দি ৩৮	মুখর কবিরে ১০২	
ইন্টু ডার ৫৭	এবার ফিরাও মোরে ৬১, ২৪৭,	
ইন্দিরা দেবী ১০০	৩২৬, ৩৪৪, ৩৫৮	
ইম্মরট্যাল্ ম্যান্ ৫৭	এব্ ট ভল্গার ১৩৬	
ইয়েট্ ৯৯	এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো ১৪৭	
ঈশোপনিষৎ ২৮, ১০৩, ২০২,	এমাস্ন্ ৫৭, ১১৫	
৩২১, ২৪৩	এমিয়েল্ জার্নাল ১৪৬	
ঈশ্বর গুপ্ত ২৮৫	এ মেমোরি (A Memory) ৪০	
উজ্জীবন ২৮০-২৮১	এস হে এস সঞ্জল ঘন বাদল	
উৎসর্গ ১৩, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৫০,	বরিষণে ১০৮	
৫২, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৮	এসে অন্ ওভারসোল ৫৭	
১০৬, ১০৭, ২৫৪, ৩১০, ৩১২	আজ্ ইউ লাইক্ ইউ ৬২	
৩২৭	এ্যাডোনিচ্ ৩১, ৩৯	
	এ্যাবারক্রম্বি, গ্যাসেল্ ১৪৬	

ওড্‌ অন্‌ এ গ্রীসিয়ান্‌ আন	২৪৬	কর্ম	৩১৭
ওড্‌ অন্‌ দি ইন্টিমেশান্‌ অব্‌		কর্মফল	২৭২, ৩৮২
ইম্‌মর্টালিটি	৩৪	করণা	৩৩১
ওড্‌ টু এ নাইটিঙ্গেল	১৪	কল্পনা	৪১, ৫২, ৮২, ২৪৪, ২৬৩
ওড্‌ টু ওয়েস্ট্‌ উইণ্ড্‌	১৪৬, ২৪৫		২৬৫, ৩২১, ৩২২
ওমর খৈয়াম	৬	কল্যাণী	১৮-২০
ওমর খৈয়াম ও রবীন্দ্রনাথ তুলনা	২	কাউপার	৮১, ৩৩৪
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ	৩, ৩৩, ৪০, ৪৪	কাঙালিনী	৩৭০
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-		কাণ্ট	২৭২
সাদৃশ্য	১৫, ৩০, ২২৪	কালিদাস	৮, ১১, ২৭, ১২৮, ১২৯
ওয়েল্‌স্‌, এইচ্‌. জি.	১০২	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	৩২৭
ওরে তোদের স্বর সহে না আর		কালের যাত্রা	২২৮-৩০০
	১৬৯-১৭০	কাল্পনিক ও বাস্তবিক	৩৬৯
কঙ্কাল	২৩১, ২৬১, ৩৮৪	কাহিনী	৪১, ৫০, ৫১, ৩৩০
কড়ি ও কোমল	২১৭, ২৮৭, ৩২৯, ৩৪২	কিপ্লিং	২৮
কণিকা	২, ৪১, ৬০, ১৪৪, ৩১৭	কিশোর প্রেম	২৩১
কত অজ্ঞানারে জানাইলে তুমি	১০২	কীটস্‌	১৪, ৪৪, ১৬৫, ২৪৬, ২৪৭
কত কি যে আসে কত কি যে		কুইন্‌ ম্যাব্‌	৫২
যায়	৫০, ৫১-৫২	কুইলার কোচ্‌, সার্ব আর্থার	১৪৬
কত লক্ষ বয়সের তপস্তার ফলে		কুমারসম্ভব	১০, ১২৮
	১৮২-১৮৩	কুমারসম্ভব ও ক্ষণিকার সেকাল	৯
কথা	৪১, ৫০, ৩২৬	কুঁড়ি	৪৬-৪৭
কথা কও কথা কও	৫০	কুয়ার ধারে	৮৩
কথা ছিল একা তরীতে কেবল তুমি		কৃতজ্ঞ	২৩১, ২৫৭-২৫৮
আমি	১১১	কৃপণ	৭৭, ৮১
কটেণ্ট্‌ মেন্ট্‌	৮৮	কেন মধুর	৩৫-৩৯
কপূরমঞ্জরী	৯	কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া	৬৫
কবিকণ্ঠহার	৪৮	কেম্পিস্‌, টামাস্‌ এ	৩৩৩
কবিকথা	৪১, ৬৪	কোকিল	৭১
কবিকাহিনী	৩১৮, ৩৫৯	কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ	১০৯
কবি-চরিত	৩১৯	কোলরিঙ্জ্‌	২৬
কবির দীক্ষা	২৯৮	ক্রিষ্ট্‌মাস্‌ জেভ্‌	১১৪
কবিতিকা	২৭৭	ক্ষণিকা	১-২ ২৩২, ২৭২, ৩২২, ৩২৫, ৩২৯, ৪৩১
কবীর	৫৩, ৫৬, ৮২, ১১৩, ১৪৫, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭	ক্সিতিমোহন সেন	৪১০
কবে আমি বাহির হলেম	১১০	খাপাড্‌লে	১২৮

খেলা	২৩২	চরনিকা	৪৮
খেয়া ১৪, ৭১-৭৩, ৮২, ১২৩, ১৩০, ১৪৮, ২৫২, ২৬০, ২২৩, ৩১০, ৩১৭, ৩২১, ৩২৩, ৩৩২		চাই গো আমি তোমারে চাই	১১১
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	৩১৭	চিঠি	৩১, ৬৮-৭০, ১০৭, ২৫৪
গরুড় পুরাণ	২২৪	চিত্রা	৬৪, ২৬১, ৩০৮, ৩২৭
গান দিয়ে যে তোমার খুজি	১১৭	চিত্রাঙ্গদা	৩৩০
গান্ধারীর আবেদন	৩২৫, ৩২৬, ৩২৯	চিন্তামণি ঘোষ	৪০৯
গান্ধী, মচান্দা	১২৮, ২৪৭, ৪০১	চির আমি	২২৯
গিরিশ ঘোষ	৩২৪	চিরকুমার সভা	৩৫৫
গীতবিতান	২৫	চির দিন	৩৭৪
গীতাঞ্জলি ৫৬, ৭১, ৭২, ৯০, ৯৮- ১০০, ১২৩, ১৩৬, ২৪৮, ৩০৭, ৩১৬, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৭৫, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৯২, ৪১৩		চিরস্বপ্ন	১১২
গীতাঞ্জলি—		চেনা	৬০
২৪, ২৫, ২৬, নব্বয় গান	১০৫	চৈতন্যচরিতামৃত	২২, ১১১, ১১৬, ৩৩৩, ৩৩৪
গীতাঞ্জলির বৈষ্ণবতাব	১১০	চৈতন্যদেব	২২
গীতালি ৭১, ৭২, ১১৫, ১৩২-১৩৫, ২৬২, ২৮৮, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩২, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১৪, ৪১৬		চৈতালি ২৫, ৮৩, ১১৬, ১৪২, ৩১৭ ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫৬, ৪০৬	
গীতিমালা ৭১, ৭২, ৭৯, ৮৪, ৯৯, ১০৫, ১২৩, ১৩০, ১৩৮, ২৪৫, ২৫৯, ২৮৮, ৩২৭, ৩৩২, ৩৮৭, ৩৮৮		চোখের বালি	৩৪৬, ৪০৭
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮		ছবি	৩০, ১৫২, ২৫৭, ৩৮০
গ্যোটে		ছবি ও গান	১৫২-১৫৬, ২৮৪, ২৮৭
ও উৎসর্গের সুদূর	৪৮	ছল	৫৯
গ্যোটে ১২৮, ২৩৪, ৪০২		ছিন্নপত্র	৩৭, ৭৭, ৭৮, ৯০, ১৩১, ১৫৭, ১৬৬
গোরী ৩৬, ৩৬৩, ৪১২		ছেলে-ভুলানো ছড়া	৩৪
বনরাম দাস ৩৮		জগৎ জুড়ে উদার সুরে	১০৪
চকলা ১৬০-১৬৫, ১৮৪		জগতে আনন্দ-যন্ত্রে আমার	
চণ্ডালিকা ১১৪, ৩০১		নিমন্ত্রণ	১০৮
চতুর্ভুজ ২৭৪		জগদীশচন্দ্র বসু	৭২
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ৪০২		জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে	১২৮
		জন্ম ও মরণ	৬১
		জন্মকথা	৩৫
		জন্মদিন	২৯৩
		জানি আমার পায়ের শব্দ	১৮০-১৮১
		জাপান-বাত্রী	১৪৪, ৩৩৬
		জাতিমান্বিতরাণাবাগ	৮৫, ৪২৬
		জীব গোবামী	৮০

জীবন-দেবতা	৪১, ৬১, ৬২, ৬৪, ১২২, ১৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৪৮, ২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০, ৩১৯, ৩৩৭, ৩৫৮, ৩৭৬, ৩৭৭	তুমি কেমন করে গান করো তে গুণী	১০৫
জীবন-মধ্যাহ্ন	২৮৮	তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে	১০৩
জীবন-স্মৃতি	৯৭, ২৮৭, ৩১৫, ৩২৮, ৩৭০	তৃতীয়া	১৩১, ২৬১
জীবনে যত পূজা হলো না সাবা	১১৯	তোমার খোঁজা শেষ হবে না	
জোড়-বিজোড়	৪২৭	মোব	১১৮
জ্ঞানদাস বর্ষোদী	৬৯, ১০৮, ২৫৪	তোমার চিনি ব'লে আমি কবেছি	
জ্যোৎস্না-রাত্রে	৩২৭	গরব	৬৬-৬৭
ঝুলন	৩১২	তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন	
টমসন্		সাধ্য নাই	১১০
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম		তোমার বীণায় কত তার আছে	৬৪-৬৫
সম্পর্কে	৬৭	তোমাতে কি বারবার করেছিহু	
টমসন্ ফ্র্যান্সিস্	৩৭	অপমান	১৮০-১৮১
টলক (লোকমাত্ৰ)	১২৮, ৪০১	ত্যাগ	৭৭-৭৮, ২৫২
ট উইলিয়াম শেলী	৪০	থেইস্	২৪৫
ট-নাইট	২৬৩	খ্রি ইয়ার্স শি গু	৮৩
টেনিসন্	৩৫, ৪০, ৪৫, ৮১, ৮৮, ১৬৫, ১২৭, ৩৩৪	খ্রি ফিশার্স	২২০
ডাকঘর	১২০-১২৯	দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও	১০৬
ডায়ার	৮৮	দাদু	৮২, ৩৩২
ডি প্রোফাগিওস্	৩৫	দাদু	
ডেজি এ্যাণ্ড পপি	৪৩	ও উৎসর্গের আবর্তন	৪৯
ডেভিডের গীতি	৩৩৩	দান	৬৮, ৭২-৮০, ১৪৮, ২৫২
ডেমন্ অব্ দি ওয়ার্লড্, দি	৫১	দাণ্ড রায়	১৬
তপোভঙ্গ	২৩১, ১৩৩, ২৩৬, ১৩৮	দিদি	৩১৭
তপোমুতি	৫৭	দিন-শেষ	৮৫
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পব	১১৬	দীক্ষা	২৬, ৩২৪
তাজমহল	১৪০, ১৫৬	দীর্ঘি	৮৫
তাসের দেশ	৭, ৩০৪-৪১৬	দীনবন্ধু মিত্র	৩২৪
ভিলোয়ানাস্তব কাব্য	৫৯	দীনের সঙ্গী	৩২৬
তীর্থসঙ্গিল	৩৪৭	ছই উপমা	১৪২
তুমি	২২৫	ছই নারী	২০, ১২৬-২০৩
তুমি এবার আমার লহ হে নাথ		ছই পাখী	১৪
লহ	১০৮-১০৯	ছই বিধা জমি	৩১৭
		হয়তো তোমার ভিড় ক'রে যাবা	
		আছে	৬৪
		হরস্ব আশা	৩২৫, ৩৪৫, ৩৫৭

দুঃখমূর্তি ও দান	৩২৩	নারী	২৮২
দুঃসময়	৩২১	নিউ ইয়র্ক ঈজ	৪০
দূর হ'তে কি শুনিম্ মৃত্যুর গর্জন	১৭৭-১৭৮	নিও প্লেটনিক ডক্ট্রিন ও উৎসর্গের প্রবাসী	৪৬
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়িয়ে	১১১	নির্ভয়ের স্বপ্নভঙ্গ	৩৪২, ৩৫২
দেবতার গ্রাস	৩১৭	নিত্য তোমার পায়ের কাছে	২১১-২১২
দেবতাব বিদায়	৮৩	নির্ভয়	১৮০, ৩১৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি	২১, ২৬	নিরুদ্দেশ-যাত্রা	৩১৬, ৩৪৩
দোসর	২৩৪, ২৫৭	নিষ্কৃতি	১২০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়		নিষ্ক্রমণ	৪১, ৬৬, ১৪১
ও তাজমহলের প্রশস্তি	১৫২	নিষ্ফল কামনা	১৪২, ৩৮৮
ধনে জনে আছি জড়িয়ে হায়	১০৬	নূতন বসন	১৭২
ধর্ম	৯৩, ৪১২	নৈবেদ্য	১১-২২, ২৪, ৪১, ৫৩, ৭২, ১০১, ১১৪, ১৩০, ২৪৮, ২৮৮, ২৮৯, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৭২, ৪১২, ৪২৪
ধর্ম-প্রচার	৩২৬	নৈতিক ব্রহ্মচারী	৪০৭
ধূলা-মলিব	৩২৬	নোবেল পুরস্কার	১০০
ধোঁকার টাট	৪২৩	ত্যাগদণ্ড	২৭, ৩২৪
ধ্যান	৩৩৩	পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে	১৬৯
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১০০, ৪১৬	পঞ্চভূত	২৩, ৩০, ৩৬, ২৮৪, ৩০৭, ৩১৩, ৩৭৪, ৩৯০
নটরাজ—ঋতুরঞ্জশালা	২৯১	পট অব বেসিল, দি	১৬৫
নটীর পূজা	২৬৭-২৭০, ৩৮৩	পগবক্ষা	৩২২
নদী	৩৮০	পতিতা	৩৩১, ৪০৩
নন্দলাল বসু	৪১৮	পথ	২২৪
নববর্ষ	১৮২	পথের পথিক করেছে আমার	১৫
নববর্ষা	১৪-১৬	পথের বাঁধন	২৮১, ২৮২
নববর্ষের আশীর্বাদ	১৮২	পদধ্বনি	২২৪, ২৩১, ২৫৬-২৫৭
নব বেশ	৬০-৬১	পবিত্র প্রেম	৩২২
নবীন	৭, ১৪৩-১৪৭	পরিভ্রাণ	৯৭, ২২৮
নবীন (বনবাণী কাব্যের একটি বিভাগ)	২৯১	পরিশেষ	২২৩-২২৫, ৩৩৭
নবীনচন্দ্র	২৮৫, ৩২৪, ৩৯৫	পরিশোধ	৩২৮
নমস্কার	২৬৬	পলাতক	২১৭-২১৮, ৩১৭
নরহরি দাস	৩৮	পশ্চিম-যাত্রীর ডারারী	২২২-২২৩, ২৫৩
নলিনীকান্ত সেন	৪০০	পটিশে বৈশাখ	২৩১
নরেন্দ্র, অ্যালফ্রেড	১৪৬	পাখীয়ে দিয়েছ গান, গায় সেই গান	২০৫-২০৮
না জানি কারে দেখিরাছি	৬৮-৭০		
নানক	৩৩২		
নাথটা বেদিন বুহুবে নাথ	১১২		

পাগল	৪২, ১০৬	প্রমথনাথ চৌধুরী	২৫২
পাডি	১৪৮-১৫২	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ	১২৪, ২২৬,
পুনশ্চ	৫৫, ২২৬-২২৭		২৭৮
পুণ্যের শিহাব	২৫, ৩৩৩	প্রসাদ	৬০
পুরস্কার	৩১৯	প্রাচীন ভারত	৩২৬
পুরাতন ভূতা	৩১৭	প্রার্থনা	২৮
পূজাবিধি	৩২২	প্রায়শ্চিত্ত	৯৭, ২২৮, ৩৭৮
পূর্ণ মিলন	৩২৯	প্রিয়নাথ সেন	২৬১, ৪০৭
পুণিমা	৩৭৪	প্রিন্সেস্ হেলিন, দি	৫৭
পূরবী	১, ৬৯, ৭৮, ৭৯, ১২০, ১৩৫, ১৬৯, ২২৪, ২৩০-২৩৬, ২৩১, ২৯৩	প্রেম	৪১, ৬৩
পোডোবাডি	২৮৪	প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে	
প্যারাডাইস্ লস্ট্	৮৮	পুলকে	১০২-১০৩
প্যাসেজ্ টু ইণ্ডিয়া	১১৪	প্রেমেব অভিষেক	৩২৮
প্রকৃতি-গাথা	৪১, ৬৪	প্রেটনিক ডকট্রিন, নিও	৪৫
প্রকৃতির প্রতিশোধ	৪৯, ২০২, ২০৩	ফাস্তুনী	২, ৯৬, ১৩৭-১৩৮, ১৪৩, ১৯০, ২৩১, ২৬২, ৩০০, ৩৫১, ৩৯০, ৩৯১, ৪২৯
প্রকৃতির প্রতিশোধ		ফাঁকি	২১৯-২২৫
ও নৈবেদ্যের মঞ্জি, তুলনায়		ফিয়ার্‌স এ্যাণ্ড ফুপলস	৬৯, ৮১, ৩৩৪
আলোচনা	২৩	ফুল কোটানো	৮৪
প্রচ্ছন্ন	৫৯, ৮৫	ফ্যান্সি	৪৪
প্রতীক্ষা	৮৫, ১৬৮-১৬৯, ২৮১, ৩৭৫	বকুল-বনেনব পাখী	২৪১
প্রদীপ	২৬৫	বঙ্কিমচন্দ্র	৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭
প্রদ্বোৎকুমার সেন	১৪২, ১৫১	বঙ্গমাতা	৩২৬
প্রবাসী	১১০, ১৭৪, ৩৮১	বজ্রে তোমার বাজ্রে ঝাঁকি	১১০
প্রবাসের প্রেম	৬১	বদল	২৩১
প্রবাহিণী	২২৯, ২৩৪, ৩০৯, ৬৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৯, ৩৯২	বনবাণী	২৮৪-২৯২, ৩২৮
প্রভাত	২৫৯-২৬০	বন্ধন	৩৭৯
প্রভাত-উৎসব	২৮৬, ৩১৮, ৩৪২, ৩৫৯	বলাকা	৭, ৩০, ১৩৪, ১৩৯-১৪২, ১৭৩-১৭৭, ২৫৭, ২৮৯, ৩৩৪, ৩৫২, ৩৮২, ৩৮৩, ৪২০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪১৭	বলাকা কাব্যের নামকরণ	৩১১-৩১৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		বলাকা ১০ নম্বর	১৬৫-১৬৬
অচলায়তন আলোচনার	১২৬	১১ "	১৬৬-১৬৮
প্রভাতসঙ্গীত	৪৬, ৫৫, ২৮৬, ৩৫৯, ৩৭৩	১২ "	১৬৮-১৬৯
প্রভাতী	২৩১, ২৬০-২৬১	১৩ "	১৬৯
প্রভু তোমা লাগি' অঁখি জাগে	১০৬	১৪ "	১৮২-১৮৩

বঙ্গাকা ১৬ নম্বর	১৮৪-১৮৬	বাসর ঘর	২৮১
১৭ "	১৮৬-৮৭	বাল্লদেব সার্বভৌম	২২
১৮ "	১৮৭-১৮৮	বাল্লরণ	
১৯ "	১৮৯-১৯০	ও নবীনতার জয়গান	১৪৫
২১ "	১৬৯-১৭০	বিউটিফুল, দি	১৫৪
২৮ "	২০৫-২০৮	বিক্রমোবঙ্গী	১০, ১১
২৯ "	২০৮-২১১	বিচার	১৬৬-১৬৮
৩০ "	২০৩-২০৫	বিচিত্রা	২৯৩
৩১ "	২১১-২১২	বিচিত্রিতা	৩০১
৩২ "	২১২-২১৩	বিচ্ছেদ	২৯৭
৩৩ "	২১৩-২১৫	বিদায়	২৮১-২৮২, ৩৭৯
৩৪ "	১৭০-১৭২	বিদ্যাপতি	১৭৪
৩৫ "	১৭২-১৭৩	বিধুশেখর শাস্ত্রী	৮৯, ৪১০
৩৬ "	১৭৩-১৭৭	বিনয়েন্দ্রনাথায়ণ সিংহ	১৪৫
৩৭ "	১৭৭-১৮৮	বিনিয়োগ সাব ভোজ	৮৯
৩৮ "	১৭৯	বিপদে মোরে রক্ষা করো	১০২
৩৯ "	১৮০	বিবাহিলী	২৩১, ২৬১
৪০ "	১৮০	বিশ্ব	৪১, ৪৩, ৪৪
৪১ "	১৮০	বিশ্বদেব	৪৮
৪৩ "	১৮০-১৮১	বিশ্বদোল	৫২
৪৫ "	১৮১	বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন	১০৯
৪৫ "	২১৫-২১৬	বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি	১৮৪-১৮৬
৪৬ "	১৮২	বিসর্জন (নাটক)	২৭৪, ৩২৬, ৪০৪
বর্ষশেষ	২২৩, ৩৪৫	বিসর্জন নাটকের উৎসর্গ	৩০৮
বর্ষামঙ্গল	১৪, ২৯১	বিহারীলাল	২৮৫
বসন্ত	৩২৪	বুদ্ধদেবের উপদেশ	৬
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪১৭	বেকস (সিদ্ধদেবের ভক্ত কবি)	৩৩৬
বসন্তের দান	২৬৫	বেকস	
বসন্তকরা ৪৪, ৪৫, ২৮৫, ২৮৮, ৩৪৪		ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্বন্ধীয়	
বাল্লপুরাণ	২৭	কবিতা	৫
বাইবেল, দি ৭৯, ৮০, ১৪৮, ২৬৩		বের্গস ১৪০, ১৪৩, ১৫৮, ১৬৫, ১৬১	
বাল্লগীর আশা ও নৈরাশ্য (প্রবন্ধ)	৩৪৫		১৬২, ১৮৬
বাঙাল	২৫৬	বেঠিক পথের পথিক	২৪০-২৪১
বার্ণস্	২৩৪	বেদান্তদর্শন	২৭২
বাল্লিকা বধ্	৮০-৮১	কেহু ও বাণা	৪০৮
		কোলা দেবী	২১৭

বৈতরণী	২৩১	মন্ত্র	১৫২
বৈষ্ণব কবিতা	৩৩৩	মরণ ৪১, ৫১, ৫৫-৫৭, ৬১, ৩৭৬	
বোঝাপড়া	২	মরণ-দোলা ৫২-৫৪, ৩৭৬	
বোধিচর্যাবৃত্তার	৫	মরণ-মিলন ৫৫	
বোরোবুত্ৰ	২২৫	মরীচিকা ৪২	
বো ঠাকুরাণীর হাট ৯৭, ২২৮, ৩৮৪		মহানির্বাণতন্ত্র ২৮, ১৬৫	
বাক্ককৌতুক	৮২	মহয়া ২৭৮-২৭৯, ২৮১, ৩২৮, ৩৩০, ৩৫৩	
ব্রহ্মসঙ্গীত ২১, ৩৩২		মাইকেল মধুসূদন ৫৮, ২৮১, ৩২৪	
ব্রাউনিং, রবার্ট ২৬, ৩৮, ৫৪, ৬৯		মাইক্রোস্কেপোগ্রাফি ৩৪	
৮১, ১১৪, ১৩৬, ১৪৬, ২৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭		মার্ক, সেন্ট ৭২	
ব্রাহ্মণ ৪০৪		মাঘের বুকে সকৌতুকে ২৩৪	
ব্রুক্‌স্টপ্‌কোর্ড ১৯২		মার্চেন্ট অব্‌ ভেনিস্ ৬২	
ব্লু বার্ড ৩৪		মাতাল ৬-৭	
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ ২৬		মাতৃশ্রাবক ৩২১	
ভব্যান (Vaughan) ৩৫		মাদমোয়াজল ও মোপা ৪০২	
ভজন পূজন সাধন আরাধনা ১১৫-১১৬		মানস ভ্রমণ ৪৪	
ভাস্কা মন্দির ২৩৮		মানস সুন্দরী ৩৪৪	
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৩৩৬, ৩৭২		মানসী ১, ১৪২, ২৮৮, ৩২৬, ৩২৮, ৪২৮	
ভাবনা নিয়ে মরিস্‌ কেন ফ্রেপে ১৮১		মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ১১	
ভাবা কাল ২৩১		মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটক ও কণিকার সেকাল ২	
ভাব ৮২		মালবায়জী, পণ্ডিত মদনমোহন ১২৮, ৪০১	
ভারততীর্থ ১১৩-১১৪, ৩২৬		মালিক মহম্মদ জায়সী ৩৩২	
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৩৬৩		মালিনী ও নৈবেদ্যের মুক্তি (তুলনায় আলোচনা) ২৩	
ভাষা ও ছন্দ ২৪৪		মিলটিন ৮৮, ২৪৬	
ভিউলিয়ামি, সি. ই. ৫৭		মিসটিক্‌, দি ১৪৬	
ভীরাভা ৭		মীরাবাই ৮০	
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৫৭		মুক্তধারা ৯৭, ২২৬-২২৮, ৩২২	
মঙ্গল গীতি ৩৪২		মুক্তি ২২-২৬, ২১৮-২১৯, ২৩৩, ৩৩৫	
মদন সেখ ৪৮		মৃত্যু ও অমৃত ৩২২	
মণিমঞ্জুষা ৫৪, ১৫২		মৃত্যুর আহ্বান ২৩১, ২৫৮, ৩৬৪	
মনকে আমার কারাকে ১১২		মৃত্যুঞ্জয় ২২৪, ৩৩৭	
"মহম্মদ" ৩৭৪			
মহুসংহিতা ২৭			

মৃত্যুশাধুরী	২৯-৩১	রঘুবংশ	১০, ২৭
মৃত্যুর পরে	৩৭৬, ৩৮০	রঘুবংশম্	
মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা		ও ক্ষণিকার সেকাল	৯
	২৯, ৩৭২-৩৯৪	রজনীকান্ত সেন	৪০৫
মেঘদূত (প্রবন্ধ)	২৫২	রজ্জবজী	৩৩২
মেঘদূত ও ক্ষণিকার সেকাল	৮	রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমণ	৩১৩-৩৩৮
মেঘনাদবধ	৫৮	রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর	
মেটার্লিঙ্ক	৩৪, ৫৭, ১০০		৩৩৮-৩৫৪
মেরিডিথ্	৫৪, ১৬৪, ৩৩৭	রথের রশি	২৯৮
মোহিতচন্দ্র সেন	২৯, ৩৩, ৪১, ৪৫, ১৪১, ৪০৭	রবীন্দ্র-পরিচয়	৩৯৪-৪৩১
মোহিতচন্দ্র সেন—ক্ষণিকার		রবি বেন্ এজরা	
ভীরুতা কবিতা সম্পর্কে	৭	(Rabbi Ben Ezra)	২৬, ১৪৬
ম্যাথ্. সেন্ট্	৮৩, ১৩১	রমা' রল'	৫৪, ৩৩৭
যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি	১৮৭-১৮৮	বাজা	৯৬, ১১১-১২৪, ১২৮, ৩২৪, ৪২৩
যথাস্থান	৭	রাজা ও রানী	৩১৭
যমুনা পুলিনের ভিখারিণী	৪২৭	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	৩০২
যাত্রা	৪০, ৬৫, ২৩১	রাজি	২৬৩, ২৬৫
যাত্রাশেষ	১৩৫-১৩৬, ২৬২	রাতে ও প্রভাতে	২০
যাত্রী	১২, ২৪৩, ২৫৩, ২৮৩, ২৯৫, ৩৫২, ৩৭৭	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৪০৭
যামিনীপ্রকাশ পড়েপাধ্যায়	৮৯	রিকলেবশানন্স অব্ আলি চাইল্ড্-	
মৃগান্তর	২৮	ছড্	৪৪
মুরোপ-প্রবাসীর পত্র	৩৫৬	রিট্-ট্, দি	৩৪
মুরোপ-বাত্রীর ডায়ারী	৩৫৬	রীস, আর্নেস্ট	
যেতে নাহি দিব	৩১৭, ৩৪৪	রবীন্দ্রনাথের শিশুসম্বন্ধীয়	
যে দিন উদিলে তুমি		কবিতা সম্পর্কে	৩৯
বিশ্বকবি দূর সিঙ্কু-পারে	১৮০	রূপ	১৪৮
যে দিন তুমি আগনি ছিল একা		রূপক	৪১, ৪৮, ৬৮
	২০৮-২১১	লক্ষ্মীর পরীক্ষা	৮৯
যেন শেষ-গানে মোর সব রাগিণী পুরে		লংফেলো	৬, ৫৬
	১১৮	লাজপৎ রায়	১২৮
যৌবন	৭, ২১৫-২১৬	লিউক্, সেন্ট্	৭৯, ৮০
যৌবন-বেগন-বেগন-রসে		লিপি	৬৯, ২৫৩-২৫৬
উজ্জ্বল আমার দিনগুলি	১৬৯	লিপি	২১৭, ২২৬
যৌবন-স্বপ্ন	২৪১, ৪২	লী, ভার্মনন্	১৫৪
রক্তকরমী	৪৪, ২৭২-২৭৪	লীলা	৪৮, ৫৯

লীলাসঙ্গিনী	২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৯,	শেকসপীয়ার	৪০৯
	২৪০	শেলী	৩৯, ৪০, ৪৩, ৫১, ৫২,
লে অডেগ্লস্	৫৭		১৪৬, ২৩৪, ২৪৫, ২৬৩
লে হাণ্ট	২৬	শেলীর Adonais ও স্মরণ	৩১
লেখন	২৭৮-২৭৭	শেষ	১২০, ২১৭, ২৩১, ২৮৪
লেজ্ অব্ দি লাস্ট্ মিন্সট্রেল	২৬	শেষ খেয়া	৭২-৭৬, ৮৫, ৩১০
লোকালয়	৪১, ৬৭	শেষ দৃশ্য	৩৩০
লোটাস্ ইটার	৮৮	শেষ বসন্ত	২৩১
লুক্সলা (নাটক)	১০, ১১, ১২৮,	শেষ বর্ষণ	২৩০
	১২৯, ২৩৪	শেষ পূজারিণী	২৫১, ২৫২
লক্ষরাচার্য		শেষের কবিতা	২৮১
ও সত্যের লক্ষণ	১৩৯, ৩৪০	শেষের মধ্যে অশেষ আছে	১১২-১২০
লজ্জা	১৪৭-১৪৮, ৩২০, ৪৩২	খেতাবতর উপনিষৎ	
লরৎকাল (বিহারীলাল রচিত)	২৮৫	ও নৈবেদ্যের শৃঙ্খল বিধে	২৭
লরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		শ্রীবিজয়	২২৫
ও গতিবাদ	১৪১	শ্রীবিজয়লক্ষ্মী	২৮৩
শাজাহান	১৪২, ১৫৬-১৬০	শ্রীমদ্ভাগবদগীতা	২৭
শাহুলকর্ণাবদান	৩০২	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	৩৪২, ৪০২
শাস্ত্রা দেবী	৩০	শ্রুতি	২৭
শাস্তিদেব	৫	সখারাম গণেশ দেউঙ্কর	২৬৬
শাপমোচন	৫৫	সঙ্কলন	২৩
শারদোৎসব	৮৯-৯৬, ১০৩, ১২১	সঙ্কল্প	৪১, ৬০
	১২৪, ১২৬, ৪১০	সঙ্কর	২৩
শিক্ষা	২৭-২৮, ৩২৬	সঙ্করিতা	৪২, ৪৩, ৫৫, ৬০
শিক্ষার হেরফের	৩৬৮	সঙ্কিতা	২২৫
শিবাজী	৩৬২	সন্তী	৩৩১, ৩৩২
শিবাজী-উৎসব	২৬৬	সন্তীশচন্দ্র রায়	৩০৩
শিবাজীর দীক্ষা	২৬৬	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৩, ১০০, ৪০৮
শিলালিপি	৫৭		৪০২, ৪২১, ৪২৭
শিশিরকুমার মৈত্র	৪৪	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	
শিশু	৩২-৩৩, ৪১	ও তাজমহলের প্রশস্তি	১৫৯
শিশু ভোলানাথ	২২২-২২৫, ২৩০,	সঙ্কাসঙ্কীত	১, ২৮৬
	৩২০, ৩৫১	সর্বদেহের ব্যাকুলতা কি বলতে	
শিশুসীলা	৩৩-৩৪	চায় বাণী	১২৭
ভক্তকণ ও ভাগ	৭৭-৭৮, ২৫২	সব পেয়েছির দেশ	৮৭-৮৮
শৃঙ্খল বিধে	২৭	সবলা	২৮০, ৩২৯, ৩৩০

সবুজের অভিযান	১৪৩	স্বদেশ প্রেম (রবীন্দ্রনাথের)	৩৫৪-৩৭১
সমাপন	২৩১	স্বার্থের সমাপ্তি	২৮
সমুদ্র	১৩৫, ১৭৬, ২৬৩	স্বরগ	২৯, ৪১
সমুদ্রের প্রতি	৪৫, ১১০	স্লামস্ অ্যাগনিস্টিস্	১ ২৪৬
সরলা দেবী	৩৪৫, ৪০৫	শ্রোত	৪৬, ৩১৮, ৩৪২, ৩৫৯
সল	২৬	শ্রোতের ফুল	৪২২
সলোমনের সাম	৩৩৩	হতভাগ্য	৪১
সং অব্ দি ওপন্ রোড্, দি	১৭৭	হতভাগ্যের গান	৩২২
সাগরিকা	২৮২-২৮৩	হাইল্যান্ড্ মেরী (Highland, Mary)	২৩৪
সান্ন হয়েছে রণ	৬৩	হাউণ্ড্ অব্ হেভন্	৩৫
সাজাহান	৩৯, ৩৬০, ৪৩২	হাডিজ্, লর্ড	৪২৭
সাবিত্রী	২৪২-২৪৬	হাফিজ্	৮০
সিমান	২৯৫	হার	৩১৩
সীতারাম (উপস্থাস)	৩২৪	হারিয়ে যাওয়া	২২০-২২১
সীমার মাঝে অসীম ভূমি	১১৬	হাস্তকৌতুক	৮২
সুদ্ব	৪৩-৪৫, ১১০, ১৭৫, ৩৮১	হাতী, এফ্, ডব্লিউ	১৭৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪২৭	হিমাত্রি	৫৭-৫৯, ৩১০
সুরদাসের প্রার্থনা	৩২৮	হিমালয়	৫৭
সুরেশ আইচ	৪০১	হিমায়ম্ (মিসেম্)	১৭৭
সুরেশ মহাজ্ঞপতি	৩৯৮	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৯৫
সুফী কবি	৫, ৩৩৩	হিং টিং ছুট্	৩২৫
সুফী সাধক	৩৩২	জুইটম্যান	৫, ১১৪, ১৭৭
সুষ্টিকর্তা	২৩৩, ৩৮৫	জদয় অরণ্য	৪১, ৪৬
সেকাল	৮-১১	হেগেল	
সেক্সপীয়ার		ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসাদৃশ্য	২৫
ও নবীনতার জয়গান	১৪৫	হে প্রিয় আজি এ প্রাতে	১৬৫-১৬৬
সেণ্ট্ অগাস্টিন্ ইভ্	৮১	হে ভুবন আমি যতক্ষণ	১৮৬-১৮৭
সেণ্ট্ জন্	১৩১	হেমচন্দ্র	২৮৫, ৩৯৪
সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ অক্ এ্যাসিসি	৩৩৩	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০
স্নেহগ্রাস	৩২৬, ৩৫৯	হে মোর দেবতা	১১২
স্নেহময়ী	২৮৭	হেরস যৈজ	৩৯৭
সোনার তরী	৪১, ৪২, ৪৫, ৬৬, ১৩০, ২৭২, ২৮৮, ৩৫৩, ৩৪৩, ৪২৮	হে রাজন্, ভূমি আমারে	৬৭-৬৮
স্টু	২৬	হোলম্, অলিতার ওয়েগেল	৪০৫
স্বর্ণ হইতে বিদায়	৩৩৪	হ্যান্সেল্ সলিলকি	৫২
স্বদেশ	৪১	হামিল্টন্-কিং হারিয়েট্ ইলিনর	৮০





